নিবেদন

গত বছর আমাদের 'খেলাধূলার আধুনিক নিয়ম-কানুন' বইটির অসাধারণ সমাদর লাভের সঙ্গে সঙ্গেই বহু শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবক-অভিভাবিকার কাছ থেকে এই অনুযোগও আসতে থাকে যে আমরা 'কর্মশিক্ষা, শারীর-শিক্ষা এবং সমাজসেবা ও বিদ্যালয়কৃতি'—এই সব কিছুর উপর একটি পূর্ণাঙ্গ বই না লিখে শুধু শারীর-শিক্ষা (যাতে মাত্র ৩০ নম্বর) নিয়ে লিখলাম কেন।

কথাটা ঠিক, বিশেষতঃ যখন অনুবন্ধ-প্রণালীর (Correlative Method) মাধ্যমে শিক্ষাদানই কাম্য। কিন্তু ক্রীড়া-সাংবাদিক হিসাবে আমরা স্বাভাবিক-ভাবেই শারীর-শিক্ষা অংশটির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলাম আর আমাদের হাতে গত বছর সময়ও ছিল অত্যন্ত অল্প। গত বছর পুরো ১০০ নম্বরের বই দিতে পারিনি বলে আমরা যতখানি লজ্জিত হয়েছিলাম, আজ আমাদের এক বছর-ব্যাপী পরিশ্রমের ফসল ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা তার চেয়ে অনেক বেশী আনন্দিত। আশা করি, নতুন রূপে নতুন সাজে বইটি আগের বইটির মতই আদর পাবে।

কর্মশিক্ষার প্রচলিত বইগুলিতে কর্মশিক্ষা সম্পর্কে ছাত্র-ছাত্রীদের কোনও ধারণা দেবার চেষ্টাই করা হয়নি। ছাত্র-ছাত্রীরা একটা নতুন বিষয় শিখছে। কিন্তু "কেন"? কে তাদের এই জিজ্ঞাসাকে তৃপ্ত করবে? এইজন্যেই **আমরা প্রথম অধ্যায়ে কর্মশিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করেছি—এ-পর্যন্ত যেটা অন্য কোনও স্কুল-পাঠ্য বইতে অনুপস্থিত। শুধু তাই নয়, আমরাই সর্বপ্রথম ওয়ার্ক বুক লেখার পদ্ধতির নমুনা দিয়েছি বইতে।**

কিন্তু এহ বাহ্য। যে পুঁথিগত শিক্ষাকে বিদায় দেবার জন্যে কর্মশিক্ষার নব-অভিষেক, তাকে অনেকেই পিছনের দরজা দিয়ে আবার ডেকে আনছেন। তাই কেউ কেউ তাঁদের বইয়ের অনুশীলনীতে "যাহা-জান-লিখ"-জাতীয় অজস্র প্রশ্ন সন্নিবিষ্ট করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন যে, তাঁদের বই থেকে ১০০ নম্বরের উত্তর করা যাবে। আবার কেউ-বা তাঁদের বইটিকে 'মোটা' দেখানোর জন্যে মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ-প্রকাশিত সিলেবাসের কর্মশিক্ষা ইত্যাদি অংশটুকু ছেপে বইয়ের

সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন। কিন্তু আমাদের বইতে বার বার যে-কথা বলেছি তা হল এই যে, শুধু বই পড়ে কাজ শেখা যায় না, হাতে-কলমে করতে হয়।

'বই পড়ে শেখা যায় না' অর্থ এই নয় যে, বইয়ের কোনও দরকারই নেই; আমরা সে-কথা কোথাও বলিনি। অর্থ এই যে, বইয়ের ভূমিকা মুখ্য নয়, গৌণ। **তাই যাঁরা ভুলবশতঃ বলছেন যে "কর্মশিক্ষা, শারীর-শিক্ষা ইত্যাদি 'প্র্যাক্‌টিক্যাল' বিষয়, ওর আবার বইয়ের দরকারটা কী?" তাঁদের সবিনয়ে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন প্রভৃতির প্র্যাক্‌টিক্যাল পরীক্ষা আজ পর্যন্ত যত ছাত্র-ছাত্রী দিয়েছে তাদের মধ্যে বইয়ের সাহায্য নেয়নি এমন কেউ আছে বলে আমাদের জানা নেই।**

বইটির নূতন অংশ লেখার ব্যাপারে হুগলী জেলা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক শ্রীঅনিলকুমার দত্ত আমাদের নানাভাবে সাহায্য করেছেন, তাঁর সাহায্য ছাড়া এই কাজ একেবারেই সম্ভব হত না। এ ছাড়া যাঁরা সাহায্য করেছেন তাঁরা হলেন শ্রীনকুল চট্টোপাধ্যায় (আনন্দবাজার পত্রিকা কার্যালয়ের গ্রন্থাগারিক), শ্রীসুরথ বসু (ঘুটিয়াবাজার মল্লিকবাটী পাঠশালা, হুগলী), শ্রীমতী আরতি মিত্র (বিনোদিনী বালিকা বিদ্যালয়, হুগলী), কল্যাণীয়া কাজল সরকার ও ভারতী কর্মকার। এঁদের সকলের সঙ্গেই আমাদের সম্পর্ক ধন্যবাদের ঊর্ধ্বে, তাই সে-চেষ্টা থেকে বিরত রইলাম। যেমন রইলাম রবীন্দ্র লাইব্রেরীর কর্ণধার শ্রীরবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস এবং প্রকাশন-সংস্থাটির সমস্ত কর্মীর ক্ষেত্রে।

বইটি লেখার কাজ যখন শেষ তখন সানন্দ বিস্ময়ে আবিষ্কার করলাম যে, পর্ষৎ-সভাপতি শ্রীসত্যেন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় নিজেই "মধ্যশিক্ষার রূপান্তর" নামে কর্মশিক্ষার উপর একটি পুস্তিকা রচনা করেছেন। আমাদের দুর্ভাগ্য এটি আমরা আগে হাতে পাইনি, পেলে এ-থেকে অনেক কিছু গ্রহণ করা যেত। অবশ্য, **"কর্মশিক্ষার পরীক্ষা কীভাবে নেওয়া হবে"** অংশটি ঐ পুস্তিকা থেকে আমরা উদ্ধৃত করেছি।

বইটি যদি ছাত্র-ছাত্রীদের কাজে লাগে তবেই আমাদের পরিশ্রম হয়ে উঠবে সার্থক। ছোট-খাটো ভুল-ত্রুটি থাকতে পারে, সেগুলির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করলে বাধিত হব।

বিনীত—

গ্রন্থকারদ্বয়

কর্মশিক্ষার পরীক্ষা কীভাবে নেওয়া হবে

সে-সম্পর্কে পর্ষদের সিদ্ধান্ত

"(১) নবম ও দশম শ্রেণীর প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রী অন্ততঃ দুটি প্রজেক্ট ওয়ার্ক করবে, যা হবে উৎপাদনমূলক ও যার শিক্ষাগত মূল্য আছে।

(২) এই কাজে প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীকে একক বা দলগতভাবে অংশগ্রহণ করতে হবে (বিকলাঙ্গ বা শারীরিক শ্রমে সম্পূর্ণ অসমর্থ বিদ্যার্থী ব্যতীত)।

(৩) প্রত্যেকের কাজের রেকর্ড রাখতে হবে। ওয়ার্ক বুকে তা নিয়মিতভাবে লেখা থাকবে এবং সেই বইগুলি স্কুল কর্তৃক সংগৃহীত ও সংরক্ষিত হবে।

(৪) ফাইন্যাল পরীক্ষার জন্য সেই সকল ওয়ার্ক বুক উপস্থাপিত করতে হবে পর্ষৎ-নিযুক্ত পরীক্ষকদের কাছে।*

(৫) কোন্ ছাত্র কোন্ গ্রুপে** বা দলে একত্রে কাজ করছে তার রেকর্ড থাকবে।

(৬) পর্ষৎ-কর্তৃক অনুমোদিত ফরমুলা অনুযায়ী কাজের মূল্যায়ন হবে এবং গ্রুপের প্রত্যেককে তদনুসারে মার্ক দেওয়া হবে।*

(৭) পরীক্ষার্থীর ব্যক্তিগত কর্মকুশলতা নিরূপণের জন্য **বাইরের পরীক্ষকগণ কাজের রেকর্ডের ভিত্তিতে মৌখিক প্রশ্নাদি করবেন এবং পরীক্ষকগণ যুক্তভাবে বিচার-বিবেচনা করে মার্ক দেবেন। প্রয়োজনবোধে কাজের নমুনাপরীক্ষাও হতে পারে।*** কী ধরনের প্রশ্ন কোন্ কাজের উপর হতে পারে তার আভাসসহ প্রয়োজনীয় নির্দেশপত্র পর্ষৎ-কর্তৃক প্রত্যেক স্কুলে যথাসময়ে প্রেরিত হবে।

(৮) পর্ষৎ-কর্তৃক নিযুক্ত প্রধান পরীক্ষক এবং রিভিউ বোর্ড চূড়ান্ত পর্যায়ে প্রত্যেক পরীক্ষার্থীর মার্ক স্থির করবেন।"*

সূচীপত্র

॥ কর্মশিক্ষা ॥

বিষয়

॥ খেলাধুলা ॥

*চিহ্নিত খেলাগুলি কেবল ছাত্রীদের জন্যে।

॥ সমাজসেবা ও বিদ্যালয়কৃতি ॥

পরিশিষ্ট

কর্মশিক্ষা

"পাখিটা মরিল। কোন্‌কালে যে কেউ তা ঠাহর করিতে পারে নাই। নিন্দুক লক্ষ্মীছাড়া রটাইল, 'পাখি মরিয়াছে।'

ভাগিনাকে ডাকিয়া রাজা বলিলেন, 'ভাগিনা, এ কী কথা শুনি!' ভাগিনা বলিল, 'মহারাজ, পাখিটার শিক্ষা পুরা হইয়াছে।'

রাজা শুধাইলেন, 'ও কি আর লাফায়?'

ভাগিনা বলিল, 'আরে রাম!'

'আর কি ওড়ে?'

'না।'

'আর কি গান গায়?'

'না।'

'দানা না পাইলে আর কি চেঁচায়?'

'না।'

রাজা বলিলেন, 'একবার পাখিটাকে আনো তো, দেখি।'

পাখি আসিল। সঙ্গে কোতোয়াল আসিল, পাইক আসিল, ঘোড়সওয়ার আসিল। রাজা পাখিটাকে টিপিলেন। সে হাঁ করিল না, হুঁ করিল না—কেবল তার পেটের মধ্যে পুঁথির শুকনো পাতা খস্‌খস্ গজ্‌গজ্ করিতে লাগিল।

বাহিরে নববসন্তের দক্ষিণহাওয়ায় কিশলয়গুলি দীর্ঘনিশ্বাসে মুকুলিত বনের আকাশ আকুল করিয়া দিল।" (রবীন্দ্রনাথ : তোতাকাহিনী)

প্রথম পরিচ্ছেদ

কর্মশিক্ষা কী এবং কেন

প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থায় লক্ষ্য করা যায় কেবল বই এবং নির্ভেজাল পুঁথিগত পদ্ধতির মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীর বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশের প্রয়াস। কোনও রকমে বই মুখস্থ করে পরীক্ষার খাতায় উগ্‌রে দিতে পারলেই কৃতিত্বের সঙ্গে পরীক্ষায় পাশ করার কোনও অসুবিধা থাকে না। আজকাল আবার এই মুখস্থ করার কষ্টটুকুও অনেক ক্ষেত্রে করতে হয় না—দল বেঁধে গুণ্ডামি করে যে যত খুশি বই-খাতা নিয়ে বসে উত্তরপত্রে উত্তর টুকে আসার বা 'গণ-টোকাটুকি'-র রেওয়াজ প্রবর্তিত হয়ে গেছে। ফল—সকলেই 'পাশ', কেউ 'ফেল' নয়! শিক্ষার কি নিদারুণ 'অবমূল্যায়ন' (devaluation)!

টোকাটুকি, তা এককভাবেই হোক আর গণ-টোকাটুকিই হোক, জঘন্য, নিন্দনীয় ও ঘৃণ্য অপরাধ এ-বিষয়ে দ্বিমত নেই। কিন্তু সৎভাবে পরীক্ষা দিয়ে যে এক শ্রেণীর তথাকথিত 'পণ্ডিত' তৈরী হচ্ছে, অধীত বিষয় সম্পর্কে তাদের ধারণাই কি সুস্পষ্ট? লব্ধ জ্ঞানের প্রয়োগ জীবনের উপযুক্ত ক্ষেত্রে করতে কি তারাই পারে?

না। তারা সে-বিষয়ে শোচনীয়ভাবে অক্ষম। একজন এম. এ., পি. এইচ. ডি., পি. আর. এস., ডি. লিট. 'পণ্ডিত' ব্যক্তি সন্দেহ নেই, কিন্তু দেশকে তিনি কতখানি দিতে পারেন? বিশেষতঃ, উন্নয়নকামী যে দেশের প্রয়োজন উৎপাদন, আরও উৎপাদন?

পুস্তককেন্দ্রিক শিক্ষা আজ আমাদের এমন একটা জায়গায় এনে দাঁড করিয়েছে যে, একদল তথাকথিত 'শিক্ষিত' ব্যক্তির সৃষ্টি হয়েছে, যারা পরিবর্তনশীল সমাজে অচল এবং দেশের বোঝাস্বরূপ। দিনের পর দিন বেড়ে উঠছে একই ধরনের কর্মপ্রত্যাশীর ভিড়, কিন্তু প্রত্যাশা পূরণের বদলে আসছে হতাশা।

এইভাবে দেখা যায়, আমাদের গতানুগতিক, ছকে-বাঁধা শিক্ষা-ব্যবস্থা ছাত্র-ছাত্রীদের সাময়িকভাবে কাজকর্ম থেকে দূরে সরিয়ে রাখে এবং একটা কৃত্রিম পরিবেশে ভবিষ্যতে সমাজ-জীবনে অংশগ্রহণের উপযোগী করে তাদের গড়ে তোলার চেষ্টা হয়। এইভাবে **সৃষ্ট হয় শিক্ষা-জগৎ ও কর্ম-জগতের মধ্যে একটা ব্যবধান।** এর ফলে শিক্ষা হয় নিরর্থক—সবদিক থেকেই। এ শিক্ষা

না করে তাদের জীবনের সমস্যা সমাধানে সাহায্য, না করে পারিবারিক ও সামাজিক দায়িত্ব পালনে সাহায্য। সুস্থ-সবল দেহ ও মন, ধৈর্য, কর্মক্ষমতা দেশপ্রেম, সহযোগিতা, স্বার্থত্যাগ, দায়িত্ব পালনের ক্ষমতা, সাহস, কর্তব্যবোধ, রুচিবোধ, সত্য, শিব ও সুন্দরের প্রতি শ্রদ্ধাবান হওয়া, নেতৃত্ব করার যোগ্যতা—এ সব পুঁথিগত শিক্ষা আমাদের দেয় না। তাই, ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যক্তিত্বের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ যদি শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য হয়, প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থা সেখানে নিদারুণভাবে ব্যর্থ।

অথচ এই শিক্ষা-ব্যবস্থাই আমাদের দেশে চলে আসছে বহুদিন ধরে। ইংরেজপ্রভুরা তাঁদের স্বার্থে কেরাণী তৈরী করার যে শিক্ষা-ব্যবস্থার বিষবৃক্ষ পুঁতেছিলেন তার ফলের বিষে আজ সারা ভারত জর্জরিত।

মহাত্মা গান্ধী বুঝতে পেরেছিলেন যে, ব্রিটিশরাজের চাপিয়ে দেওয়া শিক্ষা-ব্যবস্থা ভারতের পক্ষে সাংঘাতিকভাবে ক্ষতিকারক হবে। তাই ১৯৩৭ সালে তিনি শিক্ষা-সংস্কারের এক পরিকল্পনা তৈরী করেন—যার নাম ওয়ার্ধা পরিকল্পনা। পরের বছর গান্ধীজীর অনুপ্রেরণাতেই বুনিয়াদী শিক্ষা-পরিকল্পনা রচনা করা হয়। বুনিয়াদী শিক্ষা-পরিকল্পনায় ৬ থেকে ১৪ বছর-বয়স্ক বালক-বালিকাদের শিক্ষার কথা বলা হয়েছিল এবং এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল নানারকম শিল্পকাজের মাধ্যমে শিক্ষা। ১৯৪৫ সালে গান্ধীজী তাঁর 'নঈ তালিম' পরিকল্পনা পেশ করেন—যাতে শুধু প্রাথমিক শিক্ষা নয়, সব বয়সের সব স্তরের মানুষের উপযোগী শিক্ষার কথা বলা হয়।

স্বাধীন ভারতে তৃতীয় শিক্ষা কমিশন বা কোঠারি কমিশন সর্বপ্রথম **Work Education** বা কর্মমুখী শিক্ষা বা কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার (আমরা **কর্মশিক্ষা** কথাটিই ব্যবহার করছি) প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। কোঠারি কমিশন একথা বার বার জোর দিয়ে বলেন যে, **শিক্ষা এবং উৎপাদন পরস্পরের সহায়তায় এগিয়ে চলবে**। জীবন এবং উৎপাদনের সঙ্গে শিক্ষার সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। অন্যভাবে বলা যায়, জাতীয় পরিকল্পনায় উৎপাদনের যে-সব লক্ষ্যমাত্রা স্থিরীকৃত হচ্ছে, সেগুলিতে পৌঁছতে গেলে কঠোর পরিশ্রমের প্রয়োজন, তাই সুরু থেকেই শিশুদের মনে সঞ্চারিত করতে হবে কর্মপ্রীতি, কর্মের প্রতি এক ইতিবাচক মনোভাব। যেটা একমাত্র হাতে-কলমে কাজ করতে করতেই সম্ভব।

সুতরাং পুঁথিগত শিক্ষার সঙ্গে কর্মশিক্ষার সমন্বয় ঘটাতে হবে। পুঁথিগত

বিদ্যার প্রয়োজন জীবনে কিছুটা আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু তা ব্যক্তিত্বের সামগ্রিক বিকাশে সাহায্য করে না।

ব্যক্তিত্বের সামগ্রিক বিকাশের জন্যে যে অভিজ্ঞতালাভ, সেটাই কর্মশিক্ষা। প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থা শিক্ষাজগৎ ও কর্মজগতের মধ্যে যে-ব্যবধান সৃষ্টি করে, সেই ব্যবধান দূর করার জন্যেই চাই শিক্ষার সঙ্গে কর্মের সমন্বয়, যাকে বলা হচ্ছে **কর্ম-অভিজ্ঞতা**। কোঠারি কমিশন সুপারিশ করেছিলেন সাধারণ ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার অচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে 'কর্ম-অভিজ্ঞতার' (Work experience) প্রবর্তন।

এই **কর্ম-অভিজ্ঞতাই হল কর্মশিক্ষা**। বস্তুতঃ, শিক্ষা আর অভিজ্ঞতা সমার্থক। প্রকৃত শিক্ষা হল সমস্ত অভিজ্ঞতার সমষ্টি। কোঠারি কমিশন কর্ম-অভিজ্ঞতার এই সংজ্ঞা দিয়েছেন :

"Work experience is participation in productive work in school, in the home, in a workshop, in a farm, in a factory or any other productive situation."

অর্থাৎ বিদ্যালয়ে বা বাড়ীতে বা ওয়ার্কশপে, খামারে, শিল্প-প্রতিষ্ঠানে বা যে-কোনও উৎপাদনমূলক কাজ-কর্মে অংশগ্রহণ করাই হল কর্ম-অভিজ্ঞতা।

উপরের সংজ্ঞা থেকেই বোঝা যায় কর্মশিক্ষা তথা কর্ম-অভিজ্ঞতা কী এবং এই শিক্ষা কীভাবে প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থার গোড়ার গলদটি দূর করে শিশুর সমন্বয়পূর্ণ বিকাশে সাহায্য করবে এবং উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের অপরিহার্য নাগরিক হিসাবে তাকে তৈরী করবে।

পুঁথিগত শিক্ষার মূল ত্রুটি-টি দূর করা অর্থাৎ জীবন এবং জীবিকার সঙ্গে শিক্ষার সমন্বয় ঘটানো ছাড়াও কর্মশিক্ষা অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যও সাধিত করবে :

(১) ছাত্র-ছাত্রীদের আত্মনির্ভরশীলতা এবং শ্রমের মর্যাদাবোধ শেখাবে।

(২) ছাত্র-ছাত্রীদের কর্মদক্ষতার ফলে জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।

(৩) কর্ম-অভিজ্ঞতার মাধ্যমে ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হওয়ায় সামাজিক ও জাতীয় সংহতি শক্তিশালী হবে।

(৪) দেশের সামাজিক লক্ষ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ সামাজিক কুশলতা অর্থাৎ সহযোগিতা, সহিষ্ণুতা, নেতৃত্বক্ষমতা, সহমর্মিতা, অধ্যবসায়, দায়িত্ববোধ ইত্যাদিকে উজ্জীবিত করবে।

(৫) সামাজিক সংহতি স্থাপনে সহায়তা করে সামাজিক ব্যবধান দূর করবে।

(৬) ছাত্র-ছাত্রীদের দক্ষ ক্রেতা হওয়ার পথ সুগম করে দেবে।

(৭) তাদের মধ্যে সমস্যা-সমাধান ক্ষমতা সঞ্চারিত করবে।

(৮) ছাত্র-ছাত্রীদের আত্মপ্রচেষ্টাসম্পন্ন, আত্মপ্রত্যয়শীল এবং কষ্টসহিষ্ণু করে তুলবে।

(৯) উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রীর ব্যবস্থা করতে পারলে ছাত্র-ছাত্রীরা শিখতে শিখতেই উপার্জন করতে পারবে।

[**দুই**]

কর্মশিক্ষা কী এবং তার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে এতক্ষণ আলোচনা করা গেল। এবার দেখা যাক্, **বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের কীভাবে কর্মশিক্ষা দেওয়া হবে**। ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীদেরই কর্মশিক্ষা আবশ্যিক। তার মধ্যে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরা যা শিখবে, নবম ও দশম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যে তা একটু অন্যরকম।

প্রথম পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের চেনা পরিবেশের কর্ম-জগতের সঙ্গে পরিচিত হবে—প্রথমে নিজেরাই প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ না করে উৎপাদনাত্মক ক্রিয়াকলাপের (Productive activity) প্রকৃতি এবং পদ্ধতি নিরীক্ষণ করবে এবং তা অনুধাবন করার চেষ্টা করবে। শিক্ষক বা শিক্ষিকা তাদের নিয়ে যাবেন গ্রাম বা শহরের কাছাকাছি বিভিন্ন কৃষি বা শিল্প বা বাণিজ্যকেন্দ্রে। কোথায় নিয়ে যাওয়া হবে তা আগে থেকে ব্যবস্থা করা থাকবে, এটা বলা বাহুল্য। গিয়ে কী দেখা হবে সে বিষয়ে আগে খানিকটা আলোচনা করা হবে, আবার ফিরে এসেও কী দেখা হল সে বিষয়েও বিশদ আলোচনা করা হবে। আর, সব চেয়ে বড় কথা হল, **নিরীক্ষণ এবং তার সাহায্যে লব্ধ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফলগুলি যথাযথভাবে ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের Work Book-এ লিখে রাখবে**। কী ভাবে লিখে রাখবে সে বিষয়ে শিক্ষক বা শিক্ষিকাগণ পরামর্শ দেবেন।

কর্মশিক্ষার অর্থ বৃত্তিশিক্ষা বা কারিগরী শিক্ষা নয়। কিন্তু বিভিন্ন কর্মকেন্দ্র দেখতে দেখতে ছাত্র-ছাত্রীদের নিজেদের হাতে কিছু করবার ইচ্ছা হবেই। ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণীতে সে সুযোগও আংশিকভাবে তাদের মিলবে। তারা

কিছু কিছু সহজ হাতের কাজ—যা অল্প চেষ্টায় বা পরিশ্রমে করতে পারা যায়—তাই করবে। এই হল কর্মশিক্ষার প্রথম পর্যায়।

কিন্তু দ্বিতীয় পর্যায়ে অর্থাৎ **নবম ও দশম শ্রেণীতে** ছাত্র-ছাত্রীরা শুধু নিরীক্ষণের মাধ্যমেই বস্তুসাপেক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করার চেষ্টা করবে না। সহজ কাজও তাদের আর করতে দেওয়া হবে না। তখন **সমস্যাসঙ্কুল উৎপাদন-প্রক্রিয়ার সঙ্গে তাদের মুখোমুখি সাক্ষাৎ ঘটবে**। তাদের সামনে উপস্থিত কোনও কার্যরূপ সমস্যার সমাধান করবে বা কাজটি তারা নিজেরাই সম্পন্ন করবে। বলা হয়েছে যে, এই দৃষ্টিভঙ্গী অর্থাৎ **কার্যসমস্যা পদ্ধতি (Project method)** গ্রহণ করলেই শিক্ষার দিক থেকে কর্ম-অভিজ্ঞতার প্রয়োজন মেটানো হবে।

বেঁচে থাকতে হলে মানুষের যা যা অত্যাবশ্যক তা হল অন্ন, বস্ত্র ও আশ্রয়। এর সঙ্গে যোগ করা যায় স্বাস্থ্য। আমাদের চারপাশে নিত্য যে-সব কাজ হচ্ছে তা মানুষের এইসব মূল প্রয়োজন মেটানোর জন্যই। **এইসব সৃজনাত্মক ও উৎপাদনাত্মক কাজ ছাত্র-ছাত্রীরা দেখবে, জানবে, বুঝবে, শিখবে এবং সব শেষে নিজেরাই করবে**। সব কর্মের শিক্ষাগত গুরুত্ব তো আর সমান নয়। যে-সব কর্মের বৈচিত্র্য এবং বিভিন্ন প্রক্রিয়ার ব্যাপকতা যত বেশী, তাদের শিক্ষাগত মূল্যও তত বেশী। 'কাজ করতে গিয়ে শিশুরা যত বেশী বৈচিত্র্য ও পরিস্থিতির সম্মুখীন হবে—তত বেশী নতুন তথ্য লাভ করতে পারবে।'

সুতরাং **মুখস্থবিদ্যার স্থান এই ব্যবস্থায় নেই**। (আর টোকাটুকির তো নয়ই!) ছাত্র-ছাত্রীরা যে-সব কর্মকাণ্ড দেখবে সেগুলি যান্ত্রিক বা 'দায়সারা'-ভাবে নয়। দৃষ্ট প্রক্রিয়া 'কী' এবং 'কেন'—এ জিজ্ঞাসা যেন তাদের হয়। সব জিজ্ঞাসা তৃপ্ত করবেন শিক্ষক-শিক্ষিকারা। কর্মশিক্ষায় তাঁদের একটা বিরাট ভূমিকা রয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীরা জানতে চেষ্টা করবে: (১) সংশ্লিষ্ট কর্মে কী কী উপকরণ ব্যবহার করা হয় ও সেগুলি কোথা হতে সংগ্রহ করা হয়; (২) কর্মটির বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিবিদ্যাগত দিক, (৩) ব্যবহৃত যন্ত্রাদি (৪) কর্মটির অর্থনীতিক এবং পরিচালনাগত দিক।

এ-কথা মনে করবার কোনও কারণ নেই যে, কর্মশিক্ষা পাঠক্রমের অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কহীন। বরং ঠিক তার বিপরীত। পাঠ্যতালিকা খণ্ড খণ্ড কতকগুলি বিষয়ের সমষ্টি নয়—সেটি এক ও অবিভাজ্য। আসলে সমগ্র

জ্ঞান-জগৎটাই অখণ্ড এবং অবিচ্ছিন্ন। দু' একটি উদাহরণ নিলেই বোঝা যাবে বিষয়টি।

উদ্যান-চর্চার কথাই ধরা যাক। একটা বাগান করতে গেলে ছাত্র-ছাত্রীদের মাপজোক, বীজ, জল, মাটি, সার, আবহাওয়া, গাছের বিভিন্ন অংশ ও তাদের কাজ, এ সব কিছুর সঙ্গেই প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটাতে হবে। অর্থাৎ উদ্যান তৈরীর মাধ্যমে শিখতে হচ্ছে, ভূবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, রসায়ন বিদ্যা, ভূগোল ইত্যাদি বিষয়। তেমনি "কাতাই শিল্পে (সুতোকাটা এবং কাপড় তৈরী) কতো প্রক্রিয়াই না আছে! এই কাজ করতে হলে জমির প্রকৃতি, বীজসংরক্ষণ, চারাপালন, ওজন, টাকাকড়ির হিসাব, নানা মাপের অঙ্ক; ঐকিক নিয়ম, ভূগোল, ইতিহাস ইত্যাদি একাধিক পাঠ্য-বিষয় প্রভৃতি সমস্যার সমাধানের পথ পাবে।"

তাহলে এবার আমরা বলতে পারি, কাজের বাস্তব প্রয়োজন থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা প্রয়োজনীয় জ্ঞান পাবে এবং এই জ্ঞানলাভের বিষয়ে তাদের সাহায্য করবেন শিক্ষক-শিক্ষিকারা। এই পদ্ধতিতে পাঠদানকে বলে শিক্ষাদানের অনুবন্ধ প্রণালী (Method of Correlated Teaching)।

মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষৎ ১৯৭৪ সাল থেকে যে নতুন পাঠক্রম প্রবর্তিত করেছেন তাতে জানানো আছে ছাত্র-ছাত্রীরা কী ধরনের কাজ দেখবে এবং করবে। প্রথম পর্যায়ের দল বেঁধে কর্মকেন্দ্রে গিয়ে সুপরিকল্পিত নিরীক্ষণ (Planned Observation) সার্থকতা লাভ করবে দ্বিতীয় পর্যায়ের কর্মক্ষেত্রে সক্রিয় অংশগ্রহণে। প্রথম পর্যায়ে ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীতে বিভিন্ন পরিবেশগত কর্মের সঙ্গে পরিচয় এবং কিছু সহজ ধরনের কাজ করতে হবে। নবম ও দশম শ্রেণীতে ছাত্র-ছাত্রীরা নিজেরাই কাজ করবে এবং সেগুলি যে সহজ নয় একথা আগেই বলেছি। যে-সব কাজের তালিকা পাঠক্রমে দেওয়া আছে সেগুলি সম্পর্কে পর্ষৎ বার বার বলেছেন (Curriculum and Syllabuses for Reorganised Pattern of Secondary Education, Pp. 92, 94, 95 Work Education, Pp. 8) যে, তালিকাগুলি সম্পর্কে ধরা-বাঁধা কিছুই নেই। যে কাজগুলির কথা তাঁরা বলছেন সেগুলি আসলে দৃষ্টান্ত হিসাবে পর্ষৎ উল্লেখ করেছেন। সেই কাজগুলিই করতে হবে, **তার বাইরে কিছু করা চলবে না এমন কথা পর্ষৎ বলেননি**। বরং পরিবেশ অনুসারে প্রয়োজনের পার্থক্য ঘটতে পারে এই কথাই পর্ষৎ বলেছেন। 'The detailed programme of Work Education will vary from school to

school, according to local condition, local needs and facilites." (Work Education, Pp 12)

এই জন্যেই বলা যেতে পারে যে, **কর্মশিক্ষার নির্দিষ্ট সিলেবাস বলে কিছু নেই বা থাকতে পারে না। যেখানেই কর্ম-অভিজ্ঞতা অর্জন করা যাবে সেই সূত্রেই কর্মশিক্ষা লাভ করা যাবে।** তাই কর্মশিক্ষার কোনও বই-ই **"সিলেবাস অনুযায়ী লিখিত"** হতে পারে না, আমাদের এই বইও নয়। **কর্মশিক্ষার 'সিলেবাস' সারা কর্মজগতে ছড়িয়ে আছে।**

উপরের আলোচনার ভিত্তিতে কর্মশিক্ষা তথা কর্ম-অভিজ্ঞতার তিনটি ক্ষেত্রের কথা বলা যায়—

(১) সামাজিক উপযোগিতা আছে এমন সব কার্যসমস্যার সমাধান। (Socially useful Work Projects.)

(২) বৃত্তিমূলক পরিভ্রমণ (Occupational exploration)

(৩) নূতনের প্রবর্তন (Innovation)

(১) মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদের নির্দেশ হল তিনটি ক্ষেত্রেরই মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের কর্ম-অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে হবে। প্রথম ক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীরা এককভাবে এবং যৌথভাবেও কার্যসমস্যার সমাধান করবে। সামাজিক দিক থেকে উপযোগিতা আছে, এমন জিনিস ছাত্র-ছাত্রীরা তৈরী করবে বা উৎপন্ন করবে বা সংরক্ষণ করবে এবং সারাবে। এর মধ্যে আসছে সহজ হাতের কাজ এবং প্রোজেক্ট—যেমন, কার্ডবোর্ডের কাজ যা থেকে বই বাঁধাইয়ের কাজ করা যাবে, সুতো কাটা এবং কাপড় বোনা, কাঠের কাজ, ধাতুর কাজ, প্লাস্টিকের কাজ, মাটির কাজ, সহজ মৃৎশিল্প, দরজির কাজ এবং পোশাক তৈরীর কাজ, সূচীশিল্প, হাঁস ও মুরগী-পালন, উদ্যান-চর্চা, খাদ্য-সংরক্ষণ, বাঁশের ও বেতের কাজ, রেডিও ও ইলেকট্রনিকস্ বিদ্যা, বাড়ীর ও বিদ্যালয়ের আসবাবপত্রের রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত, বাইসাইকেল, রেডিও, স্টোভ, টাইমপিস ও নানা ধরনের বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম মেরামত ইত্যাদি অজস্র কাজ।

এখানে জানা দরকার, **নবম ও দশম শ্রেণীতে কাজ বা প্রোজেক্টগুলির অন্ততঃ দুটি এবং অনধিক চারটি করতে হবে,** তবে কোন বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের কোন্ কোন্ কাজ শেখানোর ব্যবস্থা করা হবে সেটা নির্ভর করবে বিদ্যালয়ের ও সংশ্লিষ্ট এলাকার জনসমষ্টির আর্থিক অবস্থা, সময়, ছাত্র-ছাত্রীদের শারীরিক ক্ষমতা, জ্ঞান-বুদ্ধি ও সামর্থ্য, তাদের

বিদ্যালয়ের এবং জনসমষ্টির প্রয়োজন, প্রয়োজনীয় উপকরণের সংখ্যা ইত্যাদির উপর।

অবশ্য **যে-সব ওয়ার্ক প্রোজেক্ট ঠিক করা হবে, সেগুলি সম্পর্কে আগে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের চূড়ান্ত অনুমোদন লাভ করতে হবে।** ছাত্র-ছাত্রীরা মাঝে মাঝে প্রোজেক্টগুলি সম্পর্কে তাদের অগ্রগতির মূল্যায়ন করবে। তাতে ত্রুটি সংশোধনের ও উন্নত প্রথার সুযোগ পাওয়া যায়। এ ছাড়া, 'ওয়ার্ক বুক' রাখা তো বাধ্যতামূলক। মনে রাখতে হবে, **ওয়ার্ক বুকেই ছাত্র-ছাত্রীদের কর্ম-অভিজ্ঞতার যথার্থ প্রতিফলন ঘটবে।** কাজে কাজেই ওয়ার্ক বুকটি তৈরী করতে হবে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সাহায্যে, যাতে যে কাজ করা হয়েছে তার সঠিক এবং বিস্তৃত বিবরণ ওয়ার্ক বুক থেকে পাওয়া যায়।

প্রোজেক্ট পছন্দ করার ব্যাপারে ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে শিক্ষক-শিক্ষিকারা পরামর্শ করে তাদের মতামত জানার চেষ্টা করবেন।

সমস্ত ওয়ার্ক প্রোজেক্টের এই স্তরগুলি থাকবে :

(১) যে-কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে তার লক্ষ্য নির্ণয় করতে হবে। (Identification of goals of the work)

(২) কাজ সম্পর্কে পরিকল্পনা করতে হবে। এই স্তরে কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত দিকগুলির কথা বিবেচনা করতে হবে—অর্থাৎ কী ধরনের কাজ করতে হবে, কাজের পদ্ধতি, কী কী কাঁচা মাল দরকার, যে-সব তথ্য সংগ্রহ করতে হবে, যন্ত্রাদি বাছাই, কী কী সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে, কী কী বই পড়তে হবে, কিছু দেখতে যাওয়া হলে কোন্ জায়গায় যাওয়া হবে, কাদের প্রশ্ন করা হবে, কীভাবে অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করা হবে—ইত্যাদি সবই (Planning the work)।

(৩) শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে প্রোজেক্টটির অন্তর্গত কাজটি সম্পাদন করা—এককভাবে বা দলবদ্ধভাবে। (Execution under guidance of teacher)

(৪) কাজের রেকর্ড রাখা। (Recording)

(৫) ছাত্র-ছাত্রীগণ কর্তৃক আত্মবিচার (Self-evaluation)

(২) কর্ম-অভিজ্ঞতার দ্বিতীয় ক্ষেত্র হল বৃত্তিমূলক পরিভ্রমণ। সামাজিক দিক থেকে উৎপাদনাত্মক যে-সব বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে লোকে জীবিকার সংস্থান করে, সেই কাজগুলির সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করাই হল এর

উদ্দেশ্য। শ্রেণী-কক্ষের অভ্যস্ত গণ্ডীর বাইরে গিয়ে বৃহত্তর বিশ্বের সঙ্গে পরিচয় করে ছাত্র-ছাত্রীদের অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার হবে সমৃদ্ধ, চিন্তাশক্তি পাবে বৃদ্ধি।

আগেই বলা হয়েছে, এই ধরনের পরিভ্রমণ সম্পর্কে শিক্ষক মহাশয় ও ছাত্র-ছাত্রীরা মিলে পূর্বপরিকল্পনা করে নেবেন এবং ফিরে আসার পর হবে যা দেখে আসা হল তার সম্পর্কে আলোচনা, একে অপরের সঙ্গে অভিজ্ঞতা-বিনিময় এবং রেকর্ড রাখা। এইভাবে খেত-খামার, ফ্যাক্টরী, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, দোকান, হাসপাতাল, ঔষধালয়, কামার-শালা, পোস্ট-অফিস, রেল-স্টেশন ইত্যাদি দেখে আসা যেতে পারে। ছাত্র-ছাত্রীরা নিকটস্থ এলাকায় বিভিন্ন বৃত্তির লোকের সঙ্গেও আলাপ-আলোচনা করবে। তারা কর্মীদের সঙ্গে এবং কর্তৃপক্ষের কাছে কাজের বিভিন্ন দিক নিয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবে। স্থানীয় কুশলী ব্যক্তিরা তাদের কাছে কোনও কথিকার সাহায্যে বা অভিপ্রদর্শনের সাহায্যে বুঝিয়ে বলতে পারেন। বিভিন্ন এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ অথবা ভোকেশন্যাল গাইডেন্স ব্যুরো বা সংবাদপত্র থেকে তথ্য সংগৃহীত করতে পারলে বৃত্তিমূলক পরিভ্রমণের কাজে স্থবিধা হয়।

এই জাতীয় পরিভ্রমণে গিয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা পরিচালনা বা ব্যবস্থাপনার দিকটিও (management) লক্ষ্য করবে। ছোটোখাটো দোকান, কুটির-শিল্প, খামার, স্বয়ংনিযুক্ত ব্যক্তি ইত্যাদির ক্ষেত্রে পরিচালনাগত দিকটি যদি তাদের সামনে তুলে ধরা হয় তবে তাদের অন্তর্দৃষ্টি বাড়বে এবং কোনও সংগঠন পরি-চালনার দক্ষতাও বাড়বে।

(৩) **নূতনের প্রবর্তন** হল কর্ম-অভিজ্ঞতার তৃতীয় ক্ষেত্র। আলোচনা ও পরিদর্শনের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীরা কোনও জিনিস তৈরী করবার আরও ভালো উপায় সম্বন্ধে জানতে পারবে। বাস্তব কর্মক্ষেত্রে গিয়ে এই জ্ঞান আসবে। বিদ্যালয়ে শ্রেণীকক্ষে আলোচিত হবে বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের ঐতিহাসিক দিকটি। আবিষ্কারের ইতিহাস থেকে বিভিন্ন কাহিনী, প্রযুক্তি-বিদ্যার বিভিন্ন ক্ষেত্রে মানুষের দক্ষতার বিবর্তন ইত্যাদি। আগুন তৈরীর ইতিহাস, বিভিন্ন ধরনের চাকার জন্মকথা, পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, ব্যাধির বিরুদ্ধে সংগ্রাম, 'আরো ভালোভাবে কী করে করা যায়' এ-ধরনের আলোচনা (যেমন যুগে যুগে খাদ্য সংগ্রহের পদ্ধতির উন্নতি, সময়ের পরিমাপের বিবর্তনের ইতিহাস, সরকার সংগঠনের উৎকৃষ্টতর উপায়) ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করা যেতে পারে। কর্ম-অভিজ্ঞতার এই ক্ষেত্রে প্রধান গুরুত্বই দেওয়া হবে পরিবর্তনের

উপর। কর্মের, সংগঠনের পদ্ধতি স্থিতিশীল নয়; আমাদের সকলকেই পরিবর্তনের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে হবে—মানবীয় মূল্যবোধগুলি সংরক্ষণের জন্যে ও প্রগতিসাধনের উদ্দেশ্যে—এই সত্যগুলি ছাত্র-ছাত্রীরা বুঝতে পারবে।

পরিশেষে এই কথা বলা যেতে পারে যে, যদিও কর্মশিক্ষার উদ্দেশ্য এই নয় যে, ছাত্র-ছাত্রীদের বিশেষ কোনও একটি বৃত্তিতে দক্ষ কারিগর করে তুলতে হবে তবুও কর্মশিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য হবে জীবনসংগ্রামের জন্যে তাদের প্রস্তুত করে দেওয়া—বাস্তব বৃত্তিমূলক বা উন্নয়নসংক্রান্ত যে-কাজ উত্তরজীবনে তাদের করতে হবে তারই প্রস্তুতি। সেটাই আসল কথা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কতকগুলি প্রোজেক্ট

এই অধ্যায়ে আমরা কতকগুলি প্রোজেক্ট সম্পর্কে আলোচনা করছি, যে প্রোজেক্টগুলি নবম ও দশম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরা করবে। বিশদ আলোচনার আগে কয়েকটি কথা বলে নেওয়া দরকার।

(১) আগের অধ্যায়েই বলা হয়েছে যে, সিলেবাসে যে-প্রোজেক্টগুলির কথা উল্লেখ করা আছে তা দৃষ্টান্ত বা নমুনা হিসাবে। অর্থাৎ এই ধরনের প্রোজেক্ট ছাত্র-ছাত্রীরা করতে পারে। সিলেবাসের ঐ **তালিকাতে দেওয়া নেই অথচ করবার উপযুক্ত—এমন কোনও প্রোজেক্ট স্বচ্ছন্দে নেওয়া যেতে পারে।** যেমন—রেডিও ও ইলেকট্রনিক্‌স্-এর কথা সিলেবাসে দেওয়া নেই। কিন্তু কোনও বিদ্যালয়ে সব দিক থেকে সুবিধা থাকলে ছাত্র-ছাত্রীদের ঐ প্রোজেক্টটি করানো যেতে পারে। (২) উপরের থেকেই বোঝা যাবে, **সম্ভাব্য সমস্ত রকমের প্রোজেক্টের আলোচনা কোনও একটি বইয়ে করা সম্ভব নয়।** এই বইতেও সে চেষ্টা করা হয়নি; পর্ষৎ নমুনা হিসাবে যেগুলির কথা বলেছেন তার মধ্যে অনেকগুলির সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। (৩) যে-কোনও প্রোজেক্টের ক্ষেত্রেই এ-কথা বলা চলে যে, শুধু বই পড়ে কাজ শেখা যায় না। শিক্ষাকে দীর্ঘস্থায়ী করতে গেলে হাতে-কলমে শিখতে হবে। কর্মশিক্ষার বই থেকে তো আর তত্ত্বগত (Theoretical) প্রশ্ন আসবে না যে, ছাত্রছাত্রীরা বই মুখস্থ করে চার-পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর লিখবে। এর ৫০টি নম্বরের সমস্তটাই করা কাজের মূল্যায়ন হবে। নীচের হিসাব থেকেই তা বুঝতে পারা যাবে।

নবম ও দশম শ্রেণীতে Work Education-এর নম্বর এইভাবে ভাগ করা হয়েছে—

১। যৌথ	**···১৫**	**নম্বর**
২। একক		
(প্রোজেক্টের কাজ)·····	**···৩০**	**"**
৩। ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী		
পর্যন্ত কাজের জন্য·········	**৫***	**"**
(*মোট নম্বরের ১০%)	**মোট ৫০**	**নম্বর**

সুতরাং একটি নম্বরও লেখার উপর নয়, কাজের উপর*। তাই এ-ক্ষেত্রে কেউ যদি মনে করে কর্মশিক্ষার একটি বই কিনলেই তার ৫০ নম্বরের ব্যবস্থা হয়ে গেল, সে অত্যন্ত ভুল করবে। সব কাজই তাকে নিজে করতে হবে। শারীরশিক্ষা ও সমাজসেবার বেলাতেও এই একই কথা বলা চলে। এ থেকে একটি কথা বোঝা যাবে: **যদি কোনও বইতে এই ধরনের কথা লেখা থাকে যে, সেই বই থেকে (কর্মশিক্ষা, শারীরশিক্ষা ও সমাজসেবার) ১০০ নম্বরের উত্তর করা যাবে, তা হলে তার থেকে বড় মিথ্যা আর হতে পারে না। এই ধরনের প্রচারের উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়, ছাত্র-ছাত্রীদের সরল মনের সুযোগ নিয়ে তাদের বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টা।**

একটি উদাহরণ নেওয়া যাক্। কোনও গ্রামের বিদ্যালয়ে হয়তো এই প্রোজেক্টটি নেওয়া হয়েছে—'বিদ্যালয়ের খামারে ধান চাষ।' 'কর্মশিক্ষা' বিষয়টি যদি গতানুগতিক হত তাহলে 'ধান চাষ সম্বন্ধে যাহা জান লিখ'-জাতীয় একটি প্রশ্ন আসত পরীক্ষায়। কিন্তু তা তো আর হবে না। এই প্রোজেক্টটির উপর ১৫টি নম্বরের (কারণ এটি যৌথভাবে করা হবে) সবটাই কেমন ধান চাষ করা হয়েছে তার উপর। আর ঐ চাষ করার সময় কারও হাতেই বই থাকবে না। বইয়ের থেকে একজন বৃদ্ধ কৃষকের অভিজ্ঞতা শতগুণে মূল্যবান।

তাহলে বইয়ের প্রয়োজনটা কোথায়? প্রয়োজন অবশ্যই আছে, তবে সেটা ১০০ নম্বরের উত্তর করার জন্যে নয়, অন্যত্র। প্রোজেক্টগুলি করার আগে তাদের সম্পর্কে ছাত্র-ছাত্রীদের কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক। সেগুলির সঙ্গে তাদের যে অপরিচয়ের ব্যবধান, সেই ব্যবধানটুকু কাটিয়ে ওঠাবার জন্যে নিশ্চয়ই বই চাই। তা ছাড়া কোথাও কিছু ভুল হচ্ছে কিনা জানার ব্যাপারেও হয়তো বই সাহায্য করতে পারে। তবে **বইয়ের স্থান এই শিক্ষায় গৌণ।** পুস্তক-কেন্দ্রিক বা পুঁথিগত শিক্ষার অবসানের জন্য যে শিক্ষার ব্যবস্থা তাতে যদি পুস্তকই মুখ্য হয়ে যায়, তাহলে ব্যাপারটা অনেকটা প্রবাদের 'সরষের মধ্যেই ভূত'-এর মত হয়ে দাঁড়ায় না কি?

এই পরিপ্রেক্ষিতেই কর্মশিক্ষার বইয়ের, তথা প্রোজেক্টগুলি আলোচনার ভূমিকাটি বুঝতে হবে।

---

* অবশ্য, কিছুটা মৌখিক পরীক্ষার ব্যবস্থাও থাকবে

যদি **বিদ্যালয়ের খামার** থাকে তাহলে কৃষিবিদ্যাকে প্রোজেক্ট হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে। গ্রামাঞ্চলে অনেক বিদ্যালয়ের নিজস্ব খামার থাকতে পারে। তাই প্রধানতঃ গ্রামাঞ্চলের ছাত্রদের জন্যেই এই প্রোজেক্টের কথা বলা হয়েছে। আদর্শ খামার তৈরী করতে হলে ঠিকভাবে জমি বেছে নিতে হবে, কারণ চাষের সাফল্য প্রধানতঃ জমির প্রকৃতি, মাটির গুণাগুণ, আবহাওয়া, জমির উর্বরাশক্তি এবং উৎপন্ন ফসলের বিক্রীর সুবিধার উপর নির্ভরশীল।

জমি নেওয়ার ব্যাপারে তিনটি দিকের প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে—প্রাকৃতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক। **প্রাকৃতিক ঃ** প্রথমেই জমির প্রকৃতি বিচার করতে হবে। জমির ভূ-প্রকৃতি, মৃত্তিকা-কণার আকৃতি ও গঠন ফসল চাষের উপযোগী কিনা, জমির স্বাভাবিক উর্বরতা-শক্তি কেমন, আবহাওয়া ফসল চাষের উপযোগী কিনা এসব বিষয় খুঁটিয়ে দেখতে হবে। জমি সাধারণতঃ সমতল হওয়া দরকার, কারণ এতে সমানভাবে জল দাঁড়াতে পারে। খুব উঁচু জমিতে জল দাঁড়ায় না, আবার খুব নীচু জমি জলে ডুবে যায়। একেবারে বালি মাটি বা এঁটেল মাটি শস্য চাষের বিশেষ উপযোগী নয়। কাজেই দোআঁশ মাটির জমি বেছে নেওয়া উচিত। জমির উর্বরতা হওয়া দরকার ফসলের প্রয়োজন অনুযায়ী। আবহাওয়া সম্পর্কে বলা যায়—খুব শুষ্ক বা আর্দ্র আবহাওয়া কোনওটাই শস্যচাষের অনুকূল নয়। ফার্মে কী কী ফসলের চাষ বেশী হবে, তাদের কী রকম আবহাওয়া দরকার এই অনুযায়ী ফার্মের জায়গা ঠিক করতে হবে। আর তা না হলে ফার্মের যে জায়গা ঠিক করা হয়েছে সেই অনুযায়ী ফসল ঠিক করতে হবে। **অর্থনৈতিক অবস্থার** কথাও ভেবে দেখতে হবে। ফার্মের তৈরী ফসল বিক্রীর বাজার পাওয়া যাবে কিনা, জমির দাম সস্তা না চড়া, যে ফসল আবাদ করা হচ্ছে বাজারে তাকে কী ধরনের প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হতে হচ্ছে, ফার্মের ফসল এবং বীজ, সার, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি বহন করবার উপযুক্ত রাস্তাঘাট আছে কিনা, কাছাকাছি রেল-স্টেশন আছে কিনা—ইত্যাদি। **সামাজিক অবস্থা ঃ** ফার্মের জন্যে যে জায়গা ঠিক করা হয়েছে সেই জায়গার লোকের যথেষ্ট সামাজিক চেতনা না থাকলে স্থানীয় গরু-বাছুর, ছাগল ইত্যাদি যে কোনও সময় ফসল নষ্ট করতে পারে, কিংবা ফসল চুরি হয়ে যেতেও পারে। সেই জন্যে দেখতে হবে যে জায়গায় ফার্ম করা হবে তার আশেপাশে কী ধরনের লোক থাকে।

সবচেয়ে কম খরচে সবচেয়ে বেশী পরিমাণ ফসল উৎপন্ন করার জন্যে ফার্মের 'লে-আউট' করা দরকার। আদর্শ লে-আউট দ্বারা এই বিষয়গুলির সমাধান করা যাবে—

(১) ফার্মের প্লটগুলি চেহারায় ও মাপে যতটা সম্ভব সমান হবে।

(২) বিদ্যালয়ের ফার্ম বড রাস্তা থেকে দূরে অবস্থিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

(৩) ফার্মের রাস্তাঘাট, জলসেচ ও জলনিকাশী নালা আঁকাবাঁকা না হয়ে সোজা হবে।

(৪) জমির প্লটগুলি **বড় ও আয়তাকার** (rectangular) হওয়া উচিত। বর্গাকার অথবা অন্য আকারের প্লটে লাঙ্গল করা প্রভৃতি কাজের অসুবিধা হয়। আবার ছোট প্লটে চাষ করলে খরচ তুলনামূলকভাবে বেশী পড়ে যায়।
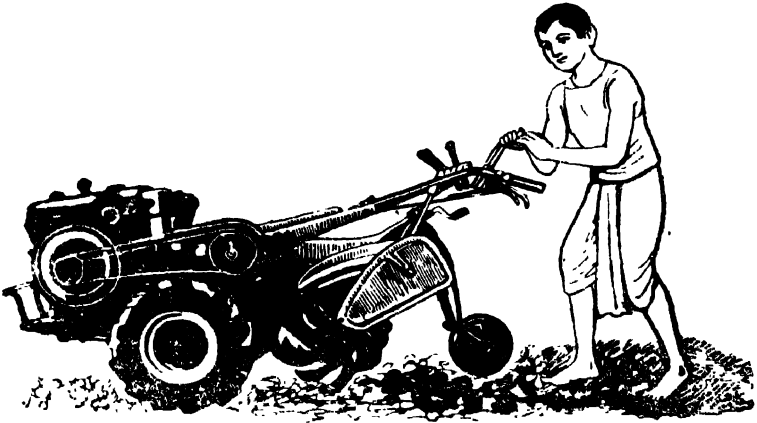
'পাওয়ার টিলার' বা কলের লাঙ্গল

(৫) সাধারণতঃ ফার্মে যত বৎসরের শস্যপর্যায় অনুসরণ করা হবে প্লটের সংখ্যা হয় ততগুলি বা তার দ্বিগুণ, তিনগুণ (কিংবা আরও বেশী গুণ করতে হবে)। ফার্মের লে-আউটের জন্যে বেড়া তৈরী, ঘরবাড়ী তৈরী, রাস্তাঘাট, জলসেচন ও নিষ্কাশনের নালা তৈরী এবং প্লট প্রস্তুত করা দরকার। **বেড়া ঃ** ফার্মের চারধারে বেড়া দেওয়া দরকার, তা না হলে মানুষ বা গরু-বাছুর সহজেই ফার্মে ঢুকে যেতে পারবে। কাঁটা-তারের বেড়াই সবচেয়ে মজবুত। সে ব্যবস্থা না করতে পারলে সাধারণ তার দিয়ে বা কাঁটাগাছ বা ঐ-ধরনের গাছ (তেশিরা মনসা, ফণিমনসা, কঙ্গা, মেহেদী, ইঙ্গা, ডালসিম, বেড়া-কলমী প্রভৃতি ছোট ছোট

গুল্ম) বা অন্ততঃ চারধারে গভীর নালা কেটে কম খরচায় বেড়া দেওয়া দরকার। যেমন ভাবেই বেড়া দেওয়া হোক, একটি বা দুটি প্রবেশ-দ্বার (gate) রাখতে হবে। **ঘর-বাড়ী ঃ** ফার্মের কাজ যারা করছে তাদের ও গবাদি পশুর বাসস্থান এবং যন্ত্রপাতি, সার, বীজ, তৈরী ফসল ইত্যাদি রাখবার জন্য পাকা বা কাঁচা বা

পাম্পিং মেসিন
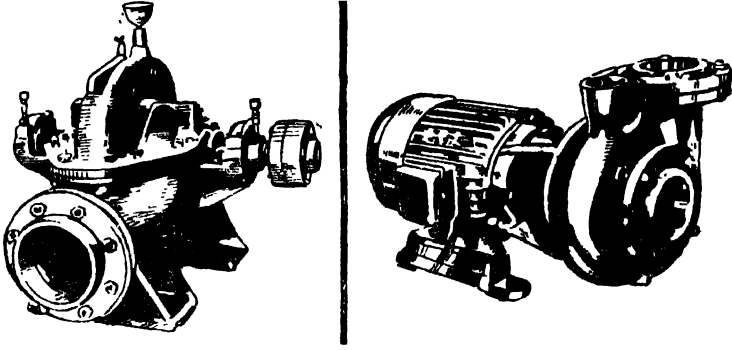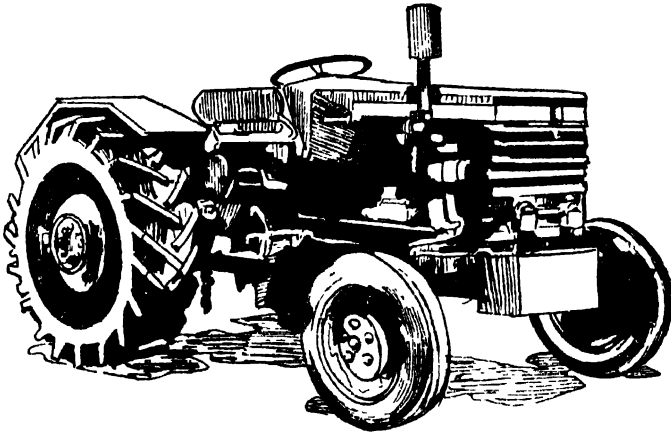
ট্র্যাক্টর

টালির ছাওয়া ঘর দরকার। অবশ্য সাধারণ ফার্মের মত বিদ্যালয় ফার্মে আলাদা করে ম্যানেজারের বাসগৃহ, তাঁর অফিস, শ্রমিকদের বাসগৃহ, গোশালা, গুদাম-ঘর, ফসল-মাড়াই মেঝে ইত্যাদি পৃথক পৃথক ভাবে করা সম্ভব নাও হতে পারে। **রাস্তাঘাট, জলসেচ ও নিষ্কাশন নালা ঃ** বেশী রাস্তা তৈরী করা মানেই

ফার্মের জমি নষ্ট করা, তবুও কয়েকটি রাস্তা না থাকলেই নয়। ফার্মের ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় একটি চওড়া প্রধান রাস্তা ছাড়াও কয়েকটি ছোট রাস্তা (যা প্রধান রাস্তার সঙ্গে লম্বভাবে যুক্ত হতে পারে বা প্রধান রাস্তার সমান্তরালে থাকবে) থাকা দরকার। জলসেচের ও জল-নিষ্কাশনের জন্যে প্রয়োজনীয় নালা রাস্তার কাছে তৈরী করতে হবে। **জমির লে-আউট ঃ** জমির প্লট তৈরী করার সময় নজর রাখতে হয় জমির সংখ্যা ও আকৃতির উপর। আকৃতি আবার নির্ভর করবে যে ধরনের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হবে তার, সেচের জলের উৎসের এবং ফার্মের ভূপ্রকৃতির উপর। ফার্মের কাজ ঠিকভাবে করার জন্যে আধুনিক ও উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতি দরকার। একটি আদর্শ ফার্মে যে-সব যন্ত্রপাতি রাখা দরকার তার অনেক কিছুই বিদ্যালয়ের ফার্মে রাখা সম্ভব নাও হতে পারে, তবু নিম্নে তালিকা দেওয়া হল ঃ

(১) দেশী লাঙ্গল, (২) মোল্ডবোর্ড লাঙ্গল, (৩) চাকতি লাঙ্গল, (৪) কালটিভেটর, (৫) বিভিন্ন ধরনের উন্নত বিদা, (৬) চাকাযুক্ত উন্নত নিড়ানি, (৭) জাপানী ধান-নিড়ানি যন্ত্র, (৮) মই, (৯) বীজ-বপন যন্ত্র, (১০) মাটি গুঁড়ো করবার যন্ত্র, (১১) ফসল কাটবার যন্ত্র, (১২) মাড়াইকল—ধান ও আখ, (১৩) ধান-ঝাড়াই

থ্রেশিং মেসিন
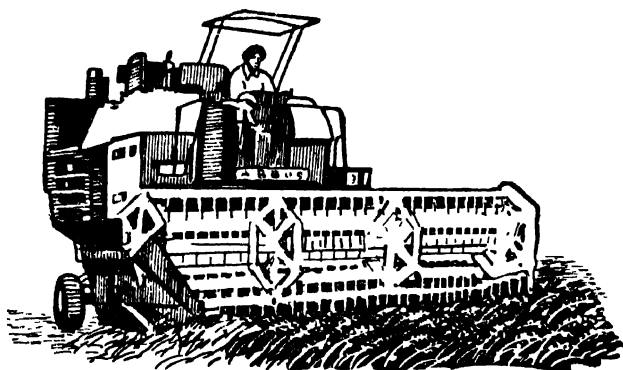
কল, (১৪) ডাস্টার, (১৫) স্প্রেয়ার, (১৬) সীড ড্রেসার, (১৭) ট্র্যাক্টর, (১৮) পাম্প, (১৯) শিউনি, (২০) দন, (২১) পারসিয়ান হুইল, (২২) নিড়ানি, খুরপী, কাস্তে ইত্যাদি, (২৩) কলম-কাটা ছুরি ও বাডিং অ্যাণ্ড গ্রাফটিং নাইফ, (২৪) ট্রেনিং এ্যাণ্ড প্রুনিং নাইফ, (২৫) বেড়াকাটা কাঁচি, (২৬) ঘাস-ছাঁটা যন্ত্র, (২৭) নবনী পৃথক করা যন্ত্র, (২৮) বাটার চার্ণার, (২৯) ফ্যাট পরীক্ষার যন্ত্র, (৩০) ডেয়ারী

থার্মোমিটার, (৩১) দুধের আপেক্ষিক গুরুত্বমাপক যন্ত্র, (৩২) টোটালিং মেসিন, (৩৩) বাডিংয়ের মুক্ত ছেদন যন্ত্র, (৩৪) ইন্‌কিউবেটর, (৩৫) বৃষ্টিমাপক যন্ত্র, (৩৬) সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাপকযন্ত্র, (৩৭) ব্যারোমিটার প্রভৃতি।

উপরের তালিকা থেকেই বোঝা যাবে যে, কৃষিকর্মের পাশাপাশি ডেয়ারী ও পোলট্রি ফার্মিং-এর ব্যবস্থা থাকবে ধরে নিয়েই তালিকাটি রচনা করা হয়েছে।

বিদ্যালয়-খামারে ধান চাষ

বিদ্যালয়ের খামারে ধান চাষ করতে হলে ধান চাষ সম্পর্কে সাধারণ বিষয়গুলি জানা দরকার। পশ্চিমবঙ্গে সাধারণতঃ তিন রকম ধানের চাষ দেখা যায়ঃ আউশ (বা শরৎকালীন ধান), আমন (বা হৈমন্তিক ধান) ও বোরো (বা বসন্তকালীন ধান)। আউশ ধান বোনার সময় বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাস (মে-জুন) এবং কাটার সময় শ্রাবণ ও ভাদ্র মাস (জুলাই-সেপ্টেম্বর) পর্যন্ত। আমন ধান সাধারণতঃ জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসে (জুন-জুলাই) বীজতলায় বোনা হয়, এবং রোয়া হয় আসাঢ় ও শ্রাবণে (১৫ জুলাই থেকে ১৫ আগস্ট) এবং কাটা হয় অগ্রহায়ণ ও পৌষ (ডিসেম্বর-জানুয়ারী) মাসে। বোরো ধান বোনা হয় সাধারণতঃ নভেম্বর মাসে আর রোয়া হয় ডিসেম্বরে এবং কাটা হয় চৈত্র-বৈশাখে (মার্চ-এপ্রিল)। অবশ্য প্রকারভেদ অনুসারে এই তিন রকম ধান চাষের সময়ের কোনও কোনও ক্ষেত্রে তারতম্য হয়ে থাকে।

চাষ-পদ্ধতিঃ (১) আউশ ধানের বীজ জমিতে হাতে ছিটিয়ে বা সারিতে বোনা হয়। কোনও কোনও জায়গায় কয়েকটি 'নাবি' জাতের আউশ ধানের চারা বীজতলায় তৈরী করে, চারাগুলি ২০ থেকে ২৫ দিনের হলেই জমি 'কাদাই' করে তাতে স্থায়িভাবে রোপণ করা হয়। হাতে ছিটিয়ে বুনলে প্রতি একরে প্রায় ৩৭ কিলোগ্রাম (১ মণ) এবং সারিতে বুনলে ১৮ থেকে ২৪ কিলোগ্রাম (২০-২৫ সের) বীজ লাগে। জমিতে রোপণ করলে একর-প্রতি বীজ লাগে মাত্র ১১ থেকে ১৪ কিলোগ্রাম (১২-১৫ সের)। সারিতে বীজ বুনলে এক সারি থেকে আর এক সারির দূরত্ব ২৪ থেকে ৩০ সেন্টিমিটার (৯-১২ ইঞ্চি) রেখে বীজ বুনতে হয় এবং গাছ একটু বড় হবার পর ৭ থেকে ১০ সেন্টিমিটার (৩-৪ ইঞ্চি) দূরে দূরে চারা রেখে বাকিগুলো তুলে ফেলতে হয়। আউশ ধান রোপণ করলে সারি ও গাছের দূরত্ব ১৫ × ১৫ সেন্টিমিটার (৬ × ৬ ইঞ্চি) অথবা ১৫ × ২৪ সেন্টিমিটার (৬ × ৯ ইঞ্চি) দিতে হবে এবং প্রত্যেক গর্তে ১টি থেকে ২টি

চারা রোপণ করতে হবে। বীজ বোনার বা চারা রোপণ করার ৫।৬ সপ্তাহ পরে আগাছা নষ্ট, মাটি আলগা করা ও সার দেবার জন্যে জমিতে নিড়ান দেওয়া দরকার। রোয়া আউশের জমিতে জাপানী নিড়ানি-যন্ত্র ব্যবহার করা যেতে পারে।

আউশ ধান কাটবার সময় বিশেষ নজর রাখতে হয়, কারণ ফসল বেশী পেকে গেলে গাছ মাটিতে শুয়ে পড়ে এবং গাছ থেকে ধানগুলি ঝরে যায়। ফলে অনেক ফসল নষ্ট হয় এবং ধানের গুণও নষ্ট হয়ে যায়। ধান গাছের খড় যখন সবুজ থেকে হলুদ রঙে পরিণত হয় তখনই ধান কাটার উপযুক্ত সময়। একর প্রতি ৬'৭৫ থেকে ৯ কুইণ্টাল (১৮ থেকে ২৪ মণ) আউশ ধান ফলে।

(২) **বোরো** ধানের চাষ এদেশে তেমন হয় না। আগেই বলা হয়েছে শীতকালে অর্থাৎ পৌষ-মাঘ মাসে বোরো ধানের চাষ করা হয়। অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে ধানের বীজ বীজতলায় ফেলা হয় এবং সপ্তাহ চারেক পরে রোপণ করা হয়। বোরো ধান চাষের সুবিধা এই যে, যে-সব অঞ্চলে আমন ধানের জমিতে অন্য কোনও রবিশস্য উৎপন্ন করা হয় না, সেচের সুবিধা থাকলে সেই সব জমিতে বোরো ধানের চাষ করা যায়। বোরো ধানের চাষের জন্যেও জল লাগে। যেসব গ্রাম সেচ-পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত সেগুলিতে বোরো ধানের চাষ করা যেতে পারে। সাধারণতঃ চৈত্র-বৈশাখ মাসে বোরো ধান কেটে নেওয়া হয়। সেই জমিতে আমন ধানের চাষও করা যেতে পারে। বোরো ধানে সার দেওয়া ও অন্যান্য পরিচর্যা ব্যবস্থা আউশ ও আমন ধানের মত। প্রতি একরে ৬'৭৫ থেকে ৯ কুইণ্টাল (১৮ থেকে ২৪ মণ) বোরো ধান ফলে।

(৩) **আমন ধান ঃ বোনা আমন**—পশ্চিমবঙ্গে মোট ধান-জমির প্রায় শতকরা ৮০ ভাগ এবং মোট চাষযোগ্য জমির প্রায় শতকরা ৭০ ভাগ জমিতে রোয়া আমন ধানের চাষ করা হয়। কয়েকটা জাতের আমন ধানের বীজ স্থায়িভাবে জমিতে বুনেও চাষ করা যায়। যে সব জায়গায় হঠাৎ জল এসে পড়ে, যেখানে জলের গভীরতা ১৩৭ থেকে ১৫০ সে. মি. (সাড়ে চার থেকে পাঁচ ফুট) এবং যেখানে বৃষ্টিপাত অল্প বলে জমি কাদা করে ধান রোয়া সম্ভব হয় না, সেইরকম জমিতে বোনা আমনের চাষ হয়। এতে একরে প্রায় ২৮ কিলোগ্রাম (৩০ সেরের মত) বীজ লাগে। বোনা আমনের চারা একটু বড় হলেই নিড়ান বা লাঙ্গল দিয়ে গাছের সংখ্যা কমানো হয় এবং আগাছা নষ্ট করা হয়। এফ. আর, কুমড়াগোড়, তিলককাচারি, আছড়া ১০৮/১, ৪৩-বি (এফ. আর ৪৩-বি)
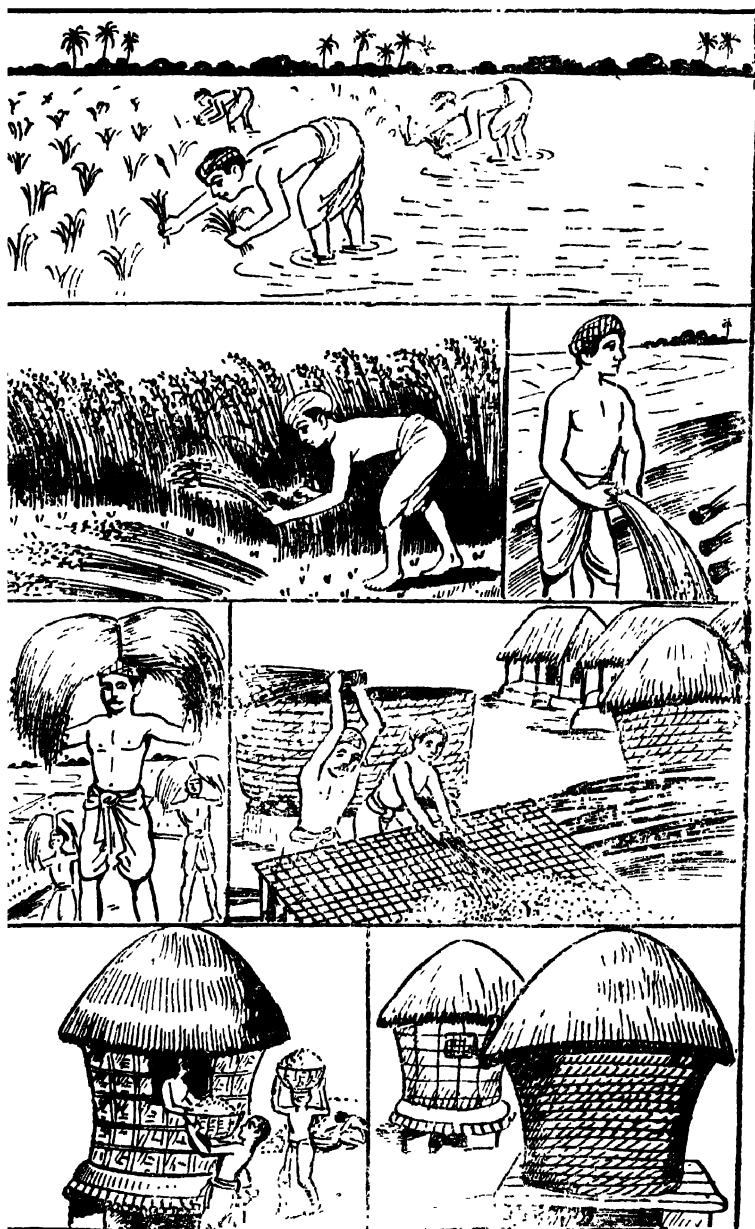
ধান রোপণ থেকে গোলায় ভর্তি

ইত্যাদি জাতের ধান বোনা আমন হিসাবে চাষ করা হয়। **রোয়া আমন**

মাটি-জলের সুবিধা থাকলে যে কোনও জমিই রোয়া আমন চাষের উপযো

তবে বর্ষার জল দাঁড়ায় এমন নীচু জমি এই ধান চাষের বিশেষ উপযোগী। কাদা ও এঁটেল মাটি আমন ধান চাষের পক্ষে সুবিধাজনক। **বীজতলা** দু'রকম উপায়ে তৈরী করা হয়—(ক) শুষ্ক বীজতলা ও (খ) আর্দ্র বীজতলা। শুষ্ক বীজ-তলার জন্যে জমিতে ভালো করে লাঙ্গল ও মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে, নরম ও সমতল করতে হয়। বীজতলা তৈরীর আগে জমিতে একর প্রতি ২০ থেকে ৪০ গাড়ী পচা ও শুকনো গোবর সার অথবা কম্পোস্ট সার দিতে হয়। বীজতলা চারা বোনার উপযুক্ত হলেই তাতে শুকনো বীজ হাতে ছিটিয়ে বুনে হালকাভাবে লাঙ্গল দিয়ে বীজগুলি ঢেকে দিতে হয়। বীজতলা থেকে জল নিষ্কাশনের ভালো ব্যবস্থা রাখতে হবে।

আর্দ্র বীজতলায় কল-বেরুনো বীজ ফেলা হয়, এতে খরচ কম পড়ে এবং আগাছা কম হয়। বীজগুলিকে ১২ ঘণ্টা জলে ভিজিয়ে রেখে অতিরিক্ত জল ফেলে দিয়ে ভিজে বস্তার উপর বিছিয়ে, উপরে আবার ভিজে বস্তা চাপা দিতে হয়। সাধারণতঃ বীজতলায় একরে ৯০ থেকে ১৫০ কিলোগ্রাম (২½-৪ মণ) বীজ লাগে। ৪ থেকে ৬ সপ্তাহ পরে চারা বোয়ার উপযোগী হয়। একরে ৪ কিলোগ্রাম বা ১০ পাউণ্ড নাইট্রোজেন (২৩ কিলোগ্রাম বা ৫০ পাউণ্ড অ্যামোনিয়াম সালফেট) চারার বৃদ্ধির পক্ষে যথেষ্ট।

ধান চাষে উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত পরিমাণ জল চাই। যে সময়ে ধান গাছ ঝাড়াল হয় সেই অবস্থায় জমিতে ৫ থেকে ৭·৫ সেন্টিমিটার গভীর (২"-৩") জল থাকা দরকার। সপ্তম দিন থেকে গাছের ফুল আসার সময় পর্যন্ত পর্যায়ে গাছের বৃদ্ধি বেশী হয়, এই সময় জমিতে ২৪-৩০ সেন্টিমিটার (৯"-১২") জল থাকা দরকার। পরবর্তী কালে জমির মাটি ভিজা থাকলেই চলবে।

জমি তৈরী : মাঘ-ফাল্গুন মাসে বৃষ্টির সুযোগ নিয়ে যথাসম্ভব লাঙ্গল দিয়ে ধান গাছের গোড়া তুলে ফেলতে হয়। তারপর বর্ষারম্ভের সময় জমিতে সবুজ সারের চাষ করতে হয়। চারা লাগাবার আগে জমিতে জল দাঁড়ালে সবুজ সারের গাছের নরম ও সবুজ ডাঁটাগুলি লাঙ্গল দিয়ে মিশিয়ে দিতে হয়। চারা লাগাবার অন্ততঃ দু' সপ্তাহ আগে সবুজ সারের গাছ মাড়ানো উচিত। তারপর জুলাই মাসের শেষভাগে জমিতে জল থাকলে লাঙ্গল ও মই দিয়ে ২।৩ বার চাষ দিয়ে জমি কাদাতে হয়।

পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে যে, ১৫ জুলাই থেকে ১৫ আগস্ট চারা রোয়ার সবচেয়ে ভালো সময়। এই সময় চারা রোয়া হলে ৩০ সে.মি. × ৩০ সে.মি.

(১২" × ১২") বা ২৪ সে.মি. × ২৪ সে.মি. (৯" × ৯") বা ১৫ সে.মি. × ১৫ সে.মি. (৬" × ৬") দূরে দূরে চারা রোয়া ভালো। ঠিক সময়ে দিলে গোছায় ২-৩টি করে চারা লাগানোই যথেষ্ট। যত 'নাবি' করে চারা রোয়া হবে গাছ থেকে গাছের দূরত্ব ও সারি থেকে সারির দূরত্ব ততই কম হবে ও গোছাতে চারার সংখ্যাও বেশী দিতে হবে। চার থেকে পাঁচ সপ্তাহ্ বয়সের চারা রোয়াই ভালো।

চারা রোয়ার সাত দিনের মধ্যে গাছ মাটিতে লেগে যায়। তারপর ৭-৮ সপ্তাহ্ পর্যন্ত গাছ থেকে শাখা বা বিয়ান বার হয়। এই সময় জমিতে কম জল রাখা দরকার। জমিতে যাতে আগাছা না জন্মায় সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হয়। ধানের দানা শক্ত হবার পর জমি থেকে জল বার করে জমিকে শুকনো করে দিতে হয়।

নাইট্রোজেন, ফসফেট ও পটাসিয়াম সারের মধ্যে **ধান চাষের পক্ষে নাইট্রোজেনের প্রয়োজনই সবচেয়ে বেশী।** ভারতীয় মাটিতে প্রচুর পরিমাণে পটাস থাকায় ধানের জন্য পটাস সারের বিশেষ প্রয়োজনই নেই। ফসফেট সার প্রয়োগেও তেমন সুফল পাওয়া যায় না। তবে অতিরিক্ত নাইট্রোজেনের অপকারিতা কমাবার জন্যে ফসফেট সার প্রয়োগ করা দরকার। আমন ধানে অ্যামোনিয়াম সালফেট সার হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

খড় সম্পূর্ণ হল্‌দে হয়ে গেলে কাস্তে দিয়ে গোছা গোছা ধান কেটে ভালোভাবে শুকোবার জন্য জমিতে ফেলে রাখা হয়। পরে আঁটি বেঁধে জমিতে তুলে আনা হয়। জলাজমিতে শুধু শীষগুলি কেটে রাখা হয়। জাত অনুসারে আমন ধানের একর-প্রতি ফলন ৯-১১·২৫ কুইন্টাল (২৪-৩০ মণ)।

ধান তুলে আনার পর ঝেড়ে খড় থেকে ধান আলাদা করা হয়।

॥ জাপানী প্রথায় ধান চাষ ॥

জাপানে উন্নত ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে ধান চাষ করার জন্যে ধানের উৎপাদনের হার অনেক বেশী। জাপানের জলবায়ু ও প্রাকৃতিক অবস্থার সঙ্গে এদেশের জলবায়ু ও প্রাকৃতিক অবস্থার অল্প-বিস্তর সাদৃশ্যও আছে। পশ্চিমবঙ্গে জাপানী পদ্ধতিতে চাষ করে খুব ভালো ফল পাওয়া গেছে। এখন উন্নত ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ধান চাষকে জাপানী প্রথায় ধান চাষ বলেই বোঝানো হয়।

এই প্রথার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হচ্ছে এই :—(১) উৎকৃষ্ট জাতের বীজ ব্যবহার, (২) একর-প্রতি কম বীজ বা কম চারা ব্যবহার, (৩) বীজকে

জীবাণু-মুক্ত করা (৪) বীজতলা ও সার তৈরী করা, (৫) জমি তৈরী করা, (৬) সার দেওয়া, (৭) সারিতে চারা রোয়া, (৮) মাধ্যমিক পরিচর্যা। (১) **উৎকৃষ্ট ধরনের বীজ**—(১) যেগুলি যে জায়গায় উপযোগী সেগুলিই ব্যবহার করা উচিত। যেমন মেদিনীপুর জেলার জন্যে ভাসামানিক, ঝিঙেশাল, রূপশাল ইত্যাদি আমন ধানের চাষ করা উচিত। (২) একর-প্রতি বীজের পরিমাণ ৪·৬ থেকে ৫·৬ কিলোগ্রাম (৫-৬ সের) হবে। (৩) ১৪ কিলোগ্রাম (১৫ সের) জলে ৫ ছটাক নুন মিশিয়ে তাতে ০·৯৩ কিলোগ্রাম (১ সের) ধান ঢেলে দিলে খারাপ ও হাল্কা বীজ ভাসবে এবং ভারী ও পুষ্ট বীজ পাত্রের নীচে পড়ে থাকে। উপরের বীজ সরিয়ে পুষ্ট বীজগুলি ছায়ায় শুকিয়ে নিয়ে **অ্যাগ্রোসাম জি. এন**. রোগনাশক ওষুধের সঙ্গে ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে। বীজ ও ওষুধের অনুপাত ৩০০ : ১ হবে। এইবার বীজ বুনবার উপযুক্ত হল। (৪) উঁচু জায়গায় বীজতলার জমি নির্বাচন করতে হবে। নির্বাচিত জমিগুলিকে ১২৫ সে. মি. চওড়া ও ৭৬২ সে. মি. (৪ ফুট—২৫ ফুট) লম্বা খণ্ডে ভাগ করে নিতে হবে। প্রত্যেক বীজতলা ১০ সে.মি. (৪ ইঞ্চি) থেকে ১৫ সে.মি. (৬ ইঞ্চি) উঁচু হবে। লাঙ্গল বা কোদালের সাহায্যে মাটিকে ভালোভাবে গুঁড়িয়ে মিহিভাবে বীজতলা তৈরী করতে হবে। প্রত্যেক বীজতলায় আধ মণ বা প্রায় ১৮ কিলোগ্রাম করে পচা গোবর সার অথবা কম্পোস্ট সার ভালো করে মিশিয়ে দিতে হবে। তারপর জমি সমান করে নিয়ে ০·৪৭ কিলোগ্রাম বা আধ সের অ্যামোনিয়াম সালফেট প্রয়োগ করতে হয়। তারপর কম্পোস্ট সারের একটি পাতলা স্তর ছড়িয়ে তার উপর একঝুড়ি কাঠের ছাই ছড়িয়ে দিতে হবে। বীজতলা তৈরী হলে তার উপর বীজগুলি খুব পাতলাভাবে ছড়িয়ে গুঁড়ো মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হয়। প্রতি বীজতলার জন্যে আধ সের বা ০·৪৭ কিলোগ্রাম বীজই যথেষ্ট। অঙ্কুর বার হওয়ার আট দিন পরে আগাছা পরিষ্কার করে দিতে হয়। বৃষ্টির জল না পেলে এই সময় জল সেচ করতে হয়। প্রায় সপ্তাহ চারেক পরে চারা ১৫ থেকে ২০ সে.মি. (৬ থেকে ৮ ইঞ্চি) লম্বা হলে সেগুলি খুব সাবধানে বীজতলা থেকে তুলে নিয়ে শিকড়ের মাটি জলে ধুয়ে জমিতে রুইতে হবে। (৫) জমি থেকে ধান কেটে নেবার পর যদি মাটিতে উপযুক্ত রস থাকে, তবে তখনই লাঙ্গল দিয়ে ধান গাছের গোড়াগুলি মাটির মধ্যে উল্টে দিতে হয়। (৬) জমি তৈরী করার আগে **সবুজ সার** প্রয়োগ করাই সুলভ ও প্রকৃষ্ট

পদ্ধতি। সবুজ সার প্রয়োগ না করলে একর প্রতি ১০-১৫ গাড়ী পচা ও শুষ্ক গোবরের সার অথবা কম্পোস্ট সার ব্যবহার করতে হবে। জমি কাদানোর সময় একর-প্রতি ২৩ কিলোগ্রাম বা ২৫ সের অ্যামোনিয়াম সালফেট $(NH_4)_2SO_4$ প্রয়োগ করতে হয়। রোয়ার প্রায় একমাস পরে ২৩ কিলোগ্রাম ঐ সার টপ ড্রেসিং হিসাবে ব্যবহার করা হয়। (৭) গাছের আলো, বাতাস ও খাবার গ্রহণের সুব্যবস্থা এবং মাধ্যমিক পরিচর্যার জন্য সারিতে চারা রোয়া উচিত। (৮) আগাছা-বিনাশ, বাতাস চলাচল এবং গাছের শিকড়গুলি ছাঁটাইয়ের জন্যে জাপানী প্যাডি উইডার দিয়ে সারির ও গাছের মধ্যে মধ্যে পরিচর্যা করা দরকার।

অধিকফলনশীল ধানের চাষ ॥

গত ৬-৭ বছরের মধ্যে ধান চাষের ক্ষেত্রে একটা যুগান্তকারী বিপ্লব ঘটে গেছে—সে হল উচ্চফলনশীল বীজের আবিষ্কার। এই কয়েক বছরের মধ্যে অনেকগুলি অধিকফলনশীল ধানের বীজ 'কটক রাইস রিসার্চ স্টেশন' থেকে আমদানি করে একর-প্রতি ফলন ৩-৪ গুণ বেড়ে গেছে—১০।১২ কুইণ্টালের জায়গায় ৩৫-৪০ কুইণ্টাল। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো আই. আর.-৮, পদ্মা, জয়া, তাইচুং, তাইনান, কালিম্পঙ, N. C.-৬৭৮, ১২৮১ ইত্যাদি। দেশী ধানের তুলনায় এইসব উচ্চফলনশীল ধানের চাষের পদ্ধতিও খানিকটা আলাদা।

॥ ধানের পোকা ও রোগ ॥

ধানের ক্ষতিকারক বহুরকমের পোকা আছে। তার মধ্যে মাজরা পোকা,
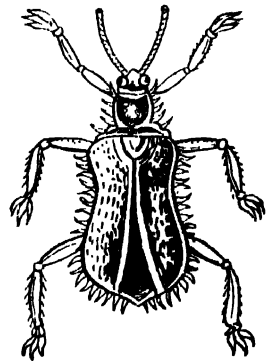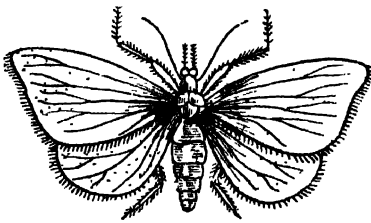
ধানের মাজরা পোকা (বামে) ও পামরী পোকা ডানে বহুগুণ বড় করে দেখানো হয়েছে

পামরী পোকা, লেদা পোকা, গাঁধী পোকা, ভেঁপু পোকা, ধানের ফড়িং, রাইস-

কেস ওয়ার্ম ইত্যাদি কুখ্যাত। **মাজরা পোকা** একরকম মথের শূককীট। আকারে ½ থেকে ¾ ইঞ্চি ও ধূসর রঙের এই মথ পাতার উপর ডিম পাড়ে; ডিম থেকে 'কীড়া' বেরিয়ে ধান গাছের ডাঁটায় গর্ত করে ঢুকে যায় এবং ডাঁটার কচি মাঝ-অংশ খেয়ে বড হতে থাকে। ফলে ডাঁটার আগার পাতাটি এবং শীষ শুকিয়ে যায়। মাজরা পোকা ধানের ডাঁটার মধ্যে থাকে বলে একে দমন করা অত্যন্ত শক্ত কাজ। কারণ কীটনাশক ওষুধ সহজে এর দেহের সংস্পর্শে আসে না। তবে আজকাল **ফলিডল ঈ-৬০৫** নামের ওষুধটি আক্রান্ত জমিতে প্রয়োগ করে ভালো ফল পাওয়া যাচ্ছে। এটি অত্যন্ত বিষাক্ত ওষুধ এবং এর কার্যকারিতা বহুদিন থাকে। অবশ্য এই পোকার জন্যে বহুরকমের প্রতিরোধ-ব্যবস্থাও অবলম্বন করতে হয়। **পামরী পোকা**—গাঢ নীল বা প্রায় কালো রঙের চতুর্ভুজাকৃতি এবং ⅛ থেকে ⅙ ইঞ্চি লম্বা। এর ডানায় কতকগুলি কাঁটা থাকে। এরা পাতার সবুজ অংশ খেয়ে গাছকে নিস্তেজ করে দেয়, ফলে ধান গাছ শুকিয়ে সাদা হয়ে যায়। আক্রান্ত ক্ষেতে পাঁচ শতাংশ বি. এইচ. সি. গুঁড়ো একর-প্রতি ১৫-২০ পাউণ্ড হিসাবে যন্ত্রের সাহায্যে ছিটাতে পারলে একে নষ্ট করা যায়। এই পোকার প্রাতুর্ভাবের ক্ষেত্রেও প্রতিরোধ-ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার। **গাঁধী বা গন্ধী পোকা**—লম্বা ধরনের অতি তুর্গন্ধময় একরকমের পোকা। এরা কচি ধানের তুধ বা রস শুষে নিয়ে ধানকে 'চিটে' করে দেয়। এক্ষেত্রে পামরী পোকা দ্বারা আক্রান্ত ক্ষেতের অনুরূপ ব্যবস্থা নিতে হয়।
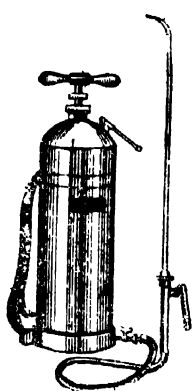
স্প্রেয়ার বা কীটনাশক ওষুধ ছিটাবার যন্ত্র

ধানের রোগের মধ্যে চিটে রোগ, ধসা রোগ, গোড়া-পচা, ডাঁটা-পচা ইত্যাদির সঙ্গে ছাত্র-ছাত্রীদের পরিচিত হওয়া দরকার। **চিটে রোগ** অতি মারাত্মক। এর আক্রমণে ধানশীষের সমস্ত ধান সাদা হয়ে চিটে হয়ে যায়, ফলে ধানের মধ্যে চাল বসে না বা বসলেও তা তেতো লাগে। আক্রান্ত ক্ষেতে পেরেনেক্স, বোর্দো-মিশ্রণ ইত্যাদি ওষুধ ছিটালে উপকার পাওয়া যায়। অন্যান্য রোগের ক্ষেত্রেও এইসব ওষুধ ছিটাতে হয়।

বিভিন্ন রকমের সার

রাসায়নিক সার (অর্থাৎ নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাস) যথাযথভাবে ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গেই কাজ আরম্ভ করে দেয়। কিন্তু প্রাণিজ ও উদ্ভিজ্জ সারের কাজ দেরীতে আরম্ভ হলেও তার ফল দীর্ঘস্থায়ী।

উদ্ভিজ্জ ও প্রাণিজ আবর্জনাকে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি এবং বজায় রাখার জন্যে দ্রুত ব্যবহারের অবস্থায় পরিণত করার পদ্ধতিকে **কম্পোস্ট তৈরী** করা বলে। **কম্পোস্ট কথাটির অর্থ মিশ্র সার**। গত ৩০ বৎসর ধরে কম্পোস্ট তৈরীর ব্যাপারে ব্যাপক প্রচার করা হয়েছে।

ভারতে এবং বিদেশে গবেষণার ফলে দেখা গেছে আকারে এবং মূল্যে গোবর সারের সমতুল্য জৈবসার নানারকমের আবর্জনা—যেমন দানাশস্যের খড়, নাড়া, তুলার বোঁটা, চীনাবাদামের খোসা, খামারের আগাছা এবং ঘাস, পাতা, পাতা-পচা, ঘরের জঞ্জাল, কাঠের ছাই, খড়কুটো, গোয়ালের চোনার ভিজে মাটি এবং ঐ জাতীয় অন্যান্য জিনিস থেকে তৈরী করা যেতে পারে। এইসব কাঁচা উদ্ভিজ্জ পদার্থের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে সেলুলোজ এবং অন্যান্য সহজে বিয়োজন-যোগ্য কার্বহাইড্রেট থাকে এবং কার্বন-নাইট্রোজেন অনুপাত থাকে ৪০।৭০+:১ (৪০ অথবা তার বেশীতে ১)। এই সমস্ত অবিয়োজিত কম নাইট্রোজেনের জৈবপদার্থকে যদি সরাসরি সার হিসেবে ব্যবহার করা হয় তাহলে মাটিতে অস্থায়িভাবে খনিজ পোষকের (বিশেষভাবে নাইট্রেট এবং অ্যামোনিয়া যৌগ) অভাব দেখা দেয়; এই সমস্ত পদার্থ অনুজীবীদের বৃদ্ধি উৎসাহিত করে ফসলের গাছের সঙ্গে লভ্য নাইট্রোজেন, ফসফরাস এবং অন্যান্য উপাদানের জন্যে প্রতিযোগিতা সুরু করে। কাজেই সার হিসেবে ব্যবহার করার আগেই তাদের কম্পোস্ট বা আংশিকভাবে বিয়োজন করে নেওয়া খুব দরকার। এর ফলে কার্বন-নাইট্রোজেন অনুপাত ১০ অথবা ১২-তে ১এ নেমে আসে।

সাধারণতঃ এইভাবে দেশী পদ্ধতিতে কম্পোস্ট প্রস্তুত করা হয়ঃ প্রথমতঃ, উঁচু, সমতল, ছায়াযুক্ত স্থান ঠিক করে নিয়ে সেখানে আবর্জনাদি জমা করতে হবে। এর পর মাটির উপরে বা গর্ত খুঁড়ে আবর্জনাগুলো স্তূপ করে সাজাতে হবে। মাটির উপর আবর্জনা রেখে কম্পোস্ট তৈরীর পদ্ধতিকে বলে **বায়ুজীবী পদ্ধতি** আর গর্ত খুঁড়ে জঞ্জাল সাজানোর পদ্ধতিকে **অ-বায়ুজীবী পদ্ধতি** বলে। প্রায় ২ থেকে ১৮ ইঞ্চি উঁচু আবর্জনার গাদা বা স্তর বিছিয়ে তার উপর গোচোনা (অভাবে কাঁচা গোবর জলে ১ : ১৫ ভাগে গুলে) দিয়ে স্তরটিকে

বিছিয়ে দিতে হয়। সব চেয়ে ভালো হয় যদি খামারের আবর্জনাকে গবাদি পশুর বিছানা হিসাবে ব্যবহার করা যায়, যাতে সেগুলি প্রচুর পরিমাণে গোচোনা শুষে নেয়। হাড়ের গুঁড়ো পাওয়া গেলে প্রতি ১০০ বর্গফুটে ১.৮-২.৮ কিলোগ্রাম বা ২-৩ সের ছিটিয়ে দিতে হয়। স্তরটি গোচোনায় ভিজিয়ে নেবার পর গোবর ও মাটি ঐ স্তরের উপর ১ ইঞ্চি বা ২.৫ সেন্টিমিটার করে ছড়িয়ে দিতে হয়। এরপর ঐ একই রকমভাবে ১ ফুট বা ৩০ সেন্টিমিটার উঁচু আরও তিনটি স্তর বিছিয়ে দিতে হয় এবং গাদার উপরের দিকটি সামান্য গোবর ও মাটি বা ২-৩ মুঠি কাঠের ছাই দিয়ে ঢেকে ঐ অবস্থায় রেখে দেওয়া হয়। যখন গাদাটি বেশ ভালভাবে বসে যায় (এর জন্যে প্রায় ৬ সপ্তাহ সময় লাগে) তখন সেটি ভালো করে উল্টে দেওয়া হয়। এর ফলে কম পচা অংশগুলো নীচে চলে যায় এবং বেশী পচা অংশগুলো উপরে আসে। গাদাটিকে আগের মত আবার ভিজিয়ে দেওয়া হয়। এর ৬ সপ্তাহ পরে আবার উল্টে ও ভিজিয়ে দিতে হয়। এই পদ্ধতিতে ৪-৫ মাসের মধ্যে কম্পোস্ট তৈরী হয়। (বলা বাহুল্য, গোয়াল থেকে গোচোনায় ভেজানো আবর্জনা পেলে আর নতুন করে গোচোনায় ভিজিয়ে নেবার দরকার নেই।)

সাধারণতঃ কম্পোস্ট গাদার প্রস্থ ৪ ফুট বা ১২০ সেন্টিমিটার এবং উচ্চতাও ঐ একই করা হয়, আর গাদার দৈর্ঘ্য নির্ভর করে আবর্জনার পরিমাণের উপর। যে-সব অঞ্চলে মাটি একটু খুঁড়লেই জল পাওয়া যায় সেইসব অঞ্চলে মাটির উপর গাদা করে কম্পোস্ট তৈরী করা উচিত। এ ছাড়া শুকনো এবং ভালো করে জল-নিষ্কাশনের ব্যবস্থা আছে এমন জায়গায় মাটির নীচে কম্পোস্ট তৈরী করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে গর্তের আকার সুবিধামত করে নিতে হবে, যেমন ১৫´×৫´×৩´। কম্পোস্ট গাদায় যাতে জল না ঢুকতে পারে, সে জন্যে গাদার চারধারে একটা 'আল' দিতে হয়।

টাউন কম্পোস্ট—আজকাল শহরের আবর্জনা এবং মল উপযুক্তভাবে তৈরী নালীতে, কম্পোস্ট করার কাজ বাসস্থান থেকে দূরে শহরের বাইরে, বহু বড় এবং ছোট শহরের পৌর প্রতিষ্ঠানের দ্বারা সাফল্যের সঙ্গে তৈরী করা হচ্ছে। ট্রেঞ্চ বা নালী সুবিধামত লম্বা, ৩-৪ ফুট চওড়া এবং ২ ফুট গভীর করে তাতে জল, শহরের আবর্জনা এবং মাটি ক্রমান্বয়ে স্তরে দিয়ে ভর্তি করা হয়। প্রায় ৩ মাসের মধ্যে কম্পোস্ট তৈরী হয়ে যায়। এক ঘনফুট আবর্জনা (ওজনে ২০ পাউণ্ড), এক গ্যালন মল (১০ পাউণ্ড), এক ঘনফুট কম্পোস্ট (৪০ পাউণ্ড) ও এক গরুর

গাড়ী (৩০ ঘনফুট) আবর্জনা (৬০০ পাউণ্ড) শহরের আবর্জনা সার তৈরীর জন্য কাজের উপযোগী।

উপরের আলোচনা থেকেই বোঝা যায় **সার তৈরীর বিষয়ে মল-মূত্রের ভূমিকা** গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের দেশে **গোমূত্র** হয় সংরক্ষণ করা হয় না, কিংবা ভুল পদ্ধতিতে সঞ্চয় করা হয়। দুধ-বন্ধ-করা গরুর চোনার মধ্যে শতকরা ৯৫ ভাগ পটাসিয়াম, ৬৩ ভাগ নাইট্রোজেন এবং ৫০ ভাগ সালফার থাকে। নাইট্রোজেন-বহুল গোচোনার অপচয়ের ফলে ভারতে এর সারমূল্য-বহুল পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। গবাদি পশুর জন্যে যে শোষক বিছানার কথা পূর্ব পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে তা ব্যবহার করা হলে গোচোনার ঠিকমত সংরক্ষণ হওয়া সম্ভব এবং নাইট্রোজেনের ক্ষতি সর্বনিম্নে আনা যায়। বিছানার ব্যবস্থা না করতে পারলে অবশ্যই ঢাকা দেওয়া পাকা আধারের মধ্যে গোচোনা সংরক্ষণ করতে হবে এবং সারগাদার গোবরের সঙ্গে মেশাতে হবে।

মানুষের মল-মূত্র মাটির উন্নয়নের যথেষ্ট সাহায্য করে থাকে বলে বহু শহরে জনস্বাস্থ্য অধিকার এর সংরক্ষণ এবং সাররূপে যাতে নিরাপদে ব্যবহার করা যায়, সেইরূপে পরিবর্তনের জন্যে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিয়ে থাকেন। মানুষের তাজা মলে শতকরা ১.০-১.৬ নাইট্রোজেন, ০.৮-১.২ ফসফরিক অ্যাসিড ও ০.২-০.৬ পটাস আছে। আর সারা ভারতের লোকসংখ্যার মলে এক বছরে ৫৯ লক্ষ টন নাইট্রোজেন, ১.৭৬ লক্ষ টন ফসফরিক অ্যাসিড ও ১.১৮ লক্ষ টন পটাস পাওয়া যাবে—অবশ্য যদি যথার্থভাবে সংরক্ষণ করা হয়।

মলে মাটি, ছাই, কাঠকয়লা, করাতের গুঁড়ো ইত্যাদি শোষকদ্রব্য মিশিয়ে নিলে একটি ধূলিকণাময় পদার্থের সৃষ্টি হয় যা সহজেই সার হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। সমপরিমাণ ছাই ও মল এবং তার সঙ্গে শতকরা ১০ ভাগ কাঠকয়লা গুঁড়ো মিশিয়ে একটি গন্ধহীন পদার্থ তৈরী হয়, যার মধ্যে শতকরা ১.৩২ ভাগ নাইট্রোজেন, ২.৮ ভাগ ফসফরিক অ্যাসিড, ৪.১ ভাগ পটাস এবং ২৪.২ ভাগ চুন থাকে। মলের সঙ্গে শতকরা ৪০-৫০ ভাগ করাতের গুঁড়ো যোগ করলে সোজাসুজি এক ধরনের শুষ্ক, আম্র ধূলিকণা পাওয়া যায় যার মধ্যে শতকরা ২-৩ ভাগ নাইট্রোজেন থাকে।

সবুজ সার : খামারের এবং অন্যান্য জৈব সারের সরবরাহ ক্রমেই দুর্লভ এবং ব্যয়বহুল হয়ে যাওয়ায় মাটিতে জৈব পদার্থ সংযোগের প্রধান সম্পূরক উপায় হিসাবে যেখানেই সম্ভবপর সবুজ সার উৎপন্ন করা হচ্ছে। তাড়াতাড়ি বাড়ে

এমন ফসল জন্মানো এবং মাটির মধ্যে মিশিয়ে দেওয়ার জন্যে তাকে চষে দেওয়াই হল সবুজ সার উৎপাদন। সবুজ সারের ফসল জৈব পদার্থ এবং অতিরিক্ত নাইট্রোজেন সরবরাহ করে, বিশেষভাবে যদি এটা শুঁটিজাতীয় ফসল হয় যার শেকড়ের অর্বুদের ব্যাকটিরিয়ার সাহায্যে বাতাসের নাইট্রোজেন সংগ্রহের ক্ষমতা আছে। একটা শুঁটিজাতীয় ফসল যা একর-প্রতি ৩-১০ টন সবুজ পদার্থ তৈরী করবে তাকে মাটিতে চাষ দিয়ে দিলে ২৪-৮০ পাউণ্ড নাইট্রোজেন যোগ করবে। এর সঙ্গে জৈব পদার্থ এবং নাইট্রোজেন সংযুক্ত হলে এটা ৩-১০ টন খামারের সারের সমতুল্য হবে। সবুজ সারের ফসল ভূমিক্ষয় এবং চোয়ানির বিরুদ্ধে রক্ষার কাজও করে থাকে।

কোনও জায়গায় সবুজ সারের জন্য শুঁটিজাতীয় যে ফসল সেই অঞ্চলের মাটি এবং জলবায়ুর পক্ষে সব চেয়ে উপযোগী, সেই জায়গায় সেটার ব্যবহারই সবচেয়ে ভালো। সবুজ সারের ফসল হিসেবে শন সারা দেশে সুপরিচিত। পশ্চিম বাংলায় **ধইঞ্চা** ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। অন্যান্য জায়গায় বন মেথি, বরবটি, বারসিম, মসুরি ইত্যাদির ব্যবহার দেখা যায়। সবক্ষেত্রেই ফসলের শেকড় এবং গোড়া মাটিতে মেশান হয়ে থাকে। ফসলের এই অবশিষ্টাংশের মধ্যে জৈব পদার্থ ছাড়াও প্রচুর পরিমাণে নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাসিয়াম এবং অন্যান্য খনিজ পোষক থাকে।

সবুজ সারের ভালভাবে পচনের জন্যে সবুজ পদার্থের বেশ রসাল হওয়া দরকার এবং মাটিতেও পর্যাপ্ত পরিমাণে আর্দ্রতা থাকা দরকার।

সবুজ সার প্রয়োগের পর ফলনের পরিমাণ শতকরা ৩০ থেকে ৫০ ভাগের মত হয়ে থাকে। শুঁটিজাতীয় ফসলের উর্বরক মূল্য (fertiliser value) প্রচুর পরিমাণে বাড়িয়ে দেওয়া যায় যদি এতে সুপার ফসফেট প্রয়োগ করা হয়।

উদ্যানকর্ষণ-বিদ্যা (Horticulture)

একটি বিখ্যাত অভিধানে Horticulture শব্দটির অর্থ বলা হয়েছে "the science and art of growing fruits, vegetables, flowers or ornamental plants." এর থেকেই বোঝা যাবে উদ্যানকর্ষণ-বিদ্যার মধ্যে সব্জী, ফুল ও ফল—সব কিছুর—চাষই ধরা হবে। সুতরাং যে-বিদ্যালয়ে উদ্যানকর্ষণ-বিদ্যাকে অন্যতম প্রোজেক্ট হিসাবে গ্রহণ করা হবে সেখানে ছাত্র-ছাত্রীরা সমস্ত রকমেরই চাষ করবে।

গৃহসংলগ্ন সব্জী-বাগান করা সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে উদ্যানকর্ষণ-বিদ্যার কিছুটা এখানে আমরা আলোচনা করেছি। এবার সাধারণভাবে উদ্যানকর্ষণ-বিদ্যা সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলা যেতে পারে। বলা বাহুল্য, একটি বইয়ের সামান্য কয়েকটি পৃষ্ঠার মাধ্যমে কোনও ছাত্র বা ছাত্রীকে উদ্যানকর্ষণ-বিদ্যা সম্পর্কে সব কিছু জানানো যায় না। আর, তা ছাড়া, ছাত্র-ছাত্রীরা এসব জিনিস হাতে-কলমে করলেই তবে অভিজ্ঞতা হয়।

ফল-ফুল ও সব্জীর জন্যে চাই রোদযুক্ত জায়গা। সাধারণতঃ সীমানায় কাঁটাযুক্ত বেড়ার গাছ, সীমানার ভিতর ধারে ধারে মাঝারী ধরনের ফল ও ফুল ও ছায়া হয় এমন গাছ, প্রবেশমুখে কোনও দর্শনীয় গাছ, প্রবেশপথের দু'ধারে লন ও তার ধারে মাঝে মাঝে মরশুমী ফুলের কেয়ারী ইত্যাদি এবং বাকী জমিতে সব্জী-বাগান—এটাই হল আদর্শ বাগান তৈরীর সূচনা।

প্রথমে শাক-সব্জীর চাষ নিয়েই আলোচনা করা যাক। উৎপাদনের সময় অনুযায়ী সব্জীগুলিকে প্রধান দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—(১) **শীতের বা রবি সব্জী**—ফুলকপি, বাঁধাকপি, গাজর, শালগম, মূলা, মটর, পালং ও অন্যান্য শীতের শাক, টোমাটো, বেগুন ইত্যাদি (২) **খারিফ শস্য** অর্থাৎ ঢেঁড়স, কুমড়ো, শসা, ঝিঙে, লাউ, পটোল, উচ্ছে, করলা ইত্যাদি বিভিন্ন জাতের শাক ও নটেডাঁটা।

শাক-সব্জীর চাষের জন্য ভালো ও উঁচু জমির দরকার। নীচু জলাজমি বা নীচু জমি শাক-সব্জী চাষের অনুপযুক্ত। কারণ সেখানে একটু বৃষ্টি হলেই জল দাঁড়ায় আর শাক-সব্জী গোড়ায় জল দাঁড়ানো সহ্য করতে পারে না। গভীর ও উর্বর দোআঁশ মাটিই শাক-সব্জী চাষের পক্ষে সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত। বেলে দোআঁশ এবং এঁটেল দোআঁশ মাটিতেও এদের চাষ করা চলতে পারে, কিন্তু শুধু এঁটেল বা শুধু বালিমাটিতে শাক-সব্জী ভালো হয় না।

শাক-সব্জীর চাষের জন্যে জমি ভালো করে তৈরী করা দরকার। জমিতে "জো" থাকা অবস্থায় ৬।৭ বার লাঙ্গল ও মই দিয়ে মাটি ভালো করে গুঁড়ো ও নরম করতে হয়। এই সময় জমিতে প্রয়োজনীয় গোবর সার বা আবর্জনা সার, কাঠের ছাই, হাড়ের গুঁড়ো, সুপার ফসফেট প্রভৃতি প্রয়োগ করে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হয়। অবশ্য বিভিন্ন সব্জীর জন্যে মাটি তৈরীর ব্যাপারে তারতম্য আছে। (সারের সম্পর্কে পরে আরো বলা হয়েছে।)

নির্ধারিত ব্যবধানে সব্জীর (মটর, শিম, কুমড়ো ইত্যাদির) বীজ বা চারা

(কপি, টোমাটো, বেগুন ইত্যাদির) সারি করে লাগিয়ে মাঝে রাস্তা রাখতে হয় যাতে পরিচর্যার সুবিধা হয়। সেচের সুবিধার জন্যে প্রতি দু'সারির মাঝে একটি করে জলের নালা রাখা দরকার।

বলা বাহুল্য, ভালো ফসলের জন্যে **চাই ভালো জাতের নীরোগ এবং সুপুষ্ট বীজ**। বীজ সংরক্ষণের ব্যাপারেও একথাটা মনে রাখতে হবে।

যে-সব ফসলের চারা তৈরী করে স্থায়িভাবে জমিতে রোপণ করা হয় তাদের জন্যে ভালো বীজতলার দরকার। সমস্ত রকমের কপি, টোমাটো, বেগুন, লঙ্কা, লেটুস প্রভৃতি কয়েকটি সব্জীর চারা তৈরী করতে হয়। অন্যান্য সব্জীর বীজ সরাসরি জমিতে স্থায়িভাবে বোনা হয়। চারধার খোলা উঁচু এবং সারাল জমিতে বীজতলা তৈরী করা দরকার। বীজ ফাঁক-ফাঁক করে ছড়িয়ে ঝুরো মাটির পাতলা আস্তরণ দিতে হবে। জল এমনভাবে দিতে হবে যেন বীজগুলি ভেসে না ওঠে। প্রখর রোদ বা প্রবল বর্ষা থেকে চারা বাঁচাবার জন্যে বীজ-তলার উপর ছাউনি দেওয়া দরকার। এছাড়া দেখতে হবে যেন সেখানে পিঁপড়ে ইত্যাদির উপদ্রব না হয়। এই উদ্দেশ্যে চারদিকে ছাইয়ের সঙ্গে অল্প পরিমাণ কেরোসিন মিশিয়ে দেওয়া উচিত। চারা ৩-৪ ইঞ্চি হলে রোপণের উপযুক্ত হয়। চারা তোলার সময় যেন শিকড়ে আঘাত না লাগে। এইজন্যে আগে থেকে বীজতলা জল দিয়ে ভিজিয়ে রাখতে হয়। বিকেলে যখন সূর্যকিরণের তেজ কমে আসে তখনই চারা তোলা উচিত।

চারা রোপণের দিন থেকে ৩-৪ দিন ভাঙ্গা টব, ঝুড়ি বা পাতা দিয়ে প্রত্যেক চারাকে ঢাকা দিতে হয়, যাতে চারাগুলি নতুন পরিবেশেও তাড়াতাড়ি সতেজ হয়ে ওঠে। কোনও কোনও সব্জীর চাষে বিশেষ সাহায্যের দরকার যেমন শিম, লাউ, কুমড়ো ইত্যাদি গাছে মাচার সাহায্য, টোমাটো গাছে কঞ্চির সাহায্য। বর্ষার বেশির ভাগ সব্জীরই মাচার দরকার।

সব্জী চাষে প্রচুর সারের দরকার। যে কোন সব্জীর জমিতে একর-প্রতি ১৬ থেকে ২০ গাড়ী (এক গাড়ী=প্রায় ১০ মণ বা ৩·৭৩ কুইন্টাল) পচা ও শুকনো গোবর সার অথবা কম্পোস্ট সার প্রয়োগ করতে হয়। জমি তৈরীর সময় এই সার মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হয়। কিন্তু এ দিয়ে সব্জীর পুরো চাহিদা মেটে না বলে প্রচুর পরিমাণে রাসায়নিক সার (যেমন—অ্যামোনিয়াম সালফেট, ইউরিয়া, সুপার ফসফেট, মিউরিয়েট অব পটাস), হাড়গুঁড়ো, কাঠের ছাই ইত্যাদি প্রয়োগ করা দরকার।

নীচের তালিকা থেকে ধারণা করা যাবে কোন্ কোন্ ফসলের জন্যে কতটা পরিমাণ নাইট্রোজেন ও ফসফরিক অম্লের প্রয়োজন :—

শাক-সব্জীর নাম	নাইট্রোজেনের পরিমাণ	ফসফরিক অম্লের পরিমাণ
	(একর প্রতি)	(একর প্রতি)
ফুলকপি	২৭ কিলোগ্রাম	৫৪ কিলোগ্রাম
বাঁধাকপি	৩৬ ,,	৭২ ,,
ওলকপি	১৮ ,,	২৭ ,,
লেটুস	১৮ ,,	২৭ ,,
টম্যাটো	১৮ ,,	৩৬ ,,
বেগুন	৯ ,,	২৭ ,,
পালং	১৩.৫ ,,	২৭ ,,
মুলো	১৩.৫ ,,	২৭ ,,
কুমড়ো, লাউ, করলা, শসা, উচ্ছে ইত্যাদি	১৮ ,,	৫৪ ,,

বর্ষাকালীন শাক-সব্জীতে সেচ না দিলেও চলতে পারে, বরং বর্ষাকালের ফসলে অতিরিক্ত জল নিষ্কাশনের উত্তম ব্যবস্থা থাকা দরকার। কিন্তু শীতকালীন ও গ্রীষ্মকালীন শাক-সব্জীর ক্ষেতে নিয়মিত সেচ দেওয়া একান্ত দরকার। এছাড়া মাধ্যমিক পরিচর্যা অর্থাৎ আগাছা দমন, গোড়ার শক্ত মাটিকে আলগা করা, গোড়ায় মাটি দেওয়া, কীটনাশক ও রোগ-প্রতিরোধকারী ওষুধ নিয়মিত-ভাবে ছিটানো, জলসেচ ও নিষ্কাশন ইত্যাদি কাজগুলি নিয়মিতভাবে করতে হবে। এর জন্যে চাই বিভিন্ন রকমের উন্নত মানের কৃষি-যন্ত্রপাতি।

শিক্ষকের অভিজ্ঞতা যে ছাত্র-ছাত্রীদের এই সব বিষয়ে সাহায্য করবে তাতে সন্দেহ নেই।

ফলের চাষকে প্রোজেক্ট হিসাবে গ্রহণ করা শক্ত। কারণ প্রধান প্রধান সুপরিচিত ফলের গাছগুলির প্রায় সবগুলিই কয়েক বছর বাদে ফল দেয়, নবম ও দশম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে সময় সাকুল্যে দু'বছর। সুতরাং আম, কাঁঠাল, লিচু, পেয়ারা, লেবু, নারিকেল ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা

করা একরকম নিরর্থক। সেদিক থেকে দেখতে গেলে কলা ও পেঁপের চাষকে প্রোজেক্ট করা যেতে পারে। কারণ প্রজাতিবিশেষে কলা চারা রোপণের ১০-১২ (মর্তমান) বা ১১-১৩ (কাঁচা) বা ১৩-১৪ (চাঁপা) এবং পেঁপে চারা লাগাবার ৮-৯ মাসের মধ্যে ফল দেয়।

তবুও সাধারণভাবে বলা যায় ফলগাছের জন্যে উঁচু, রোদযুক্ত জায়গা চাই। গাছ লাগানোর জায়গাটি নির্বাচিত করতে হবে খুব সতর্কভাবে, কারণ ভবিষ্যতে গাছ বড় হয়ে বেশী ছায়ার সৃষ্টি করলে নীচের গাছগুলি বাড়তে পারবে না। নির্দিষ্ট ব্যবধানে ৩ হাত × ৩ হাত × ৩ হাত গর্ত করে কিছুদিন রোদ খাইয়ে অর্ধেক সাধারণ মাটি ও বাকি অর্ধেক আবর্জনা সার দিয়ে গর্ত ভর্তি করে চারা বসাতে হবে। গ্রীষ্মে ও শীতে গাছের গোড়ায় আল তুলে জলসেচন ও বর্ষায় বাড়তি জল নিষ্কাশন করতে হবে। বর্ষার আগে উদ্ভিজ্জ ও প্রাণিজ সার নির্ভয়ে প্রয়োগ করতে হবে। শুকনো, রোগগ্রস্ত ডালপালা কেটে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। আম, লিচু ৪০´, সপেটা, পেয়ারা, জামরুল ২৫´; লেবু, গোলাপজাম, নারিকেল ২০´, পেঁপে, কলা, সুপারী ১০´ ও আনারস ৪´ দূরত্বে বসবে।

ফুলের চাষ দরকার আমাদের সৌন্দর্যক্ষুধাকে নিবৃত্ত করার জন্যে।

ভালোভাবে ফুলবাগান তৈরী করতে হলে ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষকের পরামর্শক্রমে স্থির করবে কোন্ কোন্ ঋতুতে কী কী মরসুমী ফুলের চাষ করা হবে, কোন্ সময় স্থায়ী ফুলগাছের উপর কী প্রকার যত্ন ও পরিচর্যা করা হবে এবং কোন্ ঋতুতে ফুলের কলম তৈরী করা হবে।

সাধারণভাবে বলা যায় যে, শীতকালে মাটি রসহীন হয়ে পড়ায় এই সময় প্রত্যেকটি গাছেই সেচ দিতে হয়। দুর্বল ও নরম কাণ্ডযুক্ত গাছগুলি ঢাকবার ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে অতিরিক্ত শীতে গাছগুলির কোনও ক্ষতি না হয়। সেইরকম গ্রীষ্মকালেও (বর্ষাকাল ছাড়া) গাছে জলসেচনের দরকার। **বর্ষাকালই বিভিন্ন রকম ফুল এবং ফলের কলম ও চারা তৈরী করবার সবচেয়ে উপযুক্ত সময়।** অক্টোবর মাস থেকে শীতকালের মরসুমী ফুলের চারা তৈরী করা উচিত এবং বাগানের জমি তৈরী, নক্‌সা তৈরী এইসব কাজগুলি শেষ করে চারা রোপণ করা উচিত।

ফুলবাগানের মাটি ঠাসা শক্ত এবং ক্ষয়প্রতিরোধক্ষম হতে হবে, কিন্তু মাটি খুব বেশী ঠাসা ও শক্ত হওয়া উচিত নয়। শক্ত মাটিকে লাঙ্গল দিয়ে বা কুপিয়ে

ঢেলা ভেঙ্গে নিতে হয়। এ ছাড়া, মাটির পর্যাপ্ত জলধারণের ক্ষমতা থাকা চাই। আর, মাটিতে গাছের খাদ্য উপাদানগুলির কোনওটিরই বেশী প্রাচুর্য থাকা উচিত নয়।

সার দিয়ে অনুর্বর মাটিকে উর্বর করে তুলতে হয়। **সার তিন রকমের ঃ** নাইট্রোজেন-ঘটিত (যেমন—গোবর, অন্যান্য মল ও মূত্র, পাতাপচা সার, সবুজ সার, কম্পোস্ট, অ্যামোনিয়াম সালফেট, ইউরিয়া, সোডিয়াম নাইট্রেট, ক্যালসিয়াম সায়নামাইড); ফসফরাস-ঘটিত (হাড়গুঁড়ো, মাছ— পচা বা গুঁড়ো, সুপার ফসফেট) এবং পটাস-ঘটিত (কাঠের ছাই, তামাক ডাঁটা, পটাসিয়াম নাইট্রেট, মিউরিয়েট অব পটাস)। কখনও কোনও সার সোজাসুজি গাছের শিকড়ের উপর দেওয়া উচিত নয়। সারের সঙ্গে সর্বদাই কিছুটা মাটি মিশিয়ে গাছের গোড়ায় প্রয়োগ করতে হয়। একবারে বেশী সার না দিয়ে বার বার অল্প মাত্রায় সার দেওয়া ভালো। গাছের কাণ্ড, শাখা, পাতা ইত্যাদি বৃদ্ধির জন্যে নাইট্রোজেন-ঘটিত সার এবং ফুল ও ফলের জন্যে ফস্ফরাস ও পটাস-ঘটিত সার ব্যবহার করা উচিত।

ফুলের চাষ করবার জন্যে যে-সব যন্ত্রপাতি দরকার বিদ্যালয়ের খামার নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে তা উল্লেখ করা হলেও এখানে আবার পৃথকভাবে সে-সব যন্ত্রপাতির নাম বলা হচ্ছে। যন্ত্রপাতিগুলিকে মোট ৯ ভাগে ভাগ করা যায় ঃ

(১) ডাল-ছাঁটা যন্ত্র (প্রুনিং নাইফ, প্রুনিং স, সিকেচার, গার্ডেন হ্যাচেট)

(২) ছাঁটাই যন্ত্র (হেজ সিয়ার, লন মোয়ার, এজিং নাইফ, গ্র্যাস কাটার)

(৩) গাছের গোড়ার মাটি আল্গা করার যন্ত্র (হ্যাণ্ড ফর্ক, খুরপী, নিড়ানি, হ্যাণ্ড কালটিভেটর, ডাচ হো)

(৪) মাটি খুঁড়বার যন্ত্র (কোদাল, স্পেডিং ফর্ক, ডিগিং ফর্ক, শাবল)

(৫) কলম তৈরী করবার যন্ত্র (বাডিং নাইফ, গ্র্যাফ্টিং নাইফ, বাডিং অ্যাণ্ড গ্র্যাফ্টিং নাইফ)

(৬) জলসেচনের যন্ত্র (ক্যান, বালতি, লন স্প্রিঙ্কলার)

(৭) চারা-রোপণের যন্ত্র (গার্ডেন ট্রাওয়েল, ট্র্যান্সপ্ল্যান্টিং স্পেড)

(৮) জমি সমতল করার যন্ত্র (গার্ডেন রেক, লন রোলার)

(৯) ঔষধ প্রয়োগের যন্ত্র ডাস্টার, স্প্রেয়ার)।

এগুলির অনেকগুলির সঙ্গেই ছাত্র-ছাত্রীদের পরিচয় আছে। অন্যান্যগুলির ব্যবহারে তারা ক্রমশঃ অভ্যস্ত হবে।

বাড়ীর সংলগ্ন ফাঁকা জায়গায় বাগান তৈরী (Kitchen Gardening) ঃ বাড়ীর সংলগ্ন যেটুকু জমি ফাঁকা থাকে তাকে ফেলে না রেখে যদি শাক-সব্জীর চাষ করা হয় তাহলে একদিকে যেমন দেশে শাক-সব্জীর উৎপাদন বাড়বে, অপরদিকে তেমনই শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যেরও উন্নতি হবে। অবশ্য শহরাঞ্চলে এরকম জমির পরিমাণ উল্লেখযোগ্য নয়; তাই এ-সব জায়গায় যেটুকু ফাঁকা জমি পাওয়া যায় তাতেই সব্জীবাগান তৈরী করতে হবে। এমন কি বাড়ীর সামনের জমিতে ফুলের চাষ ছাড়াও দু' একটা খুব দরকারী সব্জীর চাষ করতে পারলে বেশ ভালো।

এই ধরনের বাগান তৈরী করতে গেলে কয়েকটি বিষয়ের উপর নজর রাখা খুবই দরকার। যেমন, বাগান তৈরীর পরিকল্পনা এমনভাবে গ্রহণ করতে হবে, যাতে সারা বছরই নানা রকম শাক-সব্জী পাওয়া যায়। তা ছাড়া পরিবারভুক্ত ব্যক্তিদের সংখ্যা ও রুচি অনুযায়ী শাক-সব্জী বেছে নিতে হবে। শুধু তাই নয়, ঐ সব শাক-সব্জী সম্পর্কেও উত্তম জ্ঞান থাকা দরকার।

সজ্‌নে, পেঁপে, কলা, কাগ্‌জী লেবু প্রভৃতি কয়েক রকমের গাছ তৈরী করতে পারলে খুব অল্প যত্নেই বছরের পর বছর সজ্‌নে শাক ও ডাঁটা, পেঁপে, কলা, কাগ্‌জী লেবু পাওয়া যাবে। অবশ্য এসব গাছ বাগানের একপাশে এমনভাবে পুঁততে হবে যাতে তাদের ছায়ায় অন্যান্য সব্জী-গাছের কোনও ক্ষতি না হয়।

অল্প জমিতে সবচেয়ে বেশী পরিমাণ ফসল তৈরী করতে হলে কয়েকটি বিষয়ের উপর দৃষ্টি দিতে হবে: (১) বাগানের তিনদিকে বেড়ার উপর লতাজাতীয় গাছ তুলে দিতে হবে। গ্রীষ্মে ও বর্ষায় লাউ, কুমড়ো, করলা, ঝিঙে ও চিচিঙ্গে প্রভৃতি গাছের লতা এবং শীতকালে কড়াই-শুঁটি গাছ বেড়ার উপর লতিয়ে যাবে। বেড়ার যেদিকে গেট থাকবে, সেইদিকে শিমগাছ তুলে দিতে হবে। (২) একটি ফসল তোলা শেষ হলেই সেই জায়গা ফাঁকা ফেলে না রেখে সঙ্গে সঙ্গে আর একটি ফসলের চাষ দিতে হয়। (৩) বিভিন্ন প্লটের মাঝে মাঝে যে দাঁড়া বা সরু আল থাকবে সেগুলিতে মূলজ সব্জীর চাষ করতে হবে। (৪) বাগানে যে রাস্তা থাকবে, তার এক পাশে এক বা দু'সারি টম্যাটো গাছ লাগাতে হবে। গাছগুলো একটু বড় হলেই ছোট ছোট কাঠি পুঁতে বেঁধে দিতে হয়। রাস্তার আর এক পাশে লালশাক বা পালংশাক বা ঐ ধরনের কোন শাকের চাষ করতে হবে। (৫) প্রত্যেক বছর একই প্লটে এক ফসলের চাষ না করে অন্য ফসলের চাষ করতে হবে, অর্থাৎ এক কথায় শস্য-পর্যায় অনুসরণ
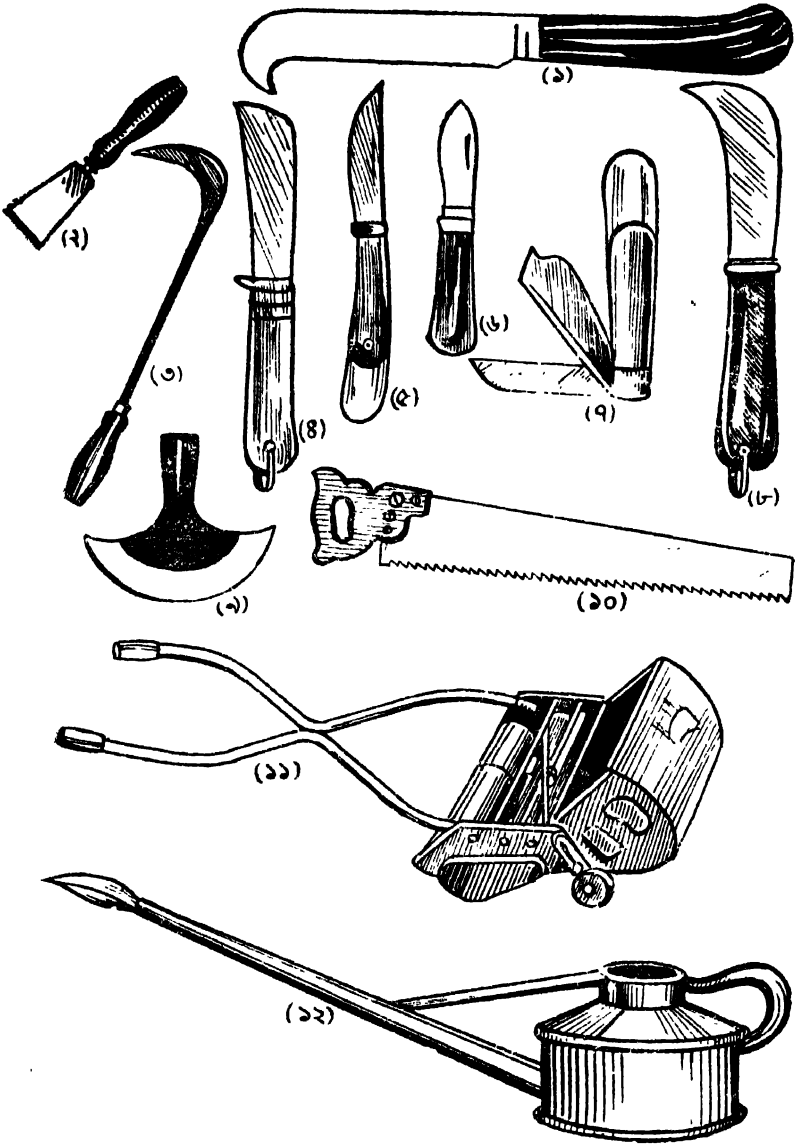
উদ্যানচর্চার বিভিন্ন যন্ত্রপাতির কয়েকটি : (১) প্রুনিং নাইফ (২) খুরপী (৩) নিড়ানি (৪) প্রুনিং নাইফ—এর ফলা গুটিয়ে ফেলা যায় (৫) গ্র্যাফ্‌টিং নাইফ (৬) বাডিং নাইফ (৭) বাডিং ও গ্র্যাফ্‌টিং নাইফ (৮) কালো হাতলের প্রুনিং নাইফ (৯) এজিং নাইফ (১০) গাছের ডাল ছাঁটাই করার করাত (১১) লন মোয়ার (১২) জলসেচের ক্যান

প্লটের ক্রমিক সংখ্যা	ফসলের নাম			স্থায়িত্ব
	রবি বা শীতকালীন	গ্রীষ্মকালীন	বর্ষাকালীন	
(১)	আলু	.... নটে, চাঁপানটে ও পুঁই (শাক)	.... বরবটি	নভেম্বর—মার্চ মার্চ—মে মে—অক্টোবর
(২)	বাঁধাকপি সঙ্গে লেটুস	.... ফরাসী শিম ও	.... ক্লাস্টার শিম	নভেম্বর—মার্চ মার্চ—অক্টোবর
(৩)	ফুলকপি (নাবি) ওলকপি সমেত	.... তরমুজ ও কাঁকুড়	.... নটেশাক পুঁইশাক	সেপ্টেম্বর—ফেব্রুয়ারী ফেব্রুয়ারী—জুন জুন—আগষ্ট
(৪)	×	ঢেঁড়স পাটশাক সহ	বেগুন (লম্বা) পালংসহ	জুলাই—মার্চ মার্চ—জুন
(৫)	×	ঢেঁড়স নটেশাক সমেত	.... বেগুন (গোল) পালং সমেত	মে—জুলাই আগষ্ট—এপ্রিল
(৬)	পেঁয়াজ ধনেশাক সমেত	.... তরমুজ ও	.... ঝিঙে	অক্টোবর—ফেব্রুয়ারী ফেব্রুয়ারী—সেপ্টেম্বর
(৭)	লঙ্কা	.... বরবটি	....	সেপ্টেম্বর—মার্চ মার্চ—আগষ্ট
(৮)	মূলো	ফুলকপি	.... শসা ও উচ্ছে	জুলাই—নভেম্বর নভেম্বর—ডিসেম্বর জানুয়ারী—জুন

করা উচিত। (৬) বাগানের দু'পাশে দু'টি আবর্জনা বা কম্পোস্ট সারের গর্ত খুঁড়তে হবে, ঐ গর্তে বাগানের জঞ্জাল, রান্নাঘরের ছাই এবং অন্যান্য আবর্জনা ও ঘরের জঞ্জাল ফেলতে হবে। গর্ত দু'টির উপর শিমগাছের লতাবার এমন ব্যবস্থা করতে হবে যে সেগুলোয় সূর্যের প্রখর আলো যেন না যায় এবং কেউ সহজে দেখতে না পায়। এই দু'টি গর্ত থেকেই বাগানের দরকারমত সারা বছরের আবর্জনা-সার পাওয়া যাবে। অবশ্য বাগান যদি খুব বড় হয় তাহলে আরও গর্তের দরকার হবে।

বাড়ীর চারদিকেই যদি জমি পড়ে থাকে, তা হলে বাগানের জন্যে বাড়ীর পিছন দিকের জমি ঠিক করাই উচিত। কেননা, তা করলে রান্নাঘর ও স্নান-ঘরের ব্যবহৃত ময়লা জল ঐদিকে সহজে নিয়ে যাওয়া যাবে এবং তাতে আংশিক সেচকার্য চলবে। তাছাড়া এতে বাড়ীর সকলেই অবসরমত বাগানের পরিচর্যা করার সুযোগ পাবেন। বাগানে নিয়মিত সেচ দেওয়ার জন্যে একটি টিউবওয়েল বা একটি পাতকুয়া রাখতে হবে।

জমির আকৃতি সম্পর্কে ধরাবাঁধা কোনও নিয়ম নেই, তবে আয়তক্ষেত্রাকার জমিই বাগানের পক্ষে সবচেয়ে উপযোগী। যতটা জমি পাওয়া যাচ্ছে তাকে কতকগুলি ছোট ছোট প্লট বা খণ্ডে ভাগ করে নিতে হয়। তারপর পরিবারের রুচি ও চাহিদামত বিভিন্ন প্লটে বিভিন্ন শাক-সব্জী চাষের একটা পরিকল্পনা তৈরী করতে হয়। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত—কোন্ ঋতুতে কী শাক-সব্জী তৈরী করা হবে তা আগে থেকেই ঠিক করে নিতে হবে। ৩৮ নং পৃষ্ঠায় সারা বছরের বিভিন্ন রকমের শাক-সব্জীর চাষের একটা সাধারণ পরিকল্পনা দেওয়া হল। অবশ্য জমির প্রকৃতি, পরিবারের রুচি ও চাহিদার তারতম্য অনুসারে এর অদল-বদল নিশ্চয়ই করা যেতে পারে। (এখানে সমস্ত বাগানটাকে আটটি প্লটে ভাগ করা হয়েছে।)

॥ টবে ফুলের চাষ ॥
(Pot Culture)

কয়েক ধরনের ফুল টবে চাষ করলেই সুন্দর দেখায়। শুকোবার সঙ্গে সঙ্গে গাছ থেকে ফুল তুলে নিলে গাছের নতুন ফুলগুলি আরও বেশীদিন স্থায়ী হয়।

জায়গার স্বল্পতাই টবে ফুলের চাষের প্রধান কারণ হলেও কতকগুলি ফুল যেন টবের জন্যেই তৈরী। বিশেষতঃ যে-সব ফুলগাছ কোনও এক বিশেষ ঋতু বা

মরসুমে জন্মে, ফোটে এবং ঋতুর শেষে মরে যায়, সেই সব গাছের ফুল অর্থাৎ **মরসুমী ফুল** টবেই বেশী মানায়।

সাধারণতঃ ১২-ইঞ্চি টব ব্যবহার করা উচিত। এতে সব রকম ছোট ফুল ও বাহারী গাছ করা চলে। টবের নীচের গর্তটি ছোট থাকলে বড় করে নিতে হয় ও টবের নীচের দিকের ইঞ্চিখানেক মত জায়গা খোলামকুচি বা টবভাঙ্গা দিয়ে ভর্তি করতে হয়। ইটভাঙ্গা বা ঝামা দিয়ে ভর্তি করলে মাটি জমাট বেঁধে যায় এবং জল বেরিয়ে যেতে পারে না।

টবের মাটি নরম, ঝুরঝুরে এবং বলা বাহুল্য, উর্বর হবে। মাটির সঙ্গে শতকরা ৮ ভাগ পাতাপচা সার, ৮ ভাগ কম্পোস্ট বা পচা গোবরসার এবং এক ভাগ বালি মিশিয়ে টব ভর্তি করতে হবে এবং নির্দিষ্ট গাছের শিকড়গুচ্ছের গুল ডুবিয়ে পুঁততে হবে, যাতে টবের উপর দিকের একইঞ্চি জায়গা খালি থাকে। ঐ খালি জায়গাটা জল ধরে রাখার জন্যে অপরিহার্য। গাছ পোঁতার পর ভালো করে জল দিতে হবে।

অত্যন্ত গরমের সময় ছাড়া টবের গাছে রোজ জল দেবার দরকার নেই। কয়েকদিন অন্তর-অন্তর যখনই জল দেওয়া হবে, গাছকে স্নান করিয়ে বেশী করে জল দিতে হয় এবং মাটি শুকিয়ে বা শক্ত হয়ে এলে কিংবা ঘাস, আগাছা ইত্যাদি জন্মালে টবের মাটি উসকে দেওয়া উচিত। তবে সাবধানতা অবলম্বন করতে হয় যেন শিকড়ের কোনও ক্ষতি না হয়। জায়গার তারতম্যে টবে জল কম বা বেশী লাগবে। রোদ বা শুকনো হাওয়ায় টব থাকলে জলের প্রয়োজন বাড়বে এবং সেইমত দিতে হবে। টবের মাটি কমে গেলে মাঝে মাঝে পূরণ করে দিতেও হবে। টবে শ্যাওলা জমলে টবের উপরকার শ্যাওলাসমেত মাটি এক ইঞ্চি ফেলে দিয়ে উপরের বর্ণনামত মাটি দিয়ে জায়গাটা ভর্তি করতে হবে। টবের নীচের গর্তটি একটি কাঠি দিয়ে পরিষ্কার করলে গর্তটি দিয়ে সব সময় বাড়তি জল বেরিয়ে যাবে এবং উপরে শ্যাওলা জমবে না। যদি বাড়তি জল বেরিয়ে যেতে না পারে তা হলে গাছের বাড় বন্ধ হয় এবং পাতা হলদে হয়ে গাছ মরেও যেতে পারে।

এখানে টবে লাগাবার মত কতকগুলি মরসুমী ফুলের নাম দেওয়া হল: **বর্ষাকালে**—কক্সকোম্ব, টোরোনিয়া, জিনিয়া। **শীতকালে**—ক্যালেণ্ডুলা, কার্নেশন্, ডায়েন্থাস, এন্টিরিনাম, এস্টার, ক্লার্কিয়া, ফ্লক্স্, প্যান্সি, চন্দ্রমল্লিকা, ডালিয়া, গাঁদা, কসমস্, কর্ণফ্লাওয়ার। **গ্রীষ্মকালে**—জিনিয়া, পেরিনিস্, পিটুনিয়া, পর্টুলেকা, নিকোসিয়ানা, লাইনারিস।

চন্দ্রমল্লিকা জমির তুলনায় টবে চাষ করাই যুক্তিযুক্ত। জমিতে চাষ করলে গাছ সংরক্ষণের ব্যাপারে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করতে হয়—গ্রীষ্মে প্রখর রোদের তাপে গাছ শুকিয়ে যায়, আবার বর্ষায় অতিরিক্ত জলে গাছ পচে যায় টবে চাষ করলে এই সমস্যার উদ্ভব হয় না।

বীজ, কাটিংস্ এবং তেউড় (কোঁড়) থেকে চন্দ্রমল্লিকার চারা তৈরী করা গেলেও বীজের গাছ থেকে বড় ও ভালো ফুল পাওয়া যায় না বলে তেউড় থেকেই করা ভালো। পৌষ-মাঘ মাসে গাছের ফুল দেওয়া শেষ হলেই ফুলগাছের গোড়া থেকে বহু তেউড় বেরোয়। এই সময় পুরোনো গাছটি গোড়া পর্যন্ত ছেঁটে টব থেকে বার করে ফেলতে হয়। তারপর মাটি ঝেড়ে শেকড়সুদ্ধ তেউড়গুলো কেটে নিতে হয়। তেউড় থেকে চারা তৈরী করার জন্যে একটু ছায়াযুক্ত জায়গায় মাটি তৈরী করে সারি থেকে সারি এবং তেউড় থেকে তেউড়ের ব্যবধান ১ ফুট বা ৩০ সেন্টিমিটার রেখে তেউড় এমনভাবে পুঁততে হয়, যেন তেউড়ের কাণ্ড-অংশটা মাটির উপরে থাকে। টবেও তেউড় পোতা যায়। পোতার পর নিয়মিত জলসেচ করতে হবে যাতে জমি সরস থাকে। ফলে, তাড়াতাড়ি তেউড় থেকে চারা হয়। জ্যৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি যখন চারাগুলি বেশ ঝাড়ালো হয়ে ওঠে তখন শিকড়সমেত তাদের তুলে আলাদা আলাদা কাণ্ডকে আলাদা আলাদা টবে (৮-১০ সেন্টিমিটার ব্যাসের) বসাতে হয়। টবগুলোকে বর্ষাকালে বৃষ্টি থেকে বাঁচাবার জন্যে ঢাকা জায়গায় কিংবা ঘরের বারান্দায় রাখতে হবে। তারপর আশ্বিন-কার্তিক মাসে চারাগুলিকে আবার টব থেকে তুলে নতুন বড় (৭-১০ ইঞ্চি বা ১৮-২৫ সে. মি.) টবে স্থায়িভাবে রোপণ করতে হবে। **টবের মাটি তৈরী করতে হবে বিশেষ যত্ন নিয়ে।** সাধারণতঃ ২ ভাগ দোআঁশ মাটি, এক ভাগ পাতাপচা সার, এক ভাগ পচা গোবরসার, ½ ভাগ বালি এবং ½ ভাগ হাড়গুঁড়ো মিশিয়ে টবের মাটি তৈরী করতে হয়। বৃদ্ধি ও ফুল দেবার সময় (মার্চ থেকে জুলাই মাস এবং আবার সেপ্টেম্বর থেকে জানুয়ারী মাস) প্রচুর পরিমাণে খাদ্য যুগিয়ে গাছের চাহিদা মেটাতে হয়। তরল সার, পাতাপচা সার, পচা-গোবরসার, খইল, হাড়গুঁড়ো, অ্যামোনিয়াম সালফেট, সুপার ফসফেট প্রভৃতি নানারকম জৈব ও অজৈব সার প্রয়োগ করতে হয়। তবে এ ব্যাপারে পরিমিতিবোধ বাঞ্ছনীয়। সারের পরিমাণ অত্যধিক হলে গাছের পাতা বড় হয়ে যায় এবং ডগার দিক জট বেঁধে চওড়া ও চ্যাপ্টা হয়ে যায়। ফুলের আকার হয়ে যায় ছোট। চলতি কথায় একে

বলে গাছের 'ষাঁড়িয়ে যাওয়া'। এরকম হলে গাছের ডগা কেটে দিলে ভালো হয়।

পোকামাকড়ের হাত থেকে যে চন্দ্রমল্লিকা রক্ষা করতে হবে তা তো বলাই বাহুল্য।

ডালিয়া শীতের মরসুমী ফুলের মধ্যে বোধ হয় সবচেয়ে জনপ্রিয়। এর গাছ ৩-৫ ফুট বা ৯০-১৫০ সেণ্টিমিটার পর্যন্ত লম্বা হয়। ডালিয়ার ডবল ও সিঙ্গল ফুল আছে। সিঙ্গলের চেয়ে ডবলের আদর অনেক বেশী। সাদা, লাল, হলদে, চকোলেট, গোলাপী, বেগুনি ইত্যাদি নানা রঙের ডালিয়া ফুল দেখা যায়।

ডালিয়া ফুলের টব একটু বড় ধরনের হলেই ভালো হয়। দো-আঁশ মাটি, গোবরসার, পাতাপচা সার, সরষের খইল, হাড়গুঁড়ো একসঙ্গে মিশিয়ে টবের মাটি তৈরী করা হয়।

ডালিয়ার চারা তৈরী করা যায় তিন রকম পদ্ধতিতে : (১) বীজ থেকে, (২) টিউবার বা স্ফীত কন্দ থেকে ও (৩) ডালের কলম থেকে। বীজ থেকে ভালো ফুল পাওয়া যায় না বলে অপর দুই পদ্ধতিতে আজকাল ডালিয়ার চাষ করা হচ্ছে। ডালিয়া গাছে আলুর মতো স্ফীত কন্দ বা 'টিউবার' বেরোয়, যার সাহায্যে চারা তৈরী করা যায়। ফুল দেবার পর গাছ মরে গেলে টিউবার তুলতে হয়। যে গাছ থেকে টিউবার তোলা হবে, কিছুদিন সেই গাছের গোড়ায় জলসেচন বন্ধ করে দিলে টিউবার ভালোভাবে পেকে উঠবে। ফেব্রুয়ারী মাসে যখন গাছ মরে যায় তখন মাটি থেকে টিউবার এমন সযত্নে তুলে নিতে হবে যেন তার 'চোখ' ('eye') নষ্ট না হয়। প্রায় একঘণ্টা এগুলিকে বাতাসে শুকিয়ে নেবার পর গামলা বা টবে বালি-ভর্তি করে টিউবারগুলো তার মধ্যে রেখে বালি দিয়ে ঢেকে কোনো ছায়াযুক্ত সুরক্ষিত জায়গায় রেখে দিতে হয়। জুলাই মাস নাগাদ যখন টিউবার থেকে নতুন চারা বেরোয় তখন তাদের হালকা নরম মাটিতে পুঁতে নিয়মিতভাবে জলসেচ করলে 'চোখ' থেকে চারা বেরোয়। চারা ইঞ্চি-দুয়েকের (৫ সে. মি.) মত লম্বা হলেই টিউবার তুলে ধারাল ছুরি দিয়ে কেটে চারাগুলিকে টিউবারসুদ্ধ আলাদা করে নিতে হবে। তারপর বালি-ভর্তি টবে ঐ চারা রোপণ করে সেচ দিলে কিছুদিন বাদে চারাগুলো থেকে নতুন পাতা গজায়। এবার এই চারাগুলো টব থেকে তুলে নতুন বড় টবে স্থায়িভাবে রোপণ করলে নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে ফুল ফুটতে আরম্ভ করে।

তবে ডালিয়ার চাষ করা সবচেয়ে সহজ কলমের মাধ্যমে। সাধারণতঃ নভেম্বর থেকে জানুয়ারী মাস পর্যন্ত ডালিয়ার কলম তৈরী করা যায়। পুষ্ট ডালিয়া ডালকে পাবের ঠিক নীচ থেকে কেটে (২০-২৩ সে. মি. বা ৮-৯ ইঞ্চি লম্বা) নিলেই কলম তৈরী করা যায়। বালি-ভর্তি টবে বা জমিতে কলম পুঁতে সেচ দিলেই ১৬-২০ দিনের মধ্যে তা থেকে নতুন শিকড় গজাবে। একমাস এই অবস্থায় রাখার পর স্থায়িভাবে নতুন টবে চারা রোপণ করতে হয়।

টবে গোলাপ ফুল করতে গেলে ১০-১২ ইঞ্চির টব চাই। নীচে গর্ত না থাকলে গর্ত করে নিতে হবে, আবার খোয়া দিয়ে গর্তটিকে ঢেকে ফেলতেও হবে। উপরে ১½ ইঞ্চি খালি রেখে উর্বর মাটি দিয়ে টব ভরাট করে তাতে কলম বসাতে হবে। প্রয়োজনমত জল দেওয়া, মাটি উস্‌কানো ও জল-নিষ্কাশনের দিকে নজর রাখতে হবে। কমপক্ষে ৫-৬ ঘণ্টা পছন্দমত জায়গায় রোদ না থাকলে গোলাপের টবগুলি দু' দলে ভাগ করে পালা করে এক দলকে রোদে প্রস্তুত রেখে অপর দলকে স্থানান্তরিত করতে হবে।

॥ মাসিক বীজ-বপন ও গাছ-রোপণ পঞ্জী ॥

বৈশাখ

বপন—সব্জী :—করলা, কাঁকরোল, চালকুমড়ো, লাউ, বেগুন, কাঁকুড়, চিচিঙ্গে, ঢেঁড়স, ঝিঙে, উচ্ছে, শশা, কুমড়ো, বরবটি প্রভৃতি। **ফুল :**—জিনিয়া, দোপাটি, আইপোমিয়া, মোরগ-ফুল প্রভৃতি মরসুমী ফুল।

রোপণ—ফল :—যাবতীয় ফল গাছ—অবশ্য জলের সুব্যবস্থা চাই। বিশেষ সময়োপযোগী—কলা ও পেঁপে। **ফুল**—গোলাপ, বগনভেলিয়া, ম্যাগনোলিয়া, বেল, যুঁই, চাঁপা, জবা, ফুরুষ, রঙ্গন, করবী, স্থলপদ্ম, রজনীগন্ধা, গন্ধরাজ, হাসনাহানা, চন্দ্রমল্লিকা, কৃষ্ণচূড়া ইত্যাদি। **পাতাবাহার :**—কোচিয়া, ক্রোটন, পাম, ঝাউ, ফার্ণ, ক্যালেডিয়াম, ক্যাকটাস ইত্যাদি। ঘাস, মাঠ ইত্যাদি তৈরী করে রাখতে হবে এবং পরে বীজ ফেলতে হবে।

জ্যৈষ্ঠ

বপন—সব্জী :—লাউ, কুমড়ো, ঢেঁড়স, পালা ঝিঙে, পালা শশা, বর্ষাতি মুলো, নটেশাক, লঙ্কা, বর্ষাতি শিম ইত্যাদি। **ফুল :**—জিনিয়া, দোপাটি, মোরগ-ফুল, গাঁদা, আইপোমিয়া ইত্যাদি।

রোপণ—ফল, ফুল ও পাতাবাহার :—এই পর্যায়ের যাবতীয় গাছ—অবশ্য জলের ব্যবস্থা চাই। বিশেষ সময়োপযোগী—কলা ও পেঁপে।

আষাঢ়

বপন—সব্জী :—শিম, ঢেঁড়স, শাক, শাঁক-আলু, টম্যাটো, শালগম, জলদি, ফুলকপি, ঝিঙে, পালং, লাউ, কুমড়ো প্রভৃতি। **ফুল** :—জিনিয়া, দোপাটি, কসমস, কোরিওপসিস, সানফ্লাওয়ার, গমফরেণ, গিলাডিয়া প্রভৃতি মরসুমী ফুল। **ঘাস, মাঠ ও বেড়া** :—ঘাস—মাঠ ও বাগানে বেড়া দেবার জন্যে ঘাস ও বেড়ার বীজ এই সময়ে লাগানো ভাল।

রোপণ—ফল :—আম, জাম, লিচু, কাঁঠাল, কলা, লেবু, সপেটা, পেয়ারা, কুল, আনারস, সুপারী, নারিকেল ইত্যাদি।

শ্রাবণ

বপন—সব্জী :—লঙ্কা, ঢেঁড়স, ঝিঙে, শিম, ধুন্দুল, বরবটি, লাউ, শশা, বিলাতী কুমড়ো, এনডিভ, এসপ্যারাগাস, স্পিনাচ, পুঁইশাক, পালং শাক, মুলো, শালগম, ফুলকপি, শাঁক-আলু, পেঁপে, টেপারী প্রভৃতি। **ফুল** :—জিনিয়া, দোপাটি, কসমস, গিলার্ডিয়া, পর্টুলেকা, কনভলভিউলাস প্রভৃতি মরসুমী ফুল।

ঘাস, মাঠ ও বেড়া :—ঘাস—মাঠের জন্য দুর্বাঘাস ও বেড়ার জন্য ইঙ্গা, ডালসিম, প্রসোপিস জুলিফ্লোরা, বাবলা, ডেডোনিয়া ভিসকোসা প্রভৃতি।

রোপণ—ফল, ফুল ও পাতাবাহার :—যাবতীয় গাছ—আষাঢ় মাসের মত।

ভাদ্র

বপন—সব্জী :—বাঁধাকপি, ফুলকপি, ওলকপি, বীট, গাজর, শালগম, টম্যাটো, লঙ্কা, লেটুস, বীন, মটর, স্কোয়াস, পার্শনিপ, শাঁক-আলু, পেঁপে, টেঁপারী প্রভৃতি। **ঘাস, মাঠ ও বেড়া** :—দুর্বাঘাসের বীজ অঙ্কুরিত হতে ৩-৪ সপ্তাহ লাগে। শীঘ্র চারা না হলে হতাশ হয়ে যত্নের ত্রুটি করা উচিত নয়। বেড়ার বীজ ফেলে এ সময় চারা প্রস্তুত করতে পারা যায়।

রোপণ—ফল, ফুল ও পাতাবাহার :—যাবতীয় গাছ—আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসের মত।

আশ্বিন

বপন—সব্জী :—নাবিজাতীয় বাঁধাকপি ও ফুলকপির বীজ এবং ওলকপি, গাজর, বীট, শালগম, টম্যাটো, লেটুস, মুলো, মটর, পেঁয়াজ, বিলাতী লঙ্কা

প্রভৃতি বিলাতী সব্জী। দেশী সব্জী-বীজের মধ্যে লাউ, কুমড়ো, পালং প্রভৃতি। **ফুল :**—শীতের মরশুমী ফুল। এস্টার, কার্নেশন, প্যান্সি, ফ্লক্স্, পপি, এণ্ট্যারিনাম, ডালিয়া, ডায়েন্থাস, সুইট-পি, হলিহক, ন্যাশটারসিয়াম প্রভৃতি।

রোপণ—ফল, ফুল ও পাতাবাহার :—যাবতীয় গাছ। যদিও অন্য সময় গোলাপের কলম রোপণ করা হয়—এই সময় থেকেই এর রোপণ সুরু হয়ে থাকে।

কার্তিক

বপন—সব্জী :—নাবি জাতীয় কপির বীজ এখনও বপন করা হয়। বীট-গাজর, শালগম, মুলো, পেঁয়াজ, শীতের লাউ, কুমড়ো, ঝিঙে, শশা, টম্যাটো, মটর, শিম, লেটুস, ফ্রেঞ্চ বীন, পালং, করলা, তরমুজ, খরমুজ, প্রভৃতি। **ফুল :**—এণ্ট্যারিনাম, এস্টার, প্যান্সি, ফ্লক্স, পপী, ডেজি, ডালিয়া ডায়েন্থাস, কার্নেশান সুইট-পি প্রভৃতি।

রোপণ—ফল, ফুল ও পাতাবাহার :—যাবতীয় গাছ—জলের ব্যবস্থা থাকলে। বিশেষ সময়োপযোগী—গোলাপ, ডালিয়া।

অগ্রহায়ণ

বপন—সব্জী :—মটর, তরমুজ, লাউ, ভুঁয়ে শশা, পেঁয়াজ, পালংশাক প্রভৃতি।

রোপণ—ফল, ফুল ও পাতাবাহার :—যাবতীয় গাছ—জলের ব্যবস্থা থাকলে। বিশেষ সময়োপযোগী—গোলাপ, ডালিয়া।

পৌষ

বপন—সব্জী :—তরমুজ, খরমুজ, ফুটি, শশা, ঝিঙে, করলা, খেঁড়ো, কুলি বেগুন, কুমড়ো, লাউ, নটে শাক প্রভৃতি।

রোপণ—ফল, ফুল ও পাতাবাহার :—যাবতীয় গাছ—জলের ব্যবস্থা থাকলে। বিশেষ সময়োপযোগী—গোলাপ ও ডালিয়া।

মাঘ

বপন—সব্জী :—লাউ, কুমড়ো, চৈতে ঝিঙে, চৈতে শশা, কুলি বেগুন তরমুজ, খরমুজ, করলা প্রভৃতি।

রোপণ—ফল, ফুল ও পাতাবাহার :—যাবতীয় গাছ—জলের সুব্যবস্থা থাকলে। গোলাপ রোপণ এখনও চলবে।

ফাল্গুন

বপন—সব্জী :- -চৈতে ঝিঙে, চৈতে শশা, ফুটি, তরমুজ, খরমুজ, কাঁকুড়, লাউ, করলা, উচ্ছে, ডাঁটা প্রভৃতি।

রোপণ—ফল, ফুল ও পাতাবাহার :—যাবতীয় গাছ—জলের সুব্যবস্থা থাকলে। সামান্য শীত থাকতেও গোলাপ রোপণ সুবিধাজনক।

চৈত্র

বপন—সব্জী :—ঝিঙে, শশা, কুমড়ো, লাউ, ঢেঁড়স, পামকীন, স্কোয়াস, বরবটি, ধুন্দুল, চিচিঙ্গে, চাঁপানটে, কাটোয়ার ডাঁটা, পুঁইশাক, আউসে বেগুন, শাঁক-আলু, পেঁপে ইত্যাদি। **ফুল :**—জিনিয়া, ব্যালসাম, করিয়পসিস, গিলাডিয়া গমফরেনা, সানফ্লাওয়ার, পটুকোল প্রভৃতি।

রোপণ—ফল, ফুল ও পাতাবাহার :—যাবতীয় গাছ—জলের সুব্যবস্থা থাকলে। কলা ও পেঁপের চাষ শুরু করা যেতে পারে।

ছোট পোলট্রি ফার্ম

নবম ও দশম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরা কর্মশিক্ষার প্রোজেক্ট হিসাবে যদি একটি ছোট পোলট্রি ফার্ম চালায় তাহলে অনেকগুলি বিষয়ে তাদের লক্ষ্য রাখা উচিত। অন্যান্য প্রোজেক্টের মত এ-ক্ষেত্রেও বই দেখে শেখার চেয়ে কোনও পোলট্রি ফার্মে গিয়ে সব কিছু ভালো করে দেখে ও জেনে নিলেই ভালো হবে, তবে মুরগী-পালনকে প্রোজেক্ট হিসাবে গ্রহণ করলে দু'একটি ভালো বই পড়ে নেওয়া উচিত।

গ্রামবাংলায় যেসব মুরগী দেখতে পাওয়া যায় অর্থাৎ দেশী মুরগী (যেমন আসীল এবং চট্টগ্রাম), সেগুলি আকারে ছোট এবং ডিমও দেয় কম। বিদেশী মুরগী বহু ধরনের আছে। পোলট্রি ফার্ম সুরু করলে কয়েকটি ভালো ডিম উৎপাদনকারী বিদেশী মুরগী বেছে নেওয়া উচিত, যেমন রোড আইল্যাণ্ড রেড, হোয়াইট লেগহর্ণ, ব্ল্যাক মিনোরকা। এই মুরগীগুলি ডিম দেয় বেশী এবং ভারতীয় আবহাওয়ার সঙ্গে এরা নিজেদের খাপ খাইয়ে নিয়েছে।

সামান্য টাকা আর একটুকরো জমি দিয়েই মুরগী খামার সুরু করা যেতে পারে। সবচেয়ে আগে দরকার **স্থান-নির্বাচন**। এমন স্থান নির্বাচন করতে হবে যেটা উঁচু, শুকনো, আর যেখানে প্রচুর ঘাস জন্মায়। নীচু স্যাঁতসেঁতে জমিতে পোলট্রি ফার্ম করার অর্থ রোগ ডেকে আনা। অবশ্য জমি একটু ঢালু হওয়া দরকার, যাতে বৃষ্টির পর জল না জমে বা কাদা না হয়।

শেয়াল, বেঁজি, বনবিড়াল প্রভৃতি মুরগীর শত্রু। এরা যাতে মুরগী চরায় জায়গায় বা বাসার মধ্যে ঢুকতে না পারে সে সম্বন্ধে সতর্ক থাকা দরকার।

জমির পরিমাণ অনুসারে মুরগীগুলিকে খোলা জায়গায় স্বাধীনভাবে অথবা আবদ্ধ অবস্থায় পালন করা হয়ে থাকে। বিদ্যালয়ে প্রচুর খালি জমি বা ফলের বাগান থাকলে মুরগীগুলি স্বাধীনভাবে চরতে পাবে। কিন্তু জমির একান্ত অভাব হলে ঘরের ভেতর বিচালি-বিছানো মেঝের উপর (Deep litter system) এমন কি খাঁচার মধ্যেও মুরগী রেখে পালন করা যায়। আবার যদি কাঠা-খানেক খালি জমি থাকে তাহলে সেই জায়গাটুকু ঘিরে নিয়ে তারই ভেতরে মুরগী রাখা চলে। দিনের বেলায় মুরগীগুলি সেই ঘেরা জায়গায় চরবে এবং রাত্রে থাকার জন্যে একটি ঘর ওর ভেতরেই থাকে।
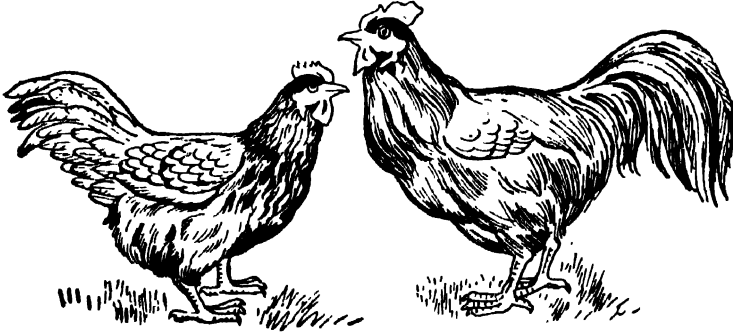
রোড আইল্যাণ্ড রেড মুরগী ও মোরগ

আজকাল ডীপ লিটার বা ঘন তৃণযুক্ত ঘরে মুরগী রাখার খুব রেওয়াজ হয়েছে এবং এতে যথেষ্ট ভালো ফল পাওয়া গেছে। 'লিটার' হল জীবজন্তুর বিছানা। মেঝেতে বিচালি ইত্যাদি বিছিয়ে সেই ঘরে আবদ্ধ অবস্থায় মুরগী-পালনই হল ডীপ লিটার পদ্ধতি। হালকা ধরনের মুরগীর জন্যে ৩ ফুট লম্বা ও ৩ ফুট চওড়া (ভারী জাতের মুরগীর জন্য ৪´×৪´) জায়গার প্রয়োজন। নরম, শুকনো ও শোষণক্ষমতা যুক্ত জিনিস নিয়ে মুরগীর লিটার করা উচিত। কাঠের গুঁড়ো ও বিচালি সহজেই পাওয়া যায়। তবে বিচালি ব্যবহার করাই ভালো, কারণ ছোট ছোট বিচালি সহজেই কম্পোস্টে পরিণত হয়। মুরগীর মল বিচালি ও কাঠের গুঁড়োর উপরে পড়ে তাদের সঙ্গে মিশে যায়, পরে রাসায়নিক পরিবর্তনে লিটার কম্পোস্টে পরিণত হয়।

ডীপ লিটার বিছানোর আগে ঘরের মেঝে পরিষ্কার করে চূন ছড়িয়ে

বিশোধিত করে নেওয়া উচিত। মেঝে যেন শুকনো খট্‌খটে হয়। প্রথমে কাঠের গুঁড়ো বিছিয়ে তার ওপর বিচালি দিয়ে ৬" মত পুরু করতে হবে। শুধু বিচালিও ব্যবহার করা যেতে পারে। তার উপরে মুরগীর মল পড়ে লিটার ৮" গভীর হয়ে যাবে।

বিদ্যালয়ের ছাদেও ডীপ লিটার ঘর করা যেতে পারে। একটি ছোট ছাদে ২০ X ১০ ফুট জায়গা থাকলে ৫০টি মুরগী রাখা যায়।

ঘরের আয়তন হবে মুরগীর সংখ্যা অনুযায়ী। মুরগী-পিছু ৪ বর্গফুট জায়গা ঘরে থাকা দরকার। ঘরের মেঝে চারপাশের জমি থেকে অন্ততঃ ফুট দুয়েক উঁচু হবে এবং স্যাঁতসেঁতে যেন না হয়। ঘরের মধ্যে যাতে পর্যাপ্ত পরিমাণে আলো ও বাতাসের ব্যবস্থা থাকে এবং বৃষ্টির ছাট না আসে সে-ব্যবস্থা থাকা দরকার। বড় পোলট্রি ফার্মে মুরগীদের পাত্র বা 'ফুড ট্রাফ', জলের পাত্র, স্যাণ্ডবাথ্, নেস্ট বা ডিম পাড়ার বাক্স, দাঁড় বা পার্চ, ডিমের ঝুড়ি, ডিম ওজনের কল, ডিম ধোওয়ার কল, ডিম গ্রেডিং-এর যন্ত্র, ঠোঁট কাটার যন্ত্র বা ডি-বীকার প্রয়োজন হয়। তবে বিদ্যালয়ের ছোট ফার্মে এর সবগুলির প্রয়োজন নেই বা সংগ্রহ করার সামর্থ্য না-ও থাকতে পারে।

লেগহর্ণ মুরগী ও মোরগ
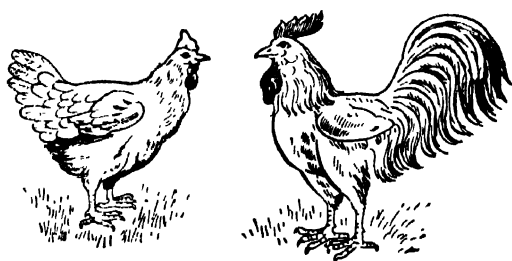
মুরগীর খাদ্য নির্বাচনের লক্ষ্য পুষ্টিকারিতা ও ডিমের উৎপাদন বৃদ্ধি। মুরগীকে যে-খাবার খাওয়ানো হবে তার মধ্যে সকল প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর উপাদানই থাকা দরকার। গম, ভুট্টা, চাল ইত্যাদি কার্বোহাইড্রেট বা শ্বেতসারজাতীয় খাদ্যে প্রোটিন নামমাত্র। এজন্যে শুধু দানা খাইয়ে রাখলে মুরগীদের স্বাস্থ্যহানি হয়। ডিম উৎপাদনের জন্যে প্রয়োজন প্রোটিনের। সুতরাং দেহের ক্ষয়পূরণ ছাড়াও ডিমের জন্যেও বাড়তি প্রোটিনের দরকার।

দেহের পুষ্টি, ক্ষয়ক্ষতিপূরণ ও ডিমের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং বাচ্চা বয়সে

দেহের বৃদ্ধির জন্যে যে-সব উপাদান দরকার সেগুলি যথাযথ ও উপযুক্ত পরিমাণে যে খাদ্যে থাকে, তাকে বলা হয় **সুষম খাদ্য** (balanced ration)।

আবার খাবারের খরচ এমন হওয়া উচিত যাতে মুরগী পালন পোষায়। অর্থাৎ দাম সস্তা না পড়লে মুরগী পালনের খরচ উঠবে না। তা ছাড়া খাদ্যগুলি যদি দূর থেকে আনতে হয় তাহলে অনেক বেশী খরচ পড়ে।

এখানে একটি পরীক্ষিত **সুষম অথচ সুলভ খাদ্যের** তালিকা দেওয়া হল :

কার্বোহাইড্রেট অংশ		প্রোটিন অংশ		অন্যান্য অংশ	
ভুট্টা	২০ ভাগ	বাদামের খইল	৩০ ভাগ	মিনারেল মিশ্রণ	৪.৫ ভাগ
গম/যব/মাইলো/জোয়ার	২০ ,,				
গমের ভুষি	২০ ,,	মাছের গুঁড়ো	৫ ,,	খাদ্য লবণ	০.৫ ,,
	৬০		৩৫ ,,		৫ ,,

মুরগীর খাদ্যের পরিমাণ নির্ভর করে বয়স ও ওজনের উপর। শাবকদের খাবার লাগে কম। পরিণত বয়সের একটি মুরগী দিনে ১০৫-১১০ গ্রাম খাবার খায়। রোড আইল্যাণ্ড প্রভৃতি ভারী জাতের মুরগীর খাবার দরকার হয় আর একটু বেশী। সাধারণভাবে প্রতি ১০টি মুরগীর জন্যে ১ কিলোগ্রাম খাবার ধরলে হিসাবের সুবিধা হবে।

মুরগীগুলিকে দিনে তিনবার খেতে দিতে হয়—সকাল ৬টায়, দুপুর ১২টায় ও বিকেল ৫টায়।

মুরগী স্বভাবতঃ ডিমের উপর বসে নিজের দেহের তাপে ডিমকে গরমে রেখে ফোটায়। কিন্তু কৃত্রিম উপায়ে ইনকিউবেটারে (Incubator) বা স্ফুটন-যন্ত্রে উপযুক্ত তাপের ব্যবস্থা করেও ডিম ফোটানো হয়। পোলট্রি ফার্মে ইনকিউবেটার ব্যবহার করা ছাড়া উপায় নেই। কেরোসিন ও বিদ্যুৎশক্তিচালিত, দু'রকম ইনকিউবেটারই দেখা যায়। ছোট ইনকিউবেটারের ধারণ-ক্ষমতা ৫০ থেকে ৪০০ ডিম। নির্ভরযোগ্য প্রস্তুতকারকদের তৈরী ইনকিউবেটার কেনাই উচিত। যন্ত্রের সঙ্গে তার ব্যবহারের নিয়মাবলী দেওয়া হয়, সেগুলো অতি অবশ্যই অনুসরণ করা উচিত।

কৃত্রিম উপায়ে ডিম ফোটাবার জন্যে যেমন ইনকিউবেটার যন্ত্র ব্যবহার করা

হয়, তেমনি ডিম থেকে বেরিয়ে-আসা শাবকদের লালন করার জন্যে কৃত্রিম লালন-যন্ত্র বা brooder ব্যবহার করা হয়। এই যন্ত্র হল কৃত্রিম উপায়ে গরম-করা একটি বাক্স, যান্ত্রিক উপায়ে যার তাপকে নিয়ন্ত্রিত করা হয়। বহু মাধ্যমের সাহায্যে কৃত্রিম লালন-যন্ত্রকে গরম করা হয়, আর মাধ্যম অনুযায়ী তাদের আলাদা আলাদা নামও হয়, যেমন Lamp brooder, Wood/Coal brooder, Gas brooder, Electric brooder, Water-pipe brooder, Battery brooder ইত্যাদি। বাজারে যে সব ব্রুডার কিনতে পাওয়া যায় তার দাম এমনিতেই খুব বেশী ছিল, আজকাল তো আরও বেড়েছে। তাই ২´×২´ বা ৪´×৩´ প্যাকিং বাক্সকে একটু অদল বদল করে নিয়ে সহজে ও অল্প খরচে ব্রুডারে পরিণত করা আর্থিক দিক থেকে সুবিধাজনক।

মুরগীর যে-সব রোগ হয় সেগুলির মধ্যে অনেকগুলি সংক্রামক, আবার অনেকগুলি সংক্রামক নয়। এ ছাড়া জরায়ুর গোলযোগ-সংক্রান্ত ব্যাধিও আছে। সংক্রামক রোগগুলির মধ্যে ফাউল কলেরা, ফাউল টাইফয়েড, মুরগীর ক্ষয়রোগ, ব্যাসিলারি হোয়াইট ডায়েরিয়া, ককসিডিওসিস, রাণীখেত রোগ, ফাউল পক্স, ফাউল প্যারালিসিস, লেরিঙ্গোট্রেকিয়াইটিস, অ্যাস্পারজিলোসিস, কৃমিজনিত বিভিন্ন রোগ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এইসব রোগ নিবারণের জন্য নানারকম প্রতিরোধক ভ্যাকসিন আছে, এছাড়া নানারকম প্রতিরোধ-ব্যবস্থাও আছে।

মুরগীর দেহে রোগের লক্ষণ দেখা দিলে রুগ্ণ মুরগীগুলিকে সরিয়ে আলাদা জায়গায় রাখতে হয়। রোগে কোনও মুরগী মারা গেলে তার মৃতদেহ ফার্ম থেকে নিয়ে গিয়ে দূরে মাটির নীচে পুঁতে ফেলতে হবে। জীবাণুনাশক ওষুধ দিয়ে রুগ্ণ মুরগীর ঘর ও চারণভূমি বিশোধিত করা দরকার। মুরগীর চরার মাঠে চুন ছড়িয়ে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া উচিত, তাতে রোগের বীজ ও কৃমি নষ্ট হয়।

কিন্তু সমস্ত ব্যবস্থাই ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে যদি গোড়ায় গলদ থাকে অর্থাৎ মুর্গী ভালো জাতের না হয়। মুরগীর বয়স, জাত (breed), স্বাস্থ্য ও দেহে কোনও খুঁত আছে কিনা এ সব পরীক্ষা করে কেনা উচিত। মুরগী থেকে ডিমের উৎপাদন বেশী এবং বাচ্চাগুলি ওজনে ভারী হলে তবেই ব্যবসায়ে লাভ হবার সম্ভাবনা থাকবে।

মৌমাছি পালন

সুদূর অতীত থেকেই আমাদের দেশে মধুসংগ্রহ চলে আসছে। খাদ্য ও ওষুধরূপে মধুর ব্যবহারের জন্যেই এর এত আদর। কিন্তু আমাদের মধু-নিষ্কাশন পদ্ধতি ছিল অত্যন্ত আদিমযুগীয়, অবৈজ্ঞানিক ও সুরুচি-বিরোধী ; মধু সংগ্রহের চেষ্টা হত সমস্ত চাকে ধোঁয়া দিয়ে মৌমাছিগুলিকে তাড়িয়ে দিয়ে। ফলে, অনেক মৌমাছি আগুনে পুড়ে মরে যেত, চাক এবং ডিম যেত নষ্ট হয়ে। মধু বার করা হত চাক টিপে। ফলে সবটা মধুই চাকের ময়লা, ডিম, বাচ্চা, মথপোকা ও মোম ইত্যাদির রসে মিশে একটা বিকৃত ভেজাল খাদ্যে পরিণত হত।

সুতরাং যে বিদ্যালয়ে মৌমাছি-পালনকে প্রোজেক্ট হিসাবে নেওয়া হবে সেখানে আধুনিক পদ্ধতিতেই মৌমাছি-পালন করতে হবে। আধুনিককালে যে কৃত্রিম **মৌ-বাক্সে (Hive)** মৌমাছি রাখা হয়, তা হুবহু বনে-জঙ্গলে, গাছের গর্তে তাদের প্রকৃতি অনুযায়ী যে-রকম চাক যে-অবস্থায় গঠন করে তারই অনুকরণমাত্র। বরং তার চাইতেও মনোরম, আরামদায়ক, পরিষ্কার ও নিরাপদ অবস্থার মধ্যে তাদের রাখার চেষ্টা করা হয়।

মৌ-বাক্সের দরজা সব সময়ই খোলা রাখা হয়। মৌমাছিরা আপন ইচ্ছামত যাতায়াত করে, পরাগ, মকরন্দ ও জল প্রভৃতি সংগ্রহ করে, তাদের কলোনির (মৌমাছি পরিবারকে মক্ষী কলোনি বলা হয়) উন্নতির জন্যে দরকারী সব কাজই মৌমাছিরা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে করে। অন্যের ইচ্ছায় বা নির্দেশে তারা করছে এ ধারণা তাদের নেই। তাদের জীবনযাপন ও প্রকৃতির উপর কোনও-রকম বাধা-নিষেধ আরোপ করা হয় না বা চলেও না। পরন্তু যে সব শত্রুর সঙ্গে সংগ্রাম করে বনজঙ্গলে তাদের প্রাকৃতিক অবস্থায় টিকে থাকতে হয়, আধুনিক কৃত্রিম মৌ-বাক্সে সে-সব শত্রুর হাত থেকে মক্ষীপালকই তাদের রক্ষা করে থাকেন। এইসব কারণে মৌমাছি এই কৃত্রিম মৌ-বাক্সই পছন্দ করে।

একটি মৌমাছি কলোনিতে তিন শ্রেণীর মৌমাছি বাস করে—রাণীমা, পুরুষ মক্ষী ও কর্মী মক্ষী। প্রত্যেক কলোনিতে মাত্র ১টি রাণীমা, কয়েক হাজার কর্মী মক্ষী (৫।৬ হাজার থেকে ৩০।৩৫ হাজার, এমন কি ৬০।৭০ হাজার-ও হতে পারে) ও কতকগুলি পুরুষ মক্ষী থাকে। রাণী মৌমাছিদের এক-একটি ২।৩ হাজার ডিম পাড়ে—১ থেকে ২ বছর পর্যন্ত। কর্মীরা শুধু যে রাণীকে খাওয়ায় এবং তত্ত্বাবধান করে তাই নয়, তারা যাবতীয় কাজকর্ম করে। আর পুরুষ মৌমাছিরা অলস—তাদের কাজ কেবল খাওয়া-দাওয়া আর আলস্যে দিন কাটানো।

আধুনিক কৃত্রিম মক্ষীঘরের বা **মৌ-বাক্সের চারটি অংশ :** (১) বটম বোর্ড (নীচেকার পাটাতন)। (২) ব্রুড চেম্বার (চারপাশের দেওয়ালবিশিষ্ট নিম্ন কক্ষ। এটা এক রকম 'আঁতুড় ঘর' বা শুশ্রূষাগার। এতে মৌ-পালক হাত দিতে পারেন না। (৩) সুপার চেম্বার (বা মধুঘর : এই মধুঘরের সব মধুই পালকের প্রাপ্য।) (৪) ছাদ বা চাল।

মৌ-বাক্স ছাড়া আর যে-সব সাজ-সরঞ্জাম আবশ্যক তা হল : (১) বী-ভেইল (মুখাবরক টুপি), (২) স্মোক ভেইল (ধূম্রক), (৩) দীঘল চাকু, (৪) মধুকোষের আবরণ উন্মোচক ছুরি (আনক্যাপিং নাইফ), (৫) হাইভ-স্ট্যাণ্ড (চারপায়া), (৬) কাঁচি, (৭) পাখীর পালক দিয়ে তৈরী বা ঐ জাতীয় হাল্কা ব্রাশ, (৮) ফ্রেম স্ট্যাণ্ড, (৯) মক্ষী অবরোধক জাল, (১০) মধু-নিষ্কাশক যন্ত্র, (১১) কুইন এক্সক্লুডার বা রাণীর চলাফেরা নিয়ন্ত্রক সরঞ্জাম, (১২) বিভাজক বোর্ড, (১৩) ডামি বোর্ড। এছাড়া কাঠের কাজের কয়েকটি যন্ত্র যেমন—স্ক্রু-ড্রাইভার, হ্যাণ্ড ড্রিল, হাতুড়ি, করাত, বাটালি ইত্যাদি দরকার।

মৌ-বাক্স কয়েক রকমের পাওয়া যায়—নিউটন, ল্যাংগস্ট্রথ, ব্রিটিশ স্ট্যাণ্ডার্ড প্রভৃতি। এর মধ্যে নিউটন হাইভের জনপ্রিয়তা খুব বেশী। রেভারেণ্ড নিউটন নামে একজন মিশনারী এই মৌ-বাক্সের প্রচলন করেন। এই মৌ-বাক্সগুলি দোতলা। অবশ্য নিউটন হাইভের মাপ সর্বত্র একরকম নয়। নিউটন সাইজের মৌ-বাক্সে বছরে গড়ে ১০-১৫ পাউণ্ড পর্যন্ত মধু পাওয়া যায়।

মৌমাছি-পালন করতে হলে প্রথমেই কোনও মক্ষীপালকের কাছ থেকে একটা কলোনি সংগ্রহ করে আনতে হয় অথবা বনজঙ্গল থেকে সন্ধান করে ধরে আনতে হবে। সোদপুর খাদি প্রতিষ্ঠানে মৌমাছি কলোনি কিনতে পাওয়া যায়। অবশ্য বনে মৌমাছি ধরার অভিজ্ঞতা নিয়ে আরম্ভ করতে পারলেই সবচেয়ে ভালো। তাতে সাহস ও অভিজ্ঞতা দুই-ই বাড়ে। মনে রাখতে হবে, মৌমাছি পালন করতে হলে ছাত্র-ছাত্রীদের **হুলের ভয় ছাড়তে হবে। হুল ফোটাবে এটা জেনেই কাজ করতে হবে। আর হুল দিলে তা সহ্যও করতে হবে।**

সাধারণতঃ বাক্সের আকার অনুসারে ৭টি বা ১০টি বা ১২টি ফ্রেম ব্যবহার করা যায়। ফ্রেমগুলি সমান্তরালভাবে পর পর সাজাতে হয়। মাঝখানের ব্যবধান ⅜″ থাকবে—এই ব্যবধান সব সময় রক্ষা করা দরকার। স্বয়ংক্রিয় ব্যবধানযুক্ত

ফ্রেমের ব্যবস্থাই নিরাপদ। ফ্রেমের সঙ্গে চাক বেঁধে বাক্সে সমান্তরালভাবে বসাতে হয়। বাঁধতে হয় কলাগাছের আঁশ দিয়ে। কলার আঁশ সিকি ইঞ্চি চওড়া ও ২ ফুট লম্বা হলেই চলবে। তবে আঁশ আগে থেকে জলে ভেজানো থাকলে ভালো।

ব্রুড চেম্বারের নীচেকার রড ও পাটাতনের মধ্যেকার ব্যবধান হবে ½" কিন্তু ব্রুড চেম্বারের ফ্রেম ও সুপার ফ্রেমের মধ্যেকার ব্যবধান ⅜"-র বেশী হওয়া উচিত নয়। মৌ-বাক্সের চালের সামনে ও পিছনে একটি করে তারের জানালা থাকবে। পাটাতনের কেন্দ্রস্থলেও একটি জানালা রাখতে হবে, আলো হাওয়া চলাচলের জন্যেই ঐগুলি দরকার।

মধু-নিষ্কাশন যন্ত্র সম্পর্কেও দু'একটা কথা জানা দরকার—যদিও ছাত্র-ছাত্রীরা এই যন্ত্রের সাহায্যে নিজেরাই একদিন মধু নিষ্কাশন করবে। এই যন্ত্রে একটি গোলাকার ড্রামের মধ্যে একটি তারের খাঁচা বা হোল্ডার ফিট-করা হয়। মধুভরা বাক্সের সীলকরা কোষগুলির মুখ বা মাথা খুলে ঐ খাঁচা হোল্ডারের ভিতর বসিয়ে ড্রামের উপরের সংলগ্ন হাতল ঘোরালে মধুকোষ থেকে মধু ছিটকে সজোরে ড্রামের গায়ে গিয়ে পড়ে ও নীচে সংলগ্ন নলমুখে বাইরে অবস্থিত বোতল বা পাত্রে গিয়ে জমে।

ছাত্র-ছাত্রীদের বিশেষভাবে জানতে হবে কী ভাবে দুই বাসার মৌমাছিদের মিলিত করতে হয়, কী ভাবেই বা মৌমাছিদের উপনিবেশ ভাগ করা হয়, কেমন করে মৌ-বাক্স অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হয়, আর কেমন করেই বা মধু-নিষ্কাশন করতে হয়। বলা বাহুল্য, এসব হাতে-কলমেই তারা শিখবে।

সুতো কাটা ও সহজ বুনন

তুলো থেকে সুতো কাটা হয় এ-কথা সকলেই জানে। কিন্তু এই কাটার কাজটি কী ভাবে নিষ্পন্ন হয়? আগে আমাদের দেশে তকলি এবং চরকায় সুতো কাটা হত। আজকাল ঐ কাজ হয় সুতোকলে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে। **তকলি** দুই অংশে বিভক্ত—চাকতি এবং দণ্ড। চাকতি তৈরী হয় কাঠ, ধাতু, শ্লেট বা পোড়ামাটি ইত্যাদি দিয়ে, ডাঁটাটি তৈরী হয় বাঁশ বা ধাতুর। নীচের দিক থেকে উপরের দিকে ক্রমশঃ সরু এই ডাঁটির মাথায় বঁড়শি-কাঁটার মত খাঁজকাটা থাকে।

প্রথমে তুলোর পাঁজের মাথার কয়েকটি আঁশ একটু পাকিয়ে সুতো তৈরী

করা হয়। একে তক্‌লির মাথায় বেঁধে তক্‌লি ঝুলিয়ে সুতো কাটা হয়। তক্‌লি ঘোরাতে হয় ডান হাতে এবং এর ঘূর্ণন ডান পাকে বা ঘড়ির কাঁটার মত (clock-wise); বাঁ হাতে পাঁজ ধরে অল্প-বিস্তর সমপরিমাণে তুলো ছাড়তে হয়। ঐ আঁশ পর পর লম্বা হয়ে পাক পড়ে সুতোয় পরিণত হয়। খানিকটা সুতো কাটা হলে চাকৃতির কাছে ডাঁটায় জড়ানো হয়। এই রকম করে তক্‌লির সাহায্যে সুতো কাটা হয়।

তলিক্
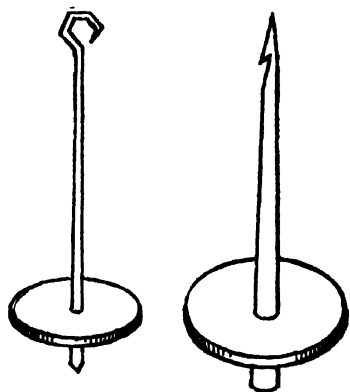
বিভিন্ন পদ্ধতিতে বিভিন্ন আসনে তক্‌লির সাহায্যে সুতো কাটা হয়—যেমন, (১) চুটকি পদ্ধতি, (২) জানু (জংঘা) পদ্ধতি, (৩) তালু (তেলো) পদ্ধতি, (৪) হাওয়া পদ্ধতি ইত্যাদি। প্রথম পদ্ধতিতে মাটির উপর তক্‌লি দাঁড় করিয়ে ডান হাতে ঘোরানো হয়। সব জায়গায় মাটি সমান না হলে পাতলা মসৃণ কাঠ বা পিচ্‌বোর্ড ইত্যাদির উপর তক্‌লি ঘোরানো হয়। ঐ কাঠ বা পিচ্‌বোর্ডকে দফ্‌তি বলে। দ্বিতীয় পদ্ধতিতে ডান পায়ের জানু (thigh)-র উপর তক্‌লি ঘষে ঘোরানো হয়। তৃতীয় পদ্ধতিতে আসনে বসে বাঁ পায়ের পাতা ডান পায়ের জানুর উপর এমনভাবে রাখা হয় যে, বাঁ পায়ের তালুতে তক্‌লি ঘষে ঘোরানো যায়। আর হাওয়া পদ্ধতিতে তক্‌লি ঘোরানো হয় শূন্যে ঝুলিয়ে।

চরকা অনেক রকমের আছে—যেমন (১) পাখী চরকা, (২) মগ্‌ন্ চরকা, (৩) গ্রাম চরকা, (৪) অম্বর চরকা, (৫) কিষাণ চরকা, (৬) বাক্স চরকা। সাধারণতঃ যে কোনও চরকা ডান পাকে ঘোরানো হয়। চরকার বিভিন্ন অংশের সঙ্গে ছাত্র-ছাত্রীদের পরিচিত হতে হবে।

চরকায় সুতো কাটা (বা তক্‌লিতে সুতো কাটা) বই পড়ে শেখার জিনিস নয়। ছাত্র-ছাত্রীরা যত সুতো কাটবে ততই দক্ষ হয়ে উঠবে। তাই এখানে মূল পদ্ধতি ও সাধারণ কয়েকটি সতর্কতামূলক ব্যবস্থার কথা বলা হল মাত্র।

পাঁজ থেকে একটু সুতো বার করে ঘুরতে-থাকা টাকুর আগায় জড়িয়ে বাঁ হাতে পাঁজটি কোলের টানে পিছনের দিকে টেনে তুললে এবং ডান হাতে চরকার

হাতল ঘোরাতে থাকলে পাঁজের আঁশগুলো পর পর লম্বা হয়ে পাক পড়ে সুতো হয়ে যায়।

খানিকটা সুতো কাটা হলে টাকুর চাকৃতির কাছে গুটাতে হয়। অনেকখানি সুতো কাটা হলে নাটাইয়ে জড়িয়ে নিতে হয়।

সুতো কাটার সময় পাকের সমানুপাত অর্থাৎ বাঁ হাতের টানের সঙ্গে ডান হাতে হাতল ঘোরানোর সমানুপাত থাকা উচিত। সুতোয় খুব কম পাক বা অত্যধিক কড়া পাক দেওয়া উচিত নয়।
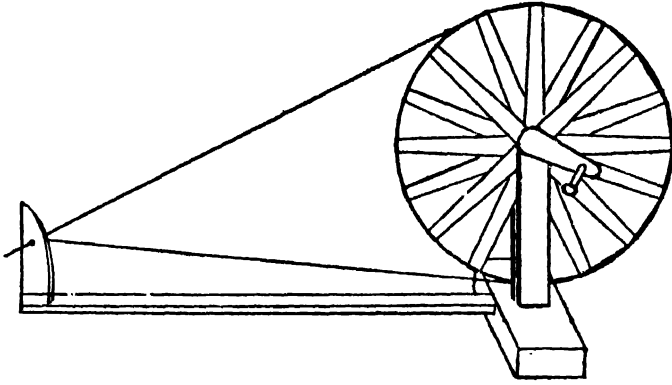
পাখী চরকা

ইঞ্চিপ্রতি সুতোর পাকসংখ্যা = সুতোর নম্বরের বর্গমূল × ৪ হওয়া উচিত।

সুতোয় একরকম পাক দেওয়া উচিত। উল্টো এবং সোজা পাকের সুতো একসঙ্গে মেশানো উচিত নয়। পাখী চরকায় সোজা পাক পড়ে। বাক্স চরকায় টাকু clock-wise ঘুরলে সোজা পাক পড়বে এবং anti-clock-wise ঘুরলে উল্টো পাক পড়বে।
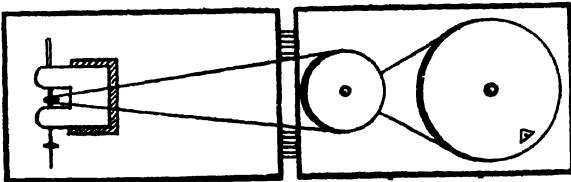
বাক্স চরকা

বুড়ো আঙুল এবং তর্জনীর টিপে পাঁজ ধরে পুরো পাঁজটি বাঁ হাতের তেলোতে

রাখতে হয়। টিপ থেকে পাঁজের কতটা অংশ বেরিয়ে থাকবে তার ঠিক মাপ বলা শক্ত। তবে সাধারণতঃ সুতো থেকে প্রায় আধ ইঞ্চি বেরিয়ে থাকে।

সুতো কাটার সময় টিপের যেখান থেকে সুতো বের হচ্ছে সেখানে অবশ্যই নজর রাখা উচিত।

কাটা সুতো চরকার টাকুতে (তক্‌লির ক্ষেত্রে ডাঁটিতে) জড়ানোর পর যেটুকু রেখে আবার সুতো কাটা আরম্ভ করা হয়, তাকে বলে হাতের সুতো। ঐ হাতের সুতো ৮″ থেকে ১৬″-র মত রাখা উচিত। চরকায় কাটতে থাকা সুতোর পাঁজের গা থেকে টাকুর অংশই কাতাই-র হাত। প্রথম অভ্যাসের সময় ২০″-র বেশী কাতাই-র হাত হওয়া উচিত নয়। অবশ্য নিপুণ শিল্পীরা ৩′ পর্যন্ত কাতাই-র হাত নিতে পারে।

নিপুণ শিল্পীরা যেমন বাঁ হাতে টানের সাহায্যে পাঁজ থেকে সমপরিমাণ কম বা বেশী আঁশ ছাড়তে পারে এবং ফলে যথাক্রমে মিহি বা মোটা সুতো তৈরী করতে পারে, ছাত্র-ছাত্রীরা যে প্রথমেই তা পারবে না এ-কথা বলাই বাহুল্য। অবশ্য একথা ঠিক যে, বেশী টান রেখে সুতো কাটলে মিহি সুতো এবং কম টান রেখে সুতো কাটলে মোটা সুতো হয়। কিন্তু অল্প দৈর্ঘ্যের আঁশ থেকে বেশী টানের মিহি সুতো কাটলে তৈরী সুতোর শক্তি কম হয়।

সুতো কাটতে হলে চরকাকে সমতলে বসাতে হবে এবং এর নড়বড়ে অংশ শক্ত করে নিতে হবে। চরকার ঘোরার জায়গায় তেল দিতে হয়। টাকুর আগা বাঁকা এবং বেশী সরু হওয়া উচিত নয়। ঘোরার সময় টাকু যেন না কাঁপে। কাটা সুতো টাকু বা নাটাই ইত্যাদিতে জড়ানোর সময় যেন কুঁচকে না যায়—তা লক্ষ্য রাখা উচিত।

তাঁতে কাপড় বোনা

তাঁত দু'রকমের হতে পারে—হস্ত-চালিত তাঁত (Handloom) এবং শক্তি-চালিত তাত (Power loom)।

তাঁত চালাতে হলে তাঁতের প্রয়োজনীয় সব সরঞ্জামের সঙ্গে ছাত্র-ছাত্রীদের অবশ্যই পরিচিত হতে হবে। চরকা, চরকি, চরকি ধাবক, নলি, কাটিম, মাকু, টান দড়ি, দক্তি, মুঠ কাঠ, মেড়া, মেড়ার শিক, মেড়ার-স্ক্রু, হাতল, বীম ফ্রেম, চাল কাঠ, পাশের কাঠ, 'ব', শানা, পুলি, লিভার, স্প্রিং, রবার, ভারী বা ভারা, প্যাডেল, ল্যাম্প, ওসারী, ড্রয়িং হুক, জো-কাঠি, 'ব'-কাঠি, খিল-কাঠি, ক্যাচার

হুইল, সিট, ব্র্যাকেট, ফন্টরেস্ট, ব্যাকরেস্ট, খাঁচা, বুড়ী কাঠ, বীম স্ট্যাণ্ড, বুক ক্রীল, সেলেট, টানার খুঁটি, ড্রাম, ফিতা, কাঁচি, উইভার্স কম্ব, ব্রাশ, ফ্ল্যাঙ্গ, গ্যালভানাইজড্ তার, লোহার রড, টাকু, সুতলি ইত্যাদি কী এবং তারা কী কাজে লাগে—সবই ছাত্র-ছাত্রীদের জানতে হবে। এক কথায়, তাঁতের সমস্ত যন্ত্রাংশ সম্পর্কে উপযুক্ত ধারণা রাখতে হবে।

হাতে তাঁত চালাতে হলে প্রথমে ছাত্র-ছাত্রীরা ঝাঁপ তোলা বা প্যাডেল চাপা, দক্তি ঠেলা, মাকু মারা ও ঘা মারা শিখবে। প্রথম প্রথম অবশ্য তাদের মাকু পড়ে যাবে, টানার সুতো ছিঁড়ে যাবে, পাড় খারাপ হয়ে যাবে। সুতরাং কেন মাকু পড়ে, কেন টানার সুতো ছিঁড়ে যায় আর কেনই বা পাড খারাপ হয়—এ সবই তাদের জেনে নিতে হবে শিক্ষকমহাশয়ের কাছ থেকে। শুধু তাই নয়, মাড়, নক্সা, রং ইত্যাদি সম্পর্কেও জ্ঞান অর্জন করা দরকার।

কাপড় তৈরী করতে দু' সেট সুতো দরকার হয়—টানা (Warp) এবং পোড়েন (Welf)। টানা হল কাপড়ের লম্বা দিক এবং পোড়েন প্রস্থের দিক। কাপড় তৈরী করতে হলে ঐ দু'সেট সুতো পরস্পর সমান দূরে এবং আড়াআড়ি-ভাবে ফেলে অর্থাৎ সমকোণে বন্ধনীর (Interlaced) সৃষ্টি করতে হবে। যে-প্রণালীতে এইরকম বন্ধনীর সৃষ্টি করা যায়, সেটাই হল বস্ত্রের গঠন-(Structure) প্রণালী বা বয়ন-প্রণালী।
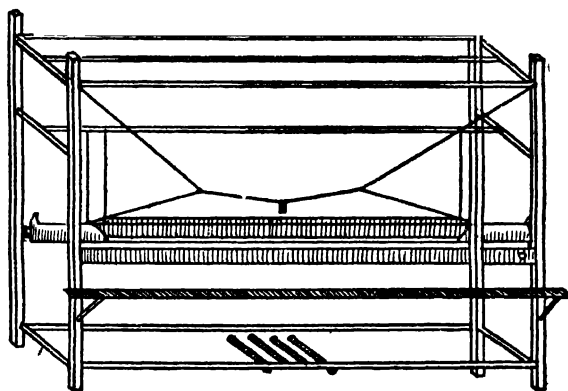
ফ্রেম ঠকঠকি তাঁত

টানার সুতোকে প্যাডেল চেপে দু'ভাগ করা হয়। একে বলা হয় ঝাঁপ তোলা বা শেডিং। ডিজাইন অনুযায়ী নির্ধারিত নিয়মে টানার সুতো পোড়েনের সুতোর জন্যে দু'ভাগে বিভক্ত হলে অর্থাৎ ঝাঁপ তোলা হলে তার পর

দক্তি ঠেলতে হয়। টানদড়ির হাতল ধরে হেঁচকা টান দিলে পোড়েন সুতো-সুদ্ধ মাকু টানার শেডের ভিতর দিয়ে যায়। পরে শানার সাহায্যে মুঠকাঠ ধরে ঘা মেরে ('beat-up' করে) পোড়েনকে নির্দিষ্ট জায়গায় বসানো হয়। এইভাবে প্রতিটি পিক্ পূর্ববর্তী পিক্ বা খেইয়ের গায়ে নির্দিষ্ট পয়েন্টে beat-up করে বসিয়ে কাপড় বোনা হয়ে থাকে।

বহু রকম বয়ন-প্রণালীর মধ্যে **সাদাসিধে বা প্লেন বুনন** (Simple or Plain weaving)-ই সহজ এবং এটাই নবম ও দশম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের প্রোজেক্টের অন্তর্ভুক্ত। ২ সুতো টানা ও ২ সুতো পোড়েন (২ × ২) নিয়ে এই সাদাসিধে বুননের একটি ইউনিট বা রিপিট (Repeat) বা ফেরতাই হয়। এর 'ব'-গাঁথা 2 ঝাঁপে—1,2 এবং 4 ঝাঁপে 1, 2, 3, 4—এরকম।

ছাত্র-ছাত্রীরা এই বুননে ধুতি, শাড়ী, গামছা, মশারী, ঝাড়ন, শার্টিং, কোটিং, লংক্লথ, তসরেট, মার্কিন, পপ্‌লিন ইত্যাদি তৈরী করতে পারবে।

সাবান তৈরী

সাবান নানা ধরনের হতে পারে, যেমন—কাপড় কাচার, গায়ে মাথার, দাড়ি কামাবার, স্যাম্পু, সমুদ্রের জলে কাপড কাচার জন্যে 'মেরিন' (Marine) সোপ, বিভিন্ন বিশেষ প্রয়োজনের জন্যে 'লিকুয়িড্' (Liquid) সোপ। এখানে কেবল কাপড়-কাচা সাবান তৈরী করার প্রক্রিয়া সংক্ষেপে জানানো হচ্ছে। কাপড়-কাচা সাবান তৈরীর জন্যে দরকার পরিষ্কার নারকেল তেল অথবা ক্যাস্টর অয়েল, চর্বি, বাদাম তেল এবং কষ্টিক সোডা। এ ছাড়া প্রয়োজনমত সংখ্যার কাঠের ছাঁচ, বড লোহার কড়াই ২।১টি, কয়েকটি খুন্তি ও হাতা, কষ্টিক গোলার পাত্র চাই। আর ব্যবসায়িক ভিত্তিতে বেশী পরিমাণে উৎপাদন করলে, স্বয়ংক্রিয় (automatic) স্ট্যাম্পিং মেসিন, স্বয়ংক্রিয় কাটিং মেসিন, ও প্যাক করার কাগজ তো লাগবেই। প্রথমে কষ্টিক সোডা জলে গুলে নিয়ে সলিউশন করে রাখা হয়। এবার উনানে কড়াই চাপিয়ে পরিমাণমত তেল ও চর্বি একসঙ্গে মিশিয়ে সম্পূর্ণভাবে গলিয়ে নেওয়া হয়। তার পরে কষ্টিক সলিউশন আস্তে আস্তে গলানো তেলের মধ্যে ঢেলে দিয়ে খুন্তি দিয়ে ভালো করে নাড়তে হয়। লক্ষ্য রাখা দরকার যেন কড়াইয়ের জিনিস পুড়ে না যায়, পুড়ে গেলেই সাবান ওজনে কম হয়ে

যাবে। সাবান তাড়াতাড়ি জমাট বেঁধে আসছে দেখা গেলে অল্প জল মিশিয়ে দিতে হবে।

সাবান সিদ্ধ হয়ে গেলেই কড়াই থেকে নামাতে হবে। কড়াইয়ের সাবান খুব অল্পমাত্রায় আঙ্গুলে লাগিয়ে যদি দেখা যায় সাবান আঙ্গুল থেকে পড়ে যাচ্ছে না, আঙ্গুলে লেগে থাকছে, তবে বুঝতে হবে আরও সিদ্ধ হবে। কড়াই নামিয়ে ফেলে ঠাণ্ডা হওয়ার মুখে ছাঁচে ঢালতে হয়। সাবান সিদ্ধ হতে হতে ইচ্ছেমত রং মিশিয়েও নেওয়া যেতে পারে।

মোমবাতি তৈরী

বর্তমান বিদ্যুৎ-সঙ্কটের পরিপ্রেক্ষিতে মোমবাতির গুরুত্ব নতুন করে বেড়ে গেছে—আজকাল সব বিদ্যুৎ-ব্যবহারকারীই "লোড শেডিং"-য়ের সময় কাজ করার জন্যে বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে হাতের কাছে মোমবাতি মজুত রাখেন। এর ফলে মোমবাতি উৎপাদন অনেকের কাছে আয়ের এক নতুন রাস্তা খুলে দিয়েছে। নবম ও দশম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরা মোমবাতি তৈরী করে তাদের নিজেদের বাড়ীতে কাজে লাগাতে তো পারেই, উপরন্তু বিদ্যালয় সমবায় ভাণ্ডারের মাধ্যমে সাধারণের কাছে বিক্রীও করতে পারে।

মোটা টিনের পাতে তৈরী ছাঁচের মেসিন একটি, একটি লোহার কড়াই (বড়) ও একটি মগের মত লোহার হাতা (বড়), ১৪০ গ্রাম হার্ড প্যারাফিন, সরষের তেল ১০ সি. সি.ও ৫০ গ্রাম চর্বি লাগবে মোমবাতি তৈরীর জন্যে। আগুনে কড়াই চাপিয়ে প্রথমে হার্ড প্যারাফিনকে গলিয়ে নিয়ে পরে তাতে চর্বি ও তেল ঢেলে ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে। (মনে রাখতে হবে, আঁচ বেশী হয়ে গিয়ে মোম পুড়ে গেলে বা কড়াইয়ের তলা 'ধরে' গেলে বাতি খারাপ হয়ে যাবে।) সব জিনিস মিশে যাবার পর হাতার সাহায্যে গরম মিশ্রণটি তুলে নিয়ে ছাঁচে ঢেলে দিতে হয়। এই মেসিনের সাহায্যেই বাতিতে সুতো পরানো হয়ে যাবে। সরষের তেলের বদলে মৌমাছির মোম Bee's wax) ১০ গ্রাম এবং হার্ড প্যারাফিনের বদলে প্যারাফিন ওয়াক্স ব্যবহার করা যেতে পারে, তবে তাতে খরচ বেশী পড়বে। তেমনি, লোহার ছাঁচের মেসিন কিনলে খরচ অনেক বেশী হবে। টিনের পাতের ছাঁচের মেসিনেরই যা দাম, তাতে ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে তা-ই সংগ্রহ করা একরকম দুঃসাধ্য।

বিদ্যালয়ের দেওয়াল চুনকাম, রং লাগানো ও বিদ্যালয় ভবন সজ্জা

যে দেওয়ালে চুনকাম করা হবে তার উপরটা পরিষ্কার এবং শুকনো হওয়া চাই। আবার যদি অত্যধিক মসৃণ হয় তা হলে রং ধরে না। সুতরাং সিরিশ কাগজ দিয়ে আগে সেটা আলগোছে ঘষে ফেলতে হবে। নতুন করে চুনকাম করতে হলে উপরটা ভালোমত পরিষ্কার করে ঝেড়ে ফেলতে হবে, যাতে আগেকার আলগা চুন একটুও না থাকে। বলা বাহুল্য, এক্ষেত্রেও পরিষ্কার করতে হবে সিরিশ কাগজ দিয়ে। পেরেক ইত্যাদি তুলে ফেলতে হবে। দেওয়ালে গর্ত, ফুটো ইত্যাদি থাকলে তা চুনের পুটিং দিয়ে বন্ধ করে দিতে হবে। তা না হলে পরে ফাটল দেখা দেবে।

চুনকামের জন্যে তাজা কলি চুন আফোটানো অবস্থায় দরকার। এই চুন টবে রেখে প্রচুর জল দিতে হবে। চুন ফুটে গেলে তা ভালো করে নাড়তে হবে এবং জল ঢেলে আন্দাজমত পাতলা করে মোটা কাপড দিয়ে (খদ্দর হলেই ভালো হয়) ছেঁকে নিতে হবে। তারপর জলে গঁদের আঠা অথবা সিরিশ ১ঘনফুটে ১ পাউণ্ড হারে চুনের জলের সঙ্গে মেশাতে হবে। এতে যদি কিছুটা তুঁতে মেশানো হয় তা হলে চুনকামের চকচকে ভাবটা কেটে যায় এবং দেখতে ভালো হয়। কিছুটা ফট্‌কিরি অথবা ½ পাউণ্ড লবণ ১ ঘনফুট চুনের গোলার সঙ্গে মেশাতে হবে। এতে চুনকাম খুব ভালোভাবে এঁটে যাবে এবং ঘষা লাগলে উঠবে না। চুনের প্রলেপ ব্রাশ দিয়ে ছ'বার করে দিতে হবে। একটা পোঁচ আড়াআড়ি (horizontally) এবং আর একটা পোঁচ খাড়াই ভাবে (vertically) দিতে হবে। একটা পোঁচ ভালোভাবে শুকিয়ে গেলে তবেই আর একটা পোঁচ লাগাতে হবে। নতুন চুনকামের জন্যে এবং পুরাতন চুন আঁচড়ে ফেলে চুন লাগানোর ব্যাপারেও তিন পোঁচ চুন দিতে হবে। বছরে বছরে চুনকাম করা হলে প্রথমে খাড়াই পোঁচ একটা দিয়ে তার পর সঙ্গে সঙ্গে আড়াআড়িভাবে পোঁচ দিতে হবে।

দেওয়াল যদি রঙীন করতে হয় তা হলে ঐ চুনের গোলার সঙ্গে প্রয়োজনমত রং, উপযুক্ত পরিমাণ আঠা বা লবণ মেশাতে হবে। ঐ চুনের গোলায় পিউড়ি অথবা মূলতান মাটি মিশিয়ে অল্প খরচায় **ফিকে হলুদ রং** করা যেতে পারে। হাস্যকর বা আপত্তিকর মনে হতে পারে, কিন্তু ছাগলের বিষ্ঠা ভালো করে পিষে মোটা কাপড়ে ছেঁকে ঐ চুনের গোলার সঙ্গে মিশিয়ে সস্তায় **ফিকে সবুজ**

রং করা যায়। **স্লেট রঙের** জন্যে ভূষো কালি এবং নীল রঙ মেশাতে হবে। সবুজ রঙের জন্যে দশ পাউণ্ড আমের খোসা চার পাঁইট জলে পাঁচ মিনিট ফুটিয়ে সেই জল দু'পাউণ্ড তুঁতে ও তিন পাঁইট জলে মেশানো দ্রবণের সঙ্গে মিশিয়ে চুনের গোলায় ঢালতে হবে। অবশ্য ভিতরের দেওয়ালে লাগাবার তৈরী রং বাজারে কিনতে পাওয়া যায়—তাতে খরচ বেশী পড়ে। তবে এর একটা স্থবিধা এই যে, এর রংটা সব জায়গাতেই সমান হয়।

রং খুব বেশী তৈরী করা উচিত নয়। একসঙ্গে একটা ঘরে লাগাবার মত বা একদিনে যেটুকু লাগবে তার বেশী রং তৈরী না করাই ভালো।

দেওয়ালের পর জানালা-দরজা ইত্যাদিতে রং লাগাতে হবে। রঙের মধ্যে সাধারণতঃ দুটো জিনিস থাকে—(১) একটা নিরেট মূল বস্তু ; এই বস্তুই কোনও জিনিসের উপরটা অস্বচ্ছ একটা আবরণে ঢেকে দেয় এবং (২) একটা তরল পদার্থ, যা মাধ্যমের কাজ করে ও ঐ নিরেট বস্তুকে কোনও জিনিসের উপর শক্ত করে আটকে রাখে। **রং তৈরী করতে হলে** প্রথমে মূল বস্তুটি তেলের সঙ্গে মেশাতে হবে ও পরিমাণমত ঘন করতে হবে। তাতে কিছু তার্পিণ তেল মেশাতে হবে। তারপর রং কিনে ভালো করে গুঁড়ো করে মিশিয়ে তাতেও তেল এবং তার্পিণ মিশিয়ে পাতলা করতে হবে। এই দুটি একসঙ্গে মেশাতে হবে এবং খদ্দরের কাপড়ে ছেঁকে ভালো ব্রাশ দিয়ে লাগাতে হবে।

প্রথমে যে কাঠে রং লাগানো হবে সেটিকে ভালো করে পরিষ্কার করে ফেলতে হবে। কাঠ অবশ্যই সীজ্‌ন করা ও শুকনো হওয়া চাই। কাঠের ফুটো, ফাটা, গর্ত ইত্যাদি পুটিং দিয়ে বুজিয়ে নিতে হবে। জানালার গরাদে রং করতে হলে সেই লোহাকেও ঐ রকম ধুলোবালি ও ময়লা ইত্যাদি থেকে মুক্ত করতে হবে। মরচে বা আগের রং আঁচড়ে তুলে ফেলতে হবে।

রং করবার ব্রাশ

রং লাগানোর ব্যাপারে দুটি বিষয় মনে রাখা দরকার। (১) ব্রাশ ভালো কুঁচির তৈরী হওয়া চাই, ঘোড়ার লেজের নয়। ঘোড়ার লেজের ব্রাশে রং ভালো করে ধরে না। রং লাগাবার কাজে গোল ব্রাশই ভালো। (২) প্রথম পোঁচটাই সবচেয়ে দরকারী। এই পোঁচই কাঠের ফুটোফাটা, লোহার ছোট গর্ত ইত্যাদি বুজিয়ে দেয়। তাছাড়া খুব ভালোভাবে লেগে যায়
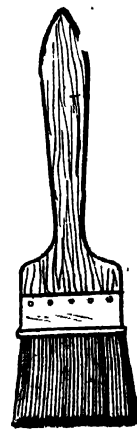
এবং দ্বিতীয় পোঁচ লাগাতে সাহায্য করে। দ্বিতীয় পোঁচ রঙের মাধ্যম শুষে নেওয়া বন্ধ করে।

নানারকমের মেশানো রং হাতের কাছে থাকা দরকার। যদি খুব বেশী রং মেশানো হয়ে যায়, তাহলে অন্য জায়গায় প্রথম পোঁচ হিসেবে ব্যবহার করা যায়। রং উপর থেকে লাগাতে আরম্ভ করে নীচের দিকে শেষ করতে হয়। রং লাগানো শেষ করার সময় উপরের দিকের একপাশ থেকে অপর পাশ পর্যন্ত সটান ব্রাশ টেনে নিতে হবে। লাগানোর কাজটি তাড়াতাড়ি শেষ করা দরকার। এক অংশ শুকিয়ে যাবার আগেই অন্য অংশে হাত লাগাতে হবে। ব্রাশের ⅓ অংশ রঙের মধ্যে ডোবাতে হয় এবং রঙের পাত্র থেকে ব্রাশ তোলবার সময় অতিরিক্ত রং পাত্রের গায়ে মুছে নিতে হবে। উপরের দিকের সঙ্গে সমকোণ করে ব্রাশ ধরতে হয় এবং ব্রাশের ঠিক আগাটা দিয়ে ছুঁইয়ে আলগোছে রং লাগাতে হয়।

মনে রাখতে হবে, স্যাঁৎসেঁতে আবহাওয়ায় কখনোই রং লাগানো ঠিক নয়। স্যাঁৎসেঁতে বা ভিজে অবস্থায় কোনও জিনিস রং করা আদৌ চলবে না। যে জিনিসটায় রং লাগাতে হবে তাতে কখনও আগে আলকাতরা লাগানো চলবে না। যখন ব্রাশ ব্যবহার করা হচ্ছে না তখন জলে অথবা তিসির তেলে কুঁচিগুলো ভিজিয়ে রাখতে হবে।

ফিনাইল তৈরী

আসলে ফিনাইল হল তেল, জল আর সাবানের সংমিশ্রণ। সাধারণভাবে সাবান তৈরীর জন্যে যে-সব উপকরণ দরকার তার সঙ্গে ক্রিয়োজোট অয়েল দিতে হয়। রজন, লিনসীড অয়েল, ক্যাস্টর অয়েল, কষ্টিক সোডা আর জল দিয়েই ফিনাইল তৈরী করা যায়। আগে পরিমাণমত লিন্‌সীড অয়েল, ক্যাস্টর অয়েল, রজন মিশিয়ে কড়াইয়ে গরম করে নিতে হয়। তারপর ঐ উত্তপ্ত মিশ্রণে কষ্টিক সোডা সলিউশন ঢেলে দিতে হয়। এইরকম করে সাবান হয়ে গেলে তাতে ক্রিয়োজোট অয়েল দিয়ে খানিকক্ষণ নাড়তে হবে যাতে ক্রিয়োজোট অয়েল নিংশেষে গলে যায়। এবার আস্তে আস্তে জল মেশাতে হবে। আর, একটু ভালো ফিনাইল করতে গেলে উল্লেখিত তেলগুলির সঙ্গে সামান্য বাদাম তেল দিতে হবে।

সলিড ফিনাইল ও হোয়াইট সেন্টেড ফিনাইল ঐ একই রকমের

মালমশলা দিয়ে করতে হয়। তবে সলিড ফিনাইল করবার সময় জল মেশানো চলবে না। এক্ষেত্রে ক্রিয়োজোট অয়েল দেবার পরও কড়াই আগুনে রেখে নাড়তে হবে। নাড়তে নাড়তে যখন ঘন হয়ে যাবে, তখন নামিয়ে ফেলে ছাঁচে ঢেলে ফেলতে হয়। আর, হোয়াইট সেন্টেড ফিনাইল করতে গেলে ক্রিয়োজোট অয়েলের পরিবর্তে পাইন অয়েল ব্যবহার করতে হয়।

বাঁশের ও বেতের কাজ

কুটির-শিল্প হিসেবে বাঁশের যে কত বিভিন্ন রকমের ব্যবহার হতে পারে তা চীন ও জাপানের দৃষ্টান্ত দেখলেই বোঝা যায়। খাঁচা, ডালা, কুলো, চালুনি, নৌকোর বৈঠা, তীর-ধনুক, ঝুড়ি, খেলনা, ট্রে, মাদুর, টেবিল ল্যাম্প, ছিপ, ফুল তোলার সাজি, বোতাম, জানালা-দরজার পর্দা, কাপড়-চোপড় রাখার ব্র্যাকেট, হ্যাণ্ডব্যাগ, ছাতার বাঁট, মই, পিচকারী, বাজে কাগজের ঝুড়ি (Waste paper basket) ইত্যাদি অজস্র জিনিস বাঁশের সাহায্যে তৈরী করা হয়। অবশ্য বিশেষ বিশেষ বাঁশে বিশেষ ধরনের কাজ হয়।

তবে মেসিনের সাহায্য নিয়ে কাজ করলে অনেক বেশী জিনিস তৈরী করা যায়। বিদ্যুৎ-চালিত করাত (ছোট), অটোমেটিক রাউণ্ড ব্লেড, ইলেকট্রিক ড্রিল মেসিন, ইলেকট্রিক স্প্রে-পেন্টিং মেসিন, ইলেকট্রিক পালিশিং মেসিন—এই সব মেসিনের সাহায্যে বাঁশকে কয়েকটি নির্দিষ্ট আকার দেওয়া যায়। বলা বাহুল্য, এ-সব মেসিনের দাম অনেক। কুটির-শিল্পীরাই এ-সব জিনিসের জন্যে যখন অর্থ ব্যয় করতে পারেন না, তখন ছাত্র-ছাত্রীদের কথা বলাই বাহুল্য। সুতরাং মেসিনের সাহায্য না নিয়ে যে-সব জিনিস তৈরী করা যায়, তার মধ্যে দু'একটির কথা এখানে বলা হচ্ছে। এই সব ক্ষেত্রে কুড়ুল, মুগুর, বাটালী, দা, হাত-করাত, তুরপুণ ইত্যাদি দিয়ে কাজ করতে হয়। **ছিপ** তৈরী করা খুব সহজ। 'তল্লা'জাতীয় সরল বাঁশ থেকে সরু সোজা ও পাকা বাঁশ বেছে নিয়ে কষ্টিক সলিউশনে ভিজিয়ে পরিষ্কার করে নিতে হবে। এর পরেও যদি বাঁশ একটু বাঁকা থাকে তবে আগুনে তাতিয়ে নিয়ে অল্প চাপ দিয়ে সোজা করে নিতে হয়। শেষকালে সরষের তেল মাখিয়ে মাসছয়েক রোদে দিতে হয়। যদি তেল শুকিয়ে যায়, মাঝে মাঝে তেল মাখিয়ে দিতে হয়। পরে ভালোভাবে বার্ণিশ লাগিয়ে নিতে হয়। **ছাতার বাঁট** তৈরী করতে হলে প্রয়োজনমত দৈর্ঘ্য বিশেষ শ্রেণীর সরু বাঁশ থেকে কেটে নিয়ে যেদিকটা বাঁকাতে হবে, তার

মধ্যে বালি পুরে দিয়ে আগুনের তাপে বাঁকাতে হয়। **ঝুড়ি ও ঝাঁকা** তৈরী হয়—যথাক্রমে বাঁশের কঞ্চি ও বাঁশের 'বেতি' (সরু ফালি) থেকে। ঝুড়ি বুনতে হলে সরল এবং পাকা 'জাওয়া' বাঁশের কঞ্চি কেটে দু'তিন দিন জলে ভিজিয়ে রেখে তারপর ঐ কঞ্চিগুলি ৪ বা ৬ ফালি করে চিরতে হয়। তারপর ঝুড়ির আকার অনুযায়ী (১½/২ হাত লম্বা) 'থিউটি' বা 'জাসি' তৈরী করে নিতে হয়।

প্রথমে মাটিতে একটি হাতদেড়েক ব্যাসের বৃত্ত এঁকে নিয়ে, বৃত্তের ব্যাসের সমান দৈর্ঘ্যের 'থিউটি' করে নিতে হয়। 'বেতি' করতে হবে কঞ্চির দৈর্ঘ্য অনুসারে ১০।১৫ হাত লম্বা। বৃত্ত আঁকার উদ্দেশ্য হল, তার ফলে ঝুড়ির কেন্দ্র ধরা সহজ হয় এবং থিউটিগুলো ছোট-বড় হয়ে যায় না ; এতে ঝুড়িটি বেশ গোল হয়। **ঝুড়ির বুনানী**ই আসল। প্রথমে ৪টি থিউটি নিতে হয়—যেমন 'A,' 'B', 'C', 'D'। A-র উপরে B, C, D-র নীচে একটি বেতি ঢুকিয়ে উপর-নীচ করে বুনে যেতে হয় এবং ৩।৪ আঙ্গুল বোনা হয়ে যাবার পর থিউটি-গুলো উল্টে দিয়ে আরও ৪টি থিউটি E, F, G, H—ঐ 'A, B, C, D' থিউটির ফাঁকগুলির মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে হবে। এইবাব ঝুড়ির পিঠের দিকটা প্রস্তুতকারী তার বুকের দিকে রেখে এবং খোলটা সামনের দিকে রেখে ঝুড়িটাকে বাঁ-পাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ডান হাতে দুটো বেতি নিয়ে থিউটিগুলোর সঙ্গে উপর-নীচ করে বুনে যায়। বুনানী শেষ হলে একটা বাঁশের 'কাবারী' দিয়ে 'চাক' তৈরী করে ঝুড়ির মুখে বেঁধে দেওয়া হয় গোল করে। কাবারীতে কয়েকটা আলগা বাঁধন দিয়ে থিউটির উঁচু মাথাগুলি ক্রমান্বয়ে ডান দিকে বেঁকিয়ে দিয়ে শক্ত বাঁধন দেওয়া হয়।

বাঁশের ফুলদানি তৈরী করা ঝুড়ি করার থেকে অনেক সহজ। প্রায় ১ বিঘৎ ভালো পাকা বাঁশ গাটসমেত কেটে নিয়ে তাকে চেঁছে ছুলে পরিষ্কার করে নিতে হবে। গাঁটের দিকটা মাটিতে থাকবে। নীচের দিকটা এমনভাবে কাটতে হবে, যেন বাঁশটা মাটিতে ঠিকভাবে বসে। বাঁশের উপরের দিকটা ফাঁকা থাকবে। এবার বাঁশের টুকরোটা অল্প আঁচের উপর ধরে ঘোরাতে হবে—কাঠের আঁচ হলেই ভালো হয়। যখন দেখা যাবে যে বাঁশের গায়ে অল্প অল্প দাগ পড়ছে তখন টুকরোটাকে ঠাণ্ডা করতে দিতে হবে। এবার ইচ্ছেমত নক্সার ছাপ দিতে হবে টুকরোটার ওপর। সব শেষে তুলোর তুলি দিয়ে নক্সাটা রং করতে হবে। দোকান থেকে বা কুমোর বাড়ী থেকে গুঁড়ো রং

আর পাকা তেল জোগাড় করে তার সাহায্যে এই রং তৈরী করতে হবে।) রং করার ব্যাপারে বৈচিত্র্য আনা চাই—যেমন লাল আর হলুদ রং দিয়ে ফুল, সবুজ দিয়ে পাতা, ফুটকি নীল রং দিয়ে। রং শুকোতে দিন-তিনেক সময় যাবে। ভালো করে শুকিয়ে গেলে এবার এতে জল দিয়ে ফুল সাজিয়ে রাখা যাবে।

বেত দিয়ে লাঠি, ধামা, ঝাঁপি, স্যুটকেস, চেয়ার, সোফা ইত্যাদি তৈরী হয়। এছাড়া মোড়া, চেয়ার, 'ইজি চেয়ার' (Easy Chair) ইত্যাদি বেত দিয়েই তৈরী করা হয়। সিঙ্গাপুরী বেতের মত আমাদের দেশী বেত তেমন মজবুত ও লম্বা হয় না।

কাঠের মত বেতেরও ঋতু-সহকরণ বা "সীজনিং" (Seasoning) দরকার। বেতের ফালিগুলো ২-৪ দিন জলে ভিজিয়ে নিয়ে পরে ঠাণ্ডা জায়গায় লম্বা করে আঁটি বেঁধে রেখে দিতে হয়। রান্নাঘরে ধোঁয়া লাগে এমন জায়গায় বেতের ফালি রেখে দিলে তাতে সহজে ঘুন ধরে না। বেতের জিনিসে গাবের কষের 'পালিশ' দিতে হয়। এই পালিশ তৈরী করা শক্ত নয়—কাঁচা গাব ঢেঁকি বা হামানদিস্তায় থেঁতো করে নিয়ে একটা পাত্রে রেখে কাপড় দিয়ে ছেঁকে নিতে হয়।

বলা বাহুল্য, বাঁশের বা বেতের জিনিস ছাত্র-ছাত্রীরা প্রথমেই নিজেরা করতে পারবে না, তাই যারা বাঁশ ও বেতের কাজ করে, তাদের কাজ ভালো করে লক্ষ্য করা উচিত।

বিদ্যালয় সমবায় ভাণ্ডার পরিচালনা

আমাদের দেশে বর্তমানে সমবায় আন্দোলনের উপর এক বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীরা যদি বিদ্যালয়ে সমবায়ের মূল নীতিগুলি সম্পর্কে শিক্ষা পায় ও তার প্রয়োগের বা অনুশীলনের সুযোগ পায়, তবে আজকের সমবায় আন্দোলনকে ভবিষ্যতে সহজেই সফল করে তোলা যাবে। এ ছাড়া দেশব্যাপী বর্তমান সর্বগ্রাসী মূল্যবৃদ্ধির অন্যতম উত্তর সমবায় ভাণ্ডারের মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয়। সেদিক থেকেও এর সার্থকতা আছে।

ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সমবায়চেতনার সঞ্চার করা ও মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে সংগ্রাম ছাড়াও সমবায় ভাণ্ডার বিদ্যালয়ে অনেক কিছুই শেখাতে পারে। সমবায় ভাণ্ডার পরিচালনার মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীরা সবচেয়ে বড় যে শিক্ষা পাবে, তা হল সহযোগিতার শিক্ষা, যার মূল কথাটি হল "দশে মিলি করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ।" আর ভাণ্ডার পরিচালনার মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীরা ব্যবসায়-সংক্রান্ত নানা শিক্ষাও লাভ করে।

সুতরাং সম্ভব হলেই প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ে একটি করে সমবায় সমিতি গঠন করা উচিত। এই সমিতিরই অন্যতম অঙ্গ হবে বিদ্যালয় সমবায় ভাণ্ডার। কাজ ভালো পাওয়া গেলে সমবায় সমিতির কর্মক্ষেত্র ধীরে ধীরে বিস্তৃত করা যেতে পারবে।

সমবায় সমিতি স্থাপনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে ছাত্র-ছাত্রীদের বিশদভাবে বুঝিয়ে দেবেন শিক্ষকমহাশয়। ছাত্র-ছাত্রীরা বুঝতে পারবে যে, এটা তাদের নিজের প্রয়োজনেই স্থাপিত হয়েছে, অন্য কোনও উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে শিক্ষকমহাশয় বা বিদ্যালয়-কর্তৃপক্ষ জোর করে তাদের উপর এটা চাপিয়ে দেননি। যখন ছাত্র-ছাত্রীরা এটা বুঝবে এবং তাদের নিত্যব্যবহার্য জিনিসপত্র অল্প দামে কেনাকাটার এবং সহজে পাওয়ার সুবিধার বিষয় বিবেচনা করবে, তখন তারা সমবায় সমিতির ও ভাণ্ডারের কাজ করবে উৎসাহের সঙ্গে, নানারকম দায়িত্ব নেবে।

ছাত্র-ছাত্রীদের দৈনন্দিন জীবনে বই, খাতা, কাগজ, পেন, পেন্সিল, কালি, রাবার, তুলি, রং প্রভৃতি কতো জিনিস দরকার। প্রথমে এই সব জিনিস নিয়েই বিদ্যালয় সমবায় ভাণ্ডারের কাজ আরম্ভ করা যেতে পারে। এর জন্যে যে মূলধন দরকার তা আসবে ছাত্র-ছাত্রীদের চাঁদা থেকে। ছাত্র-ছাত্রীরা নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী চাঁদা দিয়ে মূলধন সৃষ্টি করতে পারে। যে যেমন চাঁদা দেবে সমিতির লভ্যাংশে সেই হারে তার অধিকার থাকবে। কোনও নির্দিষ্ট চাঁদা সকলের জন্যে সমানভাবে স্থির করেও দেওয়া যেতে পারে। তবে সেই চাঁদার পরিমাণ যেন সকলেরই বহনযোগ্য হয়, যেন বেশী না হয়। অর্থ দিয়ে যারা সমিতি গড়ে তুলবে তারাই হবে সমিতির সভ্য এবং পরিচালক।

মূলধন জোগাড় হবার পর ভারপ্রাপ্ত শিক্ষকমহাশয়ের উপস্থিতিতে সমিতির সভ্যরা একত্রে বসে ভাণ্ডার পরিচালনার জন্যে পরিকল্পনা করবে। পরিকল্পনা-সমিতিই স্থির করবে কী কী জিনিস কতটা কেনা হবে, তার আনুমানিক খরচ ইত্যাদি। এসব ব্যাপারে যদি দল ভাগ করে নেওয়া যায় তাহলে কাজের সুবিধা হবে। জিনিস কেনা হলে মোট কত খরচ হয়েছে, তার হিসাব করে কার্য-নির্বাহক সমিতির সভ্যরা কোন্ জিনিস কত দামে বিক্রী হবে তা স্থির করবে। বলা বাহুল্য, বিক্রয়মূল্য ক্রয়মূল্য থেকে কিছুটা বেশী করে ধার্য হবে, না হলে সমিতির লাভ হবে না।

বিক্রীর দাম ধার্য হলে সমিতির সভ্যরা মিলে একটা তালিকা তৈরী করবে। তাতে কোন্ জিনিস কত দামে বিক্রী করতে হবে তা লেখা থাকবে। কার্য-

নির্বাহক সমিতি স্থির করে দেবে সপ্তাহের কোন্ দিন কোন্ সদস্য ভাণ্ডারী হবে। ভাণ্ডারীর কাজ হবে নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সময়ে সমিতির ভাণ্ডার খোলা, জিনিস-পত্র বিক্রী করা, বিক্রীত দ্রব্যের ও আদায়ীকৃত দামের হিসাব রাখা এবং সমস্ত টাকা-পয়সা কোষাধ্যক্ষের কাছে জমা দেওয়া। এই ভাণ্ডারটি বিদ্যালয়ের কোনও একটি ঘরে স্থাপন করা উচিত এবং এমন ব্যবস্থা করা উচিত, যেন বিদ্যালয়ের কাজ চলার সময়ে এটি খোলা থাকে।

কার্য-নির্বাহক সমিতি নোটিশ দিয়ে সকল সদস্যকে জানিয়ে দেবে কে কবে ভাণ্ডারী হবে এবং ভাণ্ডার খোলা ও বন্ধের সময় কখন। নির্দিষ্ট সময়ে প্রতিদিন ছাত্র-ছাত্রীরা সমবায় সমিতির ভাণ্ডারে তাদের প্রয়োজনীয় জিনিস কিনবে। যদি কোনও জিনিস ভাণ্ডারে না থাকে অথচ কোনও ছাত্রের/ছাত্রীর তা প্রয়োজন হয়, তবে ছাত্র বা ছাত্রী সেকথা কার্য-নির্বাহক সমিতির কর্মসচিবকে জানাবে, কার্য-নির্বাহক সমিতির নির্দেশক্রমেই সে জিনিস কেনা হবে।

সমবায় ভাণ্ডারের আয়-ব্যয়ের যাবতীয় হিসাব হিসাব-পরীক্ষক সমিতি বছরে দু'বার পরীক্ষা ক'রে দেখবে এবং বৎসরান্তে লাভ-লোকসান হিসাব করে লভ্যাংশ সদস্যদের মধ্যে বিতরণ করবে।

বিদ্যালয়ের ব্যবহারের জন্যে হাতে কাগজ তৈরী

বিদ্যালয়ে হাতে-তৈরী কাগজ-শিল্প গড়ে তোলা যেতে পারে। এই শিল্প ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে খুব জটিলও নয়, আর তারা "কাগজের ব্যবহার অনবরতই দেখছে ও করছে বলে এতে তাদের স্বাভাবিক আগ্রহও আছে।" অবিভক্ত বঙ্গে অনেক গ্রাম্য কারিগর এই শিল্পে বেশ পটু ছিল। এখনও খুঁজলে হুগলী, হাওড়া, মুর্শিদাবাদ ও বাংলাদেশের ঢাকা জেলার কোথাও কোথাও 'কাগ্‌জী' সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তির সন্ধান পাওয়া যেতে পারে; তবে এই সম্প্রদায় এখন লুপ্ত হয়ে গেছে বললেই চলে। অথচ ইউরোপের মত যন্ত্র-সভ্যতার দেশে আজও হাতে-কাগজ-প্রস্তুত শিল্প টিকে রয়েছে।

মিলে-তৈরী কাগজের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেও হাতে-তৈরী কাগজ টিকতে পারে, কারণ কতকগুলি বিশেষ কাগজ হাতেই ভাল তৈরী হয়, যেমন, আর্ট কাগজ। ব্লটিং কাগজও* হাতে বেশ সস্তাতে তৈরী করা যায়—সাইজিং দরকার হয় না বলে এর উৎপাদন-ব্যয়ও কম পড়ে। "বিদ্যালয়ে যে কাগজ প্রস্তুত হবে

* ব্লটিং কাগজ তৈরী করতে হলে ১০০ ভাগ অকজ্যালিক অ্যাসিডের সাথে ৪০০ ভাগ অ্যালকোহল জলে মিশিয়ে সেই জলে সাদা কাগজ ভালভাবে ভিজিয়ে শুকিয়ে নিতে হয়।

তা বিক্রি করবার জন্য চিন্তা করতে হবে না, কারণ বিদ্যালয়ের কাজেই যথেষ্ট কাগজের প্রয়োজন ঘটবে।" এখন সারা দেশ জুড়ে কাগজের যে নিদারুণ সংকট চলছে তার পরিপ্রেক্ষিতে হাতে-তৈরী কাগজের গুরুত্ব নতুন করে বেড়ে গেছে।

বিদ্যালয়ের জন্যে এই শিল্প-ব্যবস্থায় যতদূর সম্ভব সাধারণ আসবাব ও স্থানীয় উপকরণ ব্যবহার করাই ভালো। এই উপকরণগুলি হলে মোটামুটি কাজ চলতে পারে: (১) মণ্ড গোলা (বিটার) ও পাম্প হতে কাগজ তোলবার জন্যে চারটি মাঝারি চৌবাচ্চা বা লোহার পিপে; (২) উপকরণগুলি কোটার জন্যে ঢেঁকি বা হামানদিস্তা; (৩) মণ্ড প্রস্তুতের জন্যে ড্রাম (অভাবে ঢাকনা-যুক্ত কড়াই ও চুল্লী); (৪) মণ্ড ঘুঁটবার জন্যে মন্থনী; (৫) কাগজ তোলবার জন্যে জালিযুক্ত ফ্রেম; (৬) কাগজ ছাঁকার জন্যে পাতলা অথচ সমান বোনা বস্ত্রখণ্ড—অনেকগুলি; (৭) চাপ দিয়ে জল ঝরাবার জন্যে প্রেসার (অভাবে ওজন ও দু'টি শক্ত লোহার প্লেট); (৮) পালিশ করার জন্যে রোলার, অভাবে পাথরের শ্লেট ও শামুক বা শাঁখ; (৯) শুকোবার জন্যে নীচু দেওয়াল বা টিনের পাত। ছেঁড়া কাগজ, তুলো, সুতো, উলুজাতীয় শুকনো ঘাস, পাট, ব্যবহৃত খাদি প্রভৃতি বিভিন্ন উপকরণ থেকে বিভিন্ন ধরনের কাগজ তৈরী হয়। যে-জিনিস দিয়ে কাগজ তৈরী হবে সেগুলিকে বেছে পরিষ্কার করে নিতে হবে। ছেঁড়া কাগজ বা কাপড় থেকে কাগজ তৈরী করতে হলে সেগুলিকে আলাদা আলাদা খণ্ড খণ্ড করে কেটে হামানদিস্তা বা ঢেঁকিতে কুটে নিয়ে জল মিশিয়ে মন্থনী দিয়ে ঘুঁটে মণ্ড তৈরী করতে হয়। কয়েকবার ঐ রকম করলে মণ্ডগুলি ক্রমশঃ পরিষ্কার সাদা হয়ে আসবে। পরে জালি দেওয়া ফ্রেমের উপর মণ্ড সমানভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে, এতে জালি দিয়ে জল ঝরে পড়বে। (জল যাতে ভালোভাবে ঝরে যায় সেজন্যে ছড়িয়ে দেওয়া মণ্ডের উপর ওজন বা 'প্রেসার' দিতে হবে।) নীচু দেওয়ালে বা করোগেট টিনের পাতে কাপড়ের ন্যাকড়া সমেত (অথবা ছাড়ানো) কাগজগুলি শুকোতে দিতে হবে। শুকোনোর পর সেগুলি সংগ্রহ করে সাইজিং করতে হবে। প্রস্তর শ্লেটে রেখে আতপ চালের গুঁড়ি ছড়িয়ে শাঁখের সাহায্যে ঘষে এ-কাজ করতে হয়। রঙীন কাগজ তৈরীর ক্ষেত্রে মণ্ড গুলবার সময় জলে অভীষ্ট রঙ মেশাতে হবে।

বই বাঁধাই

সাধারণ বই বাঁধাইয়ের জন্যে যে-সব উপকরণ দরকার সেগুলির মধ্যে ধারাল ছুরি, ছোট ও বড় কাঁচি, স্ঁচ, কাঠের তক্তা, সুয়া, লোহার প্লেট,

ফোল্ডার, স্কেল, কাটিং ও স্টিচিং মেসিন প্রভৃতি প্রধান। চামড়া দিয়ে বই বাঁধাতে হলে আরও কতকগুলি বেশী উপকরণের দরকার হয়।

সাধারণ বাঁধাইয়ে বইয়ের দু'পাশের দু'দিকে ১ ইঞ্চি ছেড়ে তিনটি বিন্দু-চিহ্ন করতে হবে। এই বিন্দু তিনটিকে সুয়া দিয়ে তিনটি ফুটো করে নিয়ে প্রথম ফুটো দিয়ে সূঁচে ভরা সুতো দিয়ে দ্বিতীয় ফুটোর মধ্য দিয়ে সোজা উপরে উঠিয়ে তৃতীয় ফুটোয় প্রবেশ করাতে হবে। পরে এই সুতোটিই ঘুরিয়ে প্রথম ফুটোর মধ্যে দিয়ে আবার উপরে উঠিয়ে নিলেই বই সেলাই হয়ে যাবে। এবার সুতোর দু'দিকে চাপ দিয়ে টেনে ডবল গিঁট দিয়ে বেঁধে সেলাইয়ের কাজ শেষ হবে। এটাই হল বই বাঁধাইয়ের আসল কাজ। ছোট অথবা পুরোনো বই বাঁধাতে গেলে সমস্ত পুরোনো সেলাই কেটে ফেলে নতুন সেলাই দিতে হবে। পাতা ছেঁড়া থাকলে অয়েল পেপার দিয়ে সাবধানে জুড়ে নিতে হবে। তারপর বইয়ের মাপ অনুযায়ী সাদা বা ব্রাউন পেপার দু'ভাঁজ করে কেটে নিয়ে বইয়ের দু'দিকে সেলাই ঘেঁষে আঠা দিয়ে বসিয়ে দিতে হবে—একে বলে 'পোস্তানী'। এইবার বইয়ের মাপে (বা দরকার হলে সামান্য একটু বড় রেখে) দু'টি পেস্ট বোর্ড কেটে নিয়ে বোর্ড দু'টির দু'দিকে আঠা মাখিয়ে বইয়ের গোড়ার দিকে খানিকটা বাদ দিয়ে (১″/২″) দু'দিকের পোস্তানীর উপর সেঁটে চাপ দিয়ে রাখতে হবে। সব শেষে বাঁধাই কাপড় বা রেক্সিন মাপমত কেটে নিয়ে আঠা মাখিয়ে বইয়ের গোড়ায় লাগিয়ে দিতে হবে, আর রঙীন মার্বেল পেপার বোর্ডের উপরে দু'দিকে লাগিয়ে চাপ দিয়ে রাখতে হবে। বাঁধানো বইটি ভালভাবে শুকিয়ে যাবার পর কাটিং মেসিনে তিনদিক কেটে নিতে হবে।

চামড়া দিয়ে বই বাঁধানোর কাজ অপেক্ষকৃত শক্ত। তবে সাধারণ বাঁধাই অভ্যাস করার পর কোনও ভালো দফ্‌তরীর কাছে দেখে নিলে তাও ছাত্র-ছাত্রীদের রপ্ত হয়ে যাবে।

ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যকর অভ্যাস

দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্য মানুষের পরম সম্পদ। এই সম্পদ মানুষের একান্ত কাম্য হলেও তাকে সর্বদা পাওয়া যায় না। স্বাস্থ্য নির্ভর করে ব্যক্তিগত সদভ্যাস এবং শরীর-চর্চার উপর। ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য সম্পর্কে মানুষ যদি অজ্ঞ বা উদাসীন হয় তা হলে স্বাস্থ্যতত্ত্বজ্ঞান ব্যর্থ হয়ে পড়ে। এইজন্যেই শারীরতত্ত্ববিদরা বলেছেন স্বাস্থ্যতত্ত্বজ্ঞানের আগে প্রয়োজন স্বাস্থ্যানুশীলনের।

[**সতর্কতা ঃ** ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যকর অভ্যাসকে প্রোজেক্ট হিসাবে গ্রহণ করা হলে ছাত্র-ছাত্রীরা স্বাস্থ্য-সম্পর্কীয় বিভিন্ন চার্ট, প্রগতি-পত্র, ছবি এবং সংশোধনী-পত্র ব্যবহার করবে। তবে মনে রাখতে হবে, সব ক্ষেত্রেই যে চার্টগুলি নির্ভুল এবং স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানসম্মত এমন নয়। তাই স্বাস্থ্যবিদরা বলেন, যে-সমস্ত চার্টের বা নজির-পত্রের কোনও নির্দিষ্ট মান নেই, যা বিজ্ঞানসম্মত নয়, সেগুলি ব্যবহার না করাই ভালো। ডাক্তার এবং বিশেষজ্ঞদের নির্দেশক্রমে নির্ভরযোগ্য চার্ট ব্যবহার করা উচিত। ছাত্র-ছাত্রীরা বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সহায়তায় সরকারী তথ্যচিত্র দেখানোর ব্যবস্থা করে বা অভিপ্রদর্শনী (demonstration), আলোচনা-চক্র ইত্যাদির আয়োজন করে স্থানীয় এলাকায় জনসাধারণের মধ্যে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যকর অভ্যাসপালনের চেতনার সঞ্চার করতে পারে। এতে **কর্মশিক্ষার কাজ ছাড়া সমাজসেবাও (Social service) হবে।**]

ব্যক্তিদেহ বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিয়ে গঠিত। ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য বলতে দেহের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের স্বাস্থ্যকেই বোঝায়, অর্থাৎ দাঁত, চোখ, কান, ত্বক, চুল সব কিছুর স্বাস্থ্যই। স্বাস্থ্যগঠনে দেহের প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেরই পরিচ্ছন্নতা দরকার। তেমনই আবার পারিপার্শ্বিকের পরিচ্ছন্নতার দিকেও বিশেষ লক্ষ্য রাখা দরকার। ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যের সঙ্গে পরিচ্ছন্নতার সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। আর **পরিচ্ছন্নতার প্রয়োজন কেবল ব্যক্তিগত ব্যাপারে নয়, অন্যান্য সকলের জন্যেও বটে। কারণ, একজনের অপরিচ্ছন্নতা আর সকলের পক্ষে ক্ষতিকর হয়ে উঠতে পারে**—বিদ্যালয়েই হোক বা অন্যত্রই হোক।

প্রত্যেক দিন খাবার পর **দাঁত** ভালোভাবে পরিষ্কার না করলে দাঁতের ফাঁকে জমা খাদ্যকণাগুলো পচে মুখে দুর্গন্ধ হয় এবং ঐ পচা অংশগুলো থেকে একরকম অ্যাসিড জন্মায় যার সংস্পর্শে এসে দাঁতের এনামেল ক্ষয় হয়ে যায় এবং দন্তক্ষতের (যাকে আমরা 'দাঁতে পোকা ধরা' বলি) সৃষ্টি হয়। ফলে দাঁত একেবারে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। দাঁত অপরিষ্কার থাকলেই দাঁতের গোড়ায় ফোঁড়া হয়, পুঁজ জমে, রক্ত পড়ে ও মুখে দুর্গন্ধ হয়। দাঁতের এই ধরনের অসুখ (পাইওরিয়া) থেকে প্রথমে যকৃৎ, পরে হৃৎপিণ্ড, বৃক্ক, চোখ প্রভৃতিও খারাপ হয়ে যায়।

ঘুম থেকে উঠেই ভালো করে দাঁত মাজা দরকার। **অনেকে পাশ্চাত্য প্রথার অন্ধ অনুকরণ করে ভোরে বিছানায় শুয়েই চা পান করে**

থাকে, এটি অত্যন্ত কু-অভ্যাস। নিম, বাবলা, আস্‌শেওড়া, বকুল প্রভৃতি ডালের দাঁতন দিয়ে কিংবা ব্রাশও টুথপেস্ট দিয়ে দাঁত মাজা উচিত। ব্রাশ উপর থেকে নীচে চালানো উচিত, ডান দিক থেকে বাঁ দিকে নয়।

চোখ মানুষের এক অমূল্য সম্পদ। যার চোখ নেই তার কিছুই নেই। কাজেই চোখের পরিচ্ছন্নতা রক্ষার জন্য সকালে ঘুম থেকে উঠে চোখের পিচুটি ইত্যাদি তুলে ঠাণ্ডা জলে ভালো করে চোখ ধুয়ে ফেলা উচিত। 'চোখ ওঠা'-জাতীয় কোনও ছোঁয়াচে রোগ হলে চোখ সম্পর্কে বিশেষ যত্ন নেওয়া দরকার। এসব ক্ষেত্রে চিকিৎসকের নির্দেশক্রমে ভালো বীজঘ্ন লোশন দিয়ে চোখ ধুয়ে ফেলতে হয়। চোখ ভালো রাখতে হলে কতকগুলি নিয়ম পালন করা দরকার। যেমন: (১) উপযুক্ত আলোতে পড়াশোনার ব্যবস্থা করতে হবে। অত্যন্ত তীব্র বা অত্যন্ত ক্ষীণ—দু'রকম আলোই চোখের পক্ষে ক্ষতিকর। (২) দিনের স্বাভাবিক স্বচ্ছ আলোই বেশী বাঞ্ছনীয় এবং মঙ্গলকর। সূর্যাস্তের পরে কোনও রকম সূক্ষ্ম কাজ (ড্রইং, সেলাই, ম্যাপ দেখা) ইত্যাদি না করাই উচিত। (৩) আলোর এমন ব্যবস্থা করতে হবে, যেন কাজের সময় আলো বাঁ দিক থেকেই আসে। (৪) বসবার ভঙ্গী এমন হওয়া দরকার, যাতে চোখ সর্বদাই মনোযোগের বস্তু থেকে অন্ততঃ ১২ ইঞ্চি দূরে থাকে। (৫) চিত হয়ে শুয়ে কখনো পড়াশোনা করতে নেই। (৬) অস্পষ্ট, অপরিচ্ছন্ন বা খুব ছোট ছোট লেখা পড়ার চেষ্টা করা উচিত নয়। (৭) চোখের অত্যন্ত পরিশ্রমের পর নীল আকাশ বা সবুজ গাছপালার দিকে তাকিয়ে থাকা ভালো। কারণ নীল ও সবুজ রং চোখের ক্লান্তি দূর করে।

কান আমাদের আর এক সম্পদ, কারণ কান 'থেকেও না থাকলে' আমরা অনেক কিছু শোনার সুখ থেকে বঞ্চিত হই। শ্রবণশক্তি স্বাভাবিক রাখতে হলে নিয়মিতভাবে কানের যত্ন করা উচিত। যেমন: (১) স্নান করার আগে কানের বাইরের দিকের সুড়ঙ্গপথে তেল দিয়ে পথটিকে পরিষ্কার ও মসৃণ রাখা দরকার। (২) অত্যন্ত কর্কশ বা জোরালো আওয়াজ এড়ানো উচিত। (৩) সর্দি হলে কখনও জোরে নাক ঝাড়তে নেই। (৪) কান ব্যথা, কান থেকে পুঁজ পড়া, কান পাকা ইত্যাদি কানের কোনও রকম অসুবিধা দেখা দিলেই ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া উচিত। (৫) কান সর্বদাই পরিষ্কার রাখতে হবে। কানের মধ্যে 'খোল' জমে কঠিন হয়ে গেলে একটি তুলিতে সামান্য তেল বা গ্লিসারিন বা সোডি-বাই-কার্বনেট লোশনের সাহায্যে তাকে গলিয়ে বার করে ফেলতে হবে। পেন্সিল,

কাঠি, পিন ইত্যাদি দ্বারা কখনোই কান খোঁচানো উচিত নয়। (৬) নদী, সমুদ্র বা পুকুরে স্নানের সময় কানে তেলে ভেজানো তুলো রাখা উচিত, কিন্তু লক্ষ্য রাখতে হবে সেটা যেন বেশী ভিতরে চলে না যায়।

নাক ও মুখগহ্বর ঃ নাকের ফুটোয় তেল ঢুকিয়ে বা একটু গরম লবণ-জলের নাস নিয়ে নাসাপথ সর্বদাই মসৃণ ও পরিষ্কার রাখা দরকার। নাকে শ্লেষ্মা জমলে নাক ঝেড়ে পরিষ্কার করে ফেলতে হয়। সর্বদা নাক খোঁটা, অতিরিক্ত নস্য টানা, নাকের ফুটোয় জমা বাইরের ময়লা ও আবর্জনাদি পরিষ্কার না করা, সর্দির সময়ে মুখ দিয়ে নাক থেকে শ্লেষ্মা টেনে নিয়ে তা গিলে ফেলা প্রভৃতি অভ্যাস স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক।

চুলের গোড়া সতেজ ও সুস্থ রেখে চুলের সৌন্দর্য বজায় রাখতে হলে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ নিয়ম পালন করা দরকার ঃ (১) চিরুণী ও ব্রাশের সাহায্যে চুল পরিষ্কার করা, (২) চুলে তেল ব্যবহার, (৩) স্নানের দ্বারা চুল পরিষ্কার করা, (৪) চুলের যত্ন, (৫) চুল ও দেহের পুষ্টির জন্যে উপযুক্ত খাদ্যগ্রহণ। লক্ষ্য রাখতে হবে চিরুণীর দাঁতগুলি যেন অসম্ভব রকমের ধারালো না হয়।

ত্বককে সুস্থ রাখতে হলে প্রথমে তার পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে বিশেষ নজর দিতে হবে। নিয়মিত স্নান করা, গা মাজা প্রভৃতির সাহায্যে দেহচর্মকে পরিচ্ছন্ন রাখতে হয়। প্রতি দিন স্নান করার আগে শরীরে ভালো করে তেল মেখে স্নান করার সময় গামছার সাহায্যে সেই তেল তুলে ফেললে তেলের সঙ্গে দেহচর্মের ময়লাও বেরিয়ে আসে। স্নান করার সময় বেশ ভালো করে গা রগড়ে স্নান করা উচিত। শরীরের যে-সব জায়গায় ঘাম জমে দুর্গন্ধ হয় সেই সব জায়গাগুলিকে ভালোভাবে পরিষ্কার করা দরকার। প্রত্যেক দিন সাবান ব্যবহার করলে দেহত্বক রুক্ষ ও খসখসে হয়ে যায়, এজন্যে সাবান ব্যবহার করার পর তেল বা ক্রীম ব্যবহার করলে দেহচর্ম মসৃণ থাকে।

নখ বড় হলেই কেটে ফেলা উচিত। নখের ভিতরে যাতে কোনও রকম ময়লা বা দূষিত পদার্থ না থাকে সেদিকে নজর রাখা প্রত্যেকেরই একান্ত কর্তব্য। দাঁত দিয়ে নখ কাটা অত্যন্ত খারাপ অভ্যাস, কারণ এর ফলে নখের ময়লা বা কুচি পেটের ভিতর চলে যেতে পারে—যে কোনওটিতেই পেটের গোলযোগ ও পেটের অসুখের সম্ভাবনা থাকে।

পরিধেয় পোশাকের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাও দরকার।

স্বাস্থ্যকর অভ্যাস গঠনের সাধারণ কার্যসূচী

১। ধীরে ধীরে ভালো করে চিবিয়ে পুষ্টিকর খাদ্য খাওয়া।

২। প্রতিদিন ভালো করে গা রগড়ে স্নান করা।

৩। হাত ময়লা হলেই সাবান দিয়ে ধোওয়া, বিশেষতঃ খাওয়ার আগে এবং প্রসাধনের আগে।

৪। রোজ দিনে এবং রাতে খাওয়ার পর ব্রাশ বা দাঁতন দিয়ে ভালো করে দাঁত মাজা।

৫। নখ, চুল ও ত্বক পরিষ্কার রাখা।

৬। চোখ, নাক, কান ও গলার যত্ন নেওয়া এবং দুর্ঘটনা থেকে তাদের রক্ষা করা।

৭। কু-অভ্যাস ত্যাগ করা।

৮। দরজা-জানালা খুলে অনেকক্ষণ ঘুমানো।

৯। খোলা জায়গায় রোজ ব্যায়াম করা।

১০। ধুলো, মাছি ইত্যাদি থেকে খাদ্যবস্তু রক্ষা করা।

১১। ঘা, কাটা, ক্ষত, ফোঁড়া এবং চোটলাগা স্থানের যত্ন নেওয়া।

১২। প্রত্যেকের জন্যে নিজের আলাদা, চিরুণী, ব্রাশ, গামছা বা তোয়ালে এবং জলের গ্লাস থাকা দরকার।

খাদ্য পরিকল্পনা ও সুষম খাদ্য

(Planning of Diet : Balanced Diet)

খাদ্য দেহে তাপ ও শক্তি যোগায়, দেহ গঠনে ও মেরামতে সাহায্য করে। আবার এই খাদ্যই আভ্যন্তরীণ শারীরিক ক্রিয়াগুলি নিয়ন্ত্রণ করে আমাদের সতেজ ও কর্মঠ রাখে। পৃথিবীতে যতরকম খাদ্যদ্রব্য আছে সেগুলিকে বিশ্লেষণ করলে কেবল ৬টি রাসায়নিক উপাদান পাওয়া যায়—প্রোটিন (বা আমিষ), কার্বোহাইড্রেট (বা শ্বেতসার), স্নেহ, ধাতব লবণ, জল ও খাদ্যপ্রাণ (ভিটামিন)। এইসব বিভিন্ন খাদ্য-উপাদান দেহের উপর বিভিন্ন রকমের কাজ করে থাকে। পরের পাতার তালিকা থেকেই তা বোঝা যাবে :

খাদ্য-উপাদানের কার্যকারিতা ও গুণাগুণের দিকে লক্ষ্য রেখেই খাদ্যবস্তু নির্বাচন বা খাদ্য পরিকল্পনা করতে হয়। খাদ্য রচনায় বিশেষভাবে নজর রাখতে

হবে যাতে দেহগঠনের প্রয়োজনীয় খাদ্য উপাদানগুলির প্রত্যেকটি উপযুক্ত পরিমাণে দৈনিক আহার্য-তালিকায় বর্তমান থাকে। **সুষম খাদ্য** তালিকায়

খাদ্য উপাদান	কাজ		
	তাপ ও কর্মশক্তি যোগানো	দেহগঠন ও পোষণ	আভ্যন্তরীণ দেহ-ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ
কার্বোহাইড্রেট	✓		
স্নেহ	✓	✓	
প্রোটিন	✓	✓	✓
ধাতব লবণ		✓	✓
খাদ্যপ্রাণ			✓
জল			✓

প্রমাণ খাদ্য ও যথোপযুক্ত খাদ্যের প্রত্যেকটিই থাকা চাই। অন্যভাবে বলা যায় যে, মৌলিক সাতটি খাদ্য অতি অবশ্যই এই তালিকায় থাকবে। যেমন: (১) সবুজ ও পীত বর্ণের শাক-সব্জী: এই শ্রেণীর খাদ্য ভিটামিন 'এ'র অভাব পূরণ করে। এ ছাড়া এগুলিতে ভিটামিন 'সি'-ও কিছু পরিমাণে পাওয়া যায়। (২) লেবুজাতীয় ফল, যেমন কমলালেবু, কাগ্‌জী বা পাতিলেবু, টম্যাটো এগুলি খাদ্যে ভিটামিন 'সি'র অভাব পূরণ করে। এইগুলিতে ভিটামিন 'এ'-ও কিছু পরিমাণে থাকে। (৩) অন্যান্য ফল ও কন্দজাতীয় তরিতরকারি—ফলের ভিতরে আম, কাঁঠাল, কলা, পেঁপে, আঙ্গুর, বেদানা, আনারস, ন্যাসপাতি ; আর তরি-তরকারির ভিতর লাউ, ঢেঁড়স, সজনে, মুলো, পেঁয়াজ, আলু, শালগম প্রভৃতি এই খাদ্যের পর্যায়ে পড়ে। এই শ্রেণীর খাদ্য দ্বারা কোনও একটি ভিটামিনের অভাব পূর্ণ হয় না, বিভিন্ন প্রকার ভিটামিন ও ধাতব লবণের অভাব পূরণ করাই এইজাতীয় খাদ্যের প্রধান কাজ। (৪) দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত খাদ্য—দুধ ও দুধ থেকে তৈরী নানারকম খাদ্য আমাদের অস্থি গঠনের কাজ করে থাকে। এদের মধ্যে প্রোটিন ও ধাতব লবণ প্রচুর পরিমাণে থাকে। (৫) মাছ, মাংস, ডিম প্রভৃতি প্রাণিজ প্রোটিন আমিষ প্রোটিনের অন্তর্গত। এইজাতীয় খাদ্যের প্রধান কাজ হল দেহ গঠন করা। (৬) শস্যকণা, চাল-ডাল ও তজ্জাত খাদ্য—দেহে কার্বোহাইড্রেট যোগানোই চাল, ডাল প্রভৃতি শস্যকণার প্রধান কাজ। এই কার্বোহাইড্রেট থেকেই দেহে তাপ উৎপন্ন হয়। (৭) স্নেহজাতীয় ও

শর্করাজাতীয় খাদ্য—বিশেষভাবে দেহে তাপ উৎপাদন এই শ্রেণীর খাদ্যের প্রধান কাজ। ঘি, তেল, বনস্পতি প্রভৃতি স্নেহজাতীয় খাদ্য।

মানুষের খাদ্য-তালিকায় এই মূল সাতটি বিভাগ থাকা একান্তই প্রয়োজন। দেহের পুষ্টি, গঠন ও বৃদ্ধি খাদ্যের এই মূল সাতটি বিভাগের খাদ্যের উপরেই নির্ভর করে।
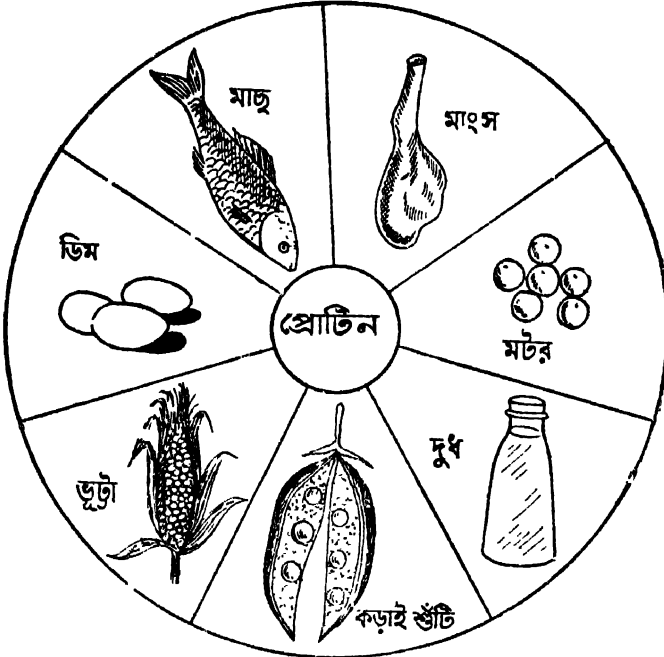
প্রোটিনজাতীয় খাদ্য (ছাত্র-ছাত্রীরা নিজেরাই এরকম চার্ট তৈরী করতে পারে)

খাদ্য পরিকল্পনা সঠিকভাবে করতে হলে কোন্ কোন্ খাদ্যদ্রব্যে কী কী উপাদান আছে এবং সেই সব উপাদান রোজ কতটা আমাদের গ্রহণ করা উচিত তা জানতে হবে। খাদ্যের পরিমাণ সকলের ক্ষেত্রে সমান হতে পারে না। বয়স এবং কাজ অনুযায়ী খাদ্যের পরিমাণের তারতম্য ঘটে। যারা কোনও কাজ করে না তাদের খাদ্যে প্রোটিনের পরিমাণ ৩ আউন্স, স্নেহজাতীয় উপাদান ১½ আউন্স এবং শ্বেতসার জাতীয় উপাদান ১২ আউন্স হলেই চলে। যারা সাধারণ রকমের পরিশ্রমী, তাদের খাদ্যে প্রোটিন ৫ আউন্স, স্নেহ ৩ আউন্স এবং শ্বেতসার ১৫ আউন্স থাকা চাই। কঠিন পরিশ্রমীদের পক্ষে প্রোটিন ৬-৭ আউন্স, স্নেহ

৩½-৪½ আউন্স এবং শ্বেতসার ১৬-১৮ আউন্স পরিমাণ না হলে চলে না। খাদ্য-রচনার ক্ষেত্রে পরিমাণ সম্পর্কে এই মূল নীতিটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং সর্বদাই মেনে চলা উচিত।

অবশ্য শেষ পর্যন্ত যথাযথভাবে খাদ্য ব্যবস্থা করা নির্ভর করে আর্থিক সঙ্গতির উপর। যাই হোক, বুদ্ধি খাটিয়ে খাদ্যতালিকা তৈরী করতে পারলে অপেক্ষাকৃত কম খরচেও **সুষম খাদ্যতালিকা** রচনা করা যেতে পারে। সুষম খাদ্যতালিকা রচনা করতে হলে খাদ্যের তিনটি প্রধান উপাদানের ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন, অর্থাৎ প্রোটিন, স্নেহ ও কার্বোহাইড্রেট খাদ্যতালিকায় থাকতেই হবে। এদের ক্রয়মূল্য, দৈনিক প্রয়োজনীয়তা এবং দৈনিক সর্বনিম্ন প্রয়োজনীয় পরিমাণ—সব কিছু ভালোভাবে জেনেই খাদ্যতালিকার পরিকল্পনা করতে হয়। (১) কার্বোহাইড্রেট দামে অপেক্ষাকৃত সস্তা। ১ গ্রাম কার্বোহাইড্রেট দেহে ৪ ক্যালোরি উৎপাদন করে। (এক কিলোগ্রাম জলকে ১° সেন্টিগ্রেড তাপে তুলতে যে-পরিমাণ তাপ দরকার হয়, সেই পরিমাণ তাপকে এক ক্যালোরি বলে। এক্ষেত্রে, যে-পরিমাণ খাদ্য দেহে এই পরিমাণ তাপ উৎপাদন করে তার তাপমূল্য এক ক্যালোরি।) (২) এক গ্রাম স্নেহজাতীয় পদার্থ থেকে ৯ ক্যালোরি পাওয়া যায়। (৩) এক গ্রাম প্রোটিন ৪ ক্যালোরি তৈরী করে। কিন্তু স্নেহ-পদার্থ ও প্রোটিন উভয়েরই দাম খুব বেশী।

একজন স্বাভাবিক পরিশ্রমী লোকের পক্ষে দৈনিক প্রায় ৩,০০০ ক্যালোরি বা তাপমূল্যের প্রয়োজন হয়।

কোনও পরিবারের জন্যে অল্প খরচে সুষম, পরিমিত ও পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থা করতে হলে দেখে নিতে হবে সেই পরিবারে রোজ কতখানি তাপমূল্যের খাদ্যের দরকার এবং পরিবারে ক'জন পুরুষ, স্ত্রী ও শিশু আছে ও তাদের বয়স কত।

অভাবের সংসারেও বদলী খাদ্যের ব্যবস্থা করে বা বারের ব্যতিক্রম ঘটিয়ে, যেমন করেই হোক, এমনভাবে খাদ্য ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে খাদ্যের তাপমূল্য বিভিন্ন বয়সের প্রয়োজনীয় ক্যালোরির নীচে না যায়।

বিভিন্ন দিক থেকে বিবেচনা করে একটি সুস্থ, কর্মক্ষম, পূর্ণবয়স্ক লোকের জন্যে পরের পাতার খাদ্যতালিকাটি তৈরী করা হয়েছে। মাংসের দাম অত্যধিক বলে (এবং ভারতবর্ষ গরমের দেশ বলেও) তালিকাটি থেকে মাংস বাদ দেওয়া হয়েছে।

খাদ্য উপাদান	খাদ্যদ্রব্য	দৈনিক পরিমাণ	ক্যালোরি মূল্য
কার্বোহাইড্রেট	চাল	২৩০ গ্রাম	৮৭৬
	আটা	১৯০ ,,	৫৯৪
উৎকৃষ্ট প্রোটিন	মাছ	১৩০ ,,	১০০
	দুধ	৩৪০ ,,	২১০
প্রোটিন (উৎকৃষ্ট নয়)	ডাল	১৩০ ,,	৪০০
স্নেহ পদার্থ	তেল ও ঘি	৮৫ ,,	৭৮৩
ভিটামিন ও খনিজ লবণ	ফল ও শাক-সব্জী	১৯০ ,,	১৬৯
জল		১½ লিটার	৩,১৩২

সংক্রামক ব্যাধি নিবারণের উপায়

সংক্রামক ব্যাধি নিবারণের উপায়কে প্রোজেক্ট হিসাবে গ্রহণ করার অর্থ হল এই উপায়গুলি অবলম্বনের সুফল ও অবলম্বন না করার কুফল সম্পর্কে বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের ও বিদ্যালয়ের বাইরে অন্যান্য জায়গায় জনসাধারণকে সচেতন করে তোলা। সুতরাং আমরা ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যকর অভ্যাস সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে যা বলেছি এখানে তারই পুনরাবৃত্তি করছি, অর্থাৎ চলচ্চিত্র, কথিকা, আলোচনাচিত্র, চিত্র-প্রদর্শনী, ম্যাজিক লন্ঠন, প্রদর্শনী, অভিপ্রদর্শন ইত্যাদির মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীরা এই কাজ করতে পারে।

বলা বাহুল্য, জনসাধারণকে কিছু বোঝাবার আগে কোনও বিষয় সম্পর্কে নিজেরা ওয়াকিবহাল হওয়া দরকার।

রোগ সংক্রামিত হয় জীবাণুর সাহায্যে। সাধারণতঃ নিঃশ্বাসের সঙ্গে, আহার্য ও পানীয়ের মাধ্যমে এবং ত্বকের সাহায্যে সংক্রামক ব্যাধির জীবাণু মানুষের দেহে প্রবেশ করে। জীবাণুগুলি এত ক্ষুদ্র এবং হাল্কা যে, জলীয় বাষ্প, বায়ু বা অন্য কোনও মাধ্যম ছাড়া এরা জীবদেহে ঢুকতে পারে না।

জীবাণুর বিস্তৃতি সর্বব্যাপী। তার বিলোপসাধন একরকম অসম্ভব। সুতরাং আমাদের ভাবতে হবে কেমন করে তাদের এড়িয়ে চলা যায়। দেহ নীরোগ ও শক্তিশালী হলে তার রোগ-প্রতিষেধক শক্তি বৃদ্ধি পায়। প্রথমে আমাদের

সেই প্রচেষ্টাই করতে হবে। জীবাণুর অনুকূল ক্ষেত্র ও পরিবেশের সংস্কার করতে পারলে অনেক সংক্রামক ব্যাধির আক্রমণ থেকে রেহাই পাওয়া যায়। কৃত্রিম প্রতিষেধক ব্যবস্থা অবলম্বনের দ্বারাও (যেমন—টীকা-দেওয়া, পরিবেশ পরিশুদ্ধ করবার ঔষধপত্রাদির ব্যবস্থা) সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপ কমানো যায়। বনজঙ্গলের সংস্কারের ফলে গ্রামে গ্রামে ম্যালেরিয়া ব্যাধির সেই ভয়াবহ প্রকোপ এখন আর নেই।

সংক্রামক ব্যাধির প্রসার ঃ মানুষের দ্বারাই সংক্রামক ব্যাধি বেশী বিস্তার লাভ করে। এক্ষেত্রে অবশ্য জীবাণুগুলি আক্রান্ত ব্যক্তিদের হাঁচি, কাশি, কথা বা নিঃশ্বাসের সঙ্গে বেরিয়ে এসে চারপাশের বায়ুকে দূষিত করে (উদাহরণ ঃ ক্ষয়কাশ, ইনফ্লুয়েঞ্জা, ডিপথিরিয়া, হাম, বসন্ত)। এছাড়া **গৃহপালিত প্রাণী ও জীবজন্তুর দ্বারা** (গোরু থেকে ক্ষয়রোগ), **কীটপতঙ্গাদির দ্বারা** (যেমন, মশা থেকে ম্যালেরিয়া, মাছি থেকে কলেরা, টাইফয়েড, উদরাময়, স্যাণ্ডফ্লাই দ্বারা প্লেগ ও কালাজ্বর), **ধূলিকণার দ্বারা, দূষিত খাদ্য ও পানীয়ের দ্বারা** (যেমন, আমাশয়, টাইফয়েড, কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদের ব্যবহৃত, মলযুক্ত কাপড়-চোপড় ইত্যাদি পুকুরে কাচা হয়, আবার সেই পুকুরের জলই সব লোক পান করে)।

পুকুরের জল অনেক ভাবেই দূষিত হয়ে থাকে

সংক্রামক ব্যাধি নিবারণের দায়িত্ব দু'রকমের—ব্যক্তিগত ও সামাজিক। সর্বক্ষেত্রেই ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা মুখ্য, সামাজিক প্রচেষ্টা তুলনায় গৌণ। ব্যাধির সংক্রমণ বন্ধ করার প্রথম উপায় হচ্ছে **পৃথকীকরণ করা**—অর্থাৎ রোগীকে

আলাদা ঘরে রাখা বা হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করা। দ্বিতীয়তঃ **প্রতিষেধক ব্যবস্থা অবলম্বন**, যেমন টীকা নেওয়া ইত্যাদি। তৃতীয় উপায় হল রোগীর ব্যবহৃত বস্ত্র ও সরঞ্জামাদি গরম জলে ফুটিয়ে নেওয়া অথবা রাসায়নিক **নির্বীজন** করা। এসব ক্ষেত্রে রোগীর ব্যক্তিগত কর্তব্যবোধ ও সতর্কতার গুণেই রোগের সংক্রমণ বন্ধ হ'তে পারে, অন্যভাবে তা সম্ভবপর নয়।

দেহে রোগের জীবাণু সংক্রমণ হলেই রোগ অনুসারে বিভিন্ন প্রকারের লক্ষণ-গুলি প্রকাশ পেতে থাকে। ছাত্রছাত্রীদের উচিত এই লক্ষণগুলি এবং রোগের বিশেষ চিহ্নগুলি ভালোভাবে জেনে রাখা। লক্ষণ দেখে রোগ সম্বন্ধে একটা আন্দাজ করা চলে কিন্তু স্থিরনিশ্চয় হওয়া যায় মাত্র রোগের বিশেষ চিহ্নগুলি দেখলেই।

পৃথকীকরণ বা স্বতন্ত্রীকরণ অর্থে শুধু রোগীকেই আলাদা করা বোঝায় না, রোগীর বিছানা-পত্র, বাসন-কোশন, জামাকাপড় ইত্যাদি সমস্ত কিছু আলাদা করা বুঝায়, বিশেষ সংক্রামক ব্যাধির ক্ষেত্রে শুশ্রূষাকারিণী ছাড়া আর কেউ রোগীর ঘরে প্রবেশ করতে পারবে না, এবং শুশ্রূষাকারিণীও যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করবে।

কোনও ব্যাধি যখন ব্যাপক আকারে দেখা দেয় তখন এইরকম ব্যক্তিগত স্বতন্ত্রীকরণ ব্যবস্থায় কোনও কাজই হয় না। তখন বিশেষ বিজ্ঞপ্তির সাহায্যে সমগ্র এলাকাটাকেই আলাদা করে রাখতে হয়। এইসব ক্ষেত্রে সমগ্র অঞ্চলটিকেই নিষিদ্ধ অঞ্চল বলে ঘোষণা করা হয়। যেমন যখন কোনও গ্রামে কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি মহামারী দেখা দেয় তখন ঐ গ্রামের সীমান্ত অঞ্চলে **"এই গ্রামে প্রবেশ নিষেধ"** এই কথা বড় বড় অক্ষরে লিখে পার্শ্ববর্তী গ্রামের লোকদের সাবধান করে দেওয়া হয়।

রোগবিস্তার প্রতিরোধের জন্যে স্বতন্ত্রীকরণ ও বিজ্ঞপ্তিজ্ঞাপনই সব নয়। জনসাধারণকে রোগের ভয়াবহতা সম্বন্ধে সচেতন করে প্রতিষেধক টীকা ইত্যাদির সাহায্যে রোগ-প্রতিরোধের চেষ্টা করতে হয়। আগেই বলা হয়েছে অশিক্ষিত ও রোগ সম্পর্কে অজ্ঞ বা উদাসীন ব্যক্তিদের কাছে মৌখিক বক্তৃতা, ম্যাজিক লণ্ঠনের সাহায্যে বক্তৃতা ইত্যাদির দ্বারা রোগেব গুরুত্ব বুঝিয়ে দিতে হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপকভাবে প্রতিষেধক ইন্‌জেক্‌শন বা টীকা দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। **ছাত্র-ছাত্রীদের উচিত টীকা এবং ইন্‌জেক্‌শন দেবার সঠিক ও স্বাস্থ্যসম্মত পদ্ধতি শিখে রাখা।** এ ব্যাপারে নিশ্চয়ই স্বাস্থ্য-বিভাগের

স্থানীয় শাখা তাদের সানন্দে ও সাগ্রহে সাহায্য করবেন। এছাড়া ঘরে এবং অন্যান্য জিনিসপত্র বিশোধন বা নির্বীজনের পদ্ধতিও তাদের হাতে-কলমে আয়ত্ত করতে হবে।

সেলাই ও কাটিং

জামা সেলাই করতে ও কাটতে হলে কতকগুলি জিনিসের দরকার হয়—আঙ্গুস্তান (অঙ্গুলিত্রাণ), সূঁচ ও সুতো, একটা সমকোণবিশিষ্ট ইঞ্চির দাগ দেওয়া কাঠের স্কোয়ার, একখানা একগজ লম্বা বা কিছু ছোট পাতলা কাঠ, একখানা ষাট ইঞ্চি লম্বা ইঞ্চি-ফিতা, একখানা কাঁচি, আঁকবার জন্যে ত্রিভুজাকৃতি রঙ্গীন টেলার্স ক্রেয়ন (অভাবে রঙীন পেন্সিলও চলতে পারে), ছাত্র-ছাত্রীদের আঁকা অভ্যাসের জন্যে কালো মিল্টন এক গজ।

সেলাই অনেক রকমের আছে ঃ—খিল্‌নি বা কাঁচা সেলাই, দরাজ, পাকা বা বকেয়া, তুর্পাই বা মোড়াই সেলাই, বোতামের ঘর। **খিল্‌নি সেলাই** দু'খণ্ড কাপড়ের কিনারা আধ ইঞ্চি ছোট-বড় করে এমনভাবে একত্র করতে হবে যে নীচের অংশ বড় থাকে। উপরের অংশের কিনারা থেকে ⅛ ইঞ্চি-পরিমাণ ভিতরে দু'খানা কাপড়ে একসঙ্গে ⅛ ইঞ্চি অন্তর সুতোসংযুক্ত সূঁচের ফোঁড় উঠিয়ে সেলাই শেষ করতে হবে। কিনারার অংশ বাঁ হাতে ধরে সেলাই করতে হয়, কাপড়ের বেশী অংশটা থাকে ডানদিকে। **দরাজ**—খিল্‌নি দিয়ে কাপড়খণ্ড দুটো জোড়া দেওয়া হলে ডানদিকের বড় অংশ দুটো দু'দিকে খুলে পেতে রেখে সেলাইয়ের বাইরে যে ছোট অংশ আছে সেটা মুড়ে চ্যাপ্টা করে পটি সেলাই করতে হবে। এই দু'খণ্ড কাপড়ের জোড়া জায়গায় যে পটি হয় তাকে দর্জির ভাষায় 'দরাজ' বলে। **পাকা বা বকেয়া সেলাই**—দরাজের দু'ধারে পাকা বা বকেয়া সেলাই করতে হয়। এই সেলাই ঠিক কলের সেলাইয়ের মত ছোট এবং খুব কাছাকাছি করতে হয়। পোশাকের যেদিক বাইরে থাকে সেইদিকে ('সদরে' বা 'রোখে') বকেয়া সেলাই করতে হয়। সূঁচের ফোঁড় উঠিয়ে ঐ ফোঁড়ের পিছনে আন্দাজমত সরে সূঁচের ফোঁড় দিতে হবে এবং যতদূর পিছনে সরে সূঁচের ফোঁড় দেওয়া হয়েছিল ঠিক ততদূর সামনে এগিয়ে ফোঁড় তুলতে হয়। এইভাবে ক্রমে ক্রমে সেলাই করে এগুতে হবে, তবে বকেয়া বা পাকা সেলাই হবে। **তুর্পাই বা মোড়াই সেলাই**—কাপড় বা জামার ধারগুলো মুড়ে বা পাকা সেলাই করে দিতে হয়, তাকে তুর্পাই সেলাই বলে।

তুর্পাই সেলাই কলেও হয়, আবার হাতেও করা যায়। হাতের সেলাই দেখতে সুন্দর হয়। এই সেলাই পোশাকের ভিতরের দিকে করতে হয়। মোড়াইয়ের ঠিক ধারে ধারে খুব ছোট ছোট ফোঁড় তুলে সেলাই করলে তুর্পাই সেলাই হয়। **বোতামের ঘর সেলাই**—বোতামঘরগুলির ধার সুতো দিয়ে খুব ভালো ও শক্ত করে মোড়াই করে সেলাই করতে হয়। বোতামঘর তৈরীর সুতো সেলাইয়ের সুতোর দ্বিগুণ মোটা হওয়া চাই। বোতামঘরের চিহ্নিত জায়গায় প্রথমে ফোঁড় তুলে ক্রমে ক্রমে চারদিক ঘুরিয়ে সেলাই শেষ করতে হয়। প্রথমে একটা ফোঁড় উঠিয়ে সূঁচে লাগানো সুতোটা সূঁচের মাথায় জড়িয়ে দিতে হবে এবং সূঁচটা সম্পূর্ণ তুলে টেনে নিতে হবে। এতে দেখা যাবে যে, বোতামঘরের ধারে একটা গিঁট বা গেরো পড়ল। এভাবে খুব কাছাকাছি সব ফোঁড় সমানভাবে তুলতে হবে, যেন গর্তের ধারগুলি বেশ মোড়া হয়ে যায় এবং যেখানে শেষ হবে সেখানে দু'ধার একসঙ্গে করে ৫।৭ বার ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে শক্ত করে গিঁট দিয়ে সেলাই শেষ করে সুতো কেটে ফেলতে হবে।

এই কয়েকরকমের সেলাই জানা থাকলেই জামা তৈরী করতে পারা যাবে। অবশ্য প্রথমে ছোট ছোট টুকরো কাপড়ে খিল্‌নি, দরাজ, বকেয়া, তুর্পাই ও বোতামের ঘর সেলাই অভ্যাস করতে হবে। শেখার সুবিধার জন্যে প্রথমে পাঞ্জাবি, ঢিলে সেমিজ, মেয়েদের ব্লাউজ, শিশুর বেনিয়ান, ইজের ও মেয়েদের ফ্রক ইত্যাদি সহজ জামাগুলি শিখতে হবে। এক-একটা জামা আলাদাভাবে শিখলে শেখার সুবিধা হবে। যে জামাটা ছাত্র-ছাত্রীরা শিখতে চাইবে সেইরকম একটা তৈরী জামার সবদিক বিশেষভাবে দেখে নিয়ে, পরে কোনও সেলাই ও কাটিং-এর বইতে তার ছবি ও অন্যান্য বিবরণ ভালোভাবে দেখে নিয়ে বইয়ের নির্দেশমত শরীরের মাপ নিতে হবে। মাপমত মিন্টন্ কাপড়ের উপর মাপের ফিতা ও স্কোয়ারের সাহায্যে চক দিয়ে আঁকা অভ্যাস করতে হবে।

কাটবার সময়ে বইয়ের নির্দেশমত কাগজের উপর জামাটি মাপমত এঁকে কাটতে হবে, কাটা কাগজটা কাপড়ের উপর পেতে দাগ দিতে হবে এবং দাগের বাইরে দাবাট রেখে কেটে নিতে হবে। এইভাবে কাটলে কাপড় নষ্ট এবং ড্রইং খারাপ হবার ভয় থাকে না।

রন্ধনবিদ্যা

রান্না রীতিমত শিক্ষা ও অভ্যাস-সাপেক্ষ। 'ওর হাতের রান্না খুব ভালো'—এই প্রশংসা শুনতে কোন্ মেয়ে না চায়?

ঠিক কবে রান্না করে খাওয়ার প্রচলন সুরু হয়ে গেছে তা বলা শক্ত। তবে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে এ প্রথা চালু হয়েছে। যে মানুষ একদিন কাঁচা মাংস খেয়ে জীবনধারণ করতো সে একদিন মুখ বদল করে দেখল মাংস পুড়িয়ে খেয়ে, তারপর অভিজ্ঞতা থেকে জল ও আগুন দিয়ে তাকে সিদ্ধ করে নেওয়ার কায়দাও শিখেছে এবং এই সিদ্ধ করার জন্যে উপযুক্ত পাত্র প্রস্তুতের প্রণালীও তাকে শিখে নিতে হয়েছে—এইভাবেই আবিষ্কৃত হয়েছে প্রথমে মাটির ও পরে নানা রকম ধাতব পাত্র।
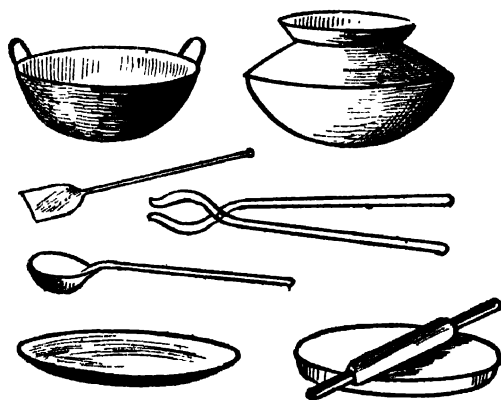
রান্নাঘরের কয়েকটি সরঞ্জাম

গোড়াতেই বলেছি, **রান্নার কাজ অনায়াসসাধ্য নয়।** রান্না হল কয়েকটি বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্যের পরিমাণমত সমন্বয় এবং এই সমন্বয়কে উপযুক্ত পরিমাণ তেল, মশলা, লবণ, জল ও জ্বাল দিয়ে সুস্বাদু করা। তাহলে খাদ্যকে সুবাসযুক্ত, সুস্বাদু, রুচিকর ও সহজপাচ্য করাই রান্নার সার কথা। সুতরাং ভোজ্যকে উপাদেয় করা যে শিক্ষাসাপেক্ষ তাতে সন্দেহ নেই—রান্নার 'রসায়ন' সম্পর্কে জ্ঞান থাকাও দরকার। এবং বলা বাহুল্য, **বই পড়ে রান্না শেখা যায় না—হাতে-কলমে শিখতে হয়।** রান্না করতে করতেই হাত পাকে। লবণ, জল বা মশলা ইত্যাদি উপকরণের যে কোনও একটার আধিক্য বা স্বল্পতা ঘটলেই রান্না 'মাটি' হয়ে যাবে। কাজেই পরিমাণ-জ্ঞান থাকা দরকার। যে রাঁধবে তার লক্ষ্য হবে অল্প তেল, মশলা দিয়ে—পরিমিত উপকরণ দিয়ে, যাতে অপচয় না ঘটে সেদিকে লক্ষ্য রেখে—রান্নার কাজ সম্পন্ন করা। এ ছাড়া মনে রাখা দরকার রান্নার ব্যাপারে খাদ্যবস্তুর নির্বাচনই প্রধান কথা। যে বা যারা

যাঁবে তাদের রুচি, প্রকৃতি ও সর্বোপরি তাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল খাদ্য নির্বাচনই রাঁধিয়ের প্রধান কাজ।

রান্না সাধারণতঃ চার রকমের—সিদ্ধ, ভাপে সিদ্ধ, ভাজা ও ঝলসানো। এর মধ্যে দ্বিতীয় প্রক্রিয়া অর্থাৎ ভাপে সিদ্ধ করাই সব চেয়ে ভালো এবং কম পরিশ্রমসাপেক্ষ। এর প্রধান সুবিধা এই যে, এই প্রক্রিয়ায় ভিটামিনের অংশ সবচেয়ে কম নষ্ট হয়।

রান্না করার অথবা রান্নাঘর, উনুন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় তৈজসপত্র সম্পর্কে আগে সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার। প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জাম, তৈজসপত্র, মাল-মশলা সব সময় পরিষ্কার অবস্থায় ও ঢেকে রাখা দরকার। ভাঁড়ারঘরের অবস্থান রান্নাঘরের পাশেই হওয়া দরকার।

উনুনের অব্যবস্থায় ও প্রয়োজনীয় জ্বালানীর অভাবে অনেক সময় দুর্ভোগ হতে পারে। উনুন এমনভাবে তৈরী করা দরকার যাতে পাচ্য বস্তু সব জায়গায় সমান জ্বাল পায়। কয়লার উনুন ছাড়া কাঠের উনুন, ইলেকট্রিক বা গ্যাসের উনুন, স্টোভ, ইকমিক বা প্রেসার কুকারের ব্যবহারও দেখতে পাওয়া যায়।

বাসন-কোসন সম্পর্কেও দু'একটি কথা জেনে রাখা ভালো। অ্যালু-মিনিয়াম, এনামেল, লোহা মাটি, কাঁসা-পিতল, স্টেনলেস স্টীল. ইত্যাদি সব কিছুরই বাসন-কোসন ব্যবহার করা হয়ে থাকে; তবে আমাদের মনে হয় হাল্কা, অল্প চেষ্টায় পরিষ্কার রাখা যায় এবং সহজে ভাঙে না, এই রকম পাত্র কেনা উচিত। অবশ্য মাঝে মাঝে চীনামাটির পাত্র ও কাচের পাত্রও ব্যবহার করতে হয়।

রান্নায় বিভিন্ন **মশলা** বাটা এবং গুঁড়ো ব্যবহার করা হয়—হলুদ, লঙ্কা, ধনে, পিঁয়াজ, আদা, জিরা, গোলমরিচ, কালোজিরা, সর্ষে, তিল, তেজপাতা, মেথি, মৌরী, দারুচিনি, রাঁধুণী, লবঙ্গ, এলাচ (ছোট ও বড়), জাফরাণ, হিং, সা-মরিচ, জৈত্রী, জায়ফল, আম-আদা ইত্যাদি। তবে বাজারে যে-সব গুঁড়ো মশলা বিক্রী হয়, সেগুলি সময় বাঁচালেও কষ্ট করে মশলা বেটে নেওয়াই ভালো। উপরের বিভিন্ন মশলা ছাড়া নানা রকমের গোটা মশলাও ব্যবহার করতে হয়। এই সব মশলার মধ্যে ফোড়নের মশলাও আছে। সাধারণতঃ জিরা, কালোজিরা, মেথি, মৌরী, রাঁধুনী, সর্ষে, পিঁয়াজ, রসুন, তেজপাতা, হিং প্রভৃতি ফোড়নের মশলা। আর পাঁচফোড়ন হল জিরা, কালোজিরা, মৌরী, রাঁধুনী ও মেথি—এই পাঁচটি মশলার একত্র সংমিশ্রণ।

বস্ত্র-ধৌতি (Laundering)

কাপড় কাচার বিজ্ঞান জানতে হলে কাপড়, কাপড়ের বিভিন্ন জমি, বিভিন্ন স্থতো, কাপড় কী ভাবে তৈরী হয়, এসমস্ত বিষয় সম্পর্কেই মোটামুটি জেনে রাখা দরকার। কাপড় স্থতো থেকে তৈরী একথা সবাই জানে। স্থতো তৈরী হয় আবার আঁশ বা তন্তু থেকে। অবশ্য সব আঁশ থেকেই স্থতো তৈরী হয় না। শক্ত, লম্বা, নমনীয়, টানলে কিছুটা লম্বা হয় (অর্থাৎ স্থিতিস্থাপক), হাতে ধরে রাখলে নরম বোধ হয় এবং জল শুষে নেবার ক্ষমতা যে সমস্ত আঁশের আছে, সেইসব আঁশ বা তন্তু দিয়েই সাধারণতঃ স্থতো তৈরী হয়ে থাকে।

আগেকার দিনে পশম, রেশম, স্থতি ও লিনেন—মোটামুটি এই চার রকমের স্বাভাবিক তন্তু দিয়েই কাপড় তৈরী হত। আজকাল বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে নানারকম কৃত্রিম তন্তু আবিষ্কৃত হয়েছে। এদের কতকগুলি স্বাভাবিক বা অকৃত্রিম, কতকগুলি আবার মিশ্রিত বা কৃত্রিম। কাজেই তন্তুগুলিকে প্রধানতঃ দু'ভাগে ভাগ করা যায়: (১) প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক (আসল) তন্তু ও (২) কৃত্রিম বা সংমিশ্রিত (নকল) তন্তু। প্রাকৃতিক বা আসল তন্তুগুলি প্রধানতঃ তিনভাগে বিভক্ত :—(১) উদ্ভিজ্জ, (২) প্রাণিজ ও (৩) খনিজ। এদের প্রত্যেকটির মধ্যেই আবার বিভিন্ন রকমের তন্তু আছে। নীচের চার্টটি থেকেই সব বোঝা যাবে :
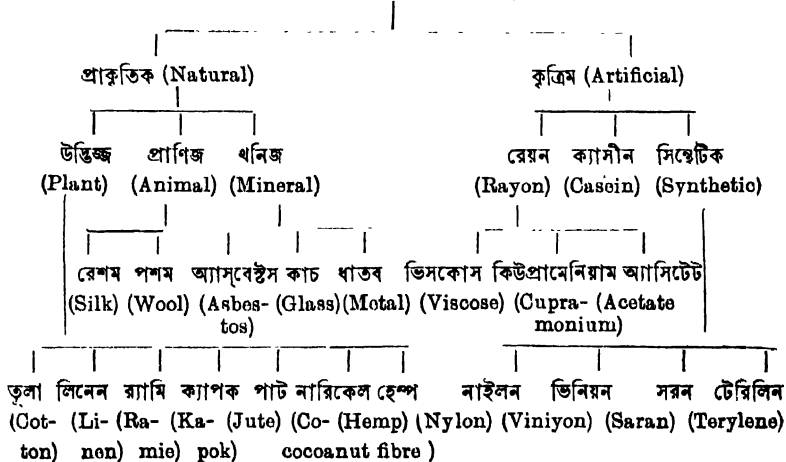
তন্তু সম্পর্কে এত কথা বলছি কারণ বস্ত্রধৌতিতে প্রধান কথাই তন্তুবিচার। সব তন্তুর সহনক্ষমতা সমান নয় বলে তাদের ধৌতিপদ্ধতিও একরকম নয়।

বিশেষতঃ দামী শাড়ী, ট্রাউজার ইত্যাদি ধৌতি সম্পর্কে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়।

এবার দেখা যাক কোন্ কাপড় কী ভাবে ধৌত করতে হয়। **সূতি** বেশ শক্ত তন্তু, ভেজালে আরও শক্তি বাড়ে, শতকরা প্রায় ৩০ ভাগ পর্যন্ত বাড়তে দেখা যায়, তাই সূতি কাপড়কে কাচবার সময় থোবড়ানো, কচলানো বা রগড়ানো চলে। শুধু সূতি কেন, অন্যান্য অনেক কাপড়ের ক্ষেত্রেও প্রধানতঃ জলের সাহায্যেই ময়লা পদার্থগুলো দূর করা হয়ে থাকে। সাবান, সোডা, অ্যামোনিয়া, বোরাক্স ইত্যাদি ক্ষারদ্রব্য বা ব্লীচিং দ্রব জলের দ্রবণক্ষমতা যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িয়ে দেয় বলে এদের সংস্রবে সহজেই জামা-কাপড়ের ময়লা দ্রবীভূত হয়ে বেরিয়ে আসে। সূতির উপর উত্তাপের প্রভাব খুব কম এবং ক্ষারদ্রব্য দিয়ে গরম জলে অনেকক্ষণ সিদ্ধ করলেও কোনও ক্ষতি হতে দেখা যায় না। তবে নতুন কাপড় জলে ভেজালে তার দৈর্ঘ্য-প্রস্থ প্রথম প্রথম দু'একবার কিছুটা সঙ্কুচিত ও ছোট হয়। কারণ বোনবার সময় সুতোগুলো টান থাকে এবং পরে তাতে জল লেগে ফুলে সঙ্কুচিত হলে তাদের মধ্যে যে অসংখ্য ফাঁক থাকে তা বুজে গিয়ে সুতোগুলো মোটা হয় এবং পরস্পর ঠাসাঠাসিতে গায়ে গায়ে লেগে গিয়ে কাপড়টাকে পুরু করে ফেলে।

কড়া অ্যাসিডের সংস্পর্শে এলে সূতি কাপড় সহজেই নষ্ট হয়ে যায়। হাল্কা অ্যাসিড দ্রবতেও সূতির কাপড় নরম ও কমজোর হয়ে যায়।

সূতি কাপড়ের জলশোষণের ক্ষমতা খুব বেশী। নিজস্ব ওজনের ৪০—৫০ ভাগ আর্দ্রতা এই কাপড় শোষণ করতে পারে। এই শোষিত আর্দ্রতা তাড়াতাড়ি বাষ্পীভূত হয় বলে সূতি কাপড় তাড়াতাড়ি শুকোয়। এইজন্যেই গ্রীষ্মকালে সূতিবস্ত্র আরামপ্রদ ও স্নিগ্ধ বলে মনে হয়।

সূতি কাপড় ভালো করে ধুলে পরে কাপড়ের রং সাধারণতঃ একটু লালচে হয়ে উঠে, সেইজন্যে কাপড়ে নীল দেবার দরকার হয়। নীলের সঙ্গে সূতি কাপড়ে মাড়ও দিতে হয়। কাপড়ে মাড় ও নীল দেবার পরে কাপড় ইস্ত্রি করে পরিপাটী করতে হয়।

লিনেন কাপড়ের গুণ প্রায় সূতির মত, তবে সূতি কাপড়ের চেয়ে এ-কাপড় বেশী টেঁকসই। সাদা সূতি কাপড়ের মত লিনেন কাপড়ও সাবান, সোডা বা অন্য রকম ক্ষারদ্রব্য দিয়ে ঠাণ্ডা জলে ভিজিয়ে বা গরম জলে সিদ্ধ করে রগড়ে কাচলে এর কোনও ক্ষতি হয় না। তবে লিনেনের অ্যাসিড প্রতিরোধ করার

ক্ষমতা সুতির চেয়ে অনেক বেশী। আর এর আর্দ্রতা শোষণের ক্ষমতাও সুতি কাপড়ের প্রায় দ্বিগুণ, সেইজন্যে লিনেন কাপড় অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা লাগে। লিনেনের উত্তাপ পরিবহণ ক্ষমতাও সুতির চেয়ে বেশী। গ্রীষ্মকালে লিনেনের পোশাক সুতির পোশাকের চেয়ে ঠাণ্ডা ও আরামদায়ক।

রেয়ন ভালো রকম তাপ-পরিবাহী এবং কোমল ও মসৃণ। রেয়ন কাপড়ে পোকা ধরে না, যেমনভাবেই পড়ে থাকুক ছাতা পড়ে নষ্ট হয় না (সুতি ও লিনেন কাপড় ভিজে অবস্থায় তালগোল পাকিয়ে রেখে দিলে ছাতা ধরে যায়)। **রেয়নে অ্যাসিড প্রয়োগ একেবারেই চলে না**; এমন কি সামান্যতম হাল্কা অ্যাসিড দ্রবও রেয়নের পক্ষে ক্ষতিকারক। ক্ষারদ্রব্যাদি ব্যবহার করলেও রেয়ন নষ্ট হয়ে যায়।

পশম দুর্বল তন্তু। এর শক্তি ভিজে অবস্থায় আরো কমে যায়। সেইজন্যে ভিজে অবস্থায় পশমের কাপড় রগড়ানো উচিত নয়। পশমের স্থিতিস্থাপকতা আছে, এজন্য পরতে আঁট মনে হয় না। বহুব্যবহারে বেশ খানিকটা বেড়ে ঝুলে যায় বটে, কিন্তু ভিজে কাপড়ের নীচে রেখে গরম ইস্ত্রি দিয়ে চাপ দিলে আবার আগের আকৃতি ফিরে আসে।

পশম ভাঁজ-নিরোধক। ধৌতি ও সংরক্ষণের কতকগুলো নিয়ম মেনে চললে পশমবস্ত্র অনেক বছর ধরে অনায়াসে ব্যবহার করা চলে। পশম তাপের কুপরিবাহী (bad conductor of heat)। বেশী উত্তাপে পশম তন্তু নমনীয়তা হারায়। এইজন্যেই পশম কাপড় অত্যধিক গরম জলে ডোবাল বা তার উপর অত্যধিক গরম ইস্ত্রি চালালে তা সহজে নষ্ট হয়ে যায়। পশম কাপড়ের উপর **ক্ষারদ্রব্যের প্রয়োগ ক্ষতিকারক**। এতে পশম কাপড় নরম ও নমনীয় তো হয়ই না, উপরন্তু শক্ত, খসখসে ও অনেক সময় হলুদভাবের হয়ে যায়। অবশ্য মৃদু-ক্ষারদ্রব (যেমন বোরাক্স) ও অ্যামোনিয়া দ্রব প্রয়োগ করলে ক্ষতি হতে দেখা যায় না। খর জল পশম তন্তুকে কর্কশ করে তোলে, এজন্যে খর জলকে মৃদু জলে রূপান্তরিত করে তবেই সেই জলে পশম কাপড় কাচা উচিত। কাচবার পর পশম তন্তু বার বার ভালো করে ধুয়ে ক্ষারদ্রবের সামান্য-তম অবশিষ্টটুকুও দূর করে ফেলা উচিত। **কড়া বা উগ্র অ্যাসিডে পশম তন্তু নষ্ট হয়ে যায়**। উগ্র অ্যাসিড প্রয়োগ করলে পশমের তন্তুগুলো ভেঙে যায়। পশমে খুব হাল্কা ধরনের অ্যাসিডের দ্রব ব্যবহার করা চলে। **পশম**

কাপড় সাদা করবার জন্যে সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইট-জাতীয় শুক্লীকরণ পদার্থ কখনোই ব্যবহার করা চলে না। পশম কাপড় থেকে কোনও দাগ ওঠাতে গেলে পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট, সোডিয়াম পার-অক্সাইড বা হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড ব্যবহার করা চলে।

রেশম উত্তাপের কুপরিবাহী বলে খুব অল্প উত্তাপে রেশম ইস্ত্রি করা উচিত। একই কারণে রেশমী কাপড়ে সহজেই পোড়া দাগ লাগে এবং ইস্ত্রি করবার সময় একটু বেশী গরম লাগলেই কাপড় পুড়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে। (রেশম পুড়লে একরকম বিশ্রী গন্ধ বার হয়। ঐ গন্ধ আসলে প্রোটিন-পোড়া গন্ধ।) সুতি কাপড়ের ভিতরে রেশমী কাপড় পাট করে ইস্ত্রি করাই নিরাপদ। সম্পূর্ণ ঠাণ্ডা জলে রেশমী কাপড় ডোবালে ওতে কিছুটা কাঠিন্য আসে। আবার অপরপক্ষে অত্যধিক গরম জলে রেশমের রঙ নষ্ট হয়ে যায় এবং ওর জমিও কতকাংশে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। **রেশমী জমি রগড়াতে নেই,** কারণ অত্যধিক রগড়ালে বা ঘষাঘষির ফলে রেশমী তন্তুগুলি নষ্ট হয়ে যেতে পারে। হাল্কা ক্ষারদ্রবেও রেশমের রঙ নষ্ট হয়ে যায় এবং রেশমের সহনশীলতা বা প্রতিরোধ-ক্ষমতাও কমে আসে—যদিও ক্ষারদ্রব পশমের চেয়ে রেশমের পক্ষে ক্ষতিকারক কম। সুতরাং রেশমের বেলাতেও ক্ষারদ্রবের প্রয়োগ যতটা সম্ভব এড়িয়ে চলা উচিত এবং সাবান দেবার পরে খুব **ভালো করে সব সাবান ধুয়ে ফেলা উচিত**। গরম ক্ষারদ্রব রেশমী কাপড়ে কখনও প্রয়োগ করা উচিত নয়—কারণ ওতে অনেক সময় রেশমের সূক্ষ্ম তন্তুগুলো গলে যায়।

উগ্র অ্যাসিডের প্রয়োগে রেশম পশমের চেয়েও তাড়াতাড়ি গলে যায়। হাল্কা অ্যাসিডগুলোকে অনেক সময় রেশম কাপড় নিজের মধ্যে টেনে নেয়। তাই বেশী জলে ভালো করে না কাচলে ঐ সব অ্যাসিড রেশম কাপড়ের জমির মধ্যে থেকে যেতে পারে এবং পরে ধোবার সময় সাবানের সংস্পর্শে এসে তার প্রতিক্রিয়ায় ফ্যাটি অ্যাসিড তৈরী হয়ে কাপড়ের জমিতে দাগ লেগে যেতে পারে। ধোয়ার আগে রেশম কাপড় হাল্কা বোরাক্স সলিউশনে ডুবিয়ে নিলে এই রকম দাগ হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে।

সুতরাং, সংক্ষেপে বলা যেতে পারে রেশম, পশম, রেয়ন প্রভৃতিতে উগ্র ক্ষারদ্রব্য ব্যবহার করা যেমন চলে না, তেমনি সিদ্ধ করা বা অতিরিক্ত গরম জলও ব্যবহার করা চলে না। এই সমস্ত তন্তুতে ক্ষার প্রয়োগ, রগড়ানো, মোচড়ানো কিংবা বেশী তাপ প্রয়োগ একেবারেই নিষিদ্ধ। মৃদু উষ্ণ জলে

কোনও গুঁড়ো সাবান (লাক্স বা সার্ফ বা ডেট-জাতীয়) কিংবা রিঠা ফলের জল ইত্যাদির সাহায্যেই রেশম, পশম, রেয়ন প্রভৃতি কাচতে হয়।

অর্গ্যাণ্ডি দামী কাপড় হলেও সুতির। একে ধুতে হয় রঙীন সুতি কাপড়ের মতই। **রঙীন জামা-কাপড় যেমন জলে ফুটোতে নেই, তেমনি অর্গ্যাণ্ডিও** কখনও জলে ফুটোতে নেই। অর্গ্যাণ্ডি কাচতে হয়। এই কাপড় কখনও রগড়ে ধুতে নেই। হাল্কা হাতে থুপে একে কাচতে হয়। ধোয়ার পর আধ-ভিজে অবস্থাতেই ইস্ত্রি চালাতে হয়। সাধারণতঃ সুতির কাপড়ের মতো অর্গ্যাণ্ডিতে কলপের স্টার্চ দরকার হয় না। তবে অত্যন্ত দামী ও ভালো মিহি জমিনের অর্গ্যাণ্ডি হলে সাধারণ কলপের বদলে গঁদের কলপ ব্যবহার করা উচিত।

জর্জেট কাপড় জলে ধুলে খুবই কুঁচকে যায় এবং ধোওয়ার পরে এইজাতীয় কাপড়ের মাপ প্রধানতঃ প্রস্থে ছোট হয়ে যায়। এইজন্যে জর্জেট কাপড়ের আগেকার মাপ বজায় রাখার জন্যে একরকম কাঠের লাঠি ব্যবহার করা হয়। এতে ইঞ্চির মাপ দাগ কাটা থাকে। ভেজাবার আগে মাপ রেখে ভিজে অবস্থায় সেই দণ্ডে মাপ অনুযায়ী টেনে সমান করে দিলে শুকোবার পর আর ছোট হয় না।

সাদা ও রঙীন রেশমের শাড়ীর পদ্ধতিতেই জর্জেট শাড়ির ধৌতি হয়। জর্জেট কাপড়ে সামান্য তাপের ইস্ত্রি করা উচিত। ইস্ত্রি করার সময় উল্টো-দিকে করতে হয়। পুরু তোয়ালে পেতে জর্জেট ইস্ত্রি করলে চাপ সব জায়গায় সমান পড়ে এবং ইস্ত্রির কাজটিও সোজা হয়।

ক্রেপ ডি সীন-এর মধ্যে সামান্য ক্রেপ আছে। তা সত্ত্বেও একে জলে কাচা যায়। কোনও নিউট্রাল সাবান বা কুঁচো সাবান কিংবা রিঠার জল দিয়ে একে পরিষ্কার করা যায়। সাধারণতঃ ক্রেপ ডি সীনের কাপড় কুঁচকে যায় বলে একে এক বিশেষ পদ্ধতিতে শুকোতে হয়। ধোওয়ার পর শাড়ীগুলি যাতে দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ঠিক আগের মাপমত রাখা যায় তার জন্যে কাঠের রোলার ব্যবহার করতে হয়।

খেলাধূলা ও শারীর-শিক্ষা

ইংরেজিতে একটা কথা আছে: 'Man does not live by bread alone'। এর অর্থ হল মানুষের জীবনধারণের স্থূল প্রয়োজনগুলি মেটানোই তার বাঁচবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। তার আরও কিছু চাই—অনেক কিছুই। মানুষের এই চাহিদা থেকেই সৃষ্টি হয়েছে কাব্য-সংগীত-চিত্রকলা-খেলাধূলা ইত্যাদির। অবশ্য সুদূর অতীতে যখন প্রতিকূল প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে লড়াই করে কোনও রকমে বেঁচে থাকাটাই মানুষের অনেকখানি সময় নিয়ে নিত, তখন স্বাভাবিকভাবেই এ-সবের বিকাশ ঘটেনি। কিন্তু ক্রমশঃ যখন মানুষ তার সংগ্রামে জয়ী হল, প্রতিকূল পরিবেশ ও প্রকৃতিকে হার মানতে বাধ্য করল, তখনই মানুষ হাঁফ ছেড়ে বাঁচতে গিয়ে দেখল নিরুদ্বেগ নিশ্চিত জীবনে আহারাদি জৈবিক প্রয়োজন মেটানো ও আত্মরক্ষা করাটাই যথেষ্ট নয়। আরও কিছু চাই।

এই 'আরও কিছু'র প্রয়োজন মানুষ বেশি করে অনুভব করল অবসর কাটাতে গিয়ে। অবসর-বিনোদনের জন্য কিছু দরকার। খেলাধূলার উদ্ভব এভাবেই হয়েছে। তবে এ-কথা বলা বাহুল্য যে, অতীতে যে-সব খেলা ছিল, তার সবগুলি এখন নেই, আবার যেগুলি আছে তাদেরও রীতি-নীতি, নিয়ম-কানুন অনেক পরিবর্তিত হয়েছে—অনেক ক্ষেত্রে একেবারে আমূল পরিবর্তিত হয়েছে। 'আর্চারি' বা ধনুর্বিদ্যার কথাই ধরা যাক। ২০,০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দেরও আগে তীর ও ধনুকের কৌশল মানুষ আয়ত্ত করেছিল—অবশ্য যদিও তখন এটা শিকারের অঙ্গমাত্র ছিল। সুসংগঠিত ক্রীড়া হিসাবে ধনুর্বিদ্যা ৩০০ খ্রীষ্টাব্দের আগে খেলাধূলার আসরে আত্মপ্রকাশ করতে পারেনি। সন-তারিখের দিক থেকে বিচার করতে গেলে মল্লযুদ্ধই প্রাচীনতম ক্রীড়া। ৩,০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দেও এর যে প্রচলন ছিল তার প্রমাণ মিশরের (এখন সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র) বেন হাসানে এবং ইরাকের কিয়া ফেফে-র কয়েকটি সুপ্রাচীন দেওয়াল-চিত্র থেকে পাওয়া গেছে।

প্রত্যেকটি খেলারই বিচিত্র এবং চিত্তাকর্ষক ইতিহাস আছে; এই বইয়ের স্বল্প-পরিসরে সে সব আলোচনা করা সম্ভব নয়। আর তা ছাড়া আমাদের আলোচ্য বিষয় খেলাধূলার নিয়ম-কানুন। ইতিহাসের কথা উল্লেখ করলাম মাত্র এই জন্যই যে, এর থেকেই বোঝা যাবে, খেলাধূলা মানুষকে দীর্ঘদিন

ধরেই আকৃষ্ট করেছে। এটা সাম্প্রতিক বা এমন কি দু'-এক শতাব্দীরও কোনও ব্যাপার নয়। আজ খেলাধূলা মানুষের জীবনের অত্যাবশ্যক অঙ্গ—খেলাধূলার কথা বাদ দিয়ে মানুষকে কল্পনা করাই যায় না। এই অবস্থা হঠাৎ একদিনে আসেনি। দীর্ঘদিন ধরে নানারকম বিবর্তনের মধ্যেই খেলাধূলার বর্তমান রূপ ও জনপ্রিয়তা গড়ে উঠেছে।

অবসর-বিনোদনের তাগিদে উদ্ভব হলেও, সেটাই খেলাধূলার একমাত্র উপযোগিতা নয়। এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করার এখানে কোনও প্রয়োজন না থাকলেও আমরা এখানে কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করছি।

যাঁরা বিভিন্ন খেলাধূলায় অংশগ্রহণ করেন তাঁদের থেকে বহুগুণ বেশি লোক দর্শক হয়ে তাঁদের খেলা দেখেন। যাঁরা খেলছেন এবং যাঁরা দেখছেন, এই দু'দলের লোক কেউই 'খেলাধূলার উদ্দেশ্য অমুক, সেই জন্যে আমি খেলছি—খেলা দেখছি' এই রকম ভাবেন না। তাঁদের সকলের* কাছেই খেলাধূলার জন্যই খেলাধূলা। আরও একটু স্পষ্ট করে বলতে পারা যায়, খেলাধূলার উদ্দেশ্য আনন্দ দেওয়া—সকলকেই। যাঁরা খেলছেন তাঁরা যেমন নির্মল আনন্দ পান, তেমনই যাঁরা তাঁদের নৈপুণ্য দেখছেন তাঁরাও সেই আনন্দের ভাগীদার। বিশ্বকবি যে অর্থেই গেয়ে থাকুন না কেন—'জগতে আনন্দযজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ', আমাদের তো মনে হয় জগৎজোড়া খেলার মেলার মাঝেই বিশ্বকবির গানের সার্থকতম প্রকাশ ঘটেছে। সত্যি, এ এক বিরাট আনন্দযজ্ঞ।

কিন্তু দৃশ্যতঃ আনন্দ দেওয়া ও অবসর-বিনোদনের জন্য হলেও পরোক্ষে খেলাধূলা আমাদের অনেক কিছু এনে দিচ্ছে। খেলাধূলার মাধ্যমে খেলোয়াড়দের শরীর সুস্থ থাকে, মন প্রফুল্ল থাকে। শুধু কি তাই? খেলাধূলার মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীরা এমন কতকগুলি সদ্‌গুণের অধিকারী হন, যেগুলি সমাজজীবনে মানুষের আদর্শ। শৃঙ্খলা, নিষ্ঠা, ধৈর্য, সংযম, স্বার্থত্যাগ, পারস্পরিক সহযোগিতা, দলগত সংহতি ইত্যাদি একাধিক সদ্‌গুণের চর্চা খেলোয়াড়রা নিজেদের অজ্ঞাতসারেই করে যাচ্ছেন। তাই তো খেলোয়াড়রা সমাজে আদর্শ হয়ে থাকেন। 'স্পোর্টসম্যান স্পিরিট' (খেলোয়াড়ী মনোবৃত্তি) বা কোনও ভুল-ত্রুটির ক্ষেত্রে 'Take it sportingly' ইত্যাদি কথাই সামাজিক জীবনে খেলাধূলার প্রয়োজনের উজ্জ্বল প্রমাণ।

---

*অবশ্য খেলাধুলা যাঁদের উপজীবিকা, সেই পেশাদার বা প্রাফেসনাল শ্রেণীর খেলোয়াড়দের কথা আলাদা। এখানে আমরা সেই বিতর্কের মধ্যে যাচ্ছি না।

খেলাধূলার সঙ্গে সঙ্গেই যার নাম উল্লেখ করতে হয়, তা শরীর-চর্চা। ঠিক 'খেলাধূলার' মধ্যে না এলেও ব্যায়াম ও শরীর-চর্চা খেলাধূলার সঙ্গে এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। কারণ অত্যন্ত সহজবোধ্য। দেহকে নীরোগ ও সুস্থ রাখতে হলে সকলেরই—এবং বিশেষ করে খেলোয়াড়দের অল্পস্বল্প শরীর-চর্চা করা দরকার। আর খেলার মাধ্যমে যা পাওয়া যায়, ব্যায়াম ও শরীর-চর্চার মাধ্যমে সেই সব সদ্‌গুণই পাওয়া যায়।

খেলাধূলা সম্পর্কে আর একটি কথা উল্লেখ না করলে আমাদের আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। বর্তমান যুগে খেলাধূলার অন্যতম প্রধান উপযোগিতা হল এই যে, খেলাধূলা মানুষকে স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে। এটা কম বড় লাভ নয়। সকলেই চায় বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় তার দেশই জয়ের মালা লাভ করুক এবং তখনই ভাষা-ধর্মের ভেদাভেদ ঘুচে গিয়ে জাতীয়তাবোধের আত্মপ্রকাশ ঘটে। ভারত যখন পাকিস্তানের কাছে হেরে যায় তখন সে ব্যথা সকল ভারতবাসীই সমানভাবে ভাগ করে নেন। এরকম ঐক্য একমাত্র যুদ্ধের সময়ই দেখা যায়। ১৯১১ সালে মোহনবাগান যখন দুর্ধর্ষ গোরাদল ইস্ট ইয়র্ককে হারিয়ে আই. এফ. এ শীল্ড লাভ করেছিল, তখন ঘটনাটি সমগ্র ভারতে এক অভূতপূর্ব জাতীয় চেতনার সঞ্চার করেছিল। ভারতবাসীর মনে এই ধারণাই হয়েছিল যে, খেলার মাঠে যখন আমরা ইংরেজকে হারাতে পারি, তখন স্বাধীনতা সংগ্রামেই বা আমরা জয়লাভ করতে সক্ষম হব না কেন? আজ বিভিন্ন ক্লাবে ক্লাবে যে রেষারেষি (যেটা অনেক সময়ই সুস্থ প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং শালীনতার সীমা অতিক্রম করে যায়) তার মূলে কিন্তু এক ধরনের 'ক্ষুদে জাতীয়তাবোধ'। অর্থাৎ 'My country, right or wrong' এবং 'My club, right or wrong'—এ দু'য়েরই উৎস এক। এটা বাঞ্ছনীয় কিনা সে প্রশ্ন আলাদা।

এইবার শারীর-শিক্ষার কথা আলোচনা করা যাক। শারীর-শিক্ষার মধ্যে খেলাধূলা আছে ঠিক কথা, কিন্তু তা ছাড়াও আরও অনেক কিছু আছে। প্রত্যেক জিনিসেরই দু'টি দিক আছে—তত্ত্বগত বা 'থিওরেটিক্যাল' এবং ব্যবহারিক বা 'প্র্যাকটিক্যাল'। খেলাধূলা হল শারীর-শিক্ষার 'প্র্যাকটিক্যাল' দিক। কিন্তু শুধু ব্যবহারিক দিকই যথেষ্ট নয়, উপযুক্ত তত্ত্বগত জ্ঞানও প্রয়োজন। তা না হলে বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা সম্ভব হয় না। আজ আমরা স্পোর্টস মেডিসিনের কথা শুনি, আবার 'ডোপিং', 'ডোপ টেস্ট' ইত্যাদির কথাও শুনি।

শারীর-বিদ্যা সম্পর্কে যথেষ্ট দখল না থাকলে কেউ এই সমস্ত বিষয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না। কাজেই, শারীর-বিদ্যা বা 'ফিজিওলজি'-ও শারীর-শিক্ষার অন্তর্গত।

শিক্ষা-ব্যবস্থায় শারীর-শিক্ষার স্থান সম্পর্কে দ্বিমত নেই। সুদূর অতীতে প্রাচীন গ্রীসে খেলাধূলা, ব্যায়াম, শরীর-চর্চা ইত্যাদি শিক্ষা-ব্যবস্থার আবশ্যিক অঙ্গ ছিল। আজ সমস্ত উন্নত রাষ্ট্রগুলিতে তো বটেই, ভারতের মত উন্নয়ন-কামী রাষ্ট্রগুলিতেও শারীর-শিক্ষা তার নিজস্ব মর্যাদার আসন করে নিয়েছে। ভারতে পাঞ্জাব, হরিয়ানা ও চণ্ডীগড়ে পাঠ্য-তালিকায় খেলাধূলা আবশ্যিক হিসাবে ঘোষিত হয়েছে। বর্তমান শিক্ষাবর্ষ (১৯৭৪) থেকে পশ্চিমবঙ্গ মধ্য-শিক্ষা পর্ষদও নতুন মাধ্যমিক শিক্ষা-ব্যবস্থায় শারীর-শিক্ষাকে সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত করে এক বৈপ্লবিক পদক্ষেপ করেছেন।

'পাঠ্য-তালিকায় আবার খেলাধূলা কেন ?' এরকম একটা প্রশ্ন অনেক ছাত্র-ছাত্রী বা অভিভাবক-অভিভাবিকার মনে জাগতে পারে। তাঁদের বলি, এর প্রয়োজন অনেক দিনই ছিল। পরাধীন ভারতে ইংরেজ শাসকরা উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে যেটা করেনি, স্বাধীন ভারতেও গড়িমসি করে সেটা করতে পঁচিশ বছর কেটে গেছে। আর দেরী করা যায় না।

শারীর-শিক্ষার লক্ষ্য শুধু শরীরের উন্নতিসাধনই নয়, ছাত্র-ছাত্রীদের সর্বাঙ্গীন বিকাশসাধন। সুতরাং শারীরিক ছাড়াও এর বিভিন্ন দিক আছে—মানসিক, নৈতিক বা মনস্তাত্ত্বিক। খেলাধূলা প্রসঙ্গে আলোচনায় যে-সব সদ্‌গুণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, বলা বাহুল্য, সেগুলির সবই শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। বস্তুতঃ, বাল্যকাল থেকে উপযুক্ত শারীর-শিক্ষা পেলে ছেলেমেয়েদের সম্পূর্ণ নিজস্ব লাভ ছাড়া প্রকৃত লাভ হয় জাতির। 'জীবনহারা অচল অসাড়' হয়ে বিশ্বের দরবারে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকাটা কোনও জাতিরই কাম্য নয়। তাই চাই এমন নাগরিক যারা একাধারে সুস্থ, সবল দেহের ও বিভিন্ন সদ্‌গুণের অধিকারী। বিখ্যাত ইংরেজ মনীষী জন স্টুয়ার্ট মিল একটা মূল্যবান কথা বলেছেন—'The worth of a nation is, in the long run, the worth of the individuals composing it.' (কোনও জাতির মূল্য শেষপর্যন্ত সেই জাতির অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদেরই মূল্য।) এই পরিপ্রেক্ষিতেই শারীর-শিক্ষা এবং পাঠ্য-তালিকায় তার স্থানকে বুঝতে হবে।

প্রথম পরিচ্ছেদ

ক্যালিস্থেনিকস্

ক্যালিস্থেনিকসের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল 'সৌন্দর্যময় শক্তি'। সুতরাং ক্যালিস্থেনিকসের উদ্দেশ্য হচ্ছে, একই সাথে সৌন্দর্য ও শক্তির আরাধনা।

ক্যালিস্থেনিকসের মধ্যে ঠিক ঠিক কোন্ ব্যায়াম অন্তর্ভুক্ত তা বলা শক্ত। কেউ বলেছেন যে, ক্যালিস্থেনিকস্ হল হাল্কা ধরনের জিমন্যাষ্টিকস্ বা চল্‌তি কথায় যাকে বলে, 'লাইট এক্সারসাইজ'। এ-দিক থেকে দেখলে সমস্ত খালি-হাতের ব্যায়াম বা 'ফ্রী-হ্যাণ্ড এক্সারসাইজ'ই ক্যালিস্থেনিকসের মধ্যে আসছে। যন্ত্রপাতির সাহায্যে ব্যায়াম করলে দেহের সৌন্দর্য খানিকটা নষ্ট হয়ে যায় এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কারণ, এ ক্ষেত্রে মাংসপেশীগুলি অত্যধিক পুষ্ট এবং শক্ত হয়ে যায়।

বিভিন্ন বিদেশী বই এবং পুরাতন সংবাদপত্র খুঁজলে দেখা যায় যে, ১৮৪৭ সালে প্রথম এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়। আরও জানা যায় যে, ক্যালিস্থেনিকসকে সকলে মেয়েদের ব্যায়াম বলেই উল্লেখ করেছেন এবং এর মধ্যে নাচ-গানেরও স্থান আছে। শুধু তাই নয়, জিমন্যাষ্টিকস্ থেকে ক্যালিস্থেনিকসকে আলাদা করে দেখানো হয়েছে এবং 'জিমন্যাসিয়ামের' মত 'ক্যালিস্থেনিয়াম'-এর কথা বলা হয়েছে।

লিত্রে নামক একজন লেখক 'Gymnastic exercises suitable in the physical education of girls' এইভাবে ক্যালিস্থেনিকসের সংজ্ঞা দিয়েছেন। আর ১৮৭১ সালের ৫ই জানুয়ারীর 'ডেলি নিউজ' থেকে ক্যালিস্থেনিকসে গানের ভূমিকার কথা জানতে পারা যায়। সেখানে কতক-গুলি ব্যায়াম সম্পর্কে বলা হয়েছে—'ব্যায়ামগুলিকে জিমন্যাষ্টিকস্ না বলে ক্যালিস্থেনিকস্ বলাই উচিত। কারণ, ওগুলির মধ্যে আছে পিয়ানো বাজনার ছন্দের তালে তালে কাঠের রিং এবং হাল্কা দণ্ড নিয়ে ছন্দোবদ্ধভাবে চলা।' আবার ১৮৮৩ সালের 'নিউ ইয়র্ক ট্রিবিউনে'র একটি সংখ্যায় (নং ১৩৩৫৪/২) দেখা যায় 'ক্যালিস্থেনিয়ামটি জনসাধারণের জন্যে উন্মুক্ত করে দেওয়া হল এবং নৈশভোজের সময় পর্যন্ত মেয়েরা নাচে মেতে রইল।' যিনি ক্যালিস্থেনিকস্

শেখাবেন তিনিও সম্ভবতঃ মহিলা। ১৮৭২ সালের একটি বইতে ক্যালিস্থেনিকসের 'শিক্ষয়িত্রী'র কথা বলা হয়েছে।

সুতরাং এ-কথা বলে নেওয়া ভালো যে, ক্যালিস্থেনিকস্ সম্পর্কে বিংশ শতাব্দীর ঔৎসুক্য তেমন কিছুই নেই। এখন জিমন্যাসিয়ামের সংখ্যা অজস্র, কিন্তু 'ক্যালিস্থেনিয়াম' কোথাও আছে বলে আমরা জানি না। তবে একাধারে স্বাস্থ্য, শক্তি ও সৌন্দর্যের সাধনা করার দিক থেকে এবং খালি-হাতে ব্যায়াম করার প্রয়োজনীয়তার দিক থেকে ক্যালিস্থেনিকসের সার্থকতা বুঝতে হবে।

মার্চিং, ড্রিল ও স্বদেশী ব্যায়াম

মানুষের জীবনে সবচেয়ে প্রয়োজন শৃঙ্খলাবোধ। যে দেশ বা জাতি যত সুশৃঙ্খল, তারাই তত উন্নত। আর এই সুশৃঙ্খল জীবন শুরু হয় প্রতিটি উন্নত দেশে বাল্যকালে ও ছাত্রাবস্থায়। প্রতিটি উন্নত দেশের যুবশিক্ষা কর্মসূচীতে এই দিকটায় কঠোর দৃষ্টি দেওয়া হয়। কে না স্বীকার করবেন—অন্যান্য দেশের তুলনায় চীন, রাশিয়া প্রভৃতি সহ বিভিন্ন সাম্যবাদী দেশের নানা দিকে দ্রুত উন্নতি ঘটেছে কঠোর নিয়মানুবর্তিতার জন্যেই। আমাদের দেশে খেলা-ধূলায়ও দেখা যায় সার্ভিসেস বা সামরিক (স্থল, নৌ ও বিমান) বাহিনীর খেলোয়াড়রা সবচেয়ে উন্নত। এর একমাত্র কারণ সুশৃঙ্খল অনুশীলন এবং অন্যান্য বিধি মেনে চলা।

ড্রিল একত্রে কাজ করতে সাহায্য করে। কোনও খেলা শুরুর আগেই ড্রিলের প্রয়োজন। মন ও দেহকে একত্রে কাজে সাহায্য করে। ড্রিল নৈতিক উন্নতি ঘটায়।

ড্রিল ও মার্চিং-এর নির্দেশের (ইনস্ট্রাকশন) দিকে যথেষ্ট নজর রাখা দরকার। ইংরেজিতে বলা হয় **'ইনস্ট্রাকশন ইন্ ড্রিল ইজ অ্যান্ আর্ট।'** যারা নির্দেশ পাবে তাদের সর্বদা কান খাড়া করে প্রস্তুত থাকতে হয় এবং প্রতিটি নির্দেশের সঙ্গে সঙ্গে তা যথাযথ অর্থাৎ নির্ভুলভাবে পালন করা একান্ত কর্তব্য।

ড্রিল শুরু করার আগে প্রত্যেককে কয়েকটি বিষয় জেনে রাখা ভাল :

(ক) প্রত্যেককে চটপটে হতে হবে।

(খ) প্রত্যেকটি ভঙ্গী নির্ভুলভাবে করতে হবে।

(গ) পরিষ্কারভাবে নির্দেশ দিতে হবে। কেউ ভুল করলে (যারা নির্দেশ মানে), তৎক্ষণাৎ সংশোধন করতে হবে। নির্দেশে ভুল কথা যেন ব্যবহৃত না হয়।

(ঘ) প্রত্যেককে পৃথকভাবে বিভিন্ন ড্রিল-ভঙ্গী অনুশীলনের সুযোগ দেওয়া উচিত।

(ঙ) প্রতিটি নির্দেশের আগে ও পরে সামান্য বিশ্রাম দিতে হয়। নির্দেশ-প্রাপ্তরা কখনও কথা বলবে না।

(চ) পোশাক একই ধরনের হলে উত্তম। পরিচ্ছন্ন পোশাক চাই। পোশাক—ছেলেদের হাফপ্যাণ্ট, স্যাণ্ডো গেঞ্জী ও মেয়েদের স্কার্ট-ফ্রক হওয়া উচিত। শাড়ি বা ঢিলে-ঢালা পোশাক বিপজ্জনক।

ড্রিলের সবচেয়ে দরকারী বা প্রথম পাঠ হল **সাবধান বা অ্যাটেনশন**। সাবধান শুনলেই দুই গোড়ালি এক লাইনে থাকবে। আর দুই পায়ের পাতা ৩০ ডিগ্রি অবস্থায় রাখতে হয়। হাঁটু, মেরুদণ্ড ও কাঁধ সোজা করে সামনের দিকে তাকাতে হয়। তখন দু'হাত দেহের দু'দিকে উরুতে লাগানো অবস্থায় থাকে। শরীরের ভার থাকে দুই পায়ের উপবে।

সাবধান বা অ্যাটেনশন

বিশ্রাম বা স্ট্যাণ্ড ইজ—শোনামাত্র বাঁ পা ১২ ইঞ্চি (৩০সেন্টিমিটার) মত বাঁদিকে সরিয়ে নিতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে হাত দু'খানি পিছনে যাবে, আর ডান হাতের পিছন দিকটা বাঁ হাতের তালুতে রাখতে হয়। তবে ডান হাতের বুড়ো আঙ্গুলটি বাঁ-হাতের বুড়ো আঙ্গুলের উপর দিয়ে যায়।

কোনও নতুন নির্দেশের আগে 'সাবধান' অবস্থায় ফিরতে হয়। তারপর নতুন নির্দেশ আসে।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পিছনে ঘোর—(ক) বাঁ পায়ের পাতার সামনে এবং ডান পায়ের গোড়ালিতে ভর দিয়ে ডান দিকে ১৮০ ডিগ্রি ঘুরতে হবে। (খ) তারপর বাঁ পা প্রায় ছয় ইঞ্চি (১৫ সেন্টিমিটার) উঁচু করে ডান পায়ের কাছে এনে দাঁড়াতে হয়। এই সময় দেহের ভারসাম্য ডান পায়ের উপরে পড়ে।

ডাইনে বা বাঁয়ে ঘোর—দু'দিকেই ঘুরতে গেলে হাঁটু সোজা রাখতে হয়। তবে ডান দিকে ঘোরার নির্দেশ পেলে বাঁ পায়ের পাতার সামনে এবং

ডান পায়ের গোড়ালিতে ভর দিয়ে ৯০ ডিগ্রি ঘুরতে হবে। তারপর বাঁ পা ছয় ইঞ্চি (১৫ সেন্টিমিটার) তুলে ডান পায়ের কাছে আনতে হয়। বাঁ দিকে ঘোরার নির্দেশ পেলে সব কিছু ডান দিকে ঘোরার বিপরীতভাবে করতে হবে।

এক লাইনে দাঁড়াও—এই নির্দেশের সঙ্গে সঙ্গে সকলেই এক লাইনে দাঁড়ায়। প্রত্যেকেই ডান হাত তুলে ডান দিকে দাঁড়ানো ছাত্র বা ছাত্রীর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে দূরত্ব স্থির করে। এই সময়ে প্রত্যেকের দূরত্ব এক বাহু। এরপর গুনতে বলা হলে ডান দিক থেকে এক, দুই, তিন করে গণনা শুরু হয়। তবে প্রতিজন নিজের সংখ্যা বলার সময় বাঁদিকে মুখ ঘুরিয়ে আবার সামনের দিকে পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে।

ধীরে চলো—এখন শরীর থাকবে সোজা। প্রথমে বাঁ পা বাড়িয়ে এগোতে হয়। দুই হাত-ই থাকবে দু'দিকের উরুতে লাগানো। পা

মার্চিং
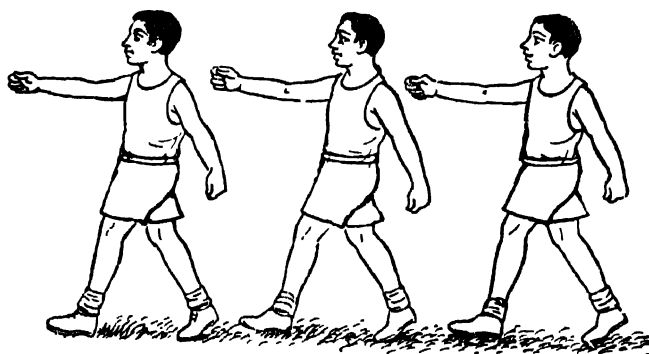
বাড়াতে হয় আনুমানিক ৩৮ সেন্টিমিটার। 'এক' বললে বাঁ পা ও 'দুই' বা 'দো' বললে ডান পা মাটিতে পড়ে।

দ্রুত চলো বা দৌড়ে চলো—শোনামাত্র গতি বাড়াতে হয়। তবে প্রত্যেকের পা সমতালে মাটিতে পড়বে ও উঠবে এবং এই সময় পায়ের পাতা মাটিতে আল্‌তোভাবে পড়েই উঠে আসে। হাত কনুইয়ের কাছে বেঁকে যায়। কনুইয়ের নিচের অংশ ও উপরের অংশে ১৩৫ ডিগ্রি কোণ সৃষ্টি হয়। শরীরের সঙ্গে হাতও আগে-পিছে দুলতে থাকে ওই ১৩৫ ডিগ্রি অবস্থায়। দ্রুত চলার সময়ও মাথা সোজা রাখতে হয়।

পত্রিকা দাও ইনাম্ নাও—এটি ড্রিলের নির্দেশের মধ্যে না হলেও

কোনও অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি বা গুণীজনের বুকে ব্যাজ, তাঁকে কিছু দিয়ে ফিরে আসার জন্য এটির প্রয়োজন হয়।

নির্দিষ্ট ছাত্র বা যুবক মার্চ করে নির্দিষ্ট অতিথি বা ব্যক্তির সামনে দাঁড়াবে তিন পা দূরত্বে। তাঁকে স্যালুট করবে এক পা এগিয়ে গিয়ে। উক্ত অতিথি এক পা এগিয়ে আসেন ও বাঁহাতে পত্রিকা বা চিঠি নেন কিংবা ওই ছাত্র তাঁকে ব্যাজ পরিয়ে দেয়। ছাত্র তারপর সাবধান অবস্থায় দাঁড়ায় ও পরে এক পা পিছিয়ে আসে। আবার তাঁকে স্যালুট দেয়। অবশেষে পিছনে ফিরে নিজের জায়গায় মার্চ করে চলে আসে।

স্যালুট—শোনামাত্র সাবধান অবস্থায় দাঁড়িয়ে ডান হাত বৃত্তাকারে মাথার কাছে আনতে হয়। হাতের প্রতিটি আঙুল তখন সবচেয়ে কাছাকাছি বা একটির সঙ্গে অপরটি লাগাতে হয়। ডান হাতের কব্জি ও কাঁধ যেন সোজা ডাইনে থাকে। স্যালুটের সময় ডান চোখ থেকে ডান হাতের বুড়ো আঙুলের দূরত্ব থাকে এক ইঞ্চি (২.৫ সেন্টিমিটার)।

স্যালুট

ড্রিল বা মার্চিং-এর সঙ্গে আমাদের দেশেও অন্যান্য দেশের মত লেজিম, ডাম্বেল, ইণ্ডিয়ান ক্লাবস্, ওয়াণ্ড প্রভৃতি স্বল্প ওজনের সরঞ্জাম নিয়ে শরীর-চর্চার রীতি বহুদিন প্রচলিত।

ক্রীড়া-শিক্ষকের নির্দেশে ওইগুলি চর্চার প্রয়োজন। এইগুলিও শৃঙ্খলাবোধে অপরিহার্য।
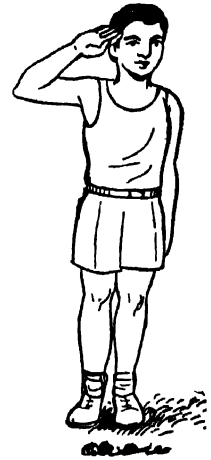
স্বদেশী ব্যায়াম

দেশীয় ব্যায়ামের মধ্যে **ডন, বৈঠক, সূর্য-নমস্কার** প্রভৃতির কথা বলা হয়েছে।

ডন দেওয়ার আগে দুই পায়ের পাতার সামনের দিকে ও হাঁটুতে ভর করে বসতে হবে। এবার দুই হাঁটু থেকে সামনের দিকে একহাত (২২.৫ সেন্টিমিটার) ও এক বিঘৎ (১৫ সেন্টিমিটার) দূরত্ব মেপে সেখানে পাশাপাশি হাতের তালুতে ও দু'পায়ের পাতার সামনের দিকে ভর করে কোমর তুলতে হবে। তবে

মেরুদণ্ড, মাথা সব যেন সোজা থাকে। এবার গোটা শরীর মাটির কাছাকাছি নামাতে হবে (ছবি দ্রষ্টব্য)। দুই কনুই ভেঙে যাবে ও কনুই দেহ থেকে
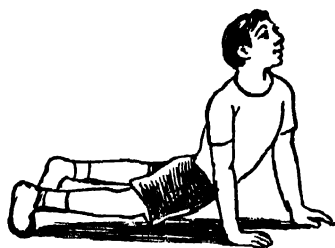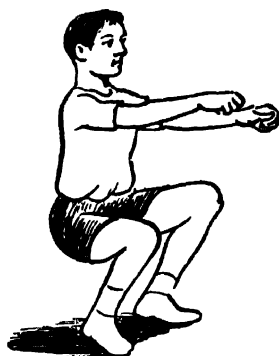
ডন বৈঠক

উপরে থাকে। কিন্তু গোটা শরীর সামনের দিকে নিয়ে আবার পিছনে নিতে হবে। তারপর আবার সোজা করে উপরে তুলতে হয়।

বৈঠক হল অনেকটা ওঠা-বসার মত। তবে এতে কোনও কিছুর সাহায্য না নিয়ে ওঠা-বসা করা হয় এবং হাত সর্বদা সামনের দিকে থাকে।

যোগব্যায়াম/আসন

শরীর সুস্থ ও সবল রাখার জন্য যোগব্যায়ামের চাইতে ভাল ব্যায়াম নেই। যোগব্যায়ামের জন্য বড় জায়গা প্রয়োজন হয় না, দরকার নেই যন্ত্রপাতি বা সরঞ্জামের। তবে যোগব্যায়াম বা আসন করার আগে খালি-হাতে অন্যান্য ব্যায়াম করা স্বাস্থ্যের পক্ষে আরও মঙ্গলের।

বজ্রাসন : দু'পায়ের গোড়ালির উপর বসতে হবে (ছবি দ্রষ্টব্য)। হাত দু'খানি দুই হাঁটুর উপরে রাখতে হবে। হাঁটু থেকে গোড়ালি পর্যন্ত উরুং নিচে লাগোয়া থাকবে। সাধারণতঃ খাওয়ার পরই এই আসনটি করার নিয়ম। বজ্রাসনে মিনিট পাঁচেক অবস্থান করতে হয়।

হলাসন : (ক) হাত দু'খানি শরীরের দুই ধারে রেখে চিৎ হয়ে শুতে হবে।

(খ) এবার হাতের উপর ভারসাম্য রেখে দুই পা একসঙ্গে মাটি বা মেঝে থেকে তুলে পিছনে নিয়ে মাথা থেকে দূরে (যতখানি পারা যায়) রাখতে হবে।
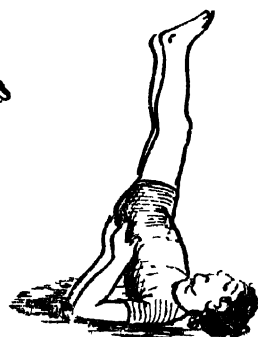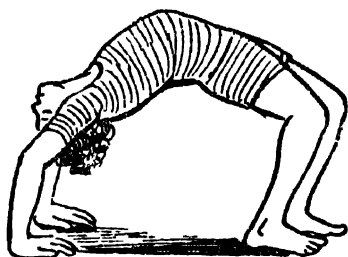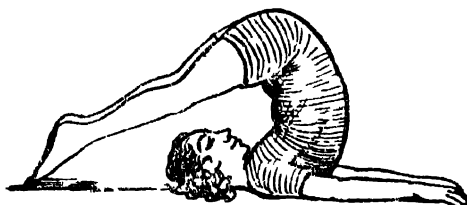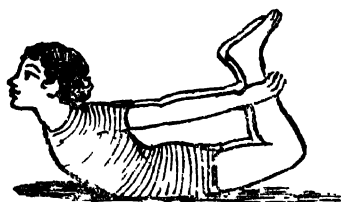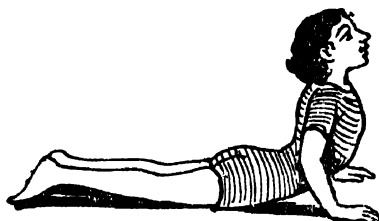
বাঁদিকে উপর থেকে নিচে :—ভুজঙ্গাসন, ধনুরাসন, হলাসন, চক্রাসন।
ডানদিকে উপর থেকে নিচে :—উৎকটাসন, বজ্রাসন, সর্বাঙ্গাসন

(গ) এই সময় স্বাভাবিকভাবে দম নিতে হয় ও ছাড়তে হয়।

উৎকটাসন : (ক) সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে।

(খ) হাঁটু বাঁকিয়ে গোড়ালি তুলে পায়ের পাতার অগ্রভাগের উপর ভারসাম্য রাখতে হবে।

(গ) হাত থাকবে হাঁটুর উপরে এবং মেরুদণ্ড সোজা করে সম্মুখে তাকাতে হবে।

উৎকটাসন

উষ্ট্রাসন

(ঘ) এবার 'খ' অবস্থায় ফিরতে হবে, তারপরে 'ক' অবস্থায়।

চক্রাসন : (ক) সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে।

(খ) যে-কোনও একদিকে বেঁকে সেইদিকের হাঁটু স্পর্শ করতে হয়। অন্যদিকেও অনুরূপ করতে হবে।

আর এক ধরনের চক্রাসন (ছবিতে) হল বেঁকে পিছনে যাওয়া। তখন দেহের ভারসাম্য থাকে হাত ও পায়ের উপর।

ধনুরাসন : (ক) মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়তে হবে, তবে হাত দু'খানি থাকবে দু'ধারে।

(খ) হাত তুলতে হবে।

(গ) হাঁটুর সংযোগে পা বাঁকাতে হবে।

(ঘ) ডান হাতে ডান পা ও বাঁ হাতে বাঁ পা ধরতে হবে পিছনের দিকে হাত নিয়ে।

(ঙ) এবার বুক তুলতে হয়। তুলতে হবে উরুও, এবং সমস্ত দেহের ভার থাকবে পেটে।

সর্বাঙ্গাসন : (ক) চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে এবং হাত শরীরের দু'ধারে লম্বা করে রাখতে হবে।

(খ) পা দু'খানি ৩০ ডিগ্রি তুলে বিশ্রাম নিতে হয়।

(গ) আরও তুলে ৬০ ডিগ্রি করে বিশ্রাম নিতে হবে।

(ঘ) এবার ৯০ ডিগ্রি তুলে বিশ্রাম নিতে হবে।

(ঙ) এবার দু'হাত দিয়ে দেহের ভারসাম্য রক্ষা করাই রীতি। এই সময় দুই কনুইয়ের উপরই দেহভার পড়ে। এবারে পাঁচ পর্যন্ত গুনে 'ক' অবস্থায় ফিরতে হবে।

গোমুখাসন : (ক) দুটি পা সামনে ছড়িয়ে বসতে হবে।

(খ) ডান পা হাঁটুব কাছ থেকে ভেঙে বাঁ হাঁটুর উপরে এনে ডান পায়ের গোড়ালি দিয়ে বাঁ দিকের নিতম্ব ছুঁতে হবে।

(গ) এবার বাঁ পা হাঁটুর কাছ থেকে ভেঙে ডান হাঁটুর নিচ দিয়ে বাঁ পায়ের গোড়ালি দিয়ে ডান দিকের নিতম্ব ছুঁতে হবে।

গোমুখাসন

(ঘ) ডান হাত মাথার উপরে তুলে কনুইয়ের কাছ থেকে ভেঙে পিঠে নামাতে হবে ও বাঁ হাত কনুইয়ের কাছ থেকে ভেঙে ডান দিকে ঘুরিয়ে ডান হাতের আঙুলগুলি ধরতে হবে।

(ঙ) এবার হাত বদল করে বাঁ হাত উপরে তুলে কনুইয়ের কাছ থেকে ভেঙে পিঠে নামাতে হবে এবং ডান হাত কনুইয়ের কাছ থেকে ভেঙে বাঁদিকে ঘুরিয়ে বাঁ হাতের আঙুলগুলি ধরতে হবে।

(চ) মেরুদণ্ড সর্বদা সোজা রাখতে হয়।

উষ্ট্রাসন : এই আসনে অবস্থানকালে আসনকারীকে উটের মত দেখা যায়। (ক) উষ্ট্রাসন করার আগে পিছন দিক থেকে দুই হাতে পায়ের গোড়ালি ধরতে হবে।

(খ) এবার বুক যথাসম্ভব এগিয়ে মাথা পিছনে নিয়ে ধনুকের মত শরীর বাঁকাতে হবে। দেখতে হবে সর্বদা যেন হাঁটু ও পায়ের পাতা মাটিতে থাকে। এই আসন করলে গলা পর্যন্ত টান পড়ে।

ভুজঙ্গাসন ঃ (ক) উপুড় হয়ে শুয়ে হাতের চেটো মাটিতে বুকের পাশে রেখে বিশ্রাম নিতে হবে। বিশ্রাম দিতে হবে দু'পায়ের পাতাকেও।

(খ) এবার হাতে ভারসাম্য রেখে বুক আস্তে আস্তে তুলতে হবে।

(গ) পায়ের পাতা তখন বিশ্রাম নেবে।

(ঘ) ধীরে ধীরে মাথা পিছনের দিকে নিয়ে যেতে হয় ; কিন্তু সম্পূর্ণভাবে যেন না যায়।

(ঙ) এবার মাথা তুলতে হবে। এই সময় হাতের উপর ভারসাম্য থাকায় কনুই কিছুটা বেঁকে থাকে।

সবশেষে পাঁচ পর্যন্ত গুনে শুরুর অবস্থায় ফিরতে হয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

জিমন্যাস্টিকস্

আন্তর্জাতিক জিমন্যাস্টিক সংস্থা বা 'ফেডারেশন ইণ্টারন্যাশনেল ছ জিমন্যাস্টিকস্' ছেলে ও মেয়েদের জন্য জিমন্যাস্টিকস্‌কে দু'ভাগে ভাগ করেছেন। তাঁরা ছেলেদের জন্য ১২টি ও মেয়েদের জন্য ৮টি ব্যায়াম নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন।

ব্যায়ামসূচী

ছেলেদের প্রতিযোগিতায় ঃ হরাইজণ্টাল ফিক্সড বার, প্যারালেল বার, রিং, পমেল্ড হর্স, লং হর্স (ভল্ট), ফ্রী-স্ট্যাণ্ডিং এক্সারসাইজ। এইগুলির প্রত্যেকটি একটি করে আবশ্যিক ও একটি করে ঐচ্ছিক ব্যায়াম করতে হয়।

মেয়েদের প্রতিযোগিতায় ঃ বিভিন্ন উচ্চতার প্যারালেল বার, বিম ব্যালান্স, লং হর্স, আনপমেল্ড, সাইডওয়েজ (বিটবোর্ড সহ)।

শ্রেণীবিন্যাস

ছেলে ঃ ওলিম্পিক গেমসে ছেলেদের দলগত প্রতিযোগিতায় ১২টি পৃথক ব্যায়ামের ৫টি সর্বোচ্চ স্কোর যোগ করে শ্রেণীবিন্যাস হয়ে থাকে। ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতায় প্রতিটি ব্যায়ামের স্কোর যোগ করাই বিধি। সরঞ্জামের ব্যক্তিগত ব্যায়ামে আবশ্যিক ও ঐচ্ছিক ব্যায়ামের গড় স্কোরের

সঙ্গে ফিক্সড্ বার, প্যারালেল বার, রিং, পমেল্ড হর্স, লং হর্স, ফ্রী-স্ট্যাণ্ডিং এক্সারসাইজের চূড়ান্ত ব্যায়ামগুলির পয়েণ্ট যোগ হয়।

মেয়ে: মেয়েদের দলগত প্রতিযোগিতার সিদ্ধান্ত হয় ৮টি ব্যক্তিগত ব্যায়ামের ৫টির সর্বোচ্চ স্কোর নিয়ে। ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতায় ৮টি প্রতিযোগিতার পৃথক স্কোর যোগ করে। সরঞ্জামের ব্যক্তিগত ব্যায়ামে আবশ্যিক ও ঐচ্ছিক ব্যায়ামে গড় স্কোরের সঙ্গে যোগ হয়ে থাকে ফ্রী-স্ট্যাণ্ডিং এক্সারসাইজ (বাদ্যসহ), বিম, বিভিন্ন উচ্চতায় বার ও ভল্টের চূড়ান্ত ব্যায়ামগুলির স্কোর।

এন্ট্রি :—সাধারণত: প্রতিটি দেশ আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় ৬ জনের দল (ছেলে ও মেয়ে) নিয়ে যেতে পারে। এদের প্রত্যেকেই সমস্ত ব্যায়ামে পারদর্শী থাকে। প্রতিযোগিতায় তাই করতে হয়। তবে দল কখনও ৫ জনের কমে হয় না। অবশ্য যারা দল পাঠাতে সক্ষম নয়, তারা ব্যক্তিগত প্রতি-যোগিতার জন্য ৩ জন পাঠাতে পারে।

প্রতিযোগিতা সম্পর্কে সাধারণ নিয়ম-কানুন: ওলিম্পিকসে বা আন্তর্জাতিক জিমন্যাষ্টিকসে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেকের বয়স ১৮ বছর হওয়া চাই। তবে অনুমতি নিয়ে ১৬ বছরের মেয়েরাও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হতে পারে। এর চাইতে কম বয়স হলে কিছুতেই চলবে না।

প্রতিযোগিতা আরম্ভের আগে দলনেতা সরঞ্জামগুলি পরীক্ষা করে দেখেন ঠিক আছে কিনা। প্রতিযোগিতা চলাকালে ঐ নেতা নিজ দলকে পরিচালনা করেন। রিং বা ফিক্সড্ বার-এর সময় তিনি জিমন্যাস্টকে তুলে ধরতে পারেন। অবধারিত দুর্ঘটনা থেকে অব্যাহতির জন্য তিনি জিমন্যাস্টকে সরঞ্জামের কাছে পূর্বাবস্থায় পৌঁছে দেন। তবে তিনি ব্যায়ামে সাহায্য করতে পারেন না, কথা বলাও নিষেধ। তাঁর কাজে পয়েণ্ট যোগ হয় না। তিনি জুরি ও দলের সঙ্গে মধ্যস্থতা করেন মাত্র।

মেয়েদের দল কেবলমাত্র মেয়ে-নেতার (বা নেত্রীর) নির্দেশেই চলে।

বিচারকমণ্ডলী সর্বদা প্রতিযোগিতা প্রাঙ্গণেই উপস্থিত থাকবেন।

দলগত প্রতিযোগিতা দুই দফায় হয়। প্রথমে আবশ্যিক ব্যায়াম, তারপর ঐচ্ছিক ব্যায়াম। সর্বদা একই সরঞ্জাম ব্যবহার করতে হয় এবং কেউ কখনও যেন তা বদল না করে।

যারা বিভিন্ন ইভেণ্টে বা ব্যায়ামে অংশ নেয়, কেবল তাদেরই ফাইনালে

অংশ নিতে দেওয়া হয়। ফাইনালে প্রত্যেককে ঐচ্ছিক ব্যায়াম করাই রীতি। কোন জিমন্যাস্ট জুরির বিনা অনুমতিতে দলের কাছ থেকে চলে গেলে আর তাকে দলের সঙ্গে যোগ দিতে দেওয়া হয় না। অন্যান্য খেলার মত এতে 'বদলী' বা 'পরিবর্ত' কাউকে নেওয়া যায় না। কেউ অসুস্থ বা আহত হলে সঙ্গে সঙ্গে তা নেতাকে জানাতে হবে, দরকার হবে চিকিৎসকের প্রয়োজনীয় সার্টিফিকেট।

প্রতিযোগী অসুস্থ বা আহত হলে ৩০ মিনিট সময় দেওয়া হয়। এর মধ্যে নির্দিষ্ট জিমন্যাস্ট প্রতিযোগিতায় যোগ না দিলে তার দল তাকে বাদ দিয়ে প্রতিযোগিতা শুরু করে এবং অসুস্থ বা আহত খেলোয়াড় বাদ হয়ে যায়।

সরঞ্জামের ইভেন্টে জিমন্যাস্টরা সেই ব্যায়াম আবার করতে পারে। পয়েন্ট না হারিয়ে আগে জুরিকে জানাতে হয় কোন্‌টি তার শেষ ব্যায়াম। লং হর্সে প্রত্যেকে দু'বার ভল্ট দিতে পারে (আবশ্যিক ও ঐচ্ছিক উভয় ক্ষেত্রে)। ফ্রী-হ্যাণ্ড দু'বার করা যায় না, লং হর্স ছাড়া ঐচ্ছিক ব্যায়ামে পুনরাবৃত্তি নিষিদ্ধ। সবচেয়ে বড় কথা —কেউ নিজের সরঞ্জাম ব্যবহার করতে পারে না। সব সরঞ্জাম সরবরাহ করবেন উদ্যোক্তারা। তবে প্রতিযোগিতার সময় কয়েকদিন আগে দু' সেট সরঞ্জাম দেওয়া হয় অনুশীলনের জন্য।

ছেলেদের সরঞ্জাম

ফিক্সড্ বার ঃ মসৃণ ইস্পাতের ২.৮ সেন্টিমিটার ব্যাসের হবে। মাটি থেকে উচ্চতা ২.৫০ মিটার। দৈর্ঘ্য —(এক দণ্ড থেকে আর এক দণ্ড পর্যন্ত) ২.৪০ মিটার।

প্যারালেল বার ঃ কাঠের তৈরি খাড়া বারগুলির ব্যাস ৫.১ সেন্টিমিটার ও সমান্তরালগুলির ব্যাস ৪.১ সেন্টিমিটার, মাটি থেকে উচ্চতা ১.৭০ মিটার। দৈর্ঘ্য ৩.৫০ মিটার। দুই সমান্তরাল বারের দূরত্ব ৪২.৪৮ সেন্টিমিটার।

হর্স ঃ দৈর্ঘ্য ১.৬০ মিটার, চওড়া ৮০ সেন্টিমিটার।

পমেল্ড হর্স ঃ হর্সের পিছন দিকটা মাটি থেকে ১.১০ মিটার উঁচু এবং পমেল্ডের উচ্চতা হর্সের পিছন থেকে ১২ সেন্টিমিটার।

লং হর্স ঃ হর্সের পিছন দিকটা মাটি থেকে ১.৩৫ মিটার উঁচু।

রিং ঃ রিং-এর ফ্রেম মাটি থেকে ৫.৫০ মিটার উঁচু হয়। রিং-এর ব্যাস ১৮ সেন্টিমিটার। দুই দড়ির ব্যবধান ৫০ সেন্টিমিটার। মাটি থেকে রিং-এর উচ্চতা আড়াই মিটার।

রিং
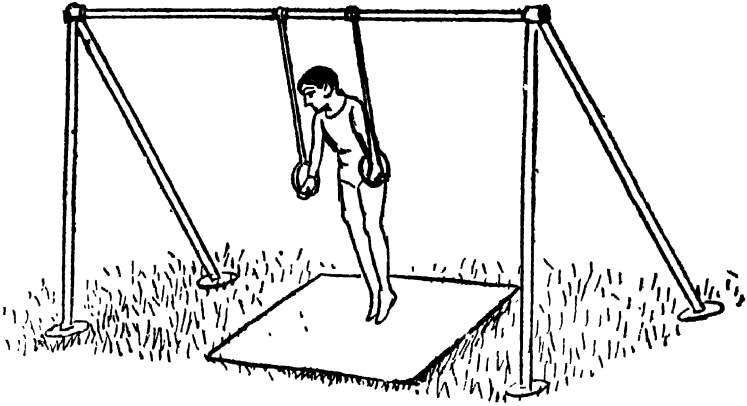
ফ্লোর ঃ দাঁড়িয়ে খালি-হাতের ব্যায়ামগুলির জন্য সমান মেঝে বা মাঠ চাই ১৪ × ১৪ মিটার মাপের। মেঝে বা মাঠ অবশ্যই কার্পেট বা নরম গদী দিয়ে মোড়া থাকবে। গদীর উচ্চতা ৫.১০ সেন্টিমিটার।

বিট বোর্ড ঃ দৈর্ঘ্য ১২০ সেন্টিমিটার, সামনের দিকে উচ্চতা ১২ সেন্টি-মিটার ও চওড়া ৬০ সেন্টিমিটার।

মেয়েদের সরঞ্জাম

বার ঃ সবচেয়ে উঁচু ২৩০ সেন্টিমিটার।
সবচেয়ে নিচু ১৫০ সেন্টিমিটার।
লম্বা ৩০০ সেন্টিমিটার।
ডিম্বাকৃতি বার ৪১ × ৫১ সেন্টিমিটার।

দুই বারের দূরত্ব ৪৩ থেকে ৪৮ সেন্টিমিটার।

বিম ঃ উপরের দিকের উচ্চতা ১২০ সেন্টিমিটার। দৈর্ঘ্য ৫০০ সেন্টিমিটার।

বিট-বোর্ডঃ ১০ সেন্টিমিটার উচ্চতার শক্ত বিট বোর্ড দরকার।

বিম ব্যালান্স
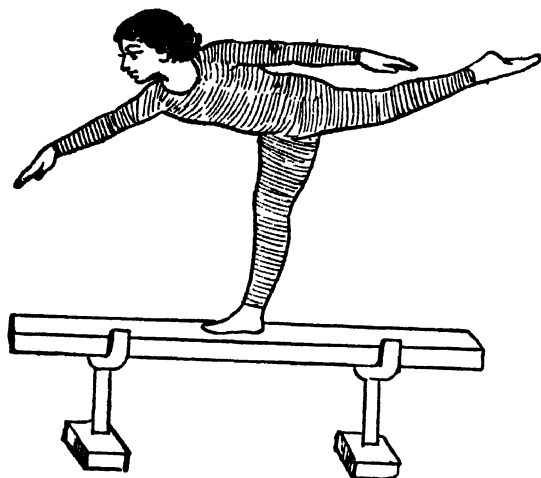
লং হর্সঃ লম্বা ১৬০ সেন্টিমিটার, উচ্চতা ১১৮ সেন্টিমিটার ও চওড়া ৩৫ সেন্টিমিটার।

লং হর্সের বিট বোর্ডের দৈর্ঘ্য ১২০ সেন্টিমিটার, উচ্চতা ১২ সেন্টিমিটার ও চওড়ায় ৬৪ সেন্টিমিটার হবে।

ফ্লোরঃ দাঁড়িয়ে খালি-হাতের ব্যায়ামের জন্য ১৪ × ১৪ মিটার আয়তনের মাঠে বা মেঝেতে কার্পেট অথবা গদীর আবরণ দিতে হবে।

অ্যাথ্‌লেটিকস্‌

ইণ্টারন্যাশনাল অ্যামেচার অ্যাথলেটিক ফেডারেশন একটি অ্যাথ্‌লেটিকস্‌ প্রতিযোগিতা পরিচালনার জন্য বহু কর্মকর্তার সুপারিশ করেছেন। যথাঃ একজন ম্যানেজার, একজন সেক্রেটারি ও একজন টেকনিক্যাল ম্যানেজার।

প্রতিযোগিতার কর্মকর্তাঃ ট্র্যাক ইভেণ্টের জন্য একজন রেফারী; ফিল্ড ইভেণ্টের জন্য এক বা একাধিক রেফারী; ওয়াকিং ইভেণ্টের জন্য একজন রেফারী; ট্র্যাক ইভেণ্টের জন্য চার বা অধিক জাজ; ফিল্ড ইভেণ্টের জন্য চার বা অধিক জাজ, ওয়াকিং ইভেণ্টের জন্য চার বা অধিক জাজ; ট্র্যাক ইভেণ্টের জন্য

চার বা অধিক আম্পায়ার ; তিন বা অধিক টাইমকীপার ; এক বা একাধিক স্টার্টার; এক বা একাধিক রি-কল স্টার্টার; স্টার্টারের এক বা একাধিক সহকারী অথবা মার্কসম্যান ; এক বা একাধিক ল্যাপ স্কোরার ; একজন রেকর্ডার এবং একজন মার্কার।

অতিরিক্ত কর্মকর্তা : এক বা একাধিক অ্যানাউন্সার ; একজন সরকারী সার্ভেয়র ; এক বা একাধিক ডাক্তার ; প্রতিযোগী, কর্মকর্তা ও সাংবাদিকের জন্য স্টুয়ার্ড।

মেয়েদের ইভেন্টে যথাসম্ভব মহিলা কর্মকর্তা বা পরিচালক রাখা উচিত এবং একজন মহিলা ডাক্তার আবশ্যিক।

প্রতিযোগিতার নিয়ম-কানুন

এন্ট্রি :

(ক) ইন্টারন্যাশনাল অ্যামেচার অ্যাথ্‌লেটিকস্ ফেডারেশনের (আই. এ. এ. এফ) বিধি অনুসারে প্রতিযোগিতায় কেবলমাত্র অপেশাদাররাই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে।

(খ) কোনও প্রতিযোগী অন্য দেশে গিয়ে প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারে স্বদেশের জাতীয় অ্যাথ্‌লেটিক সংস্থার লিখিত অনুমতি নিয়ে।

(গ) প্রত্যেক মেয়ে প্রতিযোগীকে স্বদেশের জাতীয় সংস্থা অনুমোদিত ডাক্তার কর্তৃক 'সেক্স' সার্টিফিকেট নিতে হয়।

(ঘ) কোনও মেয়ের কাছে মেডিকেল সার্টিফিকেট না থাকলে উদ্যোক্তারা তিনজন ডাক্তার নিয়ে প্যানেল করে মেয়েদের নারীত্বের পরীক্ষা করতে পারেন।

প্রতিযোগিতা :

(ক) আই. এ. এ. এফ. অনুমোদিত সরঞ্জাম ছাড়া অন্য কোনও সরঞ্জাম নিয়ে প্রতিযোগিতা করলে তা 'সম্পূর্ণ' বলে গ্রহণ করা হয় না।

(খ) জাম্প ও থ্রো ইভেন্টের ট্রায়ালের সংখ্যা কর্তৃপক্ষের অনুমতিসাপেক্ষে হ্রাস করা যায়। তবে এই সম্পর্কে কর্তৃপক্ষ প্রতিযোগিতার আগে সিদ্ধান্ত নেন।

(গ) প্রতিযোগীদের পোশাক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু

ডিজাইন যেন অন্যের প্রতিবাদের কারণ না হয়। ভিজলেও পোশাক যেন অস্বচ্ছ থাকে।

(ঘ) প্রতিযোগী এক বা উভয় পায়ে জুতো ব্যবহার করতে পারে। এই জুতো পরার হেতু তার পা দু'টিকে রক্ষা, মাটি আঁকড়ে ধরা বা দৌড়ানো ইত্যাদিতে সুবিধা। এছাড়া অতিরিক্ত অন্য কোনও সুযোগ নিতে জুতো ব্যবহার নিষেধ। জুতোয় স্প্রিং বা ওই ধরনের কিছু যেন না থাকে। গোড়ালির উচ্চতা ০'২৫ ইঞ্চির বেশি এবং জুতোর সোল ০.৫ ইঞ্চির বেশি যেন না হয়। তবে হাঁটা বা ওয়াকিং প্রতিযোগিতায় ০.৫ ইঞ্চির বেশি উঁচু সোলের জুতো ব্যবহার করা যায়। জুতোর নিচে কাঁটা বা স্পাইক থাকবে—সোলে ৬টি ও গোড়ালিতে ২টি।

(ঙ) প্রত্যেক প্রতিযোগী পিঠ ও বুকের পোশাকে নম্বর সেঁটে রাখবে। সেই নম্বরের সঙ্গে অবশ্যই প্রোগ্রামে লিখিত নম্বরের মিল থাকবে। ট্র্যাক-স্যুট পরে প্রতিযোগিতায় নামলে উভয় দিকেই যেন নম্বর থাকে। পোলভল্ট ও হাইজাম্পের সময় প্রতিযোগীরা পিঠ বা বুকের যে কোনও একদিকে নম্বর লাগাতে পারে। নম্বর ছাড়া কোনও প্রতিযোগীকে প্রতিযোগিতায় নামতে দেওয়া হয় না।

(চ) কোনও প্রতিযোগী দৌড়তে দৌড়তে অন্য প্রতিযোগীকে কনুই দিয়ে গুঁতো মারলে বা অন্যকে বাধা দিলে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের যোগ্যতা হারাবে। রেফারী তখন ইচ্ছা করলে 'অযোগ্য' প্রতিযোগীকে বাদ দিয়ে পুনরায় দৌড়ের নির্দেশ দিতে পারেন। কিন্তু ইভেন্টের ট্রায়ালে বাধাপ্রাপ্ত অ্যাথ্‌লীটকে আবার সুযোগ দেওয়া যেতে পারে।

(ছ) সমস্ত দৌড়ে প্রত্যেক প্রতিযোগী শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নিজের লেনেই থাকবে।

(জ) রেফারী যদি আম্পায়ার বা জাজ-এর কাছ থেকে রিপোর্ট পান—প্রতিযোগী উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে লেন পরিবর্তন করেছে, তাহলে রেফারী তাকে 'অযোগ্য' ঘোষণা করতে পারেন। কিন্তু তিনি যদি রিপোর্ট পান লেন-পরিবর্তন ইচ্ছাকৃত নয়, তাহলে সেই অ্যাথ্‌লীটকে যোগ্য বলেই গণ্য করা হয়।

(ঝ) কোনও প্রতিযোগী দৌড়বার সময় স্বেচ্ছায় ট্র্যাক ছেড়ে চলে গেলে আর তাকে এই দৌড়ে অংশ নিতে দেওয়া হয় না।

(ঞ) রেফারীর পূর্ব অনুমতি ছাড়া অ্যাথ্‌লেটিকস্‌ এরেনার মধ্যেকার কোনও কর্মকর্তা মাঝপথে কাউকে সময় বলে দিতে পারেন না।

(ট) কোনও প্রতিযোগী ফিল্ড ইভেণ্টে নির্দিষ্ট সময়ে হাজির না হলে পরে আর তাকে ট্রায়ালে ডাকা হয় না।

(ঠ) একই অ্যাথ্‌লীট যদি ট্র্যাক ও ফিল্ড দুই ইভেণ্টে অংশ নেয়, অথবা তার একাধিক ফিল্ড ইভেণ্টের প্রতিযোগিতা একই সঙ্গে চলে, তবে জাজ-রা রদবদল করে তাকে ডাকতে পারেন ট্রায়ালে। তাই বলে প্রতিযোগী কোনও ইভেণ্টে অনুপস্থিত থাকলে, তা আবার অনুষ্ঠানের দাবি জানাতে পারে না।

(ড) নাম বা নম্বর ডাকার পরে কেউ দেরী করে এলে 'ফল্ট' হয়েছে লিখে রাখা হয়। দ্বিতীয়বার দেরী করলে তাকে 'অযোগ্য' ঘোষণা করা হয়।

তবে হাইজাম্প, লং জাম্প, ট্রিপল জাম্প, সটপাট, ডিসকাস, হ্যামার ও জ্যাভেলিনে ২ মিনিট এবং পোলভল্টে ৩ মিনিট পর্যন্ত অপেক্ষা করা হয়।

(ঢ) পোলভল্ট বা থ্রো ইভেণ্টে সরঞ্জাম শক্ত করে ধরার জন্য চকের গুঁড়ো, মাটি (ধুলো) হাতে মাখানো যেতে পারে।

(ণ) একটি রাউণ্ড শেষ হলে রেফারী ফিল্ড ইভেণ্টের স্থান বদল করতে পারেন।

(ত) রিলে রেস ছাড়া অন্য কোনও দৌড়ের সময় ট্র্যাকের লেনে চেক মার্ক দেওয়া নিষেধ। ট্র্যাকের পাশে চিহ্ন দিলেও অ্যাথ্‌লীট বা অ্যাথ্‌লীটদের বিরুদ্ধে সাহায্য গ্রহণের অভিযোগ আনা যায়।

রাউণ্ড, হিট ও প্রাথমিক প্রতিযোগিতা

ট্র্যাক ইভেণ্ট :

(ক) ট্র্যাক ইভেণ্টগুলিতে প্রাথমিক রাউণ্ড বা হিটের প্রচলন হয়েছে প্রতিযোগীর সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায়। চূড়ান্ত পর্যায়ের আগে প্রাথমিক পর্যায়ে বাছাই করা হয়।

(খ) সমস্ত প্রাথমিক রাউণ্ডে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানাধিকারী পরবর্তী রাউণ্ডের জন্য যোগ্য বিবেচিত হয়। তাছাড়া অনেক সময় ন্যূনতম সময়ও ধার্য করা হয়।

ফিল্ড ইভেন্ট :

(ক) প্রয়োজন মনে করলে ফিল্ড ইভেন্টেও প্রাথমিক রাউণ্ডের প্রতিযোগিতা হয়।
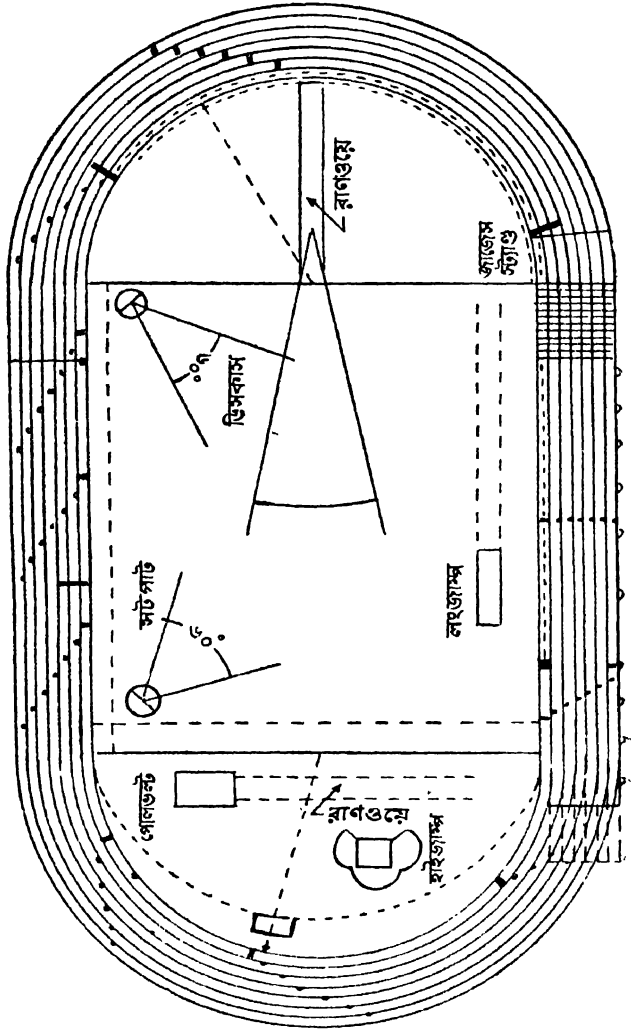
৪০০ মিটার দৌড়ের ট্র্যাক। ভিতরে ডিসকাস, সটপাট, লং জাম্প, হাইজাম্প ও পোলভল্ট-এর আরম্ভ-স্থান। এইগুলির আরম্ভ-স্থান এখন ৪৫° ডিগ্রি হয়েছে। উপরের রানওয়েটি জ্যাভেলিনের আরম্ভ-স্থান।

(খ) তবে কার পর কাকে ডাকা হবে তা স্থির হয় ড্র বা লটারির মাধ্যমে। প্রাথমিক পর্যায়ের পরে যারা পরবর্তী পর্যায়ের জন্য যোগ্য বিবেচিত হয়, তাদের জন্য পরবর্তী প্রতিযোগিতায় পুনরায় নতুন ড্র বা লটারি করতে হবে।

ডোপিং ঃ

(ক) উত্তেজক ওষুধ খেয়ে খেলোয়াড়রা ক্লান্তি দূরই শুধু নয়, শক্তি বৃদ্ধি করে দৌড়ের সময় কমাতে, ছোঁড়া ও লাফের দূরত্ব বাড়তে সচেষ্ট হয়। এই ওষুধ খাওয়া নিষিদ্ধ শুধু নৈতিক কারণে নয়, শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর বলেও।

(খ) কোনও প্রতিযোগী উত্তেজক ওষুধ খেলে তাকে আই. এ. এ. এফ বহুকালের জন্য অ্যাথলেটিকসে অংশ গ্রহণ থেকে বঞ্চিত করেন। যারা এই কাজে সাহায্য করে তৎক্ষণাৎ তাদের মাঠ থেকে বার করে দেওয়া হয়।

(গ) কর্তৃপক্ষের নির্দেশ পেলে যে কোনও অ্যাথ্‌লীট প্রতিযোগিতার পর মুহূর্তে 'অ্যান্টিডোপিং টেস্ট দেবে:

মাপ ও ওজন ঃ

(ক) অনুমোদিত স্টীল টেপ বা বার (সেন্টিমিটারের/কোয়ার্টার ইঞ্চির) দ্বারা দূরত্ব মাপতে হবে। সরকার অনুমোদিত দাঁড়িপাল্লায় সমস্ত ওজন মাপাই বিধি।

(খ) ছোঁড়া ও লাফের ইভেন্ট মাপবার জন্য স্টীল টেপ দ্বারা মাপবেন কর্মকর্তারা। মাপতে হয় ছোঁড়ার জায়গা বা 'টেক-অফ্‌' পয়েন্ট, সার্কল অথবা স্ক্র্যাচ-লাইন থেকে। মিটারে মাপা হলে কাছাকাছি সেন্টিমিটারও থাকা চাই। তবে ডিসকাস, হ্যামার ও জ্যাভেলিনে দূরত্ব মাপা হয় জোড়া সেন্টিমিটারে (যথা ৬২ ৪৪, ৬২.৪৬, ৬২.৪৮ ইত্যাদি)। ফুটে মাপা হলে কোয়ার্টার ইঞ্চি পর্যন্ত রেকর্ড রাখতে হবে। তবে ডিসকাস, হ্যামার ও জ্যাভেলিনে এক ইঞ্চি করে বাড়বে। লাফের উচ্চতা মাপতে স্টীল টেপ বা বার খাড়া বা ৯০ ডিগ্রি সমকোণে ধরতে হবে।

(গ) রাস্তায় (রোড রেস, ম্যারাথন) মাপ নিতে গেলে দৌড়ের গতি লক্ষ্য রাখতে হয়। এতে সরকারী সার্ভেয়রের সাহায্য নেওয়া হয়।

টাই ঃ ট্র্যাক ইভেন্টে ঃ হিটে টাই হলে উভয়কে পরবর্তী পর্যায়ের জন্য নির্ধারিত করা হয়। তা না হলে আবার প্রতিযোগিতা করা যেতে পারে।

ফাইনালে প্রথম স্থানে টাই হলে রেফারী দেখবেন আবার ওদের মধ্যে প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা সম্ভব কিনা। সম্ভব না হলে উভয়কে 'প্রথম' ঘোষণা করা হয়। অন্যান্য 'স্থান' (দ্বিতীয় বা তৃতীয়) টাই-এর জন্য পুনরায় প্রতিযোগিতা হয় না।

টাই : ফিল্ড ইভেন্টে :

(ক) হাইজাম্প বা পোলভল্টে টাই হলে প্রথমে দেখতে হবে কম লাফ দিয়ে কে সমান উচ্চতায় উঠেছে, তাকেই প্রথম ঘোষণা করা বিধি।

(খ) এতেও টাই থাকলে দেখতে হয় শেষ উচ্চতায় পৌছতে কার কম ফল্ট বা ভুল হয়েছে।

(গ) এর পরেও টাই থাকলে কে সবচেয়ে কম লাফ দিয়ে শেষ উচ্চতায় পৌছেছে।

(ঘ) এর পরেও টাই থাকলে পুনরায় লাফের নির্দেশ দেওয়া হয়, যে উচ্চতায় তারা চেষ্টা করেও অতিক্রম করতে পারেনি। এতে সিদ্ধান্ত না হলে বার নিচে নামানো হয় বা উপরে তোলা হয় ঘোষণা দ্বারা এবং প্রতিযোগীরা আবার লাফ দেয়।

প্রতিবাদ : (ক) কোনও অ্যাথ্‌লীটের সম্পর্কে প্রতিবাদ করতে হলে জুরি অফ অ্যাপীলের সভার আগে তা করতে হবে। জুরি না থাকলে রেফারীর কাছেও প্রতিবাদ করা যায়। সভার আগে প্রতিবাদের নিষ্পত্তি না হলে 'প্রতিবাদসাপেক্ষে প্রতিযোগিতা' চলে।

(খ) ইভেন্ট চলাকালে অবৈধ কিছু ঘটলে প্রতিবাদ তৎক্ষণাৎ করতে হয়। ফল ঘোষণার পরে ৩০ মিনিটের বেশি যেন দেরী না হয়। (কিংবা প্রাথমিক রাউণ্ড শুরুর ১৫ মিনিটের মধ্যে।

ট্র্যাক ও লেন : (ক) দৌড়ের ট্র্যাক কখনও যেন ২৪ ফুট বা ৭.৩২ মিটারের কম না হয়। সম্ভব হলে সীমানার ভিতরের দিকে ৫ সেন্টিমিটার বা ২ ইঞ্চি পরিমাণ মোটা সিমেন্ট, কাঠ ইত্যাদি দিয়ে লাইন টানা উচিত। ঘাসের ট্র্যাকে ৫ মিটার বা ৫ গজ পর-পর ফ্ল্যাগ পোঁতা উচিত।

(খ) দৌড়ের প্রতিটি লেন চওড়া হয় সর্বনিম্ন ১.২২ মিটার (৪ ফুট) ও সর্বাধিক ১.২৫ মিটার (৪ ফুট ১½ ইঞ্চি)।

(গ) ৪×৪০০ মিটার রিলে রেসে প্রথম ধাপ, দ্বিতীয় ধাপের অংশ ও প্রথম বাঁক থেকে বের হওয়া পর্যন্ত নিজ লেনে থাকতে হয়। ৪×২০০ মিটার

রিলেতে প্রথম ছুই ধাপ, তৃতীয় ধাপের অংশ, প্রথম বাঁক থেকে বের হওয়া পর্যন্ত লেনে থাকতে হয়।

তবে মাত্র ছু'টি দল থাকলে প্রথম ধাপেয় প্রথম বাঁক পর্যন্ত নিজ লেনে থাকতে হয়।

(ঘ) ৮০০ মিটার দৌড়ে প্রথম বাঁক পর্যন্ত নিজ লেনে থাকতে হবে।

(ঙ) দৌড়ের গতি সর্বদা বাঁদিকে হয়।

দৌড় আরম্ভ ও সমাপ্তি :

(ক) ৫ সেন্টিমিটার বা ২ ইঞ্চি চুন বা চকের লাইন টেনে দৌড় আরম্ভ ও সমাপ্তি চিহ্নিত হয়। দূরত্ব জানতে হবে আরম্ভ-রেখার প্রান্ত থেকে সমাপ্তি-রেখার শেষ পর্যন্ত এবং সমাপ্তি-রেখার প্রান্ত থেকে আরম্ভ-রেখার শেষ পর্যন্ত। সমাপ্তি-রেখার ছু'দিকে ছু'টি সাদা দণ্ড পোঁতা হয় এবং ট্র্যাক থেকে দূরত্ব হবে অন্ততঃ ৪০ সেন্টিমিটার।

(খ) দৌড় শুরু হবে পিস্তলের শব্দে বা অনুরূপ অন্য কিছু দ্বারা, সকলে প্রস্তুত হবার পরে।

(গ) তার আগে বলতে হবে 'অন ইওর মার্কস'। তারপর বলা হয় 'সেট'। সকলে 'সেট' হলে পিস্তলের শব্দ হবে। তবে ৮০০ মিটার দৌড়ে 'অন ইওর মার্কস' বলার পর প্রতিযোগীরা প্রস্তুত হলেই পিস্তল ছোঁড়া হয়।

দৌড় শুরুর পরে

(ঘ) 'সেট' বলার পর ধরে নিতে হয় ৩ বার পিস্তলের শব্দ হবে। কিন্তু পিস্তলের শব্দের আগে দৌড় শুরু করলে 'ভুল স্টার্ট' হবে। তখন তাকে সতর্ক করে দেওয়া হয়।

(ঙ) স্টার্টিং ব্লক ব্যবহার করা যায়। কিন্তু 'সেট'-এর সময় সেটি যেন ট্র্যাকেই থাকে।

হার্ডল রেস :

বিভিন্ন দূরত্বের হার্ডল দৌড়ে বিভিন্ন উচ্চতা থাকে। হার্ডলগুলি চওড়া হয় ৩ ফুট ১১ ইঞ্চি। প্রত্যেক দৌড়ে ১০টি হার্ডল অতিক্রম করতে হয়।

পুরুষদের জন্য ১১০, ২০০ ও ৪০০ মিটার এবং মেয়েদের জন্য ১০০ ও ২০০ মিটার হার্ডল রেস নির্দিষ্ট।

কতমিটার দৌড়	হার্ডলের সর্বনিম্ন উচ্চতা	স্ক্র্যাচলাইন থেকে প্রথম হার্ডল	মাঝের হার্ডল-গুলি	শেষ হার্ডল থেকে সমাপ্তি-রেখা
পুরুষ				
১১০	১০৬৪ সে. মি.	১৩.৭২ মি,	৯.১৪ মি.	১৪.০২ মি.
২০০	৭৫.৯ ,,	১৮.২৯ ,,	১৮ ২৯ ,,	১৭.১০ ,,
৪০০	৯১.১ ,,	৪৫ ,,	৩৫ ,,	৪০ ,,
মহিলা				
১০০	৮২.৭ সে. মি.	১৩ ,,	৮.৫ ,,	১০.৫ ,,
২০.০	৭৫.৯ ,,	১৬ ,,	১৯ ,,	১৩ ,,

(ক) প্রত্যেককে নিজ নিজ লেনে দৌড়তে হবে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত।

(খ) কেউ ইচ্ছাপূর্বক পাশের কারও দিকে পা ছুঁড়লে বা হার্ডল ফেলে দিলে তাকে 'অযোগ্য' ঘোষণা করা হয়।

স্টীপল চেজ:

(ক) ৩০০০ মিটার দৌড়ে ২৮ বার হার্ডল অতিক্রম করতে ও ৭ বার জলে লাফাতে হয়। প্রতি ধাপে চতুর্থ লাফটি জলে। সমাপ্তি-রেখা ট্র্যাকের অন্যত্র পরিবর্তন করা হয়।

(খ) শুরু থেকে প্রথম
ধাপ লাফ ছাড়াই—২৭০ মিটার
শুরু থেকে প্রথম
ধাপ ও হার্ডল পর্যন্ত—১০ মিটার
প্রথম থেকে দ্বিতীয়
হার্ডল —৭৮ মিটার
দ্বিতীয় থেকে তৃতীয়
হার্ডল —৭৮ মিটার
তৃতীয় হার্ডল থেকে
জলে লাফ —৭৮ মিটার

জলে লাফ থেকে
চতুর্থ হার্ডল —৭৮ মিটার
চতুর্থ হার্ডল থেকে
সমাপ্তি-রেখা —৬৮ মিটার
৩৯০ মিটারের ৭টি ধাপ } =২৭৩০ মিটার+প্রথম ধাপের ২৭০ মিটার
=৩০০০ মিটার

(গ) দৌড় আরম্ভ থেকে প্রথম ধাপ শুরু পর্যন্ত কোনও লাফ নেই। প্রতিযোগীরা প্রথম ধাপে ঢুকলেই হার্ডল সারিয়ে ফেলা হয়।

(ঘ) হার্ডলের সর্বনিম্ন উচ্চতা ২ ফুট ১১৮৬৭ ইঞ্চি হবে এবং চওড়া ১৩ ফুট।

(ঙ) জলের গভীরতা ২ ফুট ৩½ ইঞ্চি এবং প্রত্যেক প্রতিযোগীকে জলের মধ্য দিয়ে যেতে হবে। পাশ কাটিয়ে জলে লাফিয়ে গেলে 'অযোগ্য' বিবেচিত হবে। তবে হার্ডল লাফিয়ে বা ভল্ট দিয়ে কিংবা হার্ডলে পা রেখে অতিক্রম করা যায়।

ম্যারাথন :

(ক) ম্যারাথন দৌড় রাস্তা দিয়ে হলেও, যানবাহনের ভিড়ের সময় সাইকেল-রাস্তা বা ফুটপাথ ব্যবহার করা যায়। শুরু ও শেষ অ্যাথলেটিক ট্র্যাকেই হয়ে থাকে।

(খ) প্রত্যেক প্রতিযোগী উপযুক্ত চিকিৎসকের কাছ থেকে সার্টিফিকেট পাঠায় এণ্ট্রির সঙ্গে। তাছাড়া দৌড়ের আগে উদ্যোক্তাদের নিযুক্ত ডাক্তার প্রতিযোগীদের পরীক্ষা করেন। ডাক্তার তাকে 'অযোগ্য' বিবেচনা করতে পারেন।

(গ) ডাক্তার কোনও প্রতিযোগীকে মাঝপথেও স্বাস্থ্যের কারণে অবসরের পরামর্শ দিতে পারেন।

(ঘ) প্রত্যেক প্রতিযোগীকে পথের দূরত্ব জানাতে হয়।

(ঙ) উদ্যোক্তারা প্রথম ১১ কিলোমিটারের পরে ও পরবর্তী প্রতি ৫ কিলোমিটারে স্বল্প খাদ্য দিতে পারেন। দুই টিফিন-স্টেশনের মধ্যবর্তী স্থানে স্পঞ্জিং পয়েন্টে শুধু জল পাওয়া যায়। প্রতিযোগী নিজের সঙ্গে খাদ্য বহন করতে পারে না। তবে সে কী খাবে তা উদ্যোক্তাদের জানাতে পারে এবং এমন খাদ্য দিতে হবে যা সে বা তারা হাতে নিতে পারে।

রিলে রেস :

(ক) চক বা চুনের রেখা টেনে প্রতিটি ধাপ নির্দিষ্ট করতে হবে। টানতে হবে স্ক্র্যাচ রেখা।

(খ) স্ক্র্যাচ-লাইনের ১০ মিটার আগে পরে টেক-ওভার জোনে (যেখানে ব্যাটন পরিবর্তন করা হয়) রেখা টানতে হবে। ৪ × ১০০ মিটার দৌড়ে প্রথম জন বাদে বাকিরা টেক-ওভার জোনের বাইরে ১০ মিটারের বেশি দৌড়তে পারে না। এই সীমারেখা টানতে হবে প্রতিটি লেনে। ব্যাটনও টেক-ওভার জোনে বদল করা হয়। প্রত্যেকে নিজের লেনে ট্র্যাকের ভিতরে জুতো দিয়ে দাগ কেটে নিতে পারে, তবে টার্টান বা 'রাবারাইজ্‌ড্‌' ট্র্যাকে দাগ কাটা নিষেধ।

(গ) দৌড়বার সময় কারুর হাত থেকে ব্যাটন পড়ে গেলে তুলে নিয়ে আবার ছুটবে।

(ঘ) ব্যাটন বদলের পরেও প্রতিযোগীরা নিজ লেনে দাঁড়িয়ে থাকবে। সকলের ব্যাটন বদল হলে লেন ত্যাগ করবে।

(ঙ) ব্যাটন পরিবর্তনের সময় কেউ কাউকে ধাক্কা দিয়ে এগিয়ে দিতে পারে না।

(চ) দলের কেউ আহত বা অসুস্থ না হলে একই দল নিয়ে প্রাথমিক রাউণ্ড থেকে ফাইনাল পর্যন্ত রিলে রেস করতে হয়।

ক্রশ-কাণ্ট্রি রেস :

ক্রশ-কাণ্ট্রি দৌড় বিভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে হয়ে থাকে। এজন্যে কোনও বাঁধা নিয়ম-কানুন নেই। তবুও মোটামুটি কিছু বিধি-নিষেধ মেনে চলা হয়।

(ক) সাধারণতঃ ট্র্যাক ও ফিল্ড মরশুম শেষে ক্রশ-কাণ্ট্রি দৌড় বা রেস হয়। এবং শীতকালই উপযুক্ত মরশুম।

(খ) সরু রাস্তা, মাঠ, জঙ্গল, ঘাসের জমি, উঁচু-নিচু জমি, কিছু চাষের জমি প্রভৃতি এর মোটামুটি পথ।

(গ) পথ নির্দিষ্ট করার জন্য বাঁ দিকে লাল ফ্ল্যাগ ও ডানদিকে সাদা ফ্ল্যাগ পোঁতা হয়। তবে ওইগুলি যেন ১২৫ মিটার দূর থেকে দেখা যায়।

(ঘ) পথে বড় বাধা (যেমন : গভীর গর্ত) যেন না থাকে। কোনও কৃত্রিম বাধা সৃষ্টি নিয়ম-বহির্ভূত।

(ঙ) এণ্ট্রির সময় দূরত্ব জানানো দরকার।

বয়ঃসীমা ঃ

সিনিয়র—১৮ বছরের বেশি।

জুনিয়র—১৮ থেকে ২১ বছর।

কিশোর—১৬ থেকে ১৮ বছর।

দূরত্ব ঃ

(ক) সিনিয়রদের আনুমানিক ৮ কিলোমিটারের কম নয়, জুনিয়রদের ১০ কিলোমিটারের বেশি নয় এবং কিশোরদের ৫ কিলোমিটার।

(খ) তবে জাতীয় প্রতিযোগিতায় সিনিয়রদের ১৪½ কিলোমিটার ও তদূর্ধ্ব, জুনিয়রদের ১০ কিলোমিটারের মধ্যে ও কিশোরদের ৫ কিলোমিটার রাখা হয়েছে।

মহিলাদের ২ হাজার থেকে ৩ হাজার মিটার ও বালিকাদের দেড় হাজার মিটার নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

(গ) ক্রশ-কান্টি্র রেসের পথে টিফিন সরবরাহ নিষিদ্ধ।

জাম্পিং ইভেণ্ট ঃ

(ক) প্রতিযোগীদের ট্রায়ালে কে কার পরে অংশ নেবে, তা স্থির হবে লটারির মাধ্যমে।

(খ) কোনও জাম্পিং ইভেণ্টে রানওয়ের দূরত্ব সীমিত নয়। তবে ন্যূনতম দূরত্ব নিম্নরূপ ঃ

রানিং হাইজাম্প —১৫ মিটার

রানিং লং জাম্প
ট্রিপল জাম্প } —৪০ মিটার
পোলভল্ট

(গ) সমস্ত জাম্পিং ইভেণ্টে প্রতিযোগীদের শ্রেষ্ঠ লাফ বা জাম্পকে বিবেচনা করা হয়। অবশ্য টাই হলে অন্য নিয়ম।

(ঘ) টেক-অফ্‌ বা লাফ আরম্ভের জমি আশপাশের জমির সমান হবে।

(ঙ) হাইজাম্পে প্রতিযোগীরা রানওয়েতে টেক-অফের সুবিধার জন্য রুমাল বা অনুরূপ কোনও চিহ্ন রাখতে পারে।

পোলভল্ট, লং জাম্প ও ট্রিপল জাম্পের রানওয়েতে কোনও চিহ্ন রাখা যায় না। তবে রানওয়ের ধারে চিহ্ন দিলে আপত্তি বা বে-আইনী হয় না

কিন্তু পিট বা অবতরণের (ল্যাণ্ডিং এরিয়া) অঞ্চলে কখনও চিহ্ন রাখা চলবে না।

(চ) জাম্পিং প্রতিযোগিতার আগে জাজ-রা উচ্চতা ঘোষণা করেন। প্রতিবার উচ্চতা বাড়াবার আগে অনুরূপ ঘোষণা করতে হয়।

(ছ) অ্যাথ্‌লীট সর্বনিম্ন উচ্চতার বেশি যে কোনও উচ্চতা থেকে লাফ শুরু করতে পারে। কিন্তু উচ্চতা পরিবর্তন না করে অর্থাৎ একই উচ্চতা অতিক্রম করতে গিয়ে উপর্যুপরি তিনবার ব্যর্থ হলে সে পরবর্তী লাফের যোগ্যতা হারিয়েছে ঘোষণা করা হয়।

(জ) নূতন উচ্চতায় লাফাবার আগে সেই উচ্চতা সংশ্লিষ্ট প্রতিযোগীর সামনেই মাপতে হয়। প্রতিটি রেকর্ডের ক্ষেত্রে জাজ-রা উচ্চতা অতিক্রমের পরমুহূর্তে আবার তা মেপে নেন।

(ঝ) যেখানে ৮ জনের বেশি প্রতিযোগী, সেখানে প্রত্যেকে ৩টি করে ট্রায়ালের সুযোগ পায় এবং ৮ জন সেরা জাম্পার জাম্পের সঙ্গে অতিরিক্ত ৩টি ট্রায়াল পায়। টাই বা অষ্টম স্থানের জন্যও ৩টি অতিরিক্ত ট্রায়াল হয়। আট বা তার কম প্রতিযোগী হলে প্রত্যেকে ৬টি ট্রায়াল পেয়ে থাকে।

রানিং হাইজাম্প :

(ক) প্রতিযোগীরা অবশ্যই এক পায়ে টেক-অফ্ বা লাফ শুরু করবে।

(খ) বার অতিক্রমের মুহূর্তে কিছুর সাহায্য নেওয়া যায় না। শরীরের উপরের কোনও অংশের সাহায্য নিয়ে লাফ শুরুর আগে মাটি স্পর্শ করা যায় না।

পোল ভল্ট :

(ক) প্রতিযোগীরা ডান ও বাম যে কোনও দিক থেকে উপরের দিকে উঠতে পারেন। কিন্তু তা যেন স্টপবোর্ডের ভিতরের দিক থেকে ৬০ সেণ্টি-মিটারের বেশি এদিক-ওদিক না হয়।

(খ) টেক-অফ্ করা হয় কাঠ বা ধাতুর তৈরি বাক্স থেকে, যা মাটির সমান লেভেলের।

(গ) প্রতিযোগী ব্যর্থ ঘোষিত হয়—

(১) যদি বার স্পর্শ করে।

(২) যদি বার অতিক্রম না করতে পারে।

(৩) যদি মাটি ত্যাগের পরে উপরে ওঠার সময় পোলে নিচের হাত উপরে অথবা উপরের হাত আরও উপরে নিয়ে যায়।

(ঘ) তবে পোল ভেঙে গেলে ব্যর্থ ঘোষণা করা হয় না।

(ঙ) উপর থেকে পড়ে যাওয়ার আগে পোল কেউ স্পর্শ করতে পাবে না। স্পর্শ করলেই সেই সময়কার বা সংশ্লিষ্ট প্রতিযোগী ব্যর্থ ঘোষিত হবে।

(চ) প্রতিযোগীরা নিজের পোল ব্যবহার করতে পারে।

রানিং লং জাম্প ঃ

(ক) রানওয়ের সমান লেভেলে টেক-অফ্‌ স্থানে চিহ্ন দেওয়া থাকে। ল্যাণ্ডিং এরিয়া বা লাফ দিয়ে পড়ার জমির নিকটেই টেক-অফ্‌ লাইন থাকে। প্রতিযোগী টেক-অফ্‌ চিহ্নের আগের থেকে লাফ দিলে ব্যর্থ ঘোষিত হবে। ফুট-ফল্ট দেওয়ার জন্য টেক-অফ্‌ লাইনের পিছনে প্লাষ্টিসাইন বা অনুরূপ কিছু পেতে রাখাই বিধি। এ সম্ভব না হলে নরম মাটি বা বালি আলতোভাবে সমান করে ছড়িয়ে দেওয়া হয়।

(খ) প্রতিযোগী টেক-অফ্‌ লাইনের পশ্চাতের ভূমি ছুঁলে বা ওই লাইন বাড়িয়ে নিলে, তা সে লাফ দিক কিংবা শুধু দৌড়ে আসুক—সে ব্যর্থ ঘোষিত হবে।

(গ) লাফের দূরত্ব মাপা হয় শরীরের অংশ সবচেয়ে কাছে যেখানে মাটি স্পর্শ করেছে, সেখান পর্যন্ত।

(ঘ) নিখুঁত মাপের জন্য লাফিয়ে পড়ার জমিতে ছড়ানো বালি সর্বদা সমান রাখা প্রয়োজন।

(ঙ) ওই জমির প্রস্থ ২ মিটার ৭৫ সেন্টিমিটার বা ৯ ফুট হবে।

(চ) টেক-অফ্‌ লাইন থেকে জমির শেষ প্রান্তের দূরত্ব যেন অন্ততঃ ১৫ মিটার হয়।

(ছ) টেক-অফ্‌ বোর্ড ল্যাণ্ডিং এরিয়া থেকে ১ মিটারের কম হবে না।

ট্রিপল জাম্প ঃ

(ক) টেক-অফ্‌ বোর্ড মাটিতে পোঁতা হয় মাটির সমতল করেই রানওয়ের সোজাসুজি, এবং বোর্ডটি রাখা হয় ল্যাণ্ডিং এরিয়ার ১১ মিটার দূরে। বোর্ডে পৌছবার আগে কেউ টেক-অফ্‌ করলে তাকে অযোগ্য গণ্য করা হয়।

(খ) প্রতিযোগী যে পায়ে লাফ দিয়েছিল, মাটিতে আগে সেই পা পড়বে।

(গ) অন্য পা মাটিতে আগে পড়লে সে ব্যর্থ হবে।

হ্যামার, সটপাট, ডিসকাস ও জ্যাভেলিন

(ক) কে আগে, কে পরে ছুঁড়বে তা স্থির হবে লটারির মাধ্যমে।

(খ) ৮ জনের অধিক প্রতিযোগী থাকলে প্রত্যেকে ৩টি ট্রায়াল পায়। কিন্তু সেরা ৮জন অতিরিক্ত ৩টি করে ট্রায়াল পাবে। অষ্টম স্থানে টাই হলে তাদের ৩টি অতিরিক্ত ট্রায়াল হবে। ৮ বা তার কম প্রতিযোগী থাকলে ট্রায়াল হবে ৬টি।

(গ) থ্রো বা ছোঁড়ার ইভেন্টে প্রতিযোগী ছুঁড়বে নির্দিষ্ট স্থান থেকে।

(ঘ) থো ইভেন্টে প্রতিযোগী লোহার বেড় বা স্টপবোর্ডের অভ্যন্তরভাগ স্পর্শ করতে পারে। তবে সার্কল বা স্টপবোর্ডের উপরে শরীরের কোনও অংশ যেন স্পর্শ না করে।

(ঙ) ছোঁড়া বস্তুটি মাটিতে পড়ার আগে সার্কল ত্যাগ নিষেধ। জ্যাভেলিন মাটিতে পড়ার আগে সংশ্লিষ্ট প্রতিযোগী যেন ছোঁড়ার অঙ্গন ত্যাগ না করে।

(চ) হ্যামার ও ডিসকাস ৪৫° ডিগ্রি সেকটর থেকে ছুঁড়তে হয়।
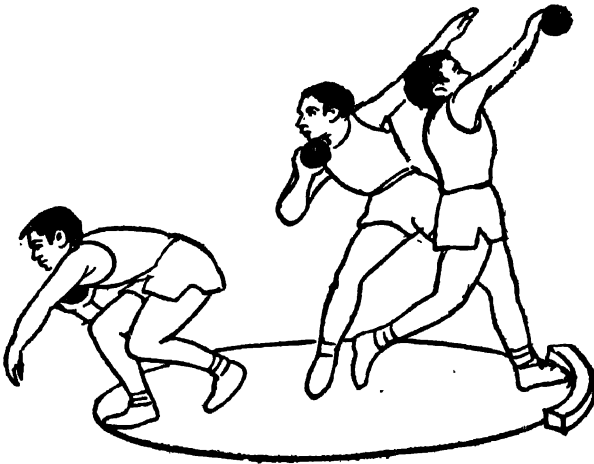
সটপাটের বিভিন্ন মুহূর্ত

(ছ) ডিসকাস, সটপাট বা জ্যাভেলিনের দূরত্ব মাপতে হয় থ্রোয়িং পয়েন্টের কাছাকাছি যেখানে ওইগুলির মাথা পড়েছে—সেই পর্যন্ত।

(জ) ছোঁড়ার ইভেন্টগুলির সরঞ্জাম সরবরাহ করেন উদ্যোক্তারাই। কোনও প্রতিযোগী এরেনার মধ্যে সরঞ্জাম নিতে পারে না।

(ঝ) সরঞ্জামগুলি স্টার্টিং পয়েন্টে হাতে করেই ফেরত আনতে হবে, ছুঁড়ে নয়।

জ্যাভেলিন : (ক) রানওয়ে ৩৬.৫ মিটারের বেশি ও ৩০ মিটারের কম হবে না। ২ সেন্টিমিটার মোটা দু'টি লাইন সমান্তরাল করে (দূরত্ব ৪ মিটার) টানতে হবে। ছোঁড়া হয় ৮ মিটার ব্যাসার্ধের চাপ থেকে। ৭ সেন্টিমিটার মোটা ধাতু বা কাঠ দ্বারা ওই স্ট্রিপটি তৈরি করা যেতে পারে।

(খ) জ্যাভেলিন সর্বদা হাতের মুঠোয় ধরা হয় ও কাঁধের উপর থেকে ছুঁড়তে হয়।

(গ) তবে জ্যাভেলিনের ফলার দিকটা সর্বাগ্রে মাটিতে না পড়ে অন্য কোনও অংশ পড়লে ওই ছোঁড়া বৈধ বিবেচিত হবে না। জ্যাভেলিন স্ট্রিপের সমান্তরাল লাইনের মধ্যেও পড়া দরকার।
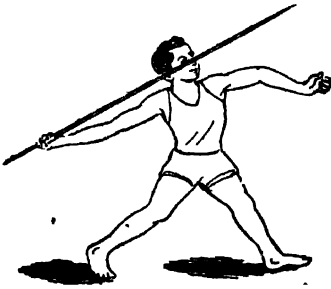
জ্যাভেলিন ছোঁড়ার মুহূর্ত
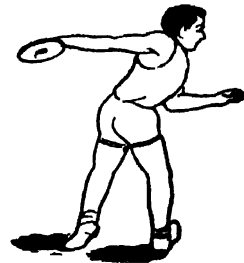
ডিসকাস ছোঁড়ার মুহূর্ত

(ঘ) ছোঁড়ার পর মাটিতে পড়ার আগে জ্যাভেলিন ভেঙে গেলে সংশ্লিষ্ট অ্যাথ্‌লীটকে পুনরায় সুযোগ দেওয়া হয়।

ডিসকাস : ডিসকাস ২.৫ মিটার ব্যাসের সার্কলের ভিতর থেকে ছোঁড়া হয়।

সটপাট : (ক) সট ছোঁড়া হয় ২.১৩৫ মিটার ব্যাসের বৃত্তের ভিতর থেকে। বৃত্তের একটি অর্ধ পরিধির উপরে স্টপবোর্ড রাখা হয়। স্টপবোর্ড মাটিতে শক্ত করে পুঁততে হবে।

(খ) অ্যাথ্‌লীট সট একহাতে কাঁধের উপরে তুলে রিং ঘুরে ছুঁড়ে দেয়। সটসহ হাত যেন নিচে না নামে।

(গ) প্রতিবার ছোঁড়ার পর মাপ নিতে হবে।

হ্যামার : (ক) ২.১৩৫ মিটার ব্যাসের বৃত্তের ভিতর থেকে হ্যামার ছুঁড়তে হয়।

(খ) হ্যামার ছোঁড়ার সময় সাধারণ গ্লাভস্ বা দস্তানা পরে নেওয়া যেতে পারে।

(গ) স্টার্টিং সার্কলে প্রতিযোগী হ্যামার ঘোরাতে পারে। প্রতিযোগিতা শুরুর আগে ছুঁড়তেও পারে—তবে বাইরে।

(ঘ) প্রতিযোগিতার সময় হ্যামার মাথার উপর ঘোরাতে ঘোরাতে মাটিতে স্পর্শ করলেই তা ট্রায়াল থো। গণ্য হবে এবং তা ফাউল।

(ঙ) তবে ঘোরানোর সময় থেকে ছুঁড়ে মাটিতে ফেলার মধ্যে হ্যামার ছিঁড়ে গেলে সংশ্লিষ্ট প্রতিযোগীকে পুনরায় সুযোগ দেওয়া হয়।

হাঁটা বা ওয়াকিং ঃ

(ক) হেঁটে এগিয়ে যাওয়ার সময় প্রতিযোগীকে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন মাটিতে পুরো পা পড়ে।

(খ) হাঁটা প্রতিযোগিতায় 'জাজ' বা বিচারকমণ্ডলী সর্বদা নজর রাখেন যেন প্রতিযোগী বা প্রতিযোগীদের অগ্রবর্তী পা মাটিতে রাখা ও পশ্চাদ্‌বর্তী পা মাটি থেকে উঠে আসা একই সময়ে হয়। প্রতিটি পদক্ষেপে যেন পায়ের উপর জোর পড়ে।

(গ) জাজরাই নিজেদের মধ্য থেকে চিফ-জাজ নিযুক্ত করেন। তবে প্রত্যেক জাজ নিজের ইচ্ছাতেই সিদ্ধান্ত নেন।

(ঘ) শুরুতে প্রতিযোগী সম্পর্কে অভিযোগ না পেলেও প্রতিযোগিতার ঠিক শেষে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ অনুযায়ী অযোগ্য ঘোষণা করা যায়।

(ঙ) হাঁটার সময় অসঙ্গতি দেখলে তৎক্ষণাৎ সংশ্লিষ্ট প্রতিযোগীকে সাবধান করে দেওয়া যায়, বিশেষ করে ঠিকমত পা ফেলা হচ্ছে না—এই অভিযোগে।

(চ) ট্র্যাক রেসে যোগ্যতা হারাবার সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রতিযোগী ট্র্যাক ত্যাগ করবে, আর হাঁটা প্রতিযোগিতায় যোগ্যতা হারালে বুকে ও পিঠে লাগানো নম্বর খুলে ফেলবে। হাঁটায় সাদা ফ্ল্যাগ দেখিয়ে প্রতিযোগী যোগ্যতা হারিয়েছে জানিয়ে দেওয়া হয়।

(ছ) ২০ কিলোমিটারের বেশি হাঁটায় ১০ কিলোমিটার দূরে উদ্যোক্তারা প্রতিযোগীদের জন্য টিফিন রাখেন। তারপর টিফিন-স্টেশন থাকবে প্রতি ৫ কিলোমিটারের মাথায়। কোনও প্রতিযোগী সঙ্গে খাদ্য বহন করতে পারে না। তবে সে কোন্ খাদ্য পছন্দ করে, তা আগেই উদ্যোক্তাদের জানিয়ে দেয়।

এবং এমন খাদ্য সরবরাহ করা হয় যাতে প্রতিযোগীরা হাতে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে তা খেতে পারে।

(জ) ৩০ কিলোমিটার বা তার চাইতে বেশি হাঁটা প্রতিযোগিতায় প্রত্যেককে 'এন্ট্রি'-র সঙ্গে ডাক্তারী সার্টিফিকেট পাঠাতে হয়। হাঁটা শুরুর আগেও উদ্যোক্তারা ডাক্তার দ্বারা প্রত্যেককে পরীক্ষা করান।

(ঝ) উদ্যোক্তারা রাস্তায় প্রতিযোগীদের নিরাপত্তা সম্পর্কে সমস্ত রকম ব্যবস্থা নেবেন। বড় বড় প্রতিযোগিতায় রাস্তায় মোটরগাড়ি চলাচল নিষেধ করাই বিধি। তা না হলে সর্বত্র অন্ততঃ যানবাহন নিয়ন্ত্রণ করতে হয়।

পেণ্টাথলন ও ডেকাথলন

ছেলেদের—

(ক) পাঁচটি ইভেণ্ট নিয়ে পেণ্টাথলন। ইভেণ্টগুলি পর-পর হবে এইভাবে : (১) লং জাম্প, (২) জ্যাভেলিন, (৩) ২০০ মিটার দৌড়, (৪) ডিসকাস ও (৫) ১৫০০ মিটার দৌড়।

(খ) ডেকাথলনে দশটি ইভেণ্ট। হবে দু'দিনে। প্রথম দিনে—(১) ১০০ মিটার দৌড়, (২) লং জাম্প, (৩) সটপাট, (৪) হাইজাম্প ও (৫) ৪০০ মিটার দৌড়। দ্বিতীয় দিনে—(১) ১১০ মিটার হার্ডলস, (২) ডিসকাস, (৩) পোলভল্ট, (৪) জ্যাভেলিন ও (৫) ১৫০০ মিটার দৌড়।

মেয়েদের—

(গ) মেয়েদের জন্য শুধু পেণ্টাথলন নির্দিষ্ট। হবে দু'দিনে। প্রথম দিনে—(১) ১০০ মিটার হার্ডলস, (২) সটপাট ও (৩) হাইজাম্প। দ্বিতীয় দিনে—(১) লং জাম্প ও (২) ২০০ মিটার দৌড়।

(ঘ) আগে পরে কারা থাকবে তা লটারির মাধ্যমে স্থির করতে হবে।

(ঙ) ১০০, ২০০ ও ৪০০ মিটার দৌড় এবং ১০০ ও ১১০ মিটার হার্ডলসে গ্রুপ অনুসারে লটারি হয়।

(চ) লং জাম্প ও থ্রো-তে ৩টি ট্রায়াল হবে। ৩ জন টাইমকীপার পৃথকভাবে সময় নেবেন। দৌড় ও হার্ডলসে কেউ ৩ বার ভুল স্টার্ট নিলে তাকে অযোগ্য বা বাতিল গণ্য করতে হবে।

(ছ) প্রতিটি ইভেণ্ট শেষে সংশ্লিষ্ট ইভেণ্টের স্কোর পয়েণ্ট এবং সম্মিলিত-ভাবে ইভেণ্টগুলির স্কোর পয়েণ্ট ঘোষণা করতে হয়।

(জ) ৫ বা ১০টি ইভেণ্টে সর্বোচ্চ পয়েণ্টপ্রাপ্ত প্রতিযোগীই বিজয়ী বা প্রথম হয়।

(ঝ) পেণ্টাথলন বা ডেকাথলনে টাই হলে যে অধিকাংশ ইভেণ্টে বেশি পয়েণ্ট পেয়েছে, তাকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। তার পরেও টাই থাকলে যে একটি ইভেণ্টে সর্বোচ্চ পয়েণ্ট পেয়েছে সে বিজয়ী হবে।

(ঞ) পেণ্টাথলনের ৫টির একটিতে ও ডেকাথলনের ১০টির একটিতে ট্রায়ালে অনুপস্থিত থাকলে তাকে আর পরের ইভেণ্টে অংশ নিতে দেওয়া হয় না।

আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় যে ইভেণ্টগুলি প্রচলিত

ছেলেদের—

দৌড়—১০০, ২০০, ৪০০, ৮০০, ১০০০, ১৫০০, ২০০০, ৩০০০, ৫০০০, ১০০০০, ২০০০০, ২৫০০০ ও ৩০০০০ মিটার।

স্টীপলচেজ—৩০০০ মিটার।

হার্ডলস—১১০, ২০০ ও ৪০০ মিটার।

রিলে রেস—৪ × ১০০, ৪ × ২০০, ৪ × ৪০০, ৪ × ৮০০ ও ৪ × ১৫০০ মিটার।

হাঁটা—২০০০০, ৩০০০০ ও ৫০০০০ মিটার

জাম্প—হাই জাম্প, লং জাম্প, ট্রিপল জাম্প ও পোলভল্ট।

থ্রো—সটপাট, ডিসকাস, জ্যাভেলিন ও হ্যামার।

এবং ডেকাথলন।

মেয়েদের—

দৌড়—৬০, ১০০, ২০০, ৪০০, ৮০০ ও ১৫০০ মিটার।

হার্ডলস—১০০ ও ২০০ মিটার (প্রত্যেকটিতে ১০টি হার্ডল থাকে)

রিলে রেস—৪ × ১০০, ৪ × ২০০, ৪ × ৪০০ ও ৪ × ৮০০ মিটার।

জাম্প—হাই জাম্প ও লং জাম্প।

থ্রো—জ্যাভেলিন, ডিসকাস ও সটপাট।

এবং পেণ্টাথলন।

সাঁতার, ডাইভিং ও ওয়াটার পোলো

সাঁতার :

(ক) প্রতিটি রেসে একজন রেফারী, একজন স্টার্টার ও প্রয়োজনীয় টাইমকীপার, জাজ ও টার্ন-ইনস্পেক্টর থাকবেন।

(খ) প্রতিযোগিতার পূর্ণ নিয়ন্ত্রক হবেন রেফারী এবং তিনি দেখবেন জাজ, টাইমকীপার ও ইনস্পেক্টররা নিজ নিজ স্থানে আছেন কিনা।

(গ) সাঁতারুদের স্থান (প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়) নির্ণয় করেন জাজরা।

(ঘ) জাজদের মধ্যে মত-পার্থক্য হলে রেফারীর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হবে।

(ঙ) টাইমকীপারের কাজ শুধু সময়ের হিসাব রাখা।

(চ) সাঁতার শুরুর আগে স্টার্টার অবশ্যই প্রতিযোগীদের জানাবেন : কীভাবে সাঁতার শুরু হবে, কতদূর যেতে হবে, কোথায় টার্ন নিতে হবে এবং খোলা জল (নদী বা সমুদ্র) হলে কোথায় গিয়ে সাঁতার শেষ করতে হবে।

স্টার্ট বা শুরু :

(ক) ব্যাক স্ট্রোক ছাড়া সব সাঁতারই ডাইভ দিয়ে শুরু হয় স্টার্টিং প্ল্যাটফর্ম থেকে। স্টার্টার বলবেন—'টেক ইওর মার্কস', তারপর কিছু সময় দিয়ে পিস্তলের গুলি ছুঁড়ে বা অনুরূপ সংকেতে (হুইস্‌ল) শুরুর নির্দেশ দেবেন।

(খ) ভুল বা 'ফলস্‌' স্টার্ট দু'বার হলে স্টার্টার সাবধান করে দেন—যেন আর ভুল না হয়। তৃতীয়বার কেউ ভুল করলে তাকে বাতিল বা অযোগ্য ঘোষণা করা হয়।

হিট :

(ক) কোর্সের দিকে সামনে তাকালে যেদিকটা সর্ব দক্ষিণ বা ডান হবে, লটারির ১ নম্বর সাঁতারু সেই স্টার্টিং ব্লকে স্থান পাবে।

(খ) সেমিফাইনালের বাছাই হবে সাঁতারু বা দল হিটে যে বা যারা সবচেয়ে দ্রুতগামী, বিজোড় লেনে সে সকলের মাঝে থাকে। আর জোড় কিংবা ৬ ও ৮ লেনের পুল হলে ৩ বা ৪ নম্বর লেনে থাকবে। দ্বিতীয় দ্রুতগামী বা দ্রুতগামীরা থাকে প্রথম দ্রুতগামীর বাঁদিকে। এইভাবে পরবর্তীরা ডান ও বাঁয়ে স্থান পায়। হিটে দু'জনের একই সময় হলে তারা কে কোন্‌ লেনে যাবে তা স্থির হয় লটারিতে।

শুরুর পরে এবং দণ্ড ইত্যাদি

(ক) একজন প্রতিযোগী অপরকে বাধা দিলে ফাউল হবে এবং বাধাদান-কারীকে বাতিল করা হতে পারে। রেফারী ওই সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে রিপোর্ট দেন।

(খ) যাকে ফাউল করা হয়, তার সাফল্যের সম্ভাবনা থাকলে জাজরা পুনরায় ওই ইভেণ্টের ব্যবস্থা করতে পারেন। ফাইনালে পুনরায় সাঁতারের নির্দেশের বিধি আছে।

(গ) টার্নিং-এর সময় সাঁতারু এক বা দুই হাতে কোর্স বা দেওয়াল স্পর্শ করে। ফিনিশ বা শেষ বিন্দুতে দেওয়াল ছুঁতে হয়।

(ঘ) যদি মাত্র একজন সাঁতারু সাঁতার কেটে দূরত্ব অতিক্রম করে, তবে তাকে বিজয়ী ঘোষণা করতে হবে।

(ঙ) রিলে সাঁতারে একজন পৌঁছে দেওয়াল ছোঁয়ার আগে পরবর্তী সাঁতারু স্টার্ট নিলে বাতিল হয়ে যাবে সেই দল।

(চ) জলে ভেসে থাকার মত কোনও কিছু সাঁতারুরা সঙ্গে নিতে পারে না।

ফ্রী-স্টাইল : ফ্রী-স্টাইলে মাথা থেকে পা পর্যন্ত দেহের পিছন দিকটা জলের উপরে থাকে, অর্থাৎ সাঁতারু যখন মাথার আগে একের পর এক দু'হাত
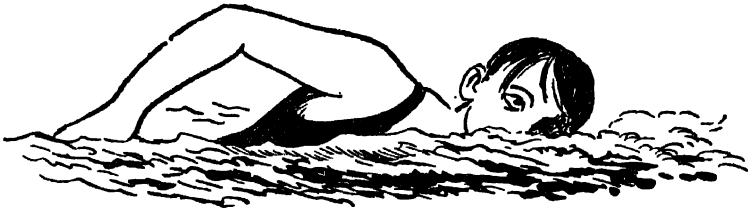
ফ্রী-স্টাইল

বাড়িয়ে জল টানতে থাকে, তখন মাঝে মাঝে দম নেওয়ার সময় সাঁতারুর মুখ দেখা যায়। দেখা যেতে পারে তার পিঠ এবং গোড়ালি ও পায়ের পাতা। হাত দিয়ে জল টেনে ও পা দিয়ে জল কেটে সে সাবলীলভাবে এগিয়ে চলে।

ব্রেস্ট স্ট্রোক : ব্রেস্ট স্ট্রোকে জলের উপরে সাঁতার দেওয়া যায় না। দু'টি হাত একই সঙ্গে বুকের কাছ থেকে জলের মধ্যে ঠেলতে হবে বা সামনের দিকে এবং জল টেনে দু'টি হাতে পিছনের দিকে নিতে হবে। সমস্ত শরীরটার ভারসাম্য থাকে বুকের উপর ; জলের উপর থাকে শুধু দু'টি কাঁধ ও মাথার

পিছনের অংশ। তবে পা খাড়াখাড়িভাবে ওঠানো-নামানো নিষেধ। টার্ন

ব্রেস্ট স্ট্রোক

নেওয়ার সময় বা সমাপ্তি-রেখায় পৌঁছলে দু'হাত স্পর্শ করতে হয়।

বাটারফ্লাই স্ট্রোক: দু'টি হাত একসঙ্গে জলের উপরে সামনের দিকে নিয়ে আবার একই সঙ্গে একইভাবে পিছনে আনতে হয় জল টেনে। এতে সমস্ত শরীরের ভারসাম্য থাকে বুকের উপর। কাঁধ থাকে জলের উপর

বাটারফ্লাই

ভাসমান। তবে বাটারফ্লাইয়ে পা খাড়াভাবে উঁচু-নিচু করা যায়। সাঁতারু সমাপ্তি-রেখায় বা টার্ন নিতে দু'হাত স্পর্শ করে।

ব্যাক স্ট্রোক: কেবল এই সাঁতারের শুরুতে সকলে জলে দাঁড়ায়। প্রত্যেকের মুখ থাকে স্টার্টিং-ব্লকের দিকে। অর্থাৎ কোর্স থাকে পেছনে। অন্যান্য সাঁতারে হাত দিয়ে জল মাথার দিক থেকে টেনে পিছনে নিতে হয় উপুড় হয়ে, কিন্তু এই সাঁতারে চিৎ হয়ে ওই কাজ করতে হয়। অন্য সাঁতারে

গোড়ালি উপরে থাকে, এই সাঁতারে গোড়ালি জলের নিচে, পায়ের পাতা উপরের দিকে ওঠে।

প্রতিবাদ : (ক) প্রতিবাদ জানাতে গেলে ঘটনার ৩০ মিনিটের মধ্যে লিখিতভাবে তা রেফারীকে দিতে হবে।

(খ) প্রতিযোগিতার আগে প্রতিবাদের ব্যাপার জানা থাকলে স্টার্টের সংকেতের আগে জানাতে হয়।

ছেলে ও মেয়েদের যে সব ইভেন্টে প্রতিযোগিতা হয় :

ফ্রী-স্টাইল : ১০০, ২০০, ৪০০, ১০০০ ও ১৫০০ মিটার।

ব্রেস্ট, বাটারফ্লাই, ব্যাক স্ট্রোক : প্রত্যেকটি ১০০ ও ২০০ মিটার।

ব্যক্তিগত মেডলি : মোট ৪০০ মিটার। পর-পর করতে হয়—বাটার-ফ্লাই, ব্যাক, ব্রেস্ট ও ফ্রী-স্টাইল।

ফ্রী-স্টাইল রিলে—৪ × ১১০ মিটার এবং ৪ × ২০০ মিটার।

মেডলি রিলে—৪ × ১০০। পর-পর কাটতে হয়—ব্যাক, ব্রেস্ট, বাটার-ফ্লাই ও ফ্রী-স্টাইল।

(ক) পুলের দৈর্ঘ্য ৫০ মিটার।

(খ) রিলে দলের প্রত্যেককে একই দেশের নাগরিক হতে হবে।

(গ) স্টার্টিং প্ল্যাটফর্ম জলের উপরিভাগ থেকে ৭৫ সেন্টিমিটারের বেশি যেন উঁচু না হয়।

ডাইভিং

(ক) স্টার্টিং অবস্থায় কোনও রকম বাধা থাকবে না। অর্থাৎ ডাইভার বিনা বাধায় লাফ দেবে।

(খ) স্ট্যাণ্ডিং ডাইভে প্রতিযোগী বোর্ডের সম্মুখপ্রান্তে গিয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ায়। পা দু'খানি এক জায়গায় থাকে, দুই হাতই সামনে প্রসারিত রাখা হয় কাঁধের সমান্তরাল করে। হাতের আঙুলগুলি একত্রিত থাকবে। এরপরে হাত প্রসারিত করে দু'দিকে বা নামিয়ে দেহের দু'ধারে আনা যেতে পারে।

রানিং ডাইভে লক্ষ্য রাখতে হয় কখন ডাইভার দৌড়ের জন্য প্রথম পা ফেলে

স্প্রিং বোর্ডের ফরওয়ার্ড ডাইভ দাঁড়িয়ে বা দৌড়ে কীভাবে আরম্ভ হবে তা নির্ভর করে ডাইভারের উপর।

(গ) তবে দৌড় সাবলীল হবে, কোনও রকম বিচলিতভাব যেন না থাকে। কিন্তু রানিং ডাইভে টেক-অফসহ চার পা-র কম দৌড়ানো যায় না। কম দৌড়ানোর অভিযোগে রেফারী সংশ্লিষ্ট প্রতিযোগীর ২ পয়েন্ট কেটে নেন। টেক-অফের আগে বোর্ডের উপর বাউন্স করা যায় না, রানিং ডাইভে দৌড়ে এসে শেষ প্রান্তের আগে দৌড় থামানো যায় না।

ব্যাক ডাইভে যদি ডাইভার বোর্ডের শেষ প্রান্তে পা সামান্য তোলে, সেজন্য ফাউল হয় না।

দ্বিতীয় প্রচেষ্টায় কেউ ভাবসাম্য রাখতে না পারলে ২ পয়েন্ট কমে যায়। একথা ঘোষণা করবেন রেফারী।

(ঘ) জলে পড়ার সময় শূন্যে দেহ সোজা থাকবে। প্রথম পর্যায়ে দেহ, হাঁটু বা নিতম্ব বেঁকে না। দুই পা একত্র থাকে, পায়ের পাতাও সোজা বর্শার ফলার মত রাখতে হয়।

দ্বিতীয় পর্যায়ে নিতম্বের কাছে বেঁকলেও পা ও পায়ের পাতা সোজা থাকে। কিন্তু হাত কেমন রাখতে হবে তা নির্ভর করে ডাইভারের উপর।

(ঙ) সমস্ত ফ্লাইং সামারসল্ট ডাইভে সামারসল্টের পরে সোজাসুজি অবস্থায় ফিরতে হয়।

(চ) সোজা ডাইভে আধা পাক বা পূর্ণ পাক খেতে হয় বোর্ড থেকে ডাইভের সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু 'পাইক' ডাইভে 'পাইক' অবস্থায় আসার আগে পাক খাওয়া চলে না। সামারসল্ট ডাইভে যে-কোনও সময়ে পাক খাওয়া যায়।

(ছ) প্রত্যেক ক্ষেত্রে জলে পড়তে হবে খাড়া বা অনুরূপভাবে। দেহ ও পা সোজা থাকবে। যখন মাথার দিকটা প্রথমে জল স্পর্শ করে তখন হাত দু'খানি মাথার দু'দিকে প্রসারিত থাকে দেহের সোজাসুজি লাইনে ও হাত দু'খানি একত্রিত হয়।

যদি আগে পা জল স্পর্শ করে, তবে হাত দু'খানি দেহের দু'পাশে লাগানো থাকে। কনুই যেন বেঁকে না যায়।

প্রতিবাদ: (ক) প্রতিবাদ করতে হয় প্রতিযোগিতা শেষ হওয়ার পরক্ষণেই—লিখিতভাবে।

(খ) তবে প্রতিবাদের বিষয় আগে জানা থাকলে প্রতিযোগিতা শুরুর ঠিক আগে তা করা যায়।

স্প্রিং বোর্ড: এই ডাইভিং-এ বোর্ডগুলি প্ল্যাটফর্মের উপর জল থেকে ১ মিটার ও ৩ মিটার উঁচুতে থাকে। বোর্ডের দৈর্ঘ্য অন্তত ৪ মিটার ও প্রস্থ ই মিটার হয়। পিচ্ছিল হওয়ার আশঙ্কামুক্ত করতে সমস্ত বোর্ডটি নারকেল দড়ির ম্যাটে মোড়ানো হয়। স্প্রিং বোর্ডের সম্মুখভাগ থেকে খাড়া জলে ঝাঁপ দিতে গেলে জলের অন্যূন গভীরতা কোথায় কেমন থাকবে তা নিম্নরূপ:

	১ মিটার উঁচু বোর্ড	**৩ মিটার উঁচু বোর্ড**
গভীরতা	৩ মিটার	৩.৫ মিটার
সামনের দূরত্ব	৫.৫ মিটার	৬.২ মিটার
দু'দিকের দূরত্ব	২.২ মিটার	২.৭ মিটার

ছেলে ও মেয়েদের স্প্রিং বোর্ড প্রতিযোগিতায় পাঁচটি আবশ্যিক ডাইভ-এর সঙ্গে পাঁচটি ঐচ্ছিক ডাইভ দিতে হয়।

আবশ্যিক ডাইভ: ফরওয়ার্ড, ব্যাক, রিভার্স, ইনওয়ার্ড, ফরওয়ার্ড কিন্তু আধা পাক দেওয়া।

হাইবোর্ড: হাইবোর্ডের প্ল্যাটফর্ম অত্যন্ত শক্ত থাকে। ২ মিটার চওড়া বোর্ড নারকেল দড়িতে মুড়তে হয়। ১০ মিটার উঁচু প্ল্যাটফর্মের দৈর্ঘ্য ৬ মিটারের কম যেন না হয় এবং ৫ মিটার উঁচু প্ল্যাটফর্মের দৈর্ঘ্য ৫ মিটার হবে।

১০ মিটার প্ল্যাটফর্মটি বাইরে ১.৫ মিটার প্রসারিত থাকে। প্ল্যাটফর্মের পিছনে এবং দু'দিকে ঘেরা ও উপরে ওঠার জন্য সিঁড়ি অবশ্য প্রয়োজন।

হাইবোর্ডে প্ল্যাটফর্ম থেকে খাড়া নিচে জলের গভীরতা কোথায় কেমন:

	৫ মিটার বোর্ড	**১০ মিটার বোর্ড**
গভীরতা	৩.৮ মিটার	৪.৫ মিটার
সামনের দূরত্ব	৭ মিটার	১০.৫ মিটার
দু'দিকের দূরত্ব	৩ মিটার	৩ মিটার

ছেলেদের হাইবোর্ড ডাইভিং-এ ৬টি আবশ্যিক ডাইভ-সমেত যতগুলি খুশি ঐচ্ছিক ডাইভ দেওয়া যায়। তবে মেয়েদের জন্য হাইবোর্ড ডাইভে শুধু ফরওয়ার্ড, ব্যাক, রিভার্স ও ইনওয়ার্ড ডাইভই নির্দিষ্ট আছে।

১৬ জনের বেশি প্রতিযোগী থাকলে প্রাথমিক ও ফাইনাল দুই পর্যায়ে প্রতিযোগিতা হয়। প্রাথমিক প্রতিযোগিতায় সীমিত ডাইভ—৬ ও বাইরে ১টি ডাইভ।

ডাইভিং-এ ১ জন রেফারী, একাধিক জাজ ও ১ জন সেক্রেটারি নিয়ে বিচারকমণ্ডলী গঠিত হয়।

ওয়াটার পোলো

ওয়াটার পোলোর জন্য ৩৯ মিটার দৈর্ঘ্যের ও ২৯ মিটার প্রস্থের এবং অন্যূন ১ মিটার গভীর জলের স্রোতবিহীন পুকুর, ট্যাঙ্ক বা পুল প্রয়োজন। তবে ২০ মিটার দৈর্ঘ্যের জলাশয়েও খেলা যেতে পারে। অর্থাৎ এক গোল থেকে আর এক গোলেব দূরত্ব ৩০ থেকে ২০ মিটার হবে। তবে মেয়েদের জন্য মাপ ১৫ × ১৭ মিটার। খেলার স্থানের সীমানা নির্ধারিত হয় গোল-লাইনের ৩০ মিটার দূর থেকে। এই জলাশয়কে আধাআধি ভাগ করা হয়। এটি 'ফিল্ড অব্ প্লে'।

গোল-লাইন থেকে ভিতরের দিকে ২ মিটার দূরে উভয়দিকে একটি করে লাইন টানা হয়, ৪ মিটার দূরে আরও একটি করে লাইন থাকে।

গোলের দুই পোস্টের ব্যবধান ৩ মিটার এবং ক্রসবার জল থেকে ১ মিটার উঁচুতে থাকে। গোলপোস্টকে সাদায়-কালোয় বা অন্য কোনও উজ্জ্বল রঙে রঙ করা হয়—খেলোয়াড়, রেফারী প্রমুখের দেখার সুবিধার জন্য।

বল চামড়ার বা রাবারের হবে। বলের পরিধি ·৬৮ মিটার থেকে ·৭১ মিটারের মধ্যে হবে। ওজন ৪০০ থেকে ৪৫০ গ্রাম।

রেফারীর কাছে সাদা পতাকা (এর একদিক নীল) এবং গোল-জাজদের কাছে দিতে হয় লাল পতাকা।

ক্যাপ : ওয়াটার পোলো খেলোয়াডদের পোশাক সম্পর্কে যথেষ্ট বিধি-নিষেধ আছে। দুই দলে ৭+৭=১৪ জন খেলোয়াড় থাকে। এদের মধ্যে গোলকীপার ছাড়া একটি দল মাথায় গাঢ় নীল এবং আর একটি দল সাদা ক্যাপ বা টুপি পরে। সাদা টুপির দলের গোলকীপার সাদা-লাল টুপি ও গাঢ় নীল টুপির দলের গোলকীপার নীল-লাল রঙের টুপি পরে।

খেলোয়াড়দের নম্বর থাকবে এইরূপ : গোলকীপার—১, লেফট্ ব্যাক—২,

রাইট ব্যাক—৩, হাফ-ব্যাক—৪, লেফট্ ফরওয়ার্ড—৫, সেণ্টার ফরওয়ার্ড—৬, রাইট ফরওয়ার্ড—৭। বদল হলে ৮, ৯, ১০ নম্বর আসবে।

খেলার শুরু : খেলায় যে কোনও পর্বের শুরুতে সকল খেলোয়াড় নিজ নিজ গোল-লাইনে দাঁড়াবে, তবে দু'জনের বেশি গোলপোস্টের মধ্যে থাকতে

ওয়াটার পোলো
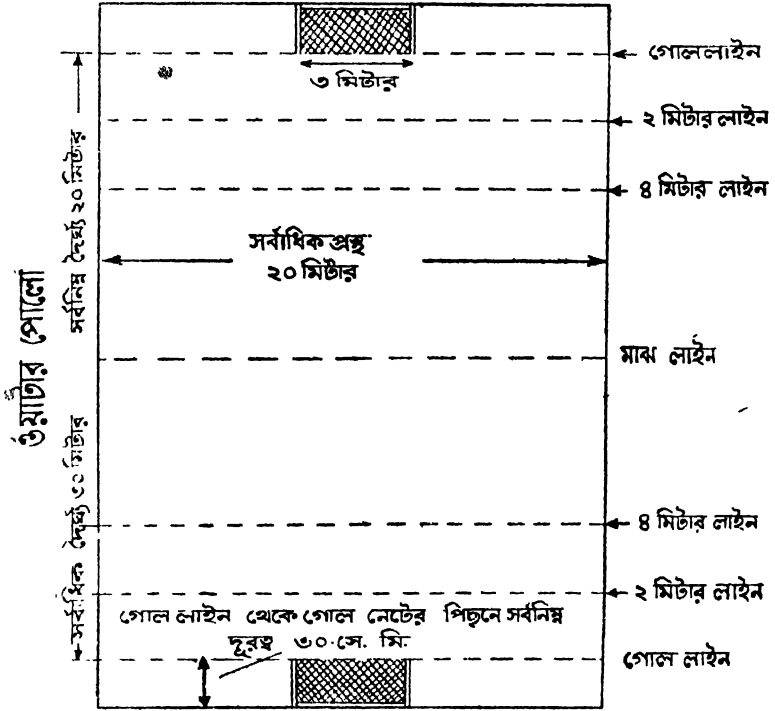
পারে না। রেফারী বাঁশি বাজিয়ে 'ফিল্ড অব্ প্লে' বা 'মাঝমাঠে' বল ছুঁড়লে খেলা শুরু হয়। খেলোয়াড়রা সাঁতার কেটে বল ছুঁড়তে থাকে। এতে পাস দেওয়া বা ড্রিবলিং করা যায়। গোল হয়ে গেলে খেলোয়াড়রা নিজেদের দিকে যে কোনও জায়গায় দাঁড়াতে পারে। শরীরের যে কোনও অংশে বল ছুঁইয়ে গোল দেওয়া যায়। তবে খেলা শুরুর পরে অন্ততঃ দু'জন খেলোয়াড়ের বল স্পর্শ করা বা খেলা দরকার।

খেলার সময় : ৫ মিনিট করে ৪ ইনিংস অর্থাৎ ২০ মিনিট খেলা হয়। প্রতি অর্ধের মধ্যে ২ মিনিট বিরতি থাকে, আর এই সময় উভয় দল দিক

পরিবর্তন করে। নির্দিষ্ট সময়ে মীমাংসা না হলে ৫ মিনিট পরে ৩ মিনিট করে দুই পর্যায়ে খেলা হবে। তখন বিরতি ১ মিনিট।

খেলোয়াড়দের সম্পর্কে : (ক) প্রতি দলে ৭ জন করে খেলোয়াড় থাকলেও ৪ জন করে অতিরিক্ত খেলোয়াড় রাখা যায়—যাদের বদলী হিসাবে খেলানো যেতে পারে।

(খ) কোনও খেলোয়াড় গায়ে গ্রীজ, তেল বা এই ধরনের কিছু মাখতে পারে না। রেফারী খেলা শুরুর আগে ওই রকম কিছু দেখলে তৎক্ষণাৎ তা মুছে ফেলতে বলেন। খেলার মাঝেও তিনি এই রকম দেখলে খেলোয়াড়কে তা মুছে খেলতে বলেন, কিন্তু খেলা বন্ধ হয় না।

গোলকীপার : (ক) গোলকীপার গোলে থাকে। তবে সে দাঁড়াতে ও হাঁটতে পারে। ঘুষি মারতে পারে বলে। লাফাতে পারে। একসঙ্গে দুই হাত ব্যবহার করতে পারে।

(খ) কিন্তু ৪ মিটার-অঞ্চলের বাইরে যেতে পারে না।

(গ) হাফওয়ে-লাইনের পিছনে বল ছুঁড়তে পারে না। তাহলে শাস্তি-স্বরূপ বিপক্ষ ফ্রী-থ্রো পায়, তাদের সর্ব-নিকটে যে খেলোয়াড় থাকে সেখান থেকে।

(ঘ) গোলকীপার কর্তৃক বার বা রেল ধরে রাখার অভিযোগে শাস্তিস্বরূপ ফ্রী-থো হয়, যেখানে ঘটনা ঘটেছে সেখান থেকে।

(ঙ) আহত বা অসুস্থ হলেই গোলকীপার অবসর নিতে পারে এবং তার বদলে আর একজন গোলে আসতে পারে। তখন বদলী জন গোলকীপারের পোশাক পরবে।

(চ) গোল-থ্রো হলে গোলকীপার সেখানে থাকতে পারে না। তার নিকটস্থ রক্ষণভাগের খেলোয়াড় থ্রোটি ঠেকায়।

(ছ) আহত হয়ে গোলকীপার বাইরে চলে গেলে পরে ফিরে সে অন্যত্র খেলতে পারে।

গোল-থ্রো : (ক) বল গোল-লাইন অতিক্রম করলেই রেফারী বাঁশি বাজান গোল হয়েছে বলে।

(খ) কিন্তু বল গোল-লাইনের উপর দিয়ে গেলে অর্থাৎ গোলে না ঢুকলে এবং সেই বল যদি আক্রমণকারী দলের কোনও খেলোয়াড় শেষ ছুঁয়ে থাকে,

তবে রক্ষণদলের গোলকীপার গোল-লাইন থেকে (দুই পোস্টের মাঝে) গোল-থ্রো করে।

(গ) গোল-থ্রো ভুল হলে আবার করতে হবে।

(ঘ) ওই সময় গোলকীপার না থাকলে তার বদলে অন্য খেলোয়াড় থ্রোটি করতে পারে।

কর্ণার-থ্রো : (ক) কিন্তু বল যদি রক্ষণদলের কারও গায়ে লেগে গোল-পোস্টের উপর দিয়ে বাইরে যায়, তবে ফুটবলের মত এখানেও আক্রমণকারীদল কর্ণার পায় (এখানে কর্ণার-থ্রো)।

(খ) ২ মিটার-লাইন থেকে কর্ণার-থ্রো করতে হয়। তখন গোলকীপারই শুধু ২ মিটার-লাইনের মধ্যে থাকে। তবে ওই সময় গোলকীপার কোনও কারণে জলের বাইরে থাকলে অন্য কোনও খেলোয়াড় কর্ণার-থ্রো ঠেকাতে পারে।

(গ) ভুল হলে পুনরায় কর্ণার-থ্রো করা যায়।

ফ্রী-থ্রো : (ক) রেফারী ফাউলকারী দলের খেলোয়াড়ের টুপির রঙের পতাকা দেখান।

(খ) যেখানে ফাউল হয়েছে সেখান থেকেই ফাউল-থ্রো করতে হয়।

(গ) গোলকীপারকে ফাউল করা হলে সে-ই যেন থ্রো করে।

(ঘ) ফ্রী, কর্ণার অথবা নিউট্রাল থ্রো যাই করা হোক—তারপর অন্ততঃ দু'জন খেলোয়াড় বল না ছুঁলে বা খেললে গোল হবে না।

নিউট্রাল থ্রো : অসুস্থ, আহত বা দুই দলের দুই বা ততোধিক খেলোয়াড় ফাউল করলে বা রেফারী দেখতে না পেলে নিউট্রাল থ্রো হয়। এই থ্রো হবে ঘটনা যেখানে ঘটেছে তার কাছাকাছি জায়গা থেকে।

গুরুতর ফাউল : (ক) বল আটকে রাখা, ডুবিয়ে ধরা ইত্যাদি।

(খ) কিক্ দেওয়া। নিশ্চিত গোল থেকে অব্যাহতির জন্য ৪ মিটারের মধ্যে ফাউল।

পেনাল্টি-থ্রো : বিপক্ষ বল নিয়ে এগিয়ে আসতে থাকলে রক্ষণ-দলের কেউ ৪ মিটার-লাইনের মধ্যে যদি ফাউল করে, তবে আক্রমণকারী দল পেনাল্টি-থ্রো পায়। ৪ মিটার-লাইনের যে কোনও স্থান থেকে পেনাল্টি-থ্রো করা যায়। এই সময় কিন্তু বল ঠেকাবে শুধু গোলকীপার। তবে গোলকীপারের

দেহের কোনও অংশ গোল-লাইনের পিছনে থাকবে না। এবং তার আগে কোনও কারণে গোলকীপার জলের বাইরে গেলে তার বদলে অন্য কেউ গোলে দাঁড়াতে পারে পেনাল্টি-থেলা আটকাতে।

জলের বাইরে ঃ খেলা চলাকালে জলের বা নির্দিষ্ট এলাকার বাইরে যাওয়া যায়, যদি

(ক) বিরতি হয়,

(খ) অসুস্থ বা আহত হলে,

(গ) রেফারীর অনুমতিতে।

কারও আঘাত বা অসুস্থতার জন্য ৩ মিনিটের বেশি খেলা বন্ধ থাকে না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ফুটবল

১নং আইন ঃ খেলার মাঠ

খেলার মাঠ এবং মাঠের আনুষঙ্গিক উপাদান পর-পৃষ্ঠায় প্রদত্ত নক্‌সা-অনুযায়ী হবে :

১। **আয়তন ঃ** খেলার মাঠটি আয়তক্ষেত্রাকার হবে। মাঠের দৈর্ঘ্য ১৩০ গজের (১২০ মিটার) বেশি হবে না, আবার ১০০ গজের (৯০ মিটার) কমও হবে না এবং প্রস্থ ১০০ গজের বেশি বা ৫০ গজের (৪৫ মিটার) কম হবে না। [আন্তর্জাতিক ম্যাচে মাঠের দৈর্ঘ্য ১২০ গজের (১১০ মিটার) বেশি বা ১১০ গজের (১০০ মিটার) কম এবং প্রস্থ ৮০ গজের (৭৫ মিটার) বেশি বা ৭০ গজের (৬৪ মিটার) কম হবে না।] সকল ক্ষেত্রেই দৈর্ঘ্য প্রস্থের চেয়ে বেশি হবে।

২। **চিহ্নদান ঃ** ছকমত মাঠটিকে সুস্পষ্ট সীমারেখার সাহায্যে চিহ্নিত করতে হবে, এই সীমারেখাগুলি ৫ ইঞ্চির (১২ সেন্টিমিটার) বেশি চওড়া হবে না এবং "V" আকারের গর্ত কেটে সীমারেখা ঠিক করা চলবে না। দীর্ঘতম সীমারেখা দু'টিকে টাচ-লাইন এবং ক্ষুদ্রতম দু'টিকে গোল-লাইন বলা হবে। মাঠের প্রত্যেক কোণে এক-একটি পতাকা বসাতে হবে; পতাকার দণ্ড অন্ততঃ ৫ ফুট (১.৫০ মিটার) উঁচু হবে এবং এর অগ্রভাগ ছুঁচালো হবে না। হাফওয়ে-লাইনের দু'পাশে এবং টাচ-লাইন থেকে অন্ততঃ, এক গজ (১ মিটার) বাইরে অনুরূপ দু'টি পতাকা রাখা যেতে

পারে। মাঠের মধ্যে আড়াআড়িভাবে একটি হাফওয়ে-লাইন টানতে হবে যা মাঠকে সমান দু'ভাগে ভাগ করে। মাঠেব কেন্দ্রবিন্দুটি সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করতে হবে এবং কেন্দ্রবিন্দু থেকে ১০ গজ (৯.১৫ মিটার) ব্যাসার্ধ নিয়ে একটি বৃত্ত আঁকতে হবে।

ফুটবলরখেলামাঠ
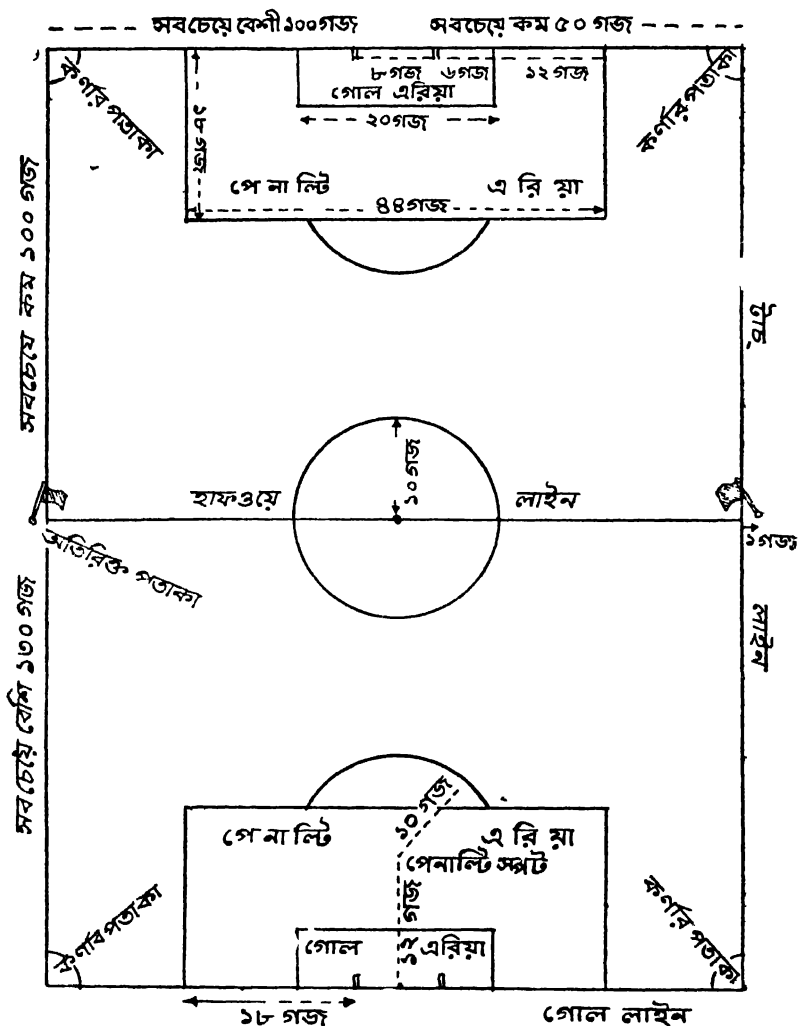
৩। **গোল-এরিয়া:** মাঠের উভয় প্রান্তেই প্রতি গোলপোস্ট থেকে ৬ গজ (৫.৫০ মিটার) দূরে গোল-লাইনের সঙ্গে সমকোণ করে দু'টি লাইন মাঠের

ভিতর দিকে ৬ গজ টেনে নিয়ে যেতে হবে এবং এই লাইন ছু'টিকে যুক্ত করবে গোল-লাইনের সঙ্গে সমান্তরাল একটি লাইন। এই লাইনগুলি ও গোল-লাইন দিয়ে ঘেরা জায়গাটিকে গোল-এরিয়া বলা হবে।

৪। **পেনাল্টি-এরিয়া:** মাঠের উভয় প্রান্তেই প্রতি গোলপোস্ট থেকে ১৮ গজ দূরে গোল-লাইনের সঙ্গে সমকোণ করে ছু'টি লাইন মাঠের ভিতর দিকে ১৮ গজ পর্যন্ত টেনে নিয়ে যেতে হবে এবং লাইন ছু'টিকেও যুক্ত করবে গোল-লাইনের সঙ্গে সমান্তরাল একটি লাইন। এই লাইনগুলি ও গোল-লাইন দিয়ে ঘেরা জায়গাটিকে পেনাল্টি-এরিয়া বলা হবে। উভয় পেনাল্টি-এরিয়ার মধ্যেই গোল-লাইনের মধ্যবিন্দু থেকে ১২ গজ দূরে একটি উপযুক্ত চিহ্ন করতে হবে; গোল-লাইনের সঙ্গে সমকোণ করছে এমন একটি কাল্পনিক লাইন বরাবর ঐ দূরত্ব মেপে নিতে হবে। চিহ্নগুলি নির্দিষ্ট করবে পেনাল্টি-কিক মারার জায়গা। প্রত্যেক পেনাল্টি-কিক মারার জায়গা থেকে ১০ গজ ব্যাসার্ধ নিয়ে একটি বৃত্তচাপ পেনাল্টি-এরিয়ার বাইরে আঁকতে হবে।

৫। **কর্ণার-এরিয়া:** প্রত্যেক কর্ণার পতাকা-দণ্ড থেকে ১ গজ ব্যাসার্ধ নিয়ে মাঠের মধ্যে এক-একটি সিকি বৃত্ত এঁকে নিতে হবে।

৬। **গোল:** উভয় গোল-লাইনের মাঝখানে থাকবে গোল। গোল তৈরি হবে এমন ছু'টি পোস্ট নিয়ে, যেগুলি মাটির উপর খাড়া ও কর্ণার-পতাকা থেকে সমদূরবর্তী এবং যাদের মধ্যের ব্যবধান ৮ গজ (ভিতরের মাপ); এই পোস্ট ছু'টিকে আড়াআড়িভাবে যুক্ত করবে একটি ক্রসবার, যার নিচের দিকটি মাঠ থেকে ৮ ফুট উঁচুতে থাকবে। গোলপোস্টগুলির প্রস্থ ও ঘনত্ব এবং ক্রসবারগুলির প্রস্থ ও ঘনত্ব ৫ ইঞ্চির (১২ সেন্টিমিটার) বেশি হবে না; পোস্ট ও বারের প্রস্থ সমান রাখতে হবে।

গোলের পিছনে পোস্ট, ক্রসবার ও মাটির সঙ্গে জাল খাটানো যেতে পারে। জাল ভালোভাবে টেনে রাখতে হবে এবং এমনভাবে লাগাতে হবে যাতে গোলকীপার চলাফেরা করার মত যথেষ্ট জায়গা পায়।

শন, পাট বা নাইলনের দড়ি দিয়ে গোল-নেট তৈরি করা যেতে পারে।

আন্তর্জাতিক বোর্ডের সিদ্ধান্ত: গোলপোস্ট ও ক্রসবার যতটা ঘন হবে, গোল-লাইনকে ততটা চওড়া করেই টানতে হবে এই উদ্দেশ্যে যে, গোল-লাইন ও গোলপোস্টের বাইরের দিক ও ভিতরের দিক সমান সমান থাকে। গোল-এরিয়া এবং পেনাল্টি-এরিয়ার সীমারেখা টানার জন্য যথাক্রমে যে ৬ গজ

এবং ১৮ গজ গোল-লাইন বরাবর মাপতে হবে, সেই মাপ আরম্ভ হবে গোল-পোস্টগুলির ভিতরের দিক থেকে। যে সব লাইনের সাহায্যে মাঠের মধ্যের বিভিন্ন এরিয়া তৈরি হয়েছে, সেগুলির সম্পূর্ণ প্রস্থ সংশ্লিষ্ট এরিয়ার অন্তর্ভুক্ত। কোনও প্রতিযোগিতামূলক খেলায় যদি ক্রসবার স্থানচ্যুত হয় বা ভেঙে যায়, তাহলে খেলা থামিয়ে দিতে হবে এবং যদি ক্রসবার যথাস্থানে বসানো বা সরানো না যায়, কিংবা খেলোয়াড়দের বিপদের কারণ হবে না এমন একটি নতুন ক্রস-বারের ব্যবস্থা করা না যায়, তা হলে খেলাটিকে পরিত্যক্ত ঘোষিত করতে হবে। দড়ি ক্রসবারের সন্তোষজনক পরিবর্ত হতে পারে না। গোলপোস্ট এবং ক্রসবার কাঠের বা ধাতুর বা আন্তর্জাতিক ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন বোর্ড মাঝে মাঝে ঠিক করবেন এমন কোনও অনুমোদিত উপকরণ দিয়ে তৈরি হতে হবে। পোস্ট ও বারগুলি বর্গাকৃতি, আয়তক্ষেত্রাকৃতি, গোলাকার, অর্ধগোলাকার বা উপবৃত্তাকার হতে পারে। অন্য কোনও উপকরণে তৈরি বা মাপের পোস্ট ও বার ব্যবহার করা চলবে না।

রেফারীদের প্রতি উপদেশ : খেলা আরম্ভ হবার বেশ খানিকটা আগে মাঠে গিয়ে দেখে নিন সব ঠিক আছে কিনা।

ক্লাব-সম্পাদকদের প্রতি উপদেশ : ১১৫ গজ লম্বা ও ৭৫ গজ চওড়া মাঠই সবচেয়ে বেশি প্রচলিত, কিন্তু যে প্রতিযোগিতায় ক্লাবগুলি যোগ দিচ্ছে, তার নিয়মই মেনে নেওয়া উচিত। যে ক্লাবের মাঠে খেলা হচ্ছে, মাঠে ঠিকমত দাগ টানার দায়িত্ব তাদেরই। হাল্‌কা রঙের পতাকা ব্যবহার করা উচিত। গোলপোস্টে সাদা রং লাগানো উচিত।

খেলোয়াড়দের প্রতি উপদেশ : খুব ভালো করে খেলার আইন জেনে নিতে হবে। গোলকীপাররা অনেক সময় কোনও সট বাঁচাতে গিয়ে বা বলের নাগাল পাবার উদ্দেশ্যে ইচ্ছা করে বার ধরে ঝুলে পড়ে এবং সেটিকে টেনে নামায়। গোলকীপারের এই ধরনের কাজ অসদাচরণের পর্যায়ে পড়ে।

২নং আইন : বল

বলটি গোলাকার হবে ; এর বাইরের আবরণ চামড়া অথবা অন্য কোনও অনুমোদিত উপকরণ দিয়ে তৈরি করতে হবে। বল তৈরির জন্য এমন কিছু ব্যবহার করা চলবে না, যা খেলোয়াড়দের পক্ষে বিপজ্জনক হতে পারে।

বলের পরিধি ২৮ ইঞ্চির বেশি বা ২৭ ইঞ্চির কম হবে না। খেলা আরম্ভের সময় বলের ওজন ১৬ আউন্সের বেশি বা ১৪ আউন্সের কম থাকবে না। বলে

হাওয়ার চাপ সমুদ্র-সমতলে বায়ুচাপের অনুরূপ হবে, অর্থাৎ প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে ১৫ পাউণ্ড বা প্রতি বর্গসেন্টিমিটারে ১ কিলোগ্রাম। রেফারী অনুমতি না দিলে খেলার সময়ের মধ্যে বল বদল করা যাবে না।

আন্তর্জাতিক বোর্ডের সিদ্ধান্ত: খেলা চলতে চলতে বল ফেটে গেলে বা বলের হাওয়া কমে গেলে খেলা থামাতে হবে এবং ঠিক যেখানে বলটি ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে গিয়েছিল, সেখানে নতুন বল ড্রপ দিয়ে খেলা আবার আরম্ভ করতে হবে।

ক্লাব-সম্পাদকদের প্রতি উপদেশ: যে ক্লাবের মাঠে খেলা হচ্ছে তাদের বলেই খেলানো উচিত। দেখে নিতে হবে, বলের হাওয়া ঠিক আছে কিনা। হাতের কাছে বাড়তি বল রেখে দিতে হবে।

৩নং আইন: খেলোয়াড়ের সংখ্যা

(১) খেলা হবে দু'টি দলের মধ্যে; কোনও দলে ১১ জনের বেশি খেলোয়াড় থাকতে পারবে না এবং এই ১১ জনের মধ্যে অবশ্যই একজন গোলকীপার থাকবে।

(২) প্রীতি খেলায় এবং আন্তর্জাতিক বা জাতীয় সংস্থার অনুমোদন-সাপেক্ষে প্রতিযোগিতামূলক খেলাতেও ২জন পর্যন্ত খেলোয়াড় বদল করা যাবে। বদলী খেলোয়াড়দের নাম খেলা আরম্ভ হবার আগেই রেফারীকে জানিয়ে দিতে হবে।

(৩) গোলকীপারের সঙ্গে জায়গা বদল করে বাকী খেলোয়াড়দের কোনও একজন অথবা আগে নাম জানিয়ে দেওয়া হয়েছে—এমন একজন বদলী খেলোয়াড় (যদি বদল চলে) খেলতে পারে। অবশ্য আগে রেফারীকে জানিয়ে তবেই এই পরিবর্তন করা যাবে।

দণ্ড: রেফারীকে আগে না জানিয়ে যদি কোনও খেলোয়াড় বা নাম দেওয়া আছে এরকম কোনও বদলী খেলোয়াড় গোলকীপারের সঙ্গে জায়গা বদল করে নিয়ে খেলে এবং পেনাল্টি-এরিয়ার মধ্যে হাত দিয়ে বল ধরে, তবে তার দলের বিরুদ্ধে পেনাল্টি-কিকের নির্দেশ দেওয়া হবে।

আন্তর্জাতিক বোর্ডের সিদ্ধান্ত: খেলায় কোনও দলে ৭ জনের কম খেলোয়াড় থাকলে সে খেলা আইনসিদ্ধ নয়, এটাই আন্তর্জাতিক বোর্ডের মত। খেলা আরম্ভ হওয়ার আগে রেফারীকে অনধিক ৫ জন সম্ভাব্য বদলী

খেলোয়াড়ের নাম জানিয়ে দিতে হবে, যাদের মধ্য থেকে ২ জনকে বেছে নেওয়া যেতে পারবে। খেলা আরম্ভের আগে বহিষ্কৃত কোনও খেলোয়াড়ের বদলে একজন বদলী খেলোয়াড় খেলতে পারে, কিন্তু সেই খেলোয়াড়কে তার দলের হয়ে খেলার সুযোগ দিতে গিয়ে কিক-অফের দেরী করানো চলবে না। খেলা আরম্ভের পর বহিষ্কৃত কোনও খেলোয়াড়ের বদলে কেউ খেলতে পারবে না। খেলা আরম্ভের আগে বা পরে কোনও বদলী খেলোয়াড়কে বহিষ্কৃত করা হলে তার বদলে কেউ খেলতে পারবে না; তবে এই সিদ্ধান্ত সেই সব খেলোয়াড়দের সম্পর্কেই প্রযোজ্য, যারা ১২নং আইন অনুসারে বহিষ্কৃত হচ্ছে, ৪নং আইন ভঙ্গকারীদের সম্পর্কে নয়। কোনও খেলোয়াড়ের বদলে একবার কেউ খেলতে নামলে পূর্বের খেলোয়াড় আর খেলায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না। খেলোয়াড় বদল করলে রেফারীকে জানাতে হবে; খেলা সাময়িকভাবে বন্ধ—মাত্র এমন সময়েই বদলী খেলোয়াড় মাঠে ঢুকতে পারবে—রেফারীর দিক থেকে সম্মতিসূচক সঙ্কেত পাবার পর।

রেফারীদের প্রতি উপদেশ : খেলা আরম্ভের সময় জেনে নিন কোন্ কোন্ খেলোয়াড় গোলকীপার হিসাবে খেলছে।

৪নং আইন : খেলোয়াড়দের সাজ-সরঞ্জাম

কোনও খেলোয়াড় এমন কিছু পরবে না যা অন্য কোনও খেলোয়াড়ের পক্ষে বিপজ্জনক। বুটগুলি নিম্ন-বর্ণিত মান-অনুযায়ী তৈরি করতে হবে :

(এ) বুটের বার চামড়ার বা রাবারের তৈরি হবে। এগুলি আড়াআড়ি-ভাবে বুটের নিচে আঁটা থাকবে এবং চ্যাপ্টা হবে। বার চওড়ায় আধ ইঞ্চির কম হবে না এবং বুটের প্রস্থ পর্যন্ত লম্বা হবে ও বারের কোণগুলি গোলাকার হবে।

(বি) বুটের স্টাড চামড়া, রাবার, অ্যালুমিনিয়াম, প্ল্যাস্টিক বা এই জাতীয় বস্তু দিয়ে তৈরি হবে এবং ফাঁপা হবে না। স্টাডের যে অংশটি তার ভিত্তি হিসাবে কাজ করে সেই অংশট বাদ দিয়ে স্টাডের বাকী অংশ বুটের সোল থেকে ¾ ইঞ্চির বেশি বেরিয়ে থাকবে না। স্টাডের ব্যাস আধ ইঞ্চির কম হবে না। যেখানে স্টাডের নিচের মুখ ক্রমশঃ সরু করা থাকে, সেখানেও স্টাডের কোনও অংশের ব্যাস আধ ইঞ্চির কম হবে না। যেখানে স্ক্রু-যুক্ত স্টাড বসানোর জন্যে ধাতুর চাকৃতি ব্যবহার করা হবে, এই চাকৃতি অবশ্যই বুটের নিচের চামড়ার সঙ্গে জুড়তে হবে এবং এর যে কোনও স্ক্রুকে স্টাডের অংশ বলেই

ধরা হবে। স্ক্রু ধরনের স্টাডের জন্য ধাতুর চাকতির ব্যবহার ছাড়া কোনও-রকম ধাতুর পাতের ব্যবহার চলবে না, এমন কি যদি সেটি চামড়া বা রাবার দিয়ে মোড়া থাকে—তবুও। সেলাই করা স্টাড বুটের নিচের চামড়ার সঙ্গে পেরেক দিয়ে বা অন্যভাবে পাশের স্ক্রুর সঙ্গে লাগানোও চলবে না। ভিত্তির অংশ ছাড়া স্টাড বারওয়ালা চাকতির মত করা যাবে না কিংবা স্টাডে কোনও রকমের বৈচিত্র্য বা অলঙ্করণ চলবে না।

(সি) বুটে বার এবং স্টাড একত্রে ব্যবহার করা চলে, যদি সবটা মিলে এই আইনের সাধারণ শর্তগুলি পূরণ করে। বুটের সোল বা গোড়ালি থেকে বার বা স্টাড ½ ইঞ্চির বেশি বেরিয়ে থাকবে না। যদি বারে বা স্টাডে পেরেক ব্যবহার করা হয়, তাহলে সেগুলিকে ভিতর দিকে ঢুকিয়ে দিতে হবে।

(**দ্রষ্টব্য:** খেলোয়াড়দের সাধারণ সাজ-পোশাক হল জার্সি অথবা সার্ট, হাফপ্যান্ট, মোজা এবং বুট। গোলকীপার এমন রঙের পোশাক পরবে যাতে অন্যান্য খেলোয়াড় থেকে তাকে আলাদা করে চেনা যায়।)

দণ্ড: এই আইনের কোনও রকম লঙ্ঘন ঘটলে, লঙ্ঘনকারী খেলোয়াড়কে তার সরঞ্জাম সংশোধন করে নেওয়ার জন্য মাঠ থেকে বহিষ্কৃত করতে হবে এবং রেফারীকে না বলে সেই খেলোয়াড় মাঠে ঢুকতে পারবে না। সাজ-পোশাক বিধিসম্মত হয়েছে এ বিষয়ে রেফারীকে নিশ্চিত হতে হবে।

আন্তর্জাতিক বোর্ডের সিদ্ধান্ত: ফুটবলে বুট পরা আইন অনুসারে বাধ্যতামূলক নয়, কিন্তু বোর্ড মনে করেন যে, প্রতিযোগিতামূলক খেলায় যখন অধিকাংশ খেলোয়াড়ই বুট পরে খেলছে—সে অবস্থায় রেফারীর উচিত নয় একজন বা কয়েকজন খেলোয়াড়কে বিনা বুটে খেলতে দেওয়া। রেফারী যদি দেখেন যে, একজন খেলোয়াড় এমন জিনিস পরে আছে যা অন্য খেলোয়াড়দের বিপদের কারণ হতে পারে, তিনি তাকে সেগুলি খুলে ফেলতে বলবেন এবং সেই খেলোয়াড় রেফারীর নির্দেশ অমান্য করলে তাকে আর খেলায় অংশ গ্রহণ করতে দেওয়া হবে না।

৫নং আইন: রেফারী

প্রত্যেক খেলা পরিচালনা করার জন্যে একজন রেফারী নিযুক্ত করতে হবে।

রেফারীর কাজ: (এ) তিনি খেলার আইন বলবৎ করবেন এবং যে কোনও বিতর্কমূলক বিষয়ে সিদ্ধান্ত জানাবেন। খেলার ফল নির্ধারণ করার ব্যাপারে

খেলা-সংক্রান্ত বাস্তব ঘটনাগুলি সম্পর্কে তাঁর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। তিনি যখন কিক-অফের সঙ্কেত দেন তখন থেকেই তাঁর আইনগত কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। খেলা সাময়িকভাবে বন্ধ বা বল খেলার বাইরে এমন সময়েও তাঁর দণ্ড দেওয়ার অধিকার থাকবে। অবশ্য যেক্ষেত্রে তিনি দেখবেন যে, দণ্ড দিলে তিনি দোষী পক্ষেরই সুবিধা করে দিচ্ছেন, সেক্ষেত্রে তিনি দণ্ড দেওয়া থেকে বিরত থাকবেন। (বি) খেলার একটা হিসাব রাখবেন ; সময়রক্ষক হিসাবে কাজ করবেন এবং পূর্ণ সময় বা যতটা সময় ঠিক করা আছে, ততটা সময় খেলাবেন। দুর্ঘটনা বা অন্য কোনও কারণে নষ্ট সময় তিনি খেলার সময়ের সঙ্গে যোগ করে নেবেন। (সি) কোনও আইনভঙ্গ ঘটলে সাময়িকভাবে খেলা থামাতে এবং অপরিহার্য কারণে বা দর্শকদের বাধা দেওয়ার ফলে বা অন্য কোনও কারণে সাময়িকভাবে বা একেবারেই খেলা বন্ধ করে দেবার স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা তাঁর আছে। এইসব ক্ষেত্রে তিনি যোগ্য কর্তৃপক্ষের কাছে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একটি রিপোর্ট পেশ করবেন। (ডি) যে সময় তিনি মাঠে ঢুকছেন সেই সময় থেকেই অসদাচরণকারী বা অভদ্র আচরণকারী কোনও খেলোয়াড়কে সতর্কিত করাব বা সেই খেলোয়াড় বার বার ঐ রকম আচরণ করলে তাকে খেলায় অংশগ্রহণ থেকে বিরত করার স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা তাঁর আছে। (ই) খেলোয়াড় এবং লাইন্সম্যান ছাড়া অন্য কোনও ব্যক্তিকে তাঁর অনুমতি ছাড়া মাঠে ঢুকতে দেবেন না। (এফ) যদি মনে করেন যে, কোনও খেলোয়াড সাংঘাতিকভাবে আহত হয়েছে, তাহলে খেলা থামাবেন এবং খেলোয়াড়টিকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মাঠের বাইরে পাঠানোর ব্যবস্থা করে সঙ্গে সঙ্গেই খেলা আবার আরম্ভ করবেন। যদি কোনও খেলোয়াড় সামান্য আঘাত পায় তাহলে খেলা থামানো হবে না—যতক্ষণ না বল খেলার বাইরে হয়। (জি) কোনও খেলোয়াড় হিংস্র আচরণ করার অপরাধে দোষী হলে তাকে আগে থেকে কোনও রকম সতর্ক না করেই খেলায় আর অংশগ্রহণ থেকে বিরত করার স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা রেফারীর থাকবে। (এইচ) সমস্ত ক্ষেত্রে থামানোর পর খেলা আবার আরম্ভের সঙ্কেত জানাবেন। (আই) খেলার বলটি ২নং আইনের শর্তগুলি পূরণ করছে কিনা সেটা রেফারী ঠিক করবেন।

আন্তর্জাতিক বোর্ডের সিদ্ধান্ত : আন্তর্জাতিক খেলায় রেফারীরা এমন ব্লেজার পরবেন, যেটাকে প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলির জামার রঙের থেকে সহজেই আলাদা বলে বোঝা যায়। রেফারীর কর্তৃত্ব এবং ক্ষমতা তিনি মাঠে ঢোকার

সঙ্গে সঙ্গেই আরম্ভ হয়, সুতরাং কোনও খেলোয়াড় বা নাম দেওয়া আছে এমন বদলী খেলোয়াড় কোনও অপরাধ করলে খেলা আরম্ভ হওয়ার আগেই তাকে তিনি মাঠ থেকে বার করে দিতে পারেন। লাইন্সম্যানরা রেফারীর সহায়ক। রেফারী যদি কোনও ঘটনা নিজেই দেখেন এবং মাঠের মধ্যে যেখানে আছেন সেখান থেকে তিনিই বেশি ভালোভাবে বিচার করতে পারেন, তাহলে কখনোই তিনি লাইন্সম্যানের হস্তক্ষেপ গ্রাহ্য করবেন না। এই বিধিসাপেক্ষে এবং লাইন্সম্যান নিরপেক্ষ হলে রেফারী লাইন্সম্যানের হস্তক্ষেপ গ্রাহ্য করতে পারেন এবং গোল হবার অব্যবহিত পূর্বের আইনলঙ্ঘনের ঘটনার যে বিবৃতি লাইন্সম্যান দেবেন তার ভিত্তিতে গোল নাকচ করতে পারেন। অবশ্য যতক্ষণ না খেলা আবার আরম্ভ করা হচ্ছে, তার মধ্যেই রেফারী তাঁর প্রথম সিদ্ধান্ত পাল্টাতে পারবেন। চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে ৫ নম্বর আইনের 'সি' অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রেফারী খেলা বন্ধ করে দিতে পারেন, কিন্তু এক্ষেত্রে কোনও দলকে 'স্ক্র্যাচ' করার এবং সেহেতু ম্যাচে পরাজিত ঘোষিত করবার ক্ষমতা বা অধিকার রেফারীর নেই। তিনি অবশ্যই উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে ঘটনার একটা বিশদ বিবরণ পাঠাবেন এবং এর পর ব্যাপারটি নিয়ে যা কিছু করবার তা ঐ কর্তৃপক্ষই করবেন। যদি কোনও খেলোয়াড় একই সময়ে দুই ধরনের দু'টি আইন ভঙ্গ করে, তাহলে রেফারী গুরুতরটির জন্যই দণ্ড দেবেন। যে সব ঘটনা রেফারী স্বয়ং দেখতে পাননি সেগুলি সম্পর্কে নিরপেক্ষ লাইন্সম্যানরা তাঁকে জানাবেন। সেই অনুসারে কাজ করাই রেফারীর কর্তব্য। খেলা চলছে এমন সময় রেফারী ট্রেনার বা অন্য কাউকে তাঁর সঙ্কেত ছাড়া মাঠে ঢুকতে দেবেন না। লাইনের বাইরে থেকে ট্রেনাররা বা ক্লাবের কর্মকর্তারা খেলোয়াড়দের উপদেশ দিলে রেফারী তা বন্ধ করবেন।

রেফারীদের প্রতি উপদেশ : প্রত্যেকটি নিয়ম শিখুন এবং বুঝুন। কখনও কখনও খেলোয়াড় ইচ্ছা করে সময় নষ্ট করে ; তাকে সতর্ক করে দেওয়া উচিত। অনুপযুক্ত আবহাওয়ার জন্য খেলা সাময়িকভাবে স্থগিত রাখার বা একেবারে বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত খুব ভালো করে বিচার-বিবেচনা করে তবেই গ্রহণ করবেন।

ক্লাব-সম্পাদকদের প্রতি উপদেশ : যে ক্লাবের মাঠে খেলা হচ্ছে সেই ক্লাবই খেলার আগে, খেলার সময় ও খেলার পরে রেফারী এবং লাইন্সম্যানদের নিরাপত্তার জন্য দায়ী।

৬নং আইন : লাইন্সম্যান

দু'জন লাইন্সম্যান নিযুক্ত করতে হবে, যাঁদের কর্তব্য (রেফারীর সিদ্ধান্ত-সাপেক্ষে) কখন বল খেলার বাইরে যায় তা এবং কোন্ পক্ষ কর্ণার-কিক, বা থ্রো-ইন পাবে তা নির্দেশিত করা। এ ছাড়া, তাঁরা রেফারীকে আইন অনুযায়ী খেলা নিয়ন্ত্রণ করার ব্যাপারে সাহায্য করবেন। যদি কোনও লাইন্সম্যান অযথা হস্তক্ষেপ করেন বা অযৌক্তিক আচরণ করেন, রেফারী তাঁকে বাতিল করে বদলী একজনের নিয়োগের ব্যবস্থা করবেন। (রেফারী বিষয়টি যোগ্য কর্তৃপক্ষের কাছে রিপোর্ট করবেন।) যে ক্লাবের মাঠে খেলা হচ্ছে সেই ক্লাবেরই উচিত লাইন্সম্যানদের পতাকা দেওয়া।

আন্তর্জাতিক বোর্ডের সিদ্ধান্ত : আন্তর্জাতিক খেলায় লাইন্সম্যানদের পতাকার রং হবে সুস্পষ্ট—উজ্জ্বল লাল বা হলদে। অন্যান্য খেলাতেও এই ধরনের পতাকা ব্যবহার করার সুপারিশ করা হচ্ছে।

খেলোয়াড়দের প্রতি উপদেশ : 'সাসপেণ্ড' থাকা অবস্থায় কোনও খেলোয়াড় লাইন্সম্যানের কাজ করতে পারবে না।

৭নং আইন : খেলার সময়

পারস্পরিক সম্মতি অনুযায়ী অন্যরকম কিছু ঠিক করা না থাকলে খেলা হবে ৪৫ মিনিট করে দু'টি সমান-ভাগের সময় নিয়ে, অবশ্য নিচের বিধিসাপেক্ষে :

(এ) প্রত্যেক ভাগেই দুর্ঘটনা বা অন্যান্য কারণে নষ্ট সময় যোগ করতে হবে। এই সময় কতটা হবে, তা রেফারী তাঁর স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা অনুযায়ী ঠিক করবেন। (বি) প্রত্যেক অর্ধেই পেনাল্টি-কিক মারতে দেওয়ার জন্য প্রয়োজন হলে স্বাভাবিক সময়ের শেষে তার পরের খেলার সময় বাড়িয়ে নিতে হবে।

রেফারীর মত না নিয়ে হাফ-টাইমের বিরতির সময় ৫ মিনিটের বেশি হবে না।

আন্তর্জাতিক বোর্ডের সিদ্ধান্ত : হাফ-টাইমের বিরতি পাওয়ার অধিকার খেলোয়াড়দের আছে।

৮নং আইন : খেলার আরম্ভ

(এ) খেলার শুরুতেই টসের সাহায্যে ঠিক করে নিতে হবে কোন্ দল কোন্ দিকে থাকবে এবং কোন্ দল কিক-অফ করবে। যে দল টসে জিতবে, তারাই ঠিক করবে দিক বেছে নেবে, না কিক-অফ করবে

রেফারী সঙ্কেত করার পর একজন খেলোয়াড় 'প্লেস্ কিক' (বলটি সেণ্টারে স্থিরভাবে বসিয়ে কিক) করে বিপক্ষের অর্ধাংশে বলটি পাঠিয়ে খেলা আরম্ভ করবে। এই সময় প্রত্যেকটি খেলোয়াড় তাদের নিজেদের অর্ধাংশে থাকবে এবং যে কিক করছে তার বিপক্ষের প্রত্যেক খেলোয়াড় যতক্ষণ না 'কিক-অফ' হয় ততক্ষণ বল থেকে অন্ততঃ ১০ গজ দূরে* থাকবে। কিক-অফের পর বলটি তার নিজের পরিধির সমান দূরত্ব** অতিক্রম করা পর্যন্ত সেটিকে খেলার মধ্যে ধরা হবে না। অপর কোনও খেলোয়াড় বলটি যতক্ষণ না স্পর্শ করছে বা খেলছে ততক্ষণ যে কিক-অফ করেছে সে বলটি খেলতে পারবে না।

(বি) **গোল হওয়ার পর ঃ** যে দলের বিরুদ্ধে গোল হয়েছে সেই দলের কোনও একজন খেলোয়াড় অনুরূপভাবে খেলাটি আবার আরম্ভ করবে।

(সি) **হাফ-টাইমের বিরতির পর ঃ** যখন খেলাটি আবার আরম্ভ হবে তখন খেলোয়াড়রা দিক বদল করে নেবে এবং যে খেলোয়াড় খেলাটি আরম্ভ করেছিল তার বিপক্ষের কোনও খেলোয়াড় কিক-অফ নেবে।

দণ্ড ঃ এই আইনের কোনও রকম লঙ্ঘন ঘটলে কিক-অফটি আবার নিতে হবে—একটি ব্যতিক্রমসাপেক্ষে—অপর কোনও খেলোয়াড় স্পর্শ করার বা খেলার আগে যদি কিকার নিজেই বলটি খেলে, তাহলে আইনলঙ্ঘনের জায়গা থেকে বিপক্ষের কোনও খেলোয়াড় ইনডাইরেক্ট ফ্রী-কিক নেবে। কিক-অফ থেকে সরাসরি গোল করা যাবে না।***

(ডি) **অন্য কোনও রকমের সাময়িক বিরতির পর ঃ** এইসব আইনে অন্যত্র উল্লেখ করা হয়নি এমন কোনও কারণজনিত সাময়িক বিরতির পর খেলা আবার আরম্ভ করতে হলে বলটি যেখানে থাকতে থাকতে খেলা বন্ধ হয়েছিল, রেফারী ঠিক সেইখানে বলটি 'ড্রপ' দেবেন—অবশ্য যদি খেলা বন্ধ হবার অব্যবহিত পূর্বে বলটি টাচ-লাইন বা গোল-লাইন অতিক্রম না করে থাকে। বলটি মাটিতে পড়া মাত্রই তাকে খেলার মধ্যে ধরা হবে। যদি রেফারীর ড্রপের পর অন্য কোনও খেলোয়াড় বলটি স্পর্শ করার আগেই সেটি টাচ-লাইন

---

* অর্থাৎ অন্ততঃ সেণ্টার-সার্কলের বাইরে থাকতে হচ্ছে।

** অর্থাৎ বলটিকে অন্ততঃ ২৭ বা ২৮ ইঞ্চি দূরত্ব অতিক্রম করে সরাসরি বিপক্ষের অর্ধাংশে যেতে হচ্ছে।

*** আমাদের মতে এই বাক্যটি যথাস্থানে দেওয়া হয়নি। এটি এখানে না দিয়ে ৮'এ' অংশের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত ছিল। কারণ সেখানেই কিক-অফ সম্পর্কে সাধারণভাবে বলা হয়েছে।

বা গোল-লাইন অতিক্রম করে যায়, তাহলে রেফারী আবার ড্রপ দেবেন বলটি মাটি স্পর্শ করা পর্যন্ত কোনও খেলোয়াড় সেটি খেলতে পারবে না। আইনের এই অংশ না মানা হলে রেফারী আবার বল ড্রপ দেবেন।

আন্তর্জাতিক বোর্ডের সিদ্ধান্ত: খেলোয়াড় ছাড়া অন্য কোনও ব্যক্তিকে দিয়ে কিক-অফ করানো নিষিদ্ধ।

খেলোয়াড়দের প্রতি উপদেশ: রেফারীর বাঁশীর শব্দমাত্রই অনেক খেলোয়াড় বিপক্ষের ১০-গজী বৃত্তের অংশে ঢুকে পড়ে বা হাফওয়ে-লাইন অতিক্রম করে। এটা আইনবিরুদ্ধ, কারণ **খেলা আরম্ভ হচ্ছে কিক-অফের সঙ্গে সঙ্গে, রেফারীর সঙ্কেতের সঙ্গে সঙ্গে নয়।**

প্রতিযোগিতামূলক খেলা অমীমাংসিত হওয়ার পর যদি অতিরিক্ত সময় খেলানোর প্রয়োজন হয়, তা হলে অধিনায়করা অবশ্যই দিক পছন্দ করার উদ্দেশ্যে আবার 'টস' করবেন। অতিরিক্ত সময় (দুই) সমান অংশে ভাগ করে নিতে হবে।

৯নং আইন: বল খেলার মধ্যে এবং খেলার বাইরে

বলকে 'খেলার বাইরে' বলে ধরা হবে:

(এ) যখন মাটিতে বা শূন্যে বলটি সম্পূর্ণভাবে গোল-লাইন কিংবা টাচ-লাইন অতিক্রম করেছে।

(বি) যখন রেফারী খেলা থামিয়েছেন।

খেলার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এ ছাড়া আর সব সময়েই বল 'খেলার মধ্যে' গণ্য হবে, এই ক্ষেত্রগুলি সমেত: (এ) বলটি গোলপোস্ট, ক্রসবার বা কর্ণার পতাকা-দণ্ডে প্রতিহত হয়ে যদি মাঠের মধ্যে ফিরে আসে; (বি) রেফারী বা লাইন্সম্যানরা মাঠের মাধ্যে আছেন এমন সময় যদি বলটি তাঁদের শরীরে প্রতিহত হয়ে ফিরে আসে; (সি) আইনলঙ্ঘন হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে এমন ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত দেওয়া পর্যন্ত।

আন্তর্জাতিক বোর্ডের সিদ্ধান্ত: টাচ-লাইন ও গোল-লাইন খেলার মাঠেরই অংশ। কারণ, যে লাইনগুলি কোনও 'এরিয়া'-র সীমারেখা হিসাবে কাজ করছে, সেগুলি সংশ্লিষ্ট এরিয়ার অন্তর্ভুক্ত।

রেফারীদের প্রতি উপদেশ: বলটি শূন্যে টাচ-লাইন অতিক্রম করে যদি খেলার মাঠের মধ্যেও পড়ে, তা হলেও সেটি খেলার বাইরে।

খেলোয়াড়দের প্রতি উপদেশঃ মনে রাখতে হবে **বলের সমগ্র অংশ** গোল-লাইন বা টাচ-লাইন অতিক্রম করলে তবেই সেটি খেলার বাইরে ; এর পরিষ্কার অর্থ হল—যখন বল এই লাইনগুলির কোনওটির উপর বরাবর গড়িয়ে যায়, তখনও সে বল খেলার মধ্যে।* বিশেষ করে এই আইনের ব্যাপারে, বাঁশী শুনে খেলতে হবে, পতাকা দেখে নয়। লাইন্সম্যানের সঙ্কেত রেফারীর উদ্দেশ্যে এবং একমাত্র রেফারীরই সিদ্ধান্ত জানাবার ক্ষমতা আছে।

১০নং আইনঃ গোল হওয়ার প্রণালী

এই সব আইনে অন্য রকম কিছু বলা না থাকলে, যখন বলের সমগ্র অংশ ক্রসবারের নিচে দুই গোলপোস্টের মধ্যে গোল-লাইন অতিক্রম করে যাবে, তখনই গোল হয়—অবশ্য যদি নিজ পেনাল্টি-এরিয়ায় অবস্থিত গোল-কীপার ছাড়া আক্রমণকারী দলের আর কোনও খেলোয়াড় হাতে বা বাহুতে করে বলটি ছুঁড়ে না দেয় বা বয়ে নিয়ে না যায় কিংবা ঠেলে না দেয়।

খেলায় যে-দল বেশী-সংখ্যক গোল করবে, সেই দল জয়ী হবে, যদি কোনও গোল না হয় বা দু'পক্ষই সমসংখ্যক গোল করে তা হলে খেলা 'ড্র' হয়েছে বলা হবে।

আন্তর্জাতিক বোর্ডের সিদ্ধান্তঃ যদি গোল হবার আগে বাইরের কোনও কিছু বল স্পর্শ করে তা হলে গোলের নির্দেশ দেওয়া যাবে না। বলটি গোলে ঢুকছে, কিন্তু বলের সমগ্র অংশ গোল-লাইন অতিক্রম করার আগেই মাঠে একজন দর্শক ঢুকে পড়ে বলটি ধরে গোল আটকাতে গেল কিন্তু স্পর্শ করতে পারল না, তারপর বলটি গোলে ঢুকল—এক্ষেত্রে গোলের নির্দেশ দিতে হবে।

রেফারীদের প্রতি উপদেশঃ 'ছুঁড়ে না দেয়'-এর মধ্যে টাচ-লাইন থেকে 'থ্রো-ইন্'ও আছে।

১১নং আইনঃ অফ্-সাইড

যে মুহূর্তে বলটি খেলা হচ্ছে, ঠিক সেই মুহূর্তে কোনও খেলোয়াড় বলের চেয়ে বিপক্ষ গোল-লাইনের বেশী কাছে থাকলে অফ্-সাইড হবে যদি না—

(এ) সে মাঠের নিজ অর্ধাংশে থাকে।

* (প্রয়োজনীয় পরিবর্তনসাপেক্ষে) গোলের ক্ষেত্রেও এই নিয়ম। বলের সমগ্র অংশ গোল-লাইনের নির্দিষ্ট অংশ অতিক্রম না করা পর্যন্ত গোল হয় না। ১০নং আইন দ্রষ্টব্য।

(বি) অন্ততঃ ২জন বিপক্ষীয় খেলোয়াড় তার চেয়ে তাদের (বিপক্ষের নিজেদের গোল-লাইনের বেশি কাছে থাকে।

(সি) বলটি শেষে একজন বিপক্ষীয় খেলোয়াড়কে স্পর্শ করেছে বা বিপক্ষীয় খেলোয়াড় বলটি শেষে খেলছে।

(ডি) সে বলটি সরাসরি গোল-কিক, কর্ণার-কিক, থ্রো-ইন্ বা রেফারীর ড্রপ থেকে পেয়ে থাকে।

দণ্ড : এই আইনের কোনও লঙ্ঘন ঘটলে লঙ্ঘনকারীর বিপক্ষীয় একজন খেলোয়াড় লঙ্ঘনের জায়গা থেকে ইনডাইরেক্ট ফ্রী-কিক নেবে।

অফ্-সাইডে থাকলেও কোনও খেলোয়াড় দণ্ডিত হবে না—যদি না রেফারীর মতে সে অফ্-সাইডে থেকে খেলার বা বিপক্ষীয় খেলোয়াড়ের প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করছে বা কোনও রকম সুবিধা নেবার চেষ্টা করছে।

আন্তর্জাতিক বোর্ডের সিদ্ধান্ত : সংশ্লিষ্ট খেলোয়াড়টি যে মুহূর্তে বল পাচ্ছে সেই মুহূর্তে অফ্-সাইড ধরা হবে না ; ধরা হবে তখনই যখন তার দলের একজন তাকে বল পাস করছে। সুতরাং সহ-খেলোয়াড়দের একজন যখন তাকে বল পাস করছে বা ফ্রী-কিক নিচ্ছে তখন যে খেলোয়াড় অফ্ সাইডে নেই, পরে বল চলবার সময় সে (বলের চেয়ে) এগিয়ে গেলেও অফ্-সাইড হবে না।

রেফারীদের প্রতি উপদেশ : আইনের শেষ অনুচ্ছেদটি ভালো করে লক্ষ্য করুন। মুখ্য বিচার্য বিষয় হল : যখন কোনও স্বপক্ষ খেলোয়াড় বলটি খেলে তখন সংশ্লিষ্ট খেলোয়াড়টি **কোথায় ছিল**, প্রায়ই যে ধারণা করা হয়, অর্থাৎ যখন সে নিজেই বলটি খেলে তখন **কোথায় আছে, তা নয়।** সুতরাং এটাই যুক্তিযুক্ত যে, বলটি খেলা হবার সময় যে খেলোয়াড় বলের সামনে নেই সে পরে ছুটে বলের চেয়ে এগিয়ে গেলেও অফ্-সাইড হতে পারে না। মনে রাখতে হবে যে, **ফ্রী-কিক্ বা পেনাল্টি-কিক্ নেবার সময়েও অফ্-সাইড আইন প্রযোজ্য।**

খেলোয়াড়দের প্রতি উপদেশ : এই আইনের সঙ্গে জড়িত কতকগুলি প্রয়োজনীয় বিষয় আছে, সেগুলিই খেলোয়াড়দের আইনটি বুঝতে এবং মনে রাখতে সাহায্য করবে—(এ) খেলোয়াড় দণ্ডিত হবে না, যদি না অফ্-সাইডে থেকে সে সুবিধা লাভ করে (১১নং আইনের শেষ অনুচ্ছেদটি দ্রষ্টব্য)। সুতরাং যদি দেখা যায় যে, খেলোয়াড় অফ্-সাইডে পড়ে গেছে, তা হলে খেলার

জায়গা থেকে তাকে দূরে থাকতে হবে এবং বিপক্ষীয় কোনও খেলোয়াড়ের প্রতিবন্ধকতা বা অসুবিধা সৃষ্টি করবে না বা সে-রকম কিছু করার ভানও করবে না। গোলকীপারের দেখবার অসুবিধা করবে না, এ বিষয়েও সাবধান হতে হবে। (বি) খেলোয়াড় কখনো অফ্-সাইড হবে না যদি এ বিষয়ে সে যত্নবান হয় যে, যখন তার দলের কেউ বলটি খেলছে তখন সে বলের সামনে থাকবে না কিংবা তার জায়গা এবং বিপক্ষ গোল-লাইনের মধ্যে অন্ততঃ দু'জন বিপক্ষীয় খেলোয়াড় আছে।

গোল-কিক্, কর্ণার-কিক্, থ্রো-ইন বা রেফারীর বল ড্রপ দেওয়ার সময় কেউ অফ্-সাইড হতে পারে না। (সি) যদি কেউ অফ্-সাইডে থাকে তা হলে সে নিজেই নিজেকে অন-সাইডে আনতে পারে না। সে অন-সাইডে আসবে কেবল তখনই যখন একজন বিপক্ষীয় খেলোয়াড় বলটি খেলে কিংবা পরে যখন বলটি তার দলের কেউ খেলে তখন সে বলের সামনে না থাকে অথবা যদি তার বিপক্ষীয় খেলোয়াড়দের অবস্থান পরিবর্তিত হয়ে উপরের (বি)-তে বর্ণিত অবস্থার অনুরূপ হয়ে যায়।*

১২নং আইন : ফাউল ও অসদাচরণ

কোনও খেলোয়াড় যদি নিম্নবর্ণিত ৯টি অপরাধের মধ্যে কোনওটি স্বেচ্ছায় করে তাহলে অপরাধের জায়গা থেকে বিপক্ষের অনুকূলে একটি **ডাইরেক্ট ফ্রী-কিকের** নির্দেশ দিয়ে তাকে দণ্ডিত করা হবে : (এ) বিপক্ষের খেলোয়াড়কে লাথি মারা বা মারার চেষ্টা করা; (বি) বিপক্ষের খেলোয়াড়কে ট্রিপ করা অর্থাৎ পা বাড়িয়ে দিয়ে অথবা তার সামনে বা পিছনে ঝুঁকে পড়ে তাকে ফেলে দেওয়া বা ফেলার চেষ্টা করা; (সি) বিপক্ষীয় খেলোয়াড়কে লক্ষ্য করে লাফিয়ে পড়া; (ডি) বিপক্ষীয় খেলোয়াড়কে হিংস্র বা বিপজ্জনকভাবে চার্জ করা; (ই) বিপক্ষীয় খেলোয়াড় প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি না করা সত্ত্বেও পিছন দিক থেকে তাকে চার্জ করা; (এফ) বিপক্ষীয় খেলোয়াড়কে আঘাত করতে উদ্যত হওয়া; (জি) বিপক্ষীয় খেলোয়াড়কে হাত বা বাহুর কোনও অংশ দিয়ে ধরে রাখা; (এইচ) বিপক্ষীয় খেলোয়াড়কে হাত বা বাহুর কোনও অংশ দিয়ে ধাক্কা দেওয়া, (আই) হাত দিয়ে বলটি খেলা অর্থাৎ বলটি হাত বা বাহু দিয়ে বয়ে নিয়ে যাওয়া,

---

*অর্থাৎ যদি দু'জন বিপক্ষীয় খেলোয়াড় গোল-লাইনের ও আক্রমণকারী খেলোয়াড়ের মধ্যে এসে যায়।

আঘাত করা বা ঠেলে দেওয়া। (→গোলকীপার নিজ পেনাল্টি-এরিয়ায় থাকলে তার সম্পর্কে এটা প্রযোজ্য নয়)।

আত্মরক্ষাকারী দলের কোনও খেলোয়াড় যদি ইচ্ছা করে পেনাল্টি-এরিয়ার মধ্যে উপরের ৯টি অপরাধের কোনওটি করে, তা হলে তার দলের বিরুদ্ধে **পেনাল্টি-কিক** দিয়ে তাকে দণ্ডিত করা হবে।

যে সময় পেনাল্টি-এরিয়ার মধ্যে এই রকম কোনও অপরাধ ঘটছে সে সময় বলটি খেলার মধ্যে থাকলেই তার অবস্থাননিরপেক্ষে পেনাল্টি-কিকের নির্দেশ দেওয়া যাবে।

যদি কোনও খেলোয়াড় নিম্নবর্ণিত পাঁচটি অপরাধের যে কোনওটি করে তাহলে অপরাধের জায়গা থেকে বিপক্ষের অনুকূলে একটি **ইনডাইরেক্ট ফ্রী-কিকের** নির্দেশ দিয়ে তাকে দণ্ডিত করা হবে :

১। এমনভাবে খেলা যেটা রেফারীর মতে বিপজ্জনক, যেমন গোলকীপার বল ধরে আছে তখন বলে কিক করার চেষ্টা করা ;

২। বল খেলার মত দূরত্বের বাইরে আছে এবং খেলোয়াড়রা কেউ সেটি খেলার চেষ্টাও করছে না এমন অবস্থায় বিপক্ষীয় খেলোয়াড়কে ন্যায়সঙ্গত চার্জ অর্থাৎ কাঁধ দিয়ে চার্জ করা ;

৩। বলটি না খেলে ইচ্ছাপূর্বক বিপক্ষীয় খেলোয়াড়ের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা অর্থাৎ বিপক্ষীয় খেলোয়াড় এবং বলের মাঝখান দিয়ে ছুটে যাওয়া বা এমনভাবে নিজের শরীর স্থাপন করা যেটা একজন বিপক্ষীয় খেলোয়াড়ের বাধা হয়ে দাঁড়ায় ;

৪। গোলকীপার (ক) বল ধরে আছে ; (খ) কোনও বিপক্ষীয় খেলোয়াড়ের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে ; (গ) গোল-এরিয়ার বাইরে চলে গেছে—এমন অবস্থা ছাড়া তাকে চার্জ করা ;

৫। গোলকীপার হয়ে খেলতে গিয়ে—

(এ) অন্য কোনও খেলোয়াড়কে খেলতে দেবার জন্য বল ছেড়ে না দিয়ে গোলকীপার যদি বল ধরা অবস্থায় বা বল মাটিতে বাউন্স করিয়ে বা শূন্যে বল ছুঁড়ে দিয়ে আবার সেটিকে ধরে ৪ পায়ের বেশি যায় ; কিংবা

(বি) এমন কৌশল অবলম্বন করে, যা রেফারীর মতে, নিজের দলকে অন্যায় সুযোগ দেবার উদ্দেশ্যে নিছক খেলা বন্ধ করে সময় নষ্ট করার জন্যেই।

একটি খেলোয়াড়কে যে সতর্কিত করা হবে, যদি—

(জে) খেলা আরম্ভ হবার পর সে আগে রেফারীর কাছ থেকে সম্মতিসূচক সঙ্কেত না পেয়েই দলে যোগ দেবার বা পুনরায় যোগ দেবার উদ্দেশ্যে মাঠে ঢোকে।

যদি খেলা থামানো হয় (সতর্ক করার জন্যে) তাহলে আইনলঙ্ঘনের জায়গায় বল ড্রপ দিয়ে রেফারী খেলাটি আরম্ভ করবেন। কিন্তু যদি খেলোয়াড়টি গুরুতর কিছু অপরাধ করে তাকে লঙ্ঘিত আইনের উপযুক্ত ধারা অনুযায়ী দণ্ডিত করা হবে।

(কে) সে বার বার খেলার আইন লঙ্ঘন করে ;

(এল) সে কথায় বা কাজে রেফারীর প্রদত্ত সিদ্ধান্তে ভিন্ন মত প্রকাশ করে ;

(এম) সে অভদ্র আচরণ করার জন্য দোষী হয়।

শেষের তিনটি অপরাধের যে কোনওটির জন্য খেলোয়াড়কে সতর্ক করা ছাড়াও অপরাধ অনুষ্ঠানের স্থান থেকে বিপক্ষের অনুকূলে একটি **ইনডাইরেক্ট ফ্রী-কিক** দিতে হবে।

কোনও খেলোয়াড়কে মাঠ থেকে **বহিষ্কৃত** করা হবে, যদি—

(এন) রেফারীর মতে, খেলোয়াড়টি হিংস্র আচরণের বা মারাত্মক ধরনের ফাউল করার জন্য দোষী ;

(ও) সে বিশ্রী বা গালিগালাজপূর্ণ ভাষা ব্যবহার করে ;

(পি) সে একবার সতর্কিত হবার পরও অসদাচরণ করতেই থাকে।

যদি অপরাধের জন্য একজন খেলোয়াড়কে বহিষ্কৃত করতে গিয়ে খেলা থামানো হয় এবং আলাদাভাবে আইনের কোনও লঙ্ঘন না হয়ে থাকে, তাহলে বিপক্ষকে অপরাধ অনুষ্ঠানের জায়গা থেকে একটি ইনডাইরেক্ট ফ্রী-কিক দিয়ে খেলাটি আবার আরম্ভ করতে হবে।

আন্তর্জাতিক বোর্ডের সিদ্ধান্ত : যদি গোলকীপার পেনাল্টি-এরিয়ার মধ্যে ইচ্ছা করে বিপক্ষীয় খেলোয়াড়ের দিকে বলটি সজোরে ছুঁড়ে দিয়ে তাকে আঘাত করে বা বলটি ধরে থাকতে থাকতে বল দিয়ে সেই খেলোয়াড়কে ধাক্কা দেয়, তবে রেফারী তার বিরুদ্ধে পেনাল্টি-কিকের নির্দেশ দেবেন।... যদি কোনও খেলোয়াড় বল হেড করার উদ্দেশ্যে তার সামনে থাকা নিজের দলীয় কোনও খেলোয়াড়ের কাঁধে ভর দিয়ে উঁচু হয় এবং সফল হয়, রেফারী খেলা থামিয়ে প্রথমোক্ত খেলোয়াড়কে অভদ্র আচরণের জন্য সতর্কিত করবে এবং বিপক্ষের অনুকূল ইনডাইরেক্ট ফ্রী-কিকের নির্দেশ

দেবে। যদি কোনও গোলকীপার প্রয়োজনের অতিরিক্ত সময় বলের উপর পড়ে আছে বলে রেফারী মনে করেন তাহলে তাকে অভদ্র আচরণের জন্য দণ্ডিত করা হবে; সে সতর্কিত হবে এবং বিপক্ষ ইনডাইরেক্ট ফ্রী-কিক পাবে এবং আবার ঐ অপরাধ করলে তাকে মাঠ থেকে বহিষ্কৃত করা হবে। খেলা চলতে চলতে যদি কোনও খেলোয়াড় রেফারীর বিনা অনুমতিতে (দুর্ঘটনা ছাড়া) মাঠ ত্যাগ করে তাহলে অভদ্র আচরণের জন্য সে দোষী হবে এবং তার বিরুদ্ধে সেইমত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। বিপক্ষীয় খেলোয়াড় বা কর্মকর্তা বা অন্যান্য ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে থুথু ফেলা বা এই ধরনের অশালীন ব্যবহারকে ১২নং আইনের (এন) ধারার অর্থে হিংস্র আচরণ বলে বিবেচনা করা হবে।

রেফারীদের প্রতি উপদেশ: এই আইনের প্রতিটি দফা সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞান সম্পূর্ণভাবে থাকা প্রয়োজন, কিন্তু এর সঠিক প্রয়োগ নির্ভর করছে 'অপরাধ ইচ্ছাকৃত কিনা'—এ সম্পর্কে রেফারীর সঙ্গে সঙ্গে মনঃস্থির করার ক্ষমতার উপর। আপনার সিদ্ধান্ত নিয়ে তর্ক করার উদ্দেশ্যে বা আপনাকে সেই সিদ্ধান্ত পরিবর্তিত করতে বাধ্য করার উদ্দেশ্যে খেলোয়াড়দের আপনাকে ঘিরে ধরতে দেবেন না।

খেলোয়াড়দের প্রতি উপদেশ: মনে রাখতে হবে, বিপক্ষীয় খেলোয়াড়ের উদ্দেশ্যে আকস্মিক লাফানো বলে কিছু থাকতে পারে না।… মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে এবং চার্জ করা হলে বিরক্ত হলে চলবে না।…বিনা তর্কে রেফারীর সিদ্ধান্ত মেনে নিতে হবে।

১১নং আইন: ফ্রী-কিক

ফ্রী-কিককে দু'শ্রেণীতে বিভক্ত করা হবে—'ডাইরেক্ট' (যা থেকে দোষী পক্ষের বিরুদ্ধে সরাসরি গোল করা চলে) এবং 'ইনডাইরেক্ট' (যা থেকে গোল করা চলে না, যদি না বলটি গোলের ভিতর যাবার আগে কিকার বাদে অন্য কোনও খেলোয়াড় খেলে বা স্পর্শ করে)।

যখন কোনও খেলোয়াড় নিজ পেনাল্টি-এরিয়ার ভিতর ডাইরেক্ট বা ইনডাইরেক্ট ফ্রী-কিক নিচ্ছে, বিপক্ষের সমস্ত খেলোয়াড় ঐ এরিয়ার বাইরে থাকবে এবং কিক নেওয়ার সময় বল থেকে অন্ততঃ ১০ গজ তফাতে থাকবে। বল নিজ পরিধি অতিক্রম করার এবং পেনাল্টি-এরিয়ার বাইরে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই তাকে খেলার মধ্যে ধরা হবে। এই সময় গোলকীপার বলটি হাতে করে

ধরতে পারবে না এই উদ্দেশ্যে যে, সে পরে কিক করে বলটি খেলার মধ্যে ফেলবে। যদি বলটি কিক করে সরাসরি পেনাল্টি-এরিয়ার বাইরে না পাঠানো হয়, কিকটি আবার নিতে হবে।

যখন কোনও খেলোয়াড় নিজ পেনাল্টি-এরিয়ার বাইরে ডাইরেক্ট বা ইনডাইরেক্ট ফ্রী-কিক নিচ্ছে, বল খেলার মধ্যে হওয়া পর্যন্ত সমস্ত বিপক্ষীয় খেলোয়াড়—যদি না তারা নিজ গোল-লাইনে দুই গোল-পোস্টের মধ্যে দাঁড়ায়, বল থেকে অন্ততঃ ১০ গজ (৯.১৫ মিটার) তফাতে থাকবে। বলটি নিজ পরিধি অতিক্রম করলেই খেলার মধ্যে গণ্য হবে।

ফ্রী-কিক নেবার আগেই যদি বিপক্ষীয় কোনও খেলোয়াড় পেনাল্টি-এরিয়ার মধ্যে বা বলের ১০ গজের (৯.১৫ মিটার) মধ্যে অবৈধভাবে ঢুকে পড়ে, আইনের শর্ত যতক্ষণ না পূরণ করা হয় ততক্ষণ রেফারী কিক করানো বন্ধ রাখবেন।

যখন ফ্রী-কিক নেওয়া হয় তখন বলটি নিশ্চল অবস্থায় থাকবে এবং অন্য খেলোয়াড় বলটি স্পর্শ করা বা খেলা পর্যন্ত কিকার দ্বিতীয়বার বল খেলবে না।

দণ্ড : যদি ফ্রী-কিক নেওয়ার পর অন্য কোনও খেলোয়াড় স্পর্শ করার বা খেলার আগেই কিকার দ্বিতীয়বার বলটি খেলে তা হলে আইনলঙ্ঘনের জায়গা থেকে বিরুদ্ধ দলের কোনও খেলোয়াড় একটি ইনডাইরেক্ট ফ্রী-কিক নেবে।

আন্তর্জাতিক বোর্ডের সিদ্ধান্ত : ইনডাইরেক্ট ফ্রী-কিক দিলে রেফারী কিকের জন্য বাঁশী বাজাবার আগে অবশ্যই হাত তুলে সঙ্কেত করে তা জানাবেন; ডাইরেক্ট ফ্রী-কিকের ক্ষেত্রে কোনও সঙ্কেতের দরকার নেই। ফ্রী-কিক নেবার সময় যে সব খেলোয়াড় নির্দিষ্ট ব্যবধানের বাইরে চলে যাবে না, তাদের সতর্কিত করা হবে এবং সেই কাজ আবার করলেই বহিষ্কৃত করা হবে। নিষিদ্ধ দূরত্বে ঢুকে পড়ে কিক নেওয়ার ব্যাপারে দেরী করানোর চেষ্টাকে গুরুতর রকমের অসদাচরণ বলে ধরতে রেফারীদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

রেফারীদের প্রতি উপদেশ : দেখবেন, কিক যেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নেওয়া হয়। অন্যথায় খেলার গতি শ্লথ হয়ে যাবে। মাত্র এই জন্যেই এটা দরকার নয়, দেরী করা অন্যায় বলেও—বিশেষতঃ ডাইরেক্ট ফ্রী-কিকের ক্ষেত্রে—কারণ দেরী হলেই দোষী পক্ষ রক্ষণভাগকে পুনর্বিন্যস্ত করার সুযোগ পেয়ে যাবে।··· কখনও কখনও দেখা গেছে কোনও খেলোয়াড় ডাইরেক্ট বা ইনডাইরেক্ট ফ্রী-কিক

থেকে সরাসরি নিজ গোলের মধ্যেই বল মেরে দেয়, সে ক্ষেত্রে রেফারী কর্ণার-কিকের নির্দেশ দেবেন—অবশ্য, ফ্রী-কিকটি পেনাল্টি-এরিয়ার ভিতরের হলে যদি আগে বল কিক করে খেলার মধ্যে পাঠানো হয়ে থাকে। অন্যথায়—পেনাল্টি-এরিয়ার মধ্যে থেকে ফ্রী-কিকটি আবার নিতে হবে। অবশ্য, যদি কোনও খেলোয়াড় ইনডাইরেক্ট ফ্রী-কিক থেকে সরাসরি বিপক্ষ গোলের মধ্যে বলটি পাঠিয়ে দেয়, রেফারী বিপক্ষের অনুকূলে একটি গোল-কিকের নির্দেশ দেবেন। কিক-অফ থেকে, গোল-কিক থেকে বা আইনের নিম্নবর্ণিত লঙ্ঘনজনিত ফ্রী-কিক থেকে সরাসরি গোল করা যায় না : (এ) কিক-অফ, থ্রো-ইন, ফ্রী-কিক, পেনাল্টি কিক, কর্ণার-কিক এবং গোল-কিক (যদি বলটি পেনাল্টি-এরিয়ার বাইরে যায়) করে অপর কোনও খেলোয়াড় খেলার আগেই সংশ্লিষ্ট খেলোয়াড়ের বলটি দ্বিতীয়বার খেলা। (বি) অফ্-সাইড অবস্থায় খেলায় কোনও রকমে বাধা সৃষ্টি করা। (সি) গোলকীপারের বল বয়ে নিয়ে যাওয়া। (ডি) অসময়ে বিপক্ষীয় খেলোয়াড়কে চার্জ করা—চার্জ বৈধ হলেও। (ই) বিপক্ষীয় খেলোয়াড়ের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা। (এফ) পেনাল্টি-কিকের সময় আইনভঙ্গ ও অভদ্র আচরণ করা। (জি) বিপজ্জনকভাবে খেলা। (এইচ) যখন বল গোলকীপার নিজ পেনাল্টি-এরিয়ায় ধরেছে বা কোনও বিপক্ষীয় খেলোয়াড়কে বাধা দিচ্ছে তখন ছাড়া অন্য সময় তাকে চার্জ করা। (আই) অভদ্র আচরণ। (জে) বার বার নিয়ম ভঙ্গ করার বা সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করার জন্যে কোনও খেলোয়াড়কে সতর্কিত করতে, অথবা সতর্কিত খেলোয়াড় বার বার অসদাচরণ করলে কিংবা বিশ্রী বা গালিগালাজপূর্ণ ভাষা ব্যবহার করলে তাকে বহিষ্কৃত করতে, রেফারীকে খেলা থামাতে হবে।

খেলোয়াড়দের প্রতি উপদেশ : মনে রাখবে ফ্রী-কিক দিলে দোষী পক্ষের সুবিধা হয় বলে যদি রেফারী মনে করেন, তা হলে ফ্রী-কিক না দেওয়ার ক্ষমতা তাঁর আছে। যদি গোল-লাইন থেকে ১০ গজের (৯.১৫ মিটার) কম দূরত্ব থেকে ফ্রী-কিক নেওয়া হয়, তাহলে আত্মরক্ষাকারী দল দুই গোল-পোস্টের মধ্যে গোল-লাইনের উপর দাঁড়াতে পারেন।

১৪নং আইন : পেনাল্টি-কিক

পেনাল্টি-কিক নিতে হবে পেনাল্টি-চিহ্ন থেকে। কিক নেবার সময় যে কিক নিচ্ছে এবং বিপক্ষ গোলরক্ষক ছাড়া আর সমস্ত খেলোয়াড় মাঠের মধ্যে থাকবে, কিন্তু পেনাল্টি-এরিয়ার বাইরে থাকবে এবং পেনাল্টি-চিহ্ন থেকে

অন্ততঃ ১০ গজ (৯.১৫ মিটার) তফাতে থাকবে। কিক হওয়া পর্যন্ত বিপক্ষ গোলরক্ষক নিজ গোল-লাইনে দুই পোস্টের মধ্যে (পা না নড়িয়ে) দাঁড়িয়ে থাকবে। যে খেলোয়াড় কিক করছে সে বলটি সামনের দিকে কিক করবে। অপর কোনও খেলোয়াড় যতক্ষণ না বলটি স্পর্শ করে বা খেলে ততক্ষণ সে দ্বিতীয়বার বলটি খেলবে না। কিক করার সঙ্গে সঙ্গেই বলটি খেলার মধ্যে বলে গণ্য হবে, অর্থাৎ তার নিজ পরিধির সমান দূরত্ব অতিক্রম করলেই। এই রকম পেনাল্টি-কিক থেকে সরাসরি গোল করা চলবে। হাফ-টাইম বা ফুল-টাইমের শেষাংশে বা অতিক্রান্ত হবার পর যখন পেনাল্টি-কিক করা হচ্ছে, তখন যদি দুই পোস্টের মাঝখান দিয়ে যাবার আগে বল গোলকীপারকে স্পর্শ করে তার দরুণ গোল বাতিল হবে না। পেনাল্টি-কিক করানোর জন্যে যদি প্রয়োজন হয় হাফ-টাইম বা ফুল-টাইম হয়ে গেলেও সময় বাড়িয়ে নিতে হবে।

দণ্ড ঃ এই আইনের কোনও রকমে লঙ্ঘন (এ) আত্মরক্ষাকারীদল কর্তৃক হলে ঃ কিকটি আবার করাতে হবে—যদি আগেই গোল না হয়ে গিয়ে থাকে। (বি) যে কিক করছে সে ছাড়া আত্মরক্ষাকারী দলের আর কোনও খেলোয়াড় কর্তৃক হলে : গোল হলে সেটি নাকচ হবে এবং কিকটি আবার নিতে হবে ; (সি) যে খেলোয়াড় কিক করেছে বল খেলার মধ্যে বলে গণ্য হওয়ার পর সে করলে, বিপক্ষের একজন খেলোয়াড় আইন লঙ্ঘনের জায়গা থেকে ফ্রী-কিক নেবে।

আন্তর্জাতিক বোর্ডের সিদ্ধান্ত ঃ যদি রেফারীর বাঁশী বাজার পর কিন্তু কিক নেওয়ার আগে গোলকীপার পায়ের পাতা নড়ায় এবং গোল না হয়, পেনাল্টি-কিকটি আবার নিতে হবে। যখন পেনাল্টি-কিক করানোর জন্যে বা আবার করানোর জন্যে খেলার সময় বাড়ানো হয় পেনাল্টি-কিকটি সম্পূর্ণ হওয়ার মুহূর্ত অবধি এই বর্ধিত সময় স্থায়ী হবে, অর্থাৎ (এ) বলটি সরাসরি গোলের মধ্যে গেলে ঃ যে মুহূর্তে বলটি সমগ্রভাবে গোল-লাইন অতিক্রম করে সেই মুহূর্তেই গোল হয় এবং খেলা শেষ হবে। (বি) যদি বলটি যে-কোনও পোস্টে বা ক্রসবারে প্রতিহত হয়ে গোলের মধ্যে যায় ঃ যে মুহূর্তে বলটি সমগ্রভাবে গোল-লাইন অতিক্রম করে সেই মুহূর্তেই গোল হয় এবং খেলা শেষ হবে। (সি) যদি বল ক্রসবারের উপর দিয়ে বা গোল-পোস্টের বাইরে দিয়ে খেলার বাইরে চলে যায় ঃ যে মুহূর্তে বল মাঠের সীমানা ছাড়ায় সেই মুহূর্তে খেলার সমাপ্তি ঘটে। (ডি) বল গোল-পোস্ট বা ক্রসবারে প্রতিহত হয়ে খেলার মধ্যে ফিরে

এলে : যে মুহূর্তে বলটি প্রতিহত হয়ে খেলার মধ্যে আসে সেই মুহূর্তে খেলা শেষ হবে। (ই) গোলকীপারের বল স্পর্শের পর বলটি গোলে ঢুকলে : যে মুহূর্তে বলটি সমগ্রভাবে গোল-লাইন অতিক্রম করে সেই মুহূর্তে গোল হয় এবং খেলা শেষ হয়। (এফ) বলটি গোলকীপার পরিষ্কারভাবে বাঁচিয়ে দিলে : রেফারী সঙ্গে সঙ্গে খেলার সমাপ্তিসূচক বাঁশী বাজাবেন। তারপর যদি হঠাৎ গোলকীপারের হাত থেকে ফস্কে বল গোল-লাইনের উপর দিয়ে চলে যায় তাহলে সেটা গোল হবে না, কারণ খেলা আগেই শেষ হয়ে গেছে। (জি) বলটির গতিপথে বাইরের কেউ সেটিকে থামিয়ে দিলে : খেলার সময় আরও বাড়াতে হবে এবং পেনাল্টি-কিকটি যথাযথভাবে করাতে হয়। (এইচ) এবং এ-ছাড়া যদি আত্মরক্ষাকারী দলের কোনও খেলোয়াড় আইনভঙ্গ করে পেনাল্টি এরিয়ায় ঢুকে পড়ে, তাহলে এই আইন অনুযায়ী সময় বাড়িয়ে কিকটি সম্পূর্ণ করতে হবে।

রেফারীদের প্রতি উপদেশ : স্পষ্টতঃই মাত্র ৯টি অপরাধের ক্ষেত্রে পেনাল্টি-কিকের নির্দেশ দেওয়া যেতে পারে, এবং তাও আবার, যদি সেগুলি ইচ্ছাকৃত হয়।

১৫নং আইন : থ্রো-ইন

যদি বলের সমগ্র অংশ মাটিতে বা শূন্যে টাচ-লাইন অতিক্রম করে যায় তা হলে সব শেষে যে খেলোয়াড়ের স্পর্শ বলটিতে লেগেছে, তার বিপক্ষের কোনও খেলোয়াড় টাচ-লাইন অতিক্রম করার জায়গা থেকে বলটি ছুঁড়ে মাঠের মধ্যে পাঠাবে। যে বল ছুঁড়ছে, ছোঁড়বার মুহূর্তে সে অবশ্যই মাঠের দিকে মুখ করবে এবং তার উভয় পায়ের পাতার কোনও অংশ হয় টাচ-লাইনের উপর, না হয় টাচ-লাইনের বাইরের মাটির উপর থাকবে। সে দু'টি হাতই ব্যবহার করবে এবং বলটি পিছন থেকে ও মাথার উপর দিয়ে ছাড়বে। বল মাঠে ঢোকা মাত্রই খেলার মধ্যে বলে গণ্য হবে, কিন্তু যতক্ষণ না অপর কোনও খেলোয়াড় বলটি স্পর্শ করছে বা খেলছে ততক্ষণ যে থ্রো-ইন করেছে সে বলটি আবার খেলবে না।

থ্রো-ইন থেকে সরাসরি গোল হয় না।

দণ্ড : (এ) যদি বলটি অবৈধভাবে ছোঁড়া হয় তা হলে বিপক্ষের কোনও খেলোয়াড় থ্রো-ইন করবে। (বি) যদি অপর কোনও খেলোয়াড় বলটি স্পর্শ

করার বা খেলার আগেই যে ছুঁড়েছে সে **বলটি** দ্বিতীয়বার খেলে তা হলে আইন লঙ্ঘনের স্থল থেকে বিপক্ষের কোনও খেলোয়াড় ইনডাইরেক্ট ফ্রী-কিক করবে।

আন্তর্জাতিক বোর্ডের সিদ্ধান্ত : যে থে্া-ইন করবে তার শরীরের কিছু অংশ অবশ্যই মাঠের মুখোমুখি থাকবে।

রেফারীদের প্রতি উপদেশ : লক্ষ্য রাখুন, যে খেলোয়াড় থে্া-ইন করছে সে যথার্থই দু'হাত ব্যবহার করেছে কিনা। অনেক খেলোয়াড়ের প্রবণতা আছে একটি হাতে ছুঁড়ে অপর হাতটি কেবল দেখানোর জন্যে ব্যবহার করা। লক্ষ্য রাখুন, বলটি **ছুঁড়ে দেওয়া হচ্ছে কিনা**; দু'টি হাত ব্যবহৃত হলেও বল হাত থেকে শুধু ছেড়ে দিলেই হয় না।

১৬নং আইন : গোল-কিক

সবশেষে আক্রমণকারী দলের কোনও খেলোয়াড় খেলার পর যদি বলের সমগ্র অংশ মাটিতে বা শূন্যে গোল-লাইন (দুই পোস্টের মধ্যবর্তী অংশটুকু ছাড়া) অতিক্রম করে যায়, তাহলে আত্মরক্ষাকারী দলের কোনও খেলোয়াড় বলটি কিক করে সরাসরি পেনাল্টি-এরিয়ার বাইরে পাঠাবে; কিকটি হবে গোল-এরিয়ার যে অর্ধ বলটির গোল-লাইন অতিক্রমের বিন্দুর সব চেয়ে কাছে সেই অংশের ভিতর যে কোনও জায়গা থেকে। পরে যাতে সে কিক করে বলটি খেলার মধ্যে পাঠাতে পারে এই উদ্দেশ্যে গোলকীপার গোল-কিক থেকে বল হাতে ধরবে না। বলটি যদি কিক করে পেনাল্টি-এরিয়া পার না করা হয় অর্থাৎ সরাসরি খেলার মধ্যে পাঠানো না হয়, তা হলে কিকটি আবার নিতে হবে। যতক্ষণ না অপর কোনও খেলোয়াড় বল স্পর্শ করছে বা খেলছে ততক্ষণ যে কিক নিয়েছে সে বলটি খেলতে পারবে না। এই কিক থেকে সরাসরি গোল করা যাবে না। গোল-কিক নেওয়ার সময় যে খেলোয়াড় গোল-কিক নিচ্ছে তার বিপক্ষের খেলোয়াড়রা পেনাল্টি-এরিয়ার বাইরে থাকবে।

দণ্ড : যদি গোল-কিক করেছে এমন কোনও খেলোয়াড় বলটি পেনাল্টি-এরিয়া অতিক্রম করার পর কিন্তু বিপক্ষের কোনও খেলোয়াড় সেটি স্পর্শ করার বা খেলার আগে দ্বিতীয়বার বলটি খেলে, তাহলে বিপক্ষকে ইনডাইরেক্ট ফ্রী-কিক দেওয়া হবে এবং কিকটি আইনলঙ্ঘনের জায়গা থেকে নিতে হবে।

আন্তর্জাতিক বোর্ডের সিদ্ধান্ত : গোল-কিক করার পর, যে কিক-করেছে সে যদি বল পেনাল্টি-এরিয়া অতিক্রম করার আগেই আবার সেটি

স্পর্শ করে তা হলে কিকটি আইন অনুসারে করা হল না এবং আবার নিতে হবে।

১৭নং আইন : কর্ণার-কিক

সবশেষে আত্মরক্ষাকারী দলের কোনও খেলোয়াড় খেলার পর যদি বলের সমগ্র অংশ মাটিতে বা শূন্যে গোল-লাইন (দুই পোস্টের মধ্যবর্তী অংশ ছাড়া) অতিক্রম করে যায় তাহলে আক্রমণকারী দলের কোনও খেলোয়াড় নিকটতম কর্ণার-পতাকাদণ্ড-সংলগ্ন বৃত্তাংশের ভিতর থেকে বলটি কিক করবে অর্থাৎ কর্ণার-কিক করবে : **পতাকা-দণ্ডটি সরানো চলবে না। এই রকম কিক থেকে সরাসরি গোল করা যাবে।** যতক্ষণ না বলটি খেলার মধ্যে আসছে অর্থাৎ নিজ পরিধির সমান দূরত্ব অতিক্রম করছে, ততক্ষণ যে খেলোয়াড় কর্ণার-কিক করছে তার বিপক্ষীয় খেলোয়াড়রা বলটির ১০ গজের (৯.১৫ মিটার) মধ্যে আসতে পারবে না এবং যতক্ষণ না অন্য কোনও খেলোয়াড় বলটি স্পর্শ করছে বা খেলছে ততক্ষণ কিকারও বলটি দ্বিতীয়বার খেলতে পারবে না।

দণ্ড : এই আইনের কোনও রকম লঙ্ঘন ঘটলে লঙ্ঘনের জায়গা থেকে **বিপক্ষের অনুকূলে ফ্রী-কিকের নির্দেশ দিতে হবে।**

॥ বিশেষ দ্রষ্টব্য ॥

আন্তর্জাতিক বোর্ড ফুটবল খেলার আইনে মেট্রিক মাপ প্রয়োগের প্রয়োজনে একটি পরিবর্তন-তালিকা তৈরি করেছেন। এখানে সেটি দেওয়া হল।

গজ/ফুট/ইঞ্চি	মিটার	গজ/ফুট/ইঞ্চি	মিটার
১৩০ গজ	১২০	১০ গজ	৯.১৫
১২০ ,,	১১০	৮ ,,	৭.৩২
১১০ ,,	১০০	৬ ,,	৫.৫০
১০০ ,,	৯০	১ ,,	১
৮০ ,,	৭৫	৮ ফুট	২.৪৪
৭০ ,,	৬৪	৫ ,,	১.৫০
৫০ ,,	৪৫	২৮ ইঞ্চি	০.৭১
১৮ ,,	১৬.৫০	২৭ ,,	০.৬৮
১২ ,,	১১	৫ ,,	০.১২

১৪ থেকে ১৬ আউন্স = ৩৯৬ থেকে ৪৫৩ গ্রাম।

টাই-ব্রেকার

দিনের পর দিন বার বার খেলা 'ড্র' হলে নক্-আউট প্রতিযোগিতার পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষের যথেষ্ট অসুবিধা হয়—সমস্ত পরিকল্পনা বানচাল হবার উপক্রম হয়, ব্যয়ের অঙ্ক যায় বেড়ে। অথচ জয়-পরাজয় মীমাংসা না হলেও তো পরবর্তী রাউণ্ডের খেলা দেওয়া যায় না। এই উদ্দেশ্যে সর্বত্র টস্ করা হত। এখন টসের যুগ গেছে, এসেছে টাই-ব্রেকার। টাই বা অমীমাংসিত অবস্থার 'ব্রেক' করে (সমাপ্তি ঘটায়) বলেই এই ব্যবস্থার নাম 'টাই-ব্রেকার'। এই ব্যবস্থায় দু'দলের যে দল পাঁচ বা প্রয়োজন হলে তার বেশি পেনাল্টি-কিক মেরে বেশি গোল করতে পারে সেই দলই জয়ী হয়। মূল আইনের অঙ্গীভূত না হলেও টাই-ব্রেকার আজকাল প্রায় সর্বত্রই প্রচলিত হয়েছে। প্রথমে ফুটবলে আসার পর হকিতেও টাই-ব্রেকার প্রথা চালু হয়েছে। সেখানে পেনাল্টি-স্ট্রোকের ব্যবস্থা। ফুটবলে টাই-ব্রেকারের নিয়ম হল এই—

(১) কোন্ দিকের গোলে সমস্ত পেনাল্টি-কিক করা হবে, তা রেফারী ঠিক করবেন।

(২) প্রতি দল পাঁচটি করে পেনাল্টি-কিক করবে পর্যায়ক্রমে।

(৩) রেফারী টস্ করবেন। যে দলের অধিনায়ক টসে জিতবেন সেইদল প্রথম কিক করবে।

(৪) যে দল বেশি গোল করবে, সেই দলই বিজয়ী ঘোষিত হবে।

(৫) নির্দিষ্ট সময়ের খেলা শেষ হবার মুহূর্তে অথবা অতিরিক্ত সময়ের খেলা শেষ হবার মুহূর্তে যে সব খেলোয়াড় মাঠে থাকবে তারাই পেনাল্টি-কিক করার অধিকারী।

(৬) ৫টি করে দু'দলের মোট ১০টি কিকের মধ্যে যদি দু'দলের গোল সমান সমান থাকে কিংবা কোনও গোল না হয়, তবে আবার একইভাবে পেনাল্টি-কিক চলতে থাকবে, যতক্ষণ না গোলের ব্যবধান সৃষ্ট হয়।

(৭) প্রতি কিক করবে প্রতি দলের পৃথক পৃথক খেলোয়াড় এবং একটি দলের সব খেলোয়াড়ের কিক হওয়া পর্যন্ত ওই দলের একজন খেলোয়াড় দ্বিতীয়বার কিক করতে পারবে না।

(৮) যে কোনও কিকের সময়ই গোলকীপার বদল করা যেতে পারে। তবে অবশ্যই, ৫নং নিয়ম অনুযায়ী যে সব খেলোয়াড় শেষ মুহূর্তে মাঠে থাকবে তাদের মধ্যের কোনও খেলোয়াড় দিয়ে এই বদল করাতে হবে।

(৯) পেনাল্টি-কিকের সময় কিকার, কিকারের পক্ষের গোলকীপার এবং প্রতিপক্ষের গোলকীপার ছাড়া মাঠের বাকি খেলোয়াড়দের সেণ্টার সার্কলের মধ্যে থাকতে হবে। কিকারের পক্ষের গোলকীপার থাকবে যেদিকে কিক হচ্ছে সেই দিকের পেনাল্টি-এরিয়ার বাইরে।

(১০) যেখানে এমন অবস্থা হবে যে একটি দল এত এগিয়ে গেছে অপর দল অবশিষ্ট পেনাল্টিগুলির প্রত্যেকটি থেকে গোল করলেও তার সমান হবে না, সে ক্ষেত্রে অবশিষ্ট পেনাল্টি-কিক করানোর প্রয়োজন হবে না।

প্রয়োজনীয় পরিবর্তনসাপেক্ষে এই নিয়মগুলি হকির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

হকি

১। **দল এবং খেলার সময়ঃ** (ক) হকি খেলা হবে দু'টি দলের মধ্যে। মাঠে কোনও দলেই এক সময়ে ১১ জনের বেশি খেলোয়াড় খেলতে পারবে না। কোনও সময়েই মাঠে কোনও দলে একাধিক গোলকীপার থাকতে পারবে না।

খেলার মধ্যে যে কোনও সময় এবং যে কোনও কারণে প্রতি দলকে একবার অনধিক দু'জন খেলোয়াড় বদল করবার অনুমতি দিতে হবে। যে খেলোয়াড়ের বদলে কেউ নেমেছে, তাকে আবার মাঠে আসার অনুমতি দেওয়া হবে না এবং সাময়িকভাবে বহিষ্কৃত কিংবা খেলায় আর অংশগ্রহণ করা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে এমন খেলোয়াড়ের বদলে কাউকে খেলার অনুমতি দেওয়া হবে না।

বল যখন খেলার বাইরে মাত্র তখন কিংবা হাফ-টাইমে খেলোয়াড় বদল চলতে পারে; তার আগে একজন আম্পায়ারের সম্মতি নিতে হবে এবং এই বদলের জন্যে কোনও অতিরিক্ত সময় দেওয়া হবে না।

(খ) খেলা আরম্ভের আগে অন্যরকম কিছু স্থির করা না হলে প্রতি অর্ধ ৩৫ মিনিট করে দু'টি অর্ধে খেলা হবে। বিরতিতে দু'টি দল প্রান্ত পরিবর্তন করে নেবে। বিরতি পাঁচ মিনিটের বেশি হবে না, যদি না খেলা আরম্ভের আগে অধিনায়কদ্বয় মিলে অন্যরকম কিছু ঠিক করেন; তবে কোনও ক্ষেত্রেই বিরতি ১০ মিনিটের বেশি হতে পারবে না।

২। **অধিনায়কঃ** (ক) অধিনায়কেরা মাঠের প্রান্ত বেছে নেবার জন্য 'টস্' করবেন;

(খ) যদি কোনও আম্পায়ার না থাকেন তাহলে আম্পায়ার হিসাবে কাজ করবেন কিংবা নিজ দলের কোনও একজন খেলোয়াড়কে আম্পায়ারের দায়িত্ব অর্পণ করবেন, এবং

(গ) যদি প্রয়োজন হয়, খেলার আগে বিপক্ষের অধিনায়ককে এবং
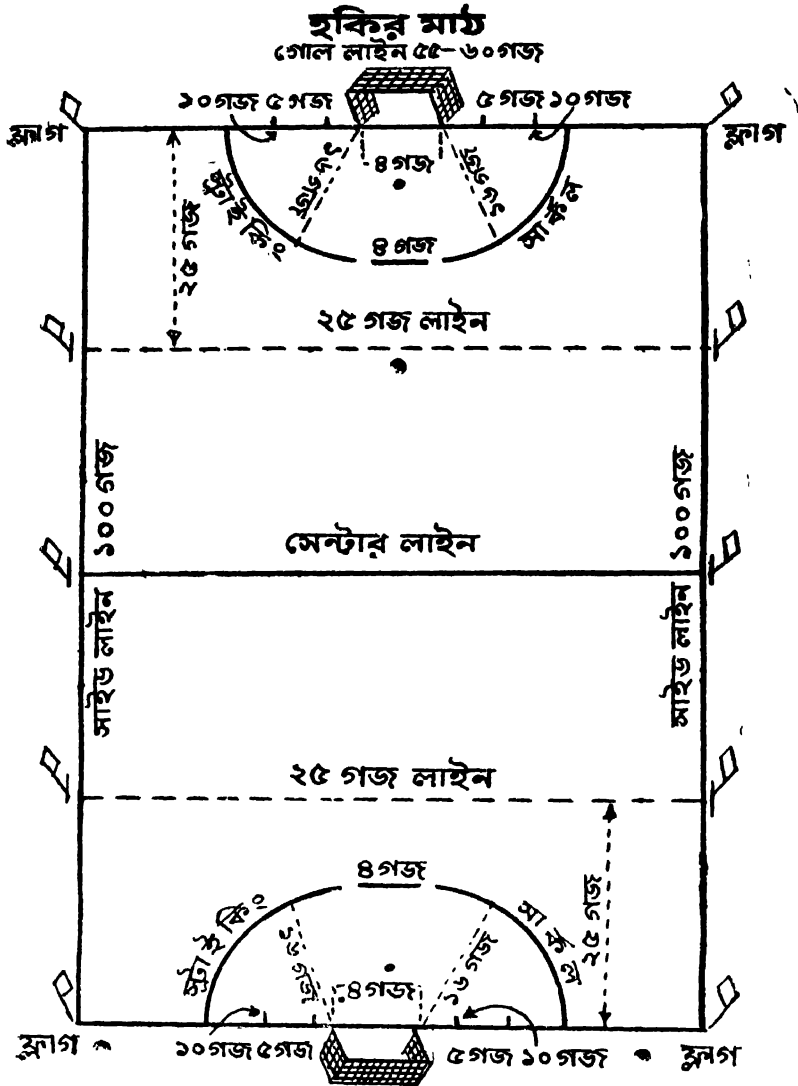
আম্পায়ারদের নিজ নিজ দলের গোলকীপার এবং পরে যখনই গোলকীপার বদল হবে, তাকে দেখিয়ে দেবেন।

৩। **খেলার মাঠ ঃ** (ক) খেলার মাঠটি আয়তক্ষেত্রাকার হবে—লম্বায়

১০০ গজ (৯১ মিটার) এবং চওড়ায় ৫৫ গজের (৫০.২৯ মিটার) কম বা ৬০ গজের (৫৪.৮৬ মিটার) বেশি হতে পারবে না। মাঠের চারধারে সাদা সীমারেখা টানতে হবে। বৃহত্তর সীমারেখা দু'টিকে সাইড-লাইন এবং ক্ষুদ্রতর দু'টিকে গোল-লাইন বলা হবে। গোল-লাইনের প্রস্থ আগাগোড়া তিন ইঞ্চি (৭.৫ সেন্টিমিটার) হবে।

(খ) মাঠের প্রত্যেক কোণে এবং সেণ্টার-লাইন ও 'পঁচিশ-গজ (১৩.৭ মিটার) লাইনে'র দু'ধারে একগজ (.৯১ মিটার) করে ছেড়ে পতাকা-দণ্ড পোঁতা থাকবে। পতাকা-দণ্ডের উচ্চতা চার ফুটের (১.২২ মিটার) কম হলে চলবে না।

[**দ্রষ্টব্য**—খসড়া ছবিতে যে-সব চিহ্ন আছে, সেগুলি ছাড়া মাঠে আর কোনওরকম চিহ্ন থাকবে না। ইণ্টারন্যাশন্যাল হকি রুল বোর্ডের সুপারিশ হল আন্তর্জাতিক ম্যাচগুলি যেন যথাসম্ভব ১০০ গজ×৬০ গজ (৯১ মিটার× ৫৪.৮৬ মিটার) মাঠে খেলানো হয়। বোর্ডের মতে খেলার মাঠটি উপযুক্ত হলেই হল, ঘাসের উপরই খেলা হবে এমন কোনও কথা নেই।]

৪। **গোল, পোস্ট ইত্যাদি ঃ** (ক) প্রত্যেক গোল-লাইনের ঠিক মাঝখানে গোল-পোস্ট ও ক্রসবারের সমন্বয়ে গোল তৈরি করতে হবে। পোস্ট দু'টি লম্বমান হবে এবং এদের মধ্যে চার ফুট (১.২২ মিটার) ব্যবধান থাকবে। পোস্ট দু'টিকে আড়াআড়িভাবে যুক্ত করবে একটি ক্রসবার, যার নিচের দিক মাঠ থেকে সাত ফুট (২.১৩ মিটার) উঁচু হবে। গোল-পোস্টগুলির সম্মুখভাগ গোল-লাইনের বহির্ভাগকে স্পর্শ করবে। গোল-পোস্টগুলি ক্রসবার ছাড়িয়ে উপরে উঠে যাবে না। আবার ক্রসবারও কোনও গোল-পোস্ট ছাড়িয়ে পাশের দিকে বেরিয়ে যাবে না। গোল-পোস্ট ও ক্রসবার প্রস্থে দু'ইঞ্চি (৫ সেন্টিমিটার) হবে এবং এদের ঘনত্ব তিন ইঞ্চির (৭.৫ সেন্টিমিটার) বেশি হবে না। এগুলির যে পিঠ খেলার মাঠের মুখোমুখি থাকবে সে পিঠকে আয়তক্ষেত্রাকার হতে হবে। গোল-পোস্ট এবং ক্রসবারে সর্বাধিক ছয় ইঞ্চি (১৫ সেন্টিমিটার) ফোকর-যুক্ত জাল ভালোভাবে লাগাতে হবে। গোলের পিছনের মাটির সঙ্গেও শক্তভাবে জাল আটকে রাখতে হবে।

(খ) জালের ভিতর দিকে একেবারে নিচে গোলবোর্ড লাগাতে হয়। গোল-লাইন থেকে পিছনের গোলবোর্ডের ব্যবধান ৪ ফুট (১.২২ মিটার)। দু'পাশের গোলবোর্ড বা সাইডবোর্ড দু'টি যেন গোল-লাইনের সঙ্গে সমকোণে থাকে। সাইডবোর্ডগুলিকে গোল-পোস্টের সঙ্গে এমনভাবে লাগাতে হয়,

সেগুলি যেন ভিতরের দিকে বা বাইরের দিকে গোল-পোস্টের প্রস্থ ছাড়িয়ে বেরিয়ে না যায়।

৫। **স্ট্রাইকিং সার্কল্ঃ** প্রত্যেক গোলের সম্মুখে গোল-লাইন থেকে ১৬ গজ (১৪.৬৩ মিটার) দূরে গোল-লাইনের সমান্তরাল করে ৪ গজ লম্বা (৩.৬৬ মিটার) এবং ৩ ইঞ্চি (৭.৫ সেন্টিমিটার) চওড়া একটি সাদা লাইন টানতে হবে। প্রস্থ বজায় রেখে এই লাইনকে দু'দিকে এমনভাবে বাড়িয়ে যেতে হবে, যেন সেটি গোল-লাইনের সঙ্গে মিশে দু'ধারে এক-একটি সিকিবৃত্ত তৈরি করে। এখানে ১৬ গজ (১৪.৬৩ মিটার) মাপতে হবে গোল-পোস্টের সামনের পিঠ থেকে বৃত্তের বাইরের দিক পর্যন্ত। এই লাইনগুলি এবং গোল-লাইন দিয়ে ঘেরা এলাকাটুকুকে স্ট্রাইকিং সার্কল্ বলা হয় (এর পর থেকে শুধু সার্কল্ বলে উল্লেখ করা হয়েছে)। লাইনগুলিকে সার্কলের অন্তর্গত ধরা হয়।

৬। **বলঃ** (ক) নিয়মমাফিক বলের আচ্ছাদন হবে সাদা রঙের চামড়া। অন্য কোনও চামড়াতে সাদা রঙ করে নিলেও চলে। সাধারণ ক্রিকেট বলের আচ্ছাদনের সেলাই যেমন, এর সেলাইও ঠিক তেমন হবে। অবশ্য বাইরে কোনও সেলাই নেই এমন বলও চলতে পারে।

(খ) সাধারণ ক্রিকেট বল যেমন কর্ক ও পাকানো সুতো (টোন সুতো) দিয়ে তৈরি হয়, এই বলের ভিতরের অংশও সেইরকম হবে।

(গ) বলের ওজন ৫¾ আউন্সের (১৬৩ গ্রাম) বেশি হবে না, আবার ৫½ আউন্সের (১৫৫.৯২ গ্রাম) কমও হবে না।

(ঘ) বলের পরিধি ৯¼ ইঞ্চির (২২.৪৯ সেন্টিমিটার) বেশি হবে না, আবার ৮13/16 ইঞ্চির (২২.৩৮ সেন্টিমিটার) কমও হবে না।

(ঙ) দু'দলের অধিনায়ক মিলে যদি রাজি হন তাহলে অন্য যে কোনও রকমের বল ব্যবহার করা যেতে পারে।

[**দ্রষ্টব্য**—'ক' থেকে 'ঘ' পর্যন্ত সব শর্ত পূরণ করে, একমাত্র এমন বলই বিধিসম্মত হকি বল এবং আন্তর্জাতিক খেলায় মাত্র এইরকম বলই ব্যবহৃত হতে পারবে। 'অন্য রকমের বল' বলতে বুঝতে হবে এমন বল, যা 'গ' ও 'ঘ'-এ বর্ণিত শর্ত পূরণ করলেও 'ক' ও 'খ'-এ বর্ণিত শর্ত পূরণ করছে না। এ-রকম বল কেবল ক্লাব-ম্যাচেই ব্যবহার করা যেতে পারে।]

৭। **স্টিকঃ** (ক) হকি-স্টিক শুধু বাম ধারেই সমতলমুখবিশিষ্ট হবে।

(খ) স্টিকের মাথা অর্থাৎ হাতলের নিচের অংশটির ধারগুলি কোনও ধাতু

দিয়ে মোড়া চলবে না বা এর মধ্যে কোনও ধাতুর পদার্থ আটকে দেওয়া বা এতে ঐ রকম সাজসজ্জা রাখাও চলবে না। আবার ধারগুলি তীক্ষ্ণ হবে না বা তা থেকে কোনও বিপজ্জনক তীক্ষ্ণ টুকরো বেরিয়ে থাকবে না। স্টিকের প্রান্তসীমাটি বর্গাকারে কাটা বা ছুঁচালো হবে না, এর ধারগুলি গোলাকারে কাটতে হবে।

(গ) স্টিকের মোট ওজন ২৮ আউন্সের (৭৯৩.৭৯ গ্রাম) বেশি হবে না, আবার ১২ আউন্সের (৩৪০.১০ গ্রাম) কমও হবে না। এবং স্টিকটি, গায়ে ব্যাণ্ডেজ জড়ানো থাকলে তা সমেত, এমন মাপের হতে হবে যেন দু'ইঞ্চি (৫ সেন্টিমিটার) ব্যাসের (ভিতরের মাপ) কোনো চাকৃতির মধ্য দিয়ে তাকে গলাতে পারা যায়।

দণ্ড : যদি কোনও স্টিক এই আইনের শর্ত পূরণ না করে তাহলে খেলা পরিচালনাকারী আম্পায়াররা সেই স্টিক ব্যবহার করতে দেবেন না।

৮। **বুট, ইত্যাদি :** কোনও খেলোয়াড় এমন কিছু পরবে না—জুতো বা অন্য কোনও কিছু—যা আম্পায়ারদের মতে অন্য খেলোয়াড়দের পক্ষে বিপজ্জনক হতে পারে।

দণ্ড : এই আইনের শর্ত পূরণ করে না এমন কিছু আম্পায়াররা কোনও খেলোয়াড়কে ব্যবহার করতে দেবেন না।

৯। **বুলি :** (ক) বল 'বুলি' করার জন্যে উভয় দলের একজন করে খেলোয়াড় 'স্কোয়ার' ভাবে সাইড-লাইনের দিকে মুখ করে এবং নিজ গোল-লাইনকে ডান দিকে রেখে দাঁড়াবে। খেলোয়াড়দ্বয়ের মধ্যের জমিতে বলটি রাখা হবে। প্রত্যেক খেলোয়াড় প্রথমে বল এবং নিজ গোল-লাইনের মধ্যের মাটিতে স্টিক দিয়ে মৃদু আঘাত করবে এবং তার পরে নিজ স্টিকের মুখের দিক দিয়ে বিপক্ষীয় খেলোয়াড়টির স্টিকে অনুরূপ আঘাত করবে। এইরকম তিনবার হবার পর দু'জনের কোনও একজনকে স্টিক দিয়ে বলটি খেলতে হবে, তার পরেই বলটি খেলার মধ্যে বলে ধরা হবে।

(খ) বল যতক্ষণ না খেলার মধ্যে আসছে, ততক্ষণ অন্য সব খেলোয়াড় নিজ নিজ গোল-লাইনের দিকে এমনভাবে দাঁড়াবে যে, বলটি গোল-লাইন থেকে যতদূরে আছে, তারা তার চেয়ে কম দূরে থাকবে এবং তাদের কেউ বলের পাঁচ গজের (৪.৫৭ মিটার) মধ্যে থাকতে পারবে না।

(গ) খেলা আরম্ভ বা গোল হবার পর, পুনরারম্ভ করতে হলে এবং বিরতির পর মাঠের ঠিক মাঝখানে 'বুলি' করতে হবে।

(ঘ) সার্কলের ভিতর গোল-লাইনের পাঁচ গজের (৪.৫৭ মিটার) মধ্যে কোনও 'বুলি' হবে না।

দণ্ড : (ক) এই আইনের কোনও রকম লঙ্ঘন ঘটলে, আবার 'বুলি' করতে হবে।

(খ) কোনও দল বার বার এই আইন লঙ্ঘন করলে আম্পায়ার বিপক্ষকে একটি 'ফ্রী হিট' দিতে এবং সার্কলের মধ্যে রক্ষণদলের কোনও খেলোয়াড় অনুরূপ লঙ্ঘন করলে বিপক্ষকে একটি পেনাল্টি-কর্ণার দিতে পারবেন।

১০। **সাধারণ খুঁটিনাটি :** (ক) স্টিকের কেবল মুখটি দিয়েই বল মারতে পারা যাবে। কোনও খেলোয়াড়ের হাতে তার স্টিক না থাকলে সে খেলায় অংশ গ্রহণ করতে বা খেলাতে কোনওরকমভাবে বাধা দিতে পারবে না।

(খ) বল মারার শুরুতে বা শেষে স্টিকের কোনও অংশ সংশ্লিষ্ট খেলোয়াড়ের কাঁধ ছাড়িয়ে উঠতে পারবে না কিংবা কোনও খেলোয়াড়ের কাঁধের চেয়ে বেশি উঁচুতে শূন্যে বল থাকলে সে তার স্টিকের কোনো অংশ দিয়ে সেটিকে থামাতে পারবে না। আবার কোনও খেলোয়াড় বলের দিকে অগ্রসর হতে গিয়ে স্টিকের কোনও অংশ তার কাঁধের চেয়ে উঁচুতে তুলতে পারবে না।

(গ) বল অবশ্যই এমনভাবে খেলা যেতে পারবে না যা নিজে বিপজ্জনক বা বিপজ্জনক খেলার সূচনা করতে পারে। 'স্কুপ্'—যাতে বল উঁচুতে উঠে যায়—মারা চলবে, যদি সেটা এই আইনের যে যে ব্যবস্থার কথা এ পর্যন্ত বলা হয়েছে সেগুলি অনুযায়ী হয়। অবশ্য ১৩ (খ) আইন-বর্ণিত বিশেষ ব্যতিক্রমের ক্ষেত্রে স্কুপ্ চলবে না। বাতাসে থাকা অবস্থায় বলটিকে কোনও খেলোয়াড় মারতে পারে, অবশ্য এই আইনের (খ) অংশ লঙ্ঘন না করে।

(ঘ) বলটি মাটিতে থাক বা বাতাসে থাক, তাকে থামানোর জন্য হাত ছাড়া শরীরের আর কোনও অংশ ব্যবহার করা যাবে না। বলটিকে যদি কোনও খেলোয়াড় হাত দিয়ে ধরে ফেলে, তা হলে সঙ্গে সঙ্গে সেটিকে ছেড়ে দিতে হবে যাতে খেলা চলে।

বিপক্ষীয় খেলোয়াড়কে বাধা দিতে গিয়ে কোনও খেলোয়াড় পায়ের উপর বা পায়ের পাতার উপর স্টিকের ভর রাখতে পারবে না।

(ঙ) স্টিক ব্যবহার না করে বল তুলে নেওয়া, কোনওরকমে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় বল নিয়ে যাওয়া বা সামনে চালানো যাবে না। বলে লাথি মারা বা বল ছুঁড়তে পারাও যাবে না।

(চ) কেউ বিপক্ষীয় কোনও খেলোয়াড়ের স্টিকে হিট করতে, স্টিক আটকে রাখতে বা ধরে রাখতে পারবে না, কিংবা স্টিকে আঘাত করতে বা বাধা দিতে পারবে না।

(ছ) কোনও খেলোয়াড় বিপক্ষীয় কোনও খেলোয়াড় এবং বলের মাঝখান দিয়ে দৌড়ে বাধা সৃষ্টি করতে পারবে না বা বাধা দেবার উদ্দেশ্যে নিজেকে বা নিজের স্টিক মাঝখানে এমনভাবে রাখতে পারবে না যাতে বিপক্ষীয় খেলোয়াড়ের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়। আবার, কেউ বিপক্ষীয় কোনও খেলোয়াড়ের বাঁ দিক থেকে আক্রমণ করতে পারবে না—যদি না সে শেষোক্ত খেলোয়াড়ের স্টিক বা শরীর ছোঁওয়ার আগে বল ছুঁয়ে থাকে। কোনওক্রমেই কোনও বিপক্ষীয় খেলোয়াড়কে চার্জ করা, লাথি মারা, ধাক্কা দেওয়া, আঘাত করা বা আটকে রাখা চলবে না।

(জ) নিজের সার্কলের মধ্যে যতক্ষণ বল থাকে ততক্ষণ গোলকীপার বলে লাথি মারতে বা শরীরের যে কোনও অংশ নিয়ে বল থামাতে পারবে। গোলাভি-মুখী কোনও মার থামাতে গিয়ে গোলকীপার দণ্ডিত হবে না, যদি—আম্পায়ার মনে করেন যে, বলটি গোলকীপারের শরীরে প্রতিহত হয়ে ফিরে এসেছে মাত্র।

(ঝ) যদি বল গোলকীপারের প্যাডে বা কোনও খেলোয়াড়ের বা আম্পায়ারের পোশাকে আটকে যায় তা হলে আম্পায়ার সাময়িকভাবে খেলা বন্ধ করবেন এবং যে জায়গায় ঐ ঘটনা ঘটেছিল সেখানে 'বুলি' করে আবার খেলা পুনরারম্ভ করাবেন। অবশ্য এ-ক্ষেত্রে ৯ (ঘ) আইন মেনে চলতে হবে।

(ঞ) যদি বল কোনও আম্পায়ারের গায়ে লাগে তাহলেও সেটি খেলার মধ্যেই আছে বলে ধরে নিতে হবে।

(ট) অমার্জিত বা বিপজ্জনক খেলা বরদাস্ত করা হবে না কিংবা এমন কোনও রকম ব্যবহার করা চলবে না যেটা আম্পায়ারের মতে অশোভন আচরণের পর্যায়ে পড়ে।

দণ্ড : (১) এই আইনের কোনও রকম লঙ্ঘন ঘটলে :

(অ) সার্কলের বাইরে : যে দল আইন লঙ্ঘন করবে তার বিরুদ্ধ দলকে ফ্রী হিট দেওয়া হবে। অবশ্য যদি আম্পায়ার মনে করেন যে, রক্ষণদলের কোনও খেলোয়াড় তার নিজেদের '২৫-গজ (২২.৮৬ মিটার) এলাকা'র মধ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে অপরাধ করেছে তা হলে তিনি অবশ্যই পেনাল্টি-কর্ণারের নির্দেশ দেবেন।

(আ) সার্কলের মধ্যে: (i) যদি আক্রমণকারী দলের খেলোয়াড় বা খেলোয়াড়রা অপরাধ করে—বিপক্ষ ফ্রী হিট পাবে। (ii) যদি রক্ষণ-দলের খেলোয়াড়রা অপরাধ করে তা হলে বিপক্ষের অনুকূলে পেনাল্টি-কর্ণার বা পেনাল্টি-স্ট্রোক দেওয়া হবে।

২। সার্কলের মধ্যে বা বাইরে যদি একই সঙ্গে আক্রমণকারী দলের ও আত্মরক্ষাকারী দলের দুই খেলোয়াড় এই আইন লঙ্ঘন করে তাহলে আইন-লঙ্ঘনের জায়গায় আম্পায়ার 'বুলি' করার নির্দেশ দেবেন। এই 'বুলি' ৯ (ঘ) আইনসাপেক্ষে হবে।

৩। কোনও খেলোয়াড় বলপ্রয়োগ করে বা বিপজ্জনকভাবে খেললে বা অভদ্র আচরণ করলে সেই দোষী খেলোয়াড়কে আম্পায়ার সতর্কিত করতে বা সাময়িকভাবে বহিষ্কৃত করতে বা ঐ খেলাতে আর একেবারেই অংশগ্রহণ করা থেকে বঞ্চিত করতে পারেন এবং এ ছাড়াও আইনলঙ্ঘনের উপযুক্ত দণ্ড দিতে পারেন। সাময়িকভাবে বহিষ্কৃত খেলোয়াড় নিজেদের গোলের জালের পিছনে থাকবে—যতক্ষণ না যে আম্পায়ার তাকে বহিষ্কৃত করেছেন তিনিই আবার তাকে খেলার অনুমতি দেন।

ব্যাখ্যা: বল যখন শূন্যে তখন বল মারাটাই যদি বিপজ্জনক হয়, তাহলে বল মারা আইনসম্মত হবে না। বল স্টিকে করে বয়ে নিয়ে যাওয়া বা স্টিকের উপর নাচাতে নাচাতে নিয়ে যাওয়ার নিয়ম নেই। গোলকীপার হাতে করে বল মারতে বা বুকে করে বল-বার করে দিতে পারবে না।

১১। গোল: (ক) বল সার্কলের মধ্যে আছে এমন অবস্থায় আক্রমণ-কারী দলের কোনও খেলোয়াড় বলে হিট করলে বা এমন কোনও খেলোয়াড়ের স্টিক হয়ে বল এলে তার পর যদি ক্রসবারের নিচে দুই গোল-পোস্টের মাঝখান দিয়ে বলের সমগ্র অংশটি গোল-লাইন অতিক্রম করে যায় একমাত্র তবেই গোল হবে; আক্রমণকারী দলের কোনও খেলোয়াড় ঐভাবে বল হিট করার পর যদি আত্মরক্ষাকারী দলের এক বা একাধিক খেলোয়াড় বলটি খেলে থাকে বা বল তাকে বা তাদের ছুঁয়ে যায় তাহলে কিছু এসে যাবে না। এ ছাড়া শুধু ১৮ (ছ) আইনে বর্ণিত উপায়ে গোল হতে পারবে। যদি খেলা চলতে চলতে গোল-পোস্ট এবং/অথবা ক্রসবার স্থানচ্যুত হয়ে যায় এবং সমগ্র বলটি এমন জায়গায় গোল-লাইন অতিক্রম করে যায় যেটা আম্পায়ারের মতে

স্বাভাবিক অবস্থায় দুই গোল-পোস্টের মধ্যে এবং/অথবা ক্রসবারের নিচে, তাহলেও গোল হবে।

(খ) যে দল সংখ্যায় বেশি গোল করবে সেই দলই জয়ী হবে।

১২। অফ্-সাইড : (ক) কোনও খেলোয়াড় যদি মাঠে তার নিজ অর্ধাংশে থাকে তাহলে কোনও ক্রমেই সে অফ্-সাইড হবে না।

(খ) ('ক' অনুচ্ছেদসাপেক্ষে) যে মুহূর্তে বল হিট করা হয় বা পুশ্-ইন করা হয় সেই মুহূর্তে হিটকারী বা পুশ্-ইনকারী খেলোয়াড়ের দলের কেউ অফ্-সাইডে অবস্থান করছে ধরা হবে, যদি না—

(i) অন্ততঃ তিনজন বিপক্ষীয় খেলোয়াড় সেই খেলোয়াড়ের থেকে তাদের নিজ গোল-লাইনের বেশি কাছে থাকে, বা

(ii) যে বল হিট করছে বা পুশ্-ইন করছে, সে সেই খেলোয়াড়ের থেকে বিপক্ষ গোল-লাইনের বেশি কাছে থাকে।

(গ) কোনও খেলোয়াড় অফ্-সাইডে থাকা সত্ত্বেও অফ্-সাইডের অপরাধে দণ্ডিত হবে না, যদি না, আম্পায়ারের মতে, সে ঐ অবস্থায় থেকে কোনও সুবিধা পাচ্ছে বা বিপক্ষীয় কোনও খেলোয়াড়ের খেলাকে প্রভাবিত করতে পারছে।

(ঘ) যে খেলোয়াড় অফ্-সাইডে আছে, বলটি বিপক্ষীয় খেলোয়াড়ের স্টিক বা শরীর ছুঁলেই বা হয়ে বেরিয়ে এলেই সে "অন্-সাইড" হয়ে যাবে না।

(ঙ) (গ) ও (ঘ) অনুচ্ছেদসাপেক্ষে, অফ্-সাইডে আছে এমন কোনও খেলোয়াড় তখনই অন্-সাইডে এসে যাচ্ছে যেইমাত্র একজন বিপক্ষীয় খেলোয়াড় স্পষ্টতঃই বলটিকে খেলে।

দণ্ড : এই আইনের লঙ্ঘন হলে (লঙ্ঘনকারীর) বিপক্ষের অনুকূলে ফ্রী হিট দিতে হবে।

দ্রষ্টব্য—যদি বল গোল-পোস্টে বা ক্রসবারে প্রতিহত হয়ে ফিরে আসে, তাহলে সেটিকে একটি সরাসরি পাশ বলেই ধরে নিতে হবে।

ব্যাখ্যা—এই বিষয়গুলির প্রতি সতর্ক দৃষ্টি দেওয়া উচিত :

(১) যখন বলটি সব শেষে তার দলের একজন খেলোয়াড় খেলছে সেই সময় যদি কেউ মাঠে বিপক্ষের অর্ধাংশে থাকে তবেই তাকে অফ্-সাইড বলা যাবে। অফ্-সাইডে আছে এমন কোনও খেলোয়াড় নিজের অর্ধাংশে এসে বলটিকে খেললেই আপনাআপনি অন্-সাইডে আসছে না।

(২) বিচার্য বিষয় হল, যে মুহূর্তে বলটি তারই দলের কোনো খেলোয়াড় হিট করে বা পুশ্-ইন করে ঠিক সেই মুহূর্তে এই খেলোয়াড় (যে অফ্-সাইডে আছে কি না প্রশ্ন উঠছে) **কোথায় ছিল** ; এটা বিচার্য নয় যে, এই খেলোয়াড় স্বয়ং যখন বলটি খেলে তখন সে কোথায় আছে।

(৩) ঘটনার সময়ে বিপক্ষের অর্ধাংশে থাকলে একজন খেলোয়াড় অফ্-সাইড হয়ে যাবে—

(ক) যদি না অন্ততঃ তিনজন বিপক্ষীয় খেলোয়াড় তার থেকে নিজেদের গোল-লাইনের বেশি কাছে থাকে, বা

(খ) যে বল হিট করেছে বা পুশ্-ইন্ করেছে সে এর থেকে বিপক্ষ গোল-লাইনের বেশি কাছে থাকে।

(৪) কোনো খেলোয়াড় অফ্-সাইডের জন্যে দণ্ডিত হবে তখনই, যদি সে বিপক্ষীয় খেলোয়াড়কে বা খেলায় বাধা দেয়, বা, আম্পায়ারের মতে অফ্-সাইডে থেকে কিছু সুবিধা পাচ্ছে, বা, তার উপস্থিতি বিপক্ষীয় খেলোয়াড়ের খেলার প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াচ্ছে। কিন্তু তার জন্যে অফ্-সাইড খেলোয়াড়টির বল ধরা পর্যন্ত আম্পায়ারের অপেক্ষা করার প্রয়োজন নেই—তিনি আগেই দণ্ড দেবেন।

(৫) বিপক্ষীয় খেলোয়াড় বল খেললেই অফ্-সাইড খেলোয়াড় অন্-সাইড হয়ে যাচ্ছে, এমন নয়। যদি, আম্পায়ারের মতে ঘটনার সময়ে সে (অফ্-সাইড খেলোয়াড়) কিছু সুবিধা পাচ্ছিল না বা, বিপক্ষীয় খেলোয়াড়ের বা খেলায় বাধা হচ্ছিল না তবেই বিপক্ষীয় খেলোয়াড়ের বল ধরামাত্রই অফ্-সাইড খেলোয়াড় 'অন্-সাইড' হয়ে যাচ্ছে।

১৩। **ফ্রী হিট**ঃ—(ক)—১৫ (ক), ১৬ (ক), ১৭ এবং ১৮ আইনের বিশেষ ব্যবস্থা ছাড়া যে জায়গায় আইন লঙ্ঘন করা হয়েছে সেখানেই ফ্রী হিট নিতে হবে। অবশ্য আত্মরক্ষাকারী দল নিজ গোল-লাইনের ভিতরের দিকের কিনারা থেকে ১৬ গজের মধ্যে ফ্রী হিট পেলে হিটটি আইনলঙ্ঘনের স্থানের উপর দিয়ে সাইড-লাইনের সমান্তরাল ঐ দূরত্বের (কল্পিত) একটি লাইনের উপরের যে কোনো জায়গা থেকে নেওয়া যাবে।

(খ) ফ্রী হিটের ক্ষেত্রে বলটিকে হিট করতে হবে বা মাটি ঘেঁষে ঠেলে দিতে হবে—'স্কুপ্' করা চলবে না।

(গ) ফ্রী হিট নেওয়ার সময় বলটি মাটির উপর নিশ্চল অবস্থায় থাকবে

এবং যে হিট করছে সে ছাড়া অন্য কোনো খেলোয়াড়—কোনো দলেরই—বলের পাঁচ গজের মধ্যে থাকতে পারবে না। যদি বলটি নিশ্চল অবস্থায় না থাকে বা যদি বলটির পাঁচ গজের মধ্যে দ্বিতীয় কোনো খেলোয়াড় থাকে, তা হলে ফ্রী হিটটি আবার নিতে হবে। অবশ্য যদি আম্পায়ারের মতে কোনো খেলোয়াড় সময় নষ্ট করবার উদ্দেশ্যে বলের পাঁচ গজের মধ্যে থাকছে তা হলে তিনি (আম্পায়ার) হিট নেওয়াতে দেরী করাবেন না।

(ঘ) ফ্রী হিট নিতে গিয়ে যদি সংশ্লিষ্ট খেলোয়াড় বলটি মিস্ করে তা হলে সে হিটটি আবার নেবে, অবশ্য যদি না সে ১০ (খ) আইন ভঙ্গ করে থাকে।

(ঙ) ফ্রী হিট নেবার পর সংশ্লিষ্ট খেলোয়াড় বলটির এমন দূরত্বের মধ্যে আসতে পারবে না যেখান থেকে বলটি খেলা যায়—যতক্ষণ না যে কোনো দলের অন্য কোনো খেলোয়াড় বলটি খেলছে বা ছুঁয়েছে।

দণ্ড: সার্কলের বাইরে এই আইনের কোনো লঙ্ঘন ঘটলে বিপক্ষের অনুকূলে ফ্রী হিট দেওয়া হবে। সার্কলের মধ্যে আক্রমণকারী দল এই আইন লঙ্ঘন করলে আত্মরক্ষাকারী দল ফ্রী হিট পাবে; আত্মরক্ষাকারী দল লঙ্ঘন করলে আক্রমণকারী দল পেনাল্টি-কর্ণার বা পেনাল্টি-স্ট্রোক পাবে।

১৪। **পুশ্-ইন:** (ক) যদি বলটির সমগ্র অংশ সাইড-লাইন অতিক্রম করে যায় তা হলে মাঠের মধ্যে সব শেষে যে খেলোয়াড় বলটি ছুঁয়েছিল তার বিপক্ষ পুশ্-ইন পাবে। যে পুশ্-ইন করবে সে যে জায়গায় বলটি সাইড-লাইন অতিক্রম করেছিল সেখান থেকে ষ্টিকের সাহায্যে ঠেলে মাঠের ভিতরে যে কোনো দিকে বলটি পাঠিয়ে দেবে।

(খ) বলটিকে সঙ্গে সঙ্গেই পুশ্-ইন করতে হবে, কিন্তু যে পুশ্-ইন করবে সে মাঠের বাইরে দাঁড়াবে এবং তার হাত, পা ও ষ্টিক সাইড-লাইনের পিছনে থাকবে। অন্য যে কোনো খেলোয়াড় যতক্ষণ না বলটি স্পর্শ করছে বা খেলছে ততক্ষণ সে বলটির এমন কাছে আসতে পারবে না যেখান থেকে বলটি খেলা যায়।

(ঘ) যে পুশ্-ইন করছে সে ছাড়া দু'দলের আর সব খেলোয়াড় মাঠের মধ্যে থাকবে এবং তাদের হাত, পা ও ষ্টিক সাত গজের লাইনের ভিতরে থাকবে। অবশ্য যদি আম্পায়ার মনে করেন যে, কোনো দলের কোনো খেলোয়াড় সাত গজের লাইনের বা সাইড-লাইনের ভিতরে যাচ্ছে সময় নষ্ট করানোর জন্য, তাহলে তিনি (আম্পায়ার) পুশ্-ইনের দেরী করাবেন না।

পুশ্-ইনকারীর ষ্টিক থেকে বলটি বেরোন মাত্রই অন্য খেলোয়াড়রা সাত গজের লাইনের বাইরে আসতে পারবে।

দণ্ড : যে পুশ্-ইন করছে সে-ই যদি এই আইনের কোনো লঙ্ঘন করে, পুশ্-ইনটি পাবে বিপক্ষ। অন্য কোনো খেলোয়াড় যদি এই আইনের লঙ্ঘন করে তা হলে পুশ্-ইনটি আবার নিতে হবে—অবশ্য ১৪ (গ) আইনের বিশেষ ব্যবস্থা ছাড়া। কিন্তু বার বার আইন লঙ্ঘন করলে বিপক্ষকে ফ্রী হিট দেওয়া হবে।

১৫। **বিহাইণ্ড :** (ক) যদি আক্রমণকারী দলের কোনো খেলোয়াড় বলটিকে গোল-লাইন অতিক্রম করে পাঠায় অথচ বিধিসম্মত গোল না হয়, কিংবা গোল-লাইন থেকে **পঁচিশ গজ বা তার বেশি দূরত্ব** হতে আত্মরক্ষা-কারী দলের কোনো খেলোয়াড় বলটি গোল-লাইনের উপর দিয়ে ভিতরে পাঠিয়ে দেয় এবং সেটি অনিচ্ছাকৃত বলে আম্পায়ার মনে করেন, তা হলে আত্ম-রক্ষাকারী দলের কোনো খেলোয়াড়কে ফ্রী হিট নিতে দিয়ে খেলাটি আবাব আরম্ভ করতে হবে। যে জায়গায় বলটি গোল-লাইন অতিক্রম করেছিল ঠিক তার বিপরীত দিকে গোল-লাইনের ভিতরের কিনারা থেকে ১৬ গজ দূরত্বের মধ্যে থেকে এই ফ্রী হিট নিতে হবে।

(খ) যদি আত্মরক্ষাকারী দলের কোনো খেলোয়াড় গোল-লাইন থেকে **পঁচিশ গজের কম দূরত্ব** হতে বলটি নিজ গোল-লাইনের উপর পাঠিয়ে দিয়ে ফেলে এবং সেটি **অনিচ্ছাকৃত** বলে আম্পায়ার মনে করেন, তা হলে আক্রমণকারী দলের অনুকূলে কর্ণার দিতে হবে—অবশ্য যদি না এর মধ্যেই গোল হয়ে গিয়ে থাকে।

(গ) অবশ্য, যদি আম্পায়ার মনে করেন যে, আত্মরক্ষাকারী দলের কোনো খেলোয়াড় মাঠের যে কোনো জায়গা থেকে **ইচ্ছা করেই** বলটি নিজ গোল-লাইনের উপর দিয়ে পাঠিয়েছে তাহলে আক্রমণকারী দলের অনুকূলে পেনাল্টি-কর্ণার দিতে হবে—যদি না তার আগেই গোল হয়ে গিয়ে থাকে।

ব্যাখ্যা : (খ ও গ সম্পর্কে) এখানে একমাত্র বিচার্য বিষয় হল খেলোয়াড় ইচ্ছা করে বলটি 'বিহাইণ্ড' করেছে কিনা। বলটি পিছনে পাঠানোর ফলে আত্মরক্ষাকারী দলের কোনো খেলোয়াড় হয়তো একটি গোলই বাঁচিয়ে ফেলল, কিন্তু সেই ঘটনা যেন আম্পায়ারের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত না করে।

১৬। **কর্ণার :** (ক) যেখানে বলটি আত্মরক্ষাকারী দলের গোল-লাইন

অতিক্রম করেছে তার কাছের কর্ণার-ফ্ল্যাগটি থেকে তিন গজ দূরত্বের মধ্যে গোল-লাইনের বা সাইড-লাইনের উপর থেকে আক্রমণকারী দল ফ্রী হিট করে কর্ণার নেবে।

(খ) যখন হিট নেওয়া হবে তখন আত্মরক্ষাকারী দলের খেলোয়াড়রা মাঠের বাইরে গোল-লাইনের পিছনে থাকবে এবং তাদের পা দু'টি ও স্টিক নিজ গোল-লাইনের পিছনে রাখতে হবে। যে হিট নিচ্ছে সে বাদে আক্রমণকারী দলের আর সব খেলোয়াড় মাঠের মধ্যে থাকবে এবং প্রত্যেকের পা দু'টি ও স্টিক সার্কলের বাইরে রাখতে হবে।

(গ) যদি কর্ণার হিট নেওয়ার আগেই আত্মরক্ষাকারী দলের কোনো খেলোয়াড় গোল-লাইন অতিক্রম করে মাঠের মধ্যে ঢুকে পড়ে বা আক্রমণকারী দলের কোনো খেলোয়াড় সার্কলের মধ্যে ঢুকে পড়ে তা হলে আম্পায়ার হিটটি আবার নেবার নির্দেশ দিতে পারেন।

(ঘ) কর্ণার হিট থেকে গোলে কোনো বল মারতে পারা যাবে না, যদি না আগে আক্রমণকারী দলের কোনো খেলোয়াড় মাঠের উপর বলটি থামিয়ে থাকে (নিশ্চল হতেই হবে এমন কথা নেই) বা, বলটি আত্মরক্ষাকারী দলের কোনো খেলোয়াড়ের স্টিক বা শরীর ছুঁয়ে থাকে।

দণ্ড ঃ আত্মরক্ষাকারী দলের খেলোয়াড় যদি বার বার ইচ্ছা করে ১৬ (গ) আইন লঙ্ঘন করে তাহলে আক্রমণকারী দলকে পেনাল্টি-কর্ণার দেওয়া যেতে পারে। যদি ১৬ (ঘ) আইনের কোনো রকম লঙ্ঘন হয় তা হলে লঙ্ঘনকারীর বিপক্ষ ফ্রী হিট পাবে।

ব্যাখ্যা ঃ ১৬ (ঘ) আইনে বলটি শূন্যে থাকা অবস্থায় আক্রমণকারী দলের কোনো খেলোয়াড় স্টিক বা হাতের সাহায্যে বলটি থামাতে পারবে। যদি বলটি স্টিকের সাহায্যে থামানো হয় তাহলে বলটি খেলার আগে নিশ্চল না হলেও চলবে, কিন্তু সেটিকে অবশ্যই মাটিতে থাকতে হবে। যদি হাতে করে থামানো হয় তাহলে অবশ্যই বলটিকে আগে মাটির উপরে সম্পূর্ণ নিশ্চল অবস্থায় থাকতে হবে, তার পরে খেলা যাবে।

১৭। পেনাল্টি কর্ণার ঃ (ক) পেনাল্টি-কর্ণারের ক্ষেত্রে ১৬নং আইন প্রযোজ্য হবে ; তফাৎ এই ক্ষেত্রগুলিতে :—(১) ১৬নং আইনের 'ক' অংশে বর্ণিত ফ্রী হিট আত্মরক্ষাকারী দলের যে কোনো গোল-পোস্ট থেকে অন্ততঃ ১০ গজ দূরে গোল-লাইনের যে কোনো জায়গা থেকে নিতে হবে।

(ii) আত্মরক্ষাকারী দলের খেলোয়াড়দের অবস্থান সম্পর্কে ১৬নং আইনের 'খ' অংশে যা বলা হয়েছে এক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয়। এক্ষেত্রে আত্মরক্ষাকারী দলের ৬ জনের বেশি খেলোয়াড় নিজ গোল-লাইনের পিছনে দাঁড়াতে পারবে না; যতক্ষণ না হিট নেওয়া হয় ততক্ষণ দলের আর সব খেলোয়াড় সেণ্টার-লাইনের বাইরে থাকবে। (iii) ১৬ আইনের 'গ' অংশটি শুধু আত্মরক্ষাকারী দলের যে সব খেলোয়াড় গোল-লাইনের পিছনে আছে তাদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

(খ) এই আইনের কোনো রকম লঙ্ঘন ঘটলে আম্পায়ার আবার হিটটি নেবার নির্দেশ দেবেন।

দণ্ড: এই আইন লঙ্ঘনের দণ্ডও ১৬নং আইনের অনুরূপ; তফাৎ শুধু এইটুকু যে, আত্মরক্ষাকারী দলের খেলোয়াড় যদি বার বার ইচ্ছা করে ঐ আইনের 'গ' অংশ লঙ্ঘন করে তাহলে আত্মরক্ষাকারী দলের বিরুদ্ধে পেনাল্টি-স্ট্রোকের নির্দেশ দেওয়া যেতে পারে।

ব্যাখ্যা: পেনাল্টি-কর্ণার থেকে সরাসরি গোল করা যেতে পারে, তবে ১১নং আইনের শর্তাদি পূরণ করতে হবে।

১৮। পেনাল্টি-স্ট্রোক: (ক) যদি আম্পায়ার মনে করেন যে, গোল বাঁচানোর উদ্দেশ্যে—

(i) আত্মরক্ষাকারী দলের কোনো খেলোয়াড় সার্কলের ভিতরে ইচ্ছা করে ১০নং আইন বা ১৬নং আইন ভঙ্গ করেছে; বা,

(ii) আত্মরক্ষাকারী দলের কোনো খেলোয়াড় সার্কলের মধ্যে অনিচ্ছাকৃতভাবে ১০নং আইনের এমন লঙ্ঘন করেছে যেটা না হলে আক্রমণকারী দল নিশ্চিত গোল করত,

তা হলে তিনি বিপক্ষের অনুকূলে পেনাল্টি-স্ট্রোকের নির্দেশ দেবেন।

(খ) গোল-লাইনের মাঝখান থেকে ৮ গজ দূরে মাঠের মধ্যে নির্দিষ্ট একটি জায়গা থেকে আক্রমণকারী দলের কোনো খেলোয়াড় পেনাল্টি-স্ট্রোক নেবে। বলটি ঠেলে দিয়ে বা আলতোভাবে মেরে বা স্কুপ্ করে এই স্ট্রোক নেওয়া যাবে। যে স্ট্রোক নেবে তাকে বলের খুব কাছেই দাঁড়াতে হবে এবং স্ট্রোক নিতে গিয়ে সে এক পা'র বেশি অগ্রসর হতে পারবে না। সে একবারই বল ছুঁতে পারবে এবং তার পর বলের বা গোলকীপারের দিকে বা গোলকীপার অক্ষম হয়ে থাকলে কিংবা খেলায় অংশগ্রহণ থেকে তাকে বঞ্চিত করা হলে তার

অধিনায়ক-মনোনীত যে খেলোয়াড় বদলী গোলকীপার হিসাবে খেলছে, তার দিকে এগিয়ে যেতে পারবে না।

(গ) পেনাল্টি-স্ট্রোক নেওয়ার সময় গোলকীপার বা তার বদলী খেলোয়াড় গোল-লাইনের উপর দাঁড়িয়ে থাকবে। যে স্ট্রোক নিচ্ছে এবং গোলকীপার, এরা নিজ নিজ জায়গায় দাঁড়ানোর পর যতক্ষণ না বলটি হিট করা হয় ততক্ষণ গোলকীপার গোল-লাইন ছাড়তে বা তার কোনো পা নড়াতে পারবে না। গোলাভিমুখী কোনো বল থামাতে গিয়ে বলটি তার শরীরে বা হাতে লেগে ফিরে এসেছে মাত্র, আম্পায়ার এইরকম মনে করলে, গোলকীপারকে দণ্ড দেওয়া যাবে না। বলটি যখন গোলকীপারের কাঁধের চেয়ে বেশি উচ্চতায় থাকবে তখন সে স্টিকের কোনো অংশ দিয়ে বলটিকে ছুঁতে পারবে না।

গোলকীপারকে বা তার বদলী খেলোয়াড়কে গোলকীপারের সাধারণ সুযোগগুলি দিতে হবে। অবশ্য বদলী গোলকীপারকে কোনো রকম পোশাক পরিবর্তন না করেই গোল রক্ষা করতে হবে।

যে স্ট্রোক নিচ্ছে সে যদি বল মারার আগে এমন কোনো কাজ করে যার ফলে গোলকীপার যে-কোনো পা নড়াতে প্ররোচিত হয় কিংবা যদি পূর্বোল্লিখিত খেলোয়াড় বলটি মারার ভান করে, তা হলে স্ট্রোকটি আবার দেওয়া হতে পারে।

(ঘ) যতক্ষণ না আম্পায়ার বাঁশী বাজিয়ে স্ট্রোক নিতে সঙ্কেত করছেন ততক্ষণ আক্রমণকারী দলের খেলোয়াড় পেনাল্টি-স্ট্রোক নিতে পারবে না।

(ঙ) পেনাল্টি-স্ট্রোক নেওয়ার সময় দু'দলের আর সব খেলোয়াড়কে নিকটস্থ ২৫-গজ লাইনের বাইরে থাকতে হবে।

(চ) যে ধরনের স্ট্রোকই করা হোক না কেন, মেরে বলটিকে যে কোনো উচ্চতায় তোলা যেতে পারে।

(ছ) যদি পেনাল্টি-স্ট্রোকের ফলে :

(i) বলের সমগ্র অংশটি দুই গোল-পোস্টের মধ্যে এবং ক্রসবারের নীচে গোল-লাইন অতিক্রম করে যায়, তা হলে গোল হবে।

(ii) **গোলকীপার বা তার বদলী খেলোয়াড়ের দ্বারা কোনো আইন লঙ্ঘিত হবার ফলে যদি গোল না হয়, তাহলে আম্পায়ার গোলের নির্দেশ দেবেন।** অবশ্য, এই আইনলঙ্ঘনের মূলে যদি যে স্ট্রোক নিয়েছে তার কোনো কাজ থাকে, যা উপরে 'গ' অংশে বলা হয়েছে, তা হলে আম্পায়ার ঐ রকম নির্দেশ দেবেন না।

(iii) সব ক্ষেত্রেই পেনাল্টি-স্ট্রোক শেষ হওয়ার পর বলটি সার্কলের মধ্যে স্থির থাকবে বা সার্কলের বাইরে চলে যাবে। যদি না গোল করা হয়ে থাকে তাহলে আত্মরক্ষাকারী দলের কোনো খেলোয়াড় ফ্রী হিট নিয়ে খেলাটি আবার আরম্ভ করবে। গোল-লাইনের মাঝখান থেকে মাঠের মধ্যে ১৬ গজ (গোল-লাইনের ভিতরের কিনারা থেকে) দূরে কোনো জায়গা থেকে ফ্রী হিট নিতে হবে। [১৯ (গ) (iii) আইন দ্রষ্টব্য]

(জ) পেনাল্টি-স্ট্রোকের নির্দেশদান এবং খেলা পুনরারম্ভের মধ্যে যতটা সময় যায়, খেলার সময় ততটা বাড়িয়ে দিতে হবে।

দণ্ড: যদি আক্রমণকারী দলের কোনো খেলোয়াড় এই আইন বা অন্য কোনো আইন লঙ্ঘন করে তাহলে এই আইনের ছ (iii) অংশ অনুসারে খেলাটি আবার আরম্ভ হবে। যদি আত্মরক্ষাকারী দলের কোনো খেলোয়াড় এই আইনের লঙ্ঘন করে তা হলে আম্পায়ার স্ট্রোকটি আবার নেবার নির্দেশ দিতে পারেন।

ব্যাখ্যা: যদি আম্পায়ার মনে করেন যে, সার্কলের মধ্যে ১০নং আইন বা ১৩নং আইন ভঙ্গ করা হয়েছে একমাত্র গোল করা বন্ধ করার উদ্দেশ্যেই, সেক্ষেত্রে পেনাল্টি-স্ট্রোকের নির্দেশ দেওয়া উচিত—যদিও তিনি দেখেন যে, আইন লঙ্ঘিত না হলে গোল যে হতই এমন কথা জোর করে বলা যায় না। (এমনও হতে পারে যে, এক খেলোয়াড়ের বিরুদ্ধে ফাউল করা হয়েছে অথচ গোল করার সুযোগ ছিল আর এক খেলোয়াড়ের।) বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে যে, এই দণ্ড মাত্র সেই সেই ক্ষেত্রেই দেওয়া যাবে, যেখানে অপরাধগুলি খেলাকে গুরুত্বপূর্ণভাবে প্রভাবিত করে এবং যেখানে পেনাল্টি-কর্ণারের চেয়ে বেশি কঠোর দণ্ড দেওয়া দরকার। এটা ঠিক কথা যে, আইনের লঙ্ঘন ইচ্ছাকৃত না অনিচ্ছাকৃত, তা স্থির করাটা আম্পায়ারের পক্ষে সব সময় সহজ হয় না, কিন্তু আইনে যে ধরনের লঙ্ঘন একেবারেরই নিষিদ্ধ—যেমন চার্জ করা, আর আইন অনুযায়ী কিছু করতে গিয়ে যদি কোনো লঙ্ঘন হয়, যেমন, হ্যাণ্ডবল—এই দু'য়ের মধ্যে পার্থক্য অবশ্যই করা উচিত।

স্ট্রোক নেওয়ার পর গোলকীপার যদি বলটি ধরে ফেলে এবং আটকে রাখে তা হলেই বলটি 'স্থির' রয়েছে ধরা হবে, অবশ্য বলটি দুই পোস্টের মধ্যের গোল-লাইনের উপর দিয়ে নিয়ে যাওয়া বাদে।

১৯। **আম্পায়ার:** (ক) দু'জন আম্পায়ার থাকবেন। প্রত্যেকেই

একটি সাইড-লাইনের সম্পূর্ণটি নিয়ে খেলাবেন, কিন্তু শুধু তাঁর অর্ধাংশের কর্ণার সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবেন।

(খ) খেলোয়াড় আবেদন করা পর্যন্ত অপেক্ষা না করেই আম্পায়ার তাঁর সিদ্ধান্ত জানাবেন।

(গ) শুধু বাঁশী বাজিয়ে আম্পায়ার—

(i) খেলার প্রতি অর্ধ শুরু ও শেষ করবেন।

(ii) কোনো দণ্ডাদেশ বলবৎ করবেন বা অন্য কোনো কারণে খেলা থামাবেন।

(iii) প্রয়োজন হলে বুঝিয়ে দেবেন যে, বলটির সমগ্র অংশ গোল-লাইন বা সাইড-লাইন অতিক্রম করেছে।

(iv) গোলের নির্দেশ দেবেন।

(v) পেনাল্টি-স্ট্রোক আরম্ভ করাবেন।

(vi) পেনাল্টি-স্ট্রোকের পর বা ২০ (ক) আইন অনুসারে খেলা সাময়িক-ভাবে বন্ধ হলে খেলা আবার আরম্ভ করাবেন।

(ঘ) যে-সব ক্ষেত্রে আম্পায়ার নিশ্চিত হবেন যে, তিনি দণ্ড দিলে অপরাধকারী পক্ষেরই সুবিধা হচ্ছে সেইসব ক্ষেত্রে তিনি দণ্ডদান থেকে বিরত থাকবেন।

(ঙ) নিজেদের মধ্যে ঠিক করে নিয়ে একজন আম্পায়ারই সম্পূর্ণ খেলাটির সময় দেখতে পারেন বা দু'জনই এক অর্ধ করে পারেন। খেলা থামানো ছাড়া উপায় নেই এমন কারণে বা দুর্ঘটনার জন্যে যেটুকু সময় নষ্ট হয় সেটুকু বাদ দিয়ে পুরো সময় খেলাতে হবে।

(চ) যে-সব গোল হয় তাদের একটা লিখিত বিবরণ আম্পায়াররা রাখবেন।

২০। দুর্ঘটনা : (ক) যদি কোনো খেলোয়াড় বা আম্পায়ার অক্ষম হয়ে পড়েন তাহলে আম্পায়ার বা দ্বিতীয় আম্পায়ার খেলাটি সাময়িকভাবে বন্ধ রাখবেন। দু'টি ক্ষেত্রের কোনোটিতেই যদি খেলা সাময়িকভাবে বন্ধ রাখার ঠিক আগেই কোনো দল গোল করে তাহলে গোলটি দিতে হবে, যদি আম্পায়ারের মতে, দুর্ঘটনাটি না ঘটলেও গোলটি হত।

(খ) আম্পায়ারের পছন্দমত একটি জায়গা থেকে 'বুলি' করে খেলা আবার আরম্ভ করতে হবে। অবশ্য এই বুলি ৯ (খ) আইনসাপেক্ষে করতে হবে।

ক্রিকেট

ক্রিকেটের আইন

(এ) খেলোয়াড়, আম্পায়ার এবং স্কোরার

১। **দল**—খেলা হয় দু'টি দলের মধ্যে; অন্যরকম কিছু ঠিক করা না থাকলে প্রতি দলে এগারো জন খেলোয়াড় থাকবে। প্রতি দল খেলবে একজন অধিনায়কের অধীনে, যিনি ইনিংসের টস্ করার আগে তাঁর খেলোয়াড়দের মনোনীত করবেন; এর পর বিপক্ষীয় অধিনায়কের সম্মতি ছাড়া এদের বদল করা চলবে না।

টীকা: ১। যদি কোনো সময়ে অধিনায়ককে না পাওয়া যায় তা হলে এই এবং অন্যান্য আইন থেকে উদ্ভূত পরিস্থিতির দ্রুত মোকাবিলা করার জন্য অবশ্যই তাঁর হয়ে একজন প্রতিনিধি কাজ করবেন।

২। যে খেলায় প্রতি দলে এগারো জনের বেশি খেলোয়াড় অংশ-গ্রহণ করে, তাকে প্রথম শ্রেণীর বলে গণ্য করা হবে না এবং কোনো ক্ষেত্রেই কোনো দল এগারো জনের বেশি খেলোয়াড় নিয়ে খেলবে না।

২। **পরিবর্ত খেলোয়াড়**—খেলার মধ্যে অসুস্থতা বা আঘাতের জন্য কোনো খেলোয়াড় অসমর্থ হয়ে পড়লে তার হয়ে একজন পরিবর্তকে ফিল্ড করবার বা দুই উইকেটের মধ্যে দৌড়বার সুযোগ দিতে হবে; অসমর্থতা অন্য কোনো কারণে হলে বিপক্ষীয় অধিনায়কের সম্মতি ছাড়া এই সুযোগ দেওয়া হবে না। যে ব্যক্তি পরিবর্ত খেলোয়াড় হিসাবে ফিল্ড করতে যাবে তার বিষয়ে বিপক্ষীয় অধিনায়কের কাছ থেকে সম্মতি নিতে হবে, (যাতে) সে (অধিনায়ক) নির্দেশ দিতে পারে কোন্ কোন্ জায়গায় পরিবর্ত খেলোয়াড় ফিল্ড করতে পারবে না।

টীকা: ১। কোনো খেলোয়াড়ের হয়ে পরিবর্ত খেলোয়াড় আগে খেলে থাকলেও সেই খেলোয়াড় পরে আবার ব্যাট, বল বা ফিল্ড করতে পারবে।

২। আহত ব্যাটসম্যান আউট হয়ে যাবে যদি তার রাণার ৩৬, ৪০ বা ৪১নং আইন ভঙ্গ করে। স্ট্রাইকার হিসাবে সে

স্বয়ং আইনের অধীনে থাকছে ; যদি সে কোনো উদ্দেশ্যে 'আউট অব গ্রাউণ্ড' হয় তাহলে ৪১ এবং ৪২নং আইন অনুসারে সে আউট হবে উইকেটকীপারের দিকে, উইকেট ভাঙ্গার সময় অপর ব্যাটসম্যান বা পরিবর্ত যেখানেই থাকুক না কেন। আহত ব্যাটসম্যান যখন স্ট্রাইকার নয় তখন সে খেলার বাইরে এবং এমন জায়গায় দাঁড়াবে যাতে সে খেলার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করে।

৩। **আম্পায়ার নিয়োগ**—ইনিংসের জন্য টসের আগে প্রতি প্রান্তে একজন করে দু'জন আম্পায়ারকে নিযুক্ত করতে হবে যাঁরা আইন অনুসারে চরম নিরপেক্ষতার সঙ্গে খেলা নিয়ন্ত্রিত করবেন ; উভয় অধিনায়কের সম্মতি ছাড়া খেলার সময়ের মধ্যে কোনো আম্পায়ার বদলানো যাবে না।

টীকা : প্রতিদিনের খেলা আরম্ভ হবার ৩০ মিনিট আগে আম্পায়াররা মাঠ কর্তৃপক্ষের কাছে নিজেদের উপস্থিত করবেন ;

৪। **স্কোরার**—যত রাণ হবে তার হিসাব লিপিবদ্ধ করবেন স্কোরাররা, তারা ঐ উদ্দেশ্যে নিযুক্ত হবেন ; স্কোরাররা আম্পায়ারের সমস্ত নির্দেশ ও সংকেত গ্রহণ করবেন এবং সেগুলির প্রাপ্তি-স্বীকার করবেন।

টীকা : যতক্ষণ না স্কোরার সঙ্কেতের উত্তর দিচ্ছেন ততক্ষণ অপেক্ষা না করে আম্পায়ারদের খেলা চালিয়ে যাওয়া উচিত নয়। সন্দেহের অবকাশ আছে এমন বিষয়ের মীমাংসার জন্য স্কোরার এবং আম্পায়ারদের মধ্যে পারস্পরিক আলোচনা সব সময়েই চলতে পারে।

(বি) খেলার সরঞ্জাম এবং মাঠ

৫। **বল**—বলের ওজন ৫$\frac{1}{2}$ আউন্সের কম বা ৫$\frac{3}{4}$ আউন্সের বেশি হবে না। এর পরিধির মাপ ৮$\frac{13}{16}$ ইঞ্চির কম বা ৯ ইঞ্চির বেশি হবে না। বিপরীত কোনো রকম চুক্তি না হয়ে থাকলে দুই অধিনায়কের যে কেউ প্রতি ইনিংসের শুরুতে নতুন বল দাবি করতে পারেন। বল হারিয়ে গেলে বা খেলার অযোগ্য হয়ে গেলে আম্পায়াররা আর একটি বল ব্যবহার করার অনুমতি দেবেন। যখনই বল বদলানো হবে তাঁরা ব্যাটসম্যানদের সে কথা জানিয়ে দেবেন।

টীকা : ১। প্রথম শ্রেণীর খেলায় যে-সব বল ব্যবহার করা হবে, সেগুলি খেলা শুরুর আগে আম্পায়ারদের ও অধিনায়কদের দ্বারা অনুমোদিত হওয়া উচিত।

২। প্রথম শ্রেণীর খেলায়, পুরনো বল দিয়ে নির্দিষ্ট-সংখ্যক ওভার বল করা হয়ে গেলে ফিল্ডিং-পক্ষের অধিনায়ক নতুন বল দাবি করতে পারেন। কোন্ দেশে ঐ ওভার-সংখ্যা কত হবে সেটা সংশ্লিষ্ট দেশের ক্রিকেটের 'গভর্নিং বডি' স্থির করবেন, তবে তা ৭৫ ওভারের কম বা ৮৫ ওভারের বেশি (৮ বলের ওভার হলে ৫৫-র কম বা ৬৫-র বেশি) হবে না।* অন্য স্তরের ক্রিকেটে এই বিধিগুলি প্রযোজ্য হবে না, যদি না ইনিংসের জন্য টস্ করার আগে সে বিষয়ে কোনো মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে।

৩। হারিয়ে-যাওয়া বা খেলার অনুপযুক্ত হয়ে যাওয়া বলের বদলে যেটি দেওয়া হবে সেটির ক্ষয় বা ব্যবহার বাতিল বলটির অনুরূপ হয়ে থাকা উচিত

৬। **ব্যাট**—ব্যাটের সবচেয়ে চওড়া অংশ ৪$\frac{1}{4}$ ইঞ্চি অতিক্রম করবে না ;. এর দৈর্ঘ্য ৩৮ ইঞ্চির বেশি হবে না।

৭। **পিচ**—দুই উইকেটের মধ্যস্থলকে যে রেখা** যুক্ত করে সেই রেখার উভয় দিকে ৫ ফুট চওড়া যতখানি জায়গা দুই বোলিং ক্রীজের মধ্যে পড়ছে মাঠের সেই অংশকে পিচ বলে ধরা হয়। ইনিংসের জন্যে টস্ হবার আগে পর্যন্ত মাঠ-কর্তৃপক্ষ পিচের নির্বাচন এবং প্রস্তুতির ব্যাপারে দায়ী থাকবেন ; তার পর থেকে এর ব্যবহার এবং রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ন্ত্রিত করবেন আম্পায়াররা। খেলার সময়ের মধ্যে পিচের পরিবর্তন করা চলবে না, যদি না তা খেলার পক্ষে অনুপযোগী হয়ে যায় এবং সেক্ষেত্রেও, কেবল উভয় অধিনায়কের সম্মতি নিয়েই।

৮। **উইকেট**—পরস্পরের মুখোমুখি এবং সমান্তরালভাবে একদিকের স্টাম্প থেকে অপরদিকের স্টাম্প পর্যন্ত ২২ গজ ব্যবধান রেখে উইকেট পুঁততে হবে। প্রতি উইকেট চওড়ায় ৯ ইঞ্চি হবে এবং গঠিত হবে তিনটি স্টাম্প নিয়ে। স্টাম্পের উপর দু'টি বেল থাকবে। স্টাম্পগুলির গঠন সমান ও পর্যাপ্ত মাপের

* ভারত টার্ফ উইকেটে ৭৫ এবং ম্যাটিং উইকেটে ৫০ ওভার স্থির করা হয়েছে।

** বলা বাহুল্য এরকম কোনো লাইন নেই ; এটা একটা কল্পিত লাইন।

হবে, যাতে তাদের মধ্য দিয়ে বল গলে না যেতে পারে এবং মাটি থেকে স্টাম্পের চূড়া ২৮ ইঞ্চি হবে। বেলগুলির প্রত্যেকটি লম্বায় ৪$\frac{3}{8}$ ইঞ্চি হবে এবং স্টাম্পের উপর বসানো-থাকা অবস্থায় স্টাম্প ছাড়িয়ে $\frac{1}{2}$ ইঞ্চির বেশি উঠবে না।

টীকা : ১। বেল বসানোর খাঁজ বাদে স্টাম্পের মাথা গম্বুজাকৃতি হবে।

২। জোর বাতাস বইলে, আম্পায়ারদের অনুমতি নিয়ে অধিনায়করা বেল ব্যবহার না করার বিষয়ে রাজি হতে পারেন। (৩১নং আইনের ৩-এর টীকা দ্রষ্টব্য।)

৯। **বোলিং ও পপিং ক্রীজ**—স্টাম্পগুলির সঙ্গে একই লাইনে বোলিং ক্রীজ চিহ্নিত করতে হবে ; লম্বায় ৮ ফুট ৮ ইঞ্চি (২.৬৪ মিটার) এবং স্টাম্পগুলি
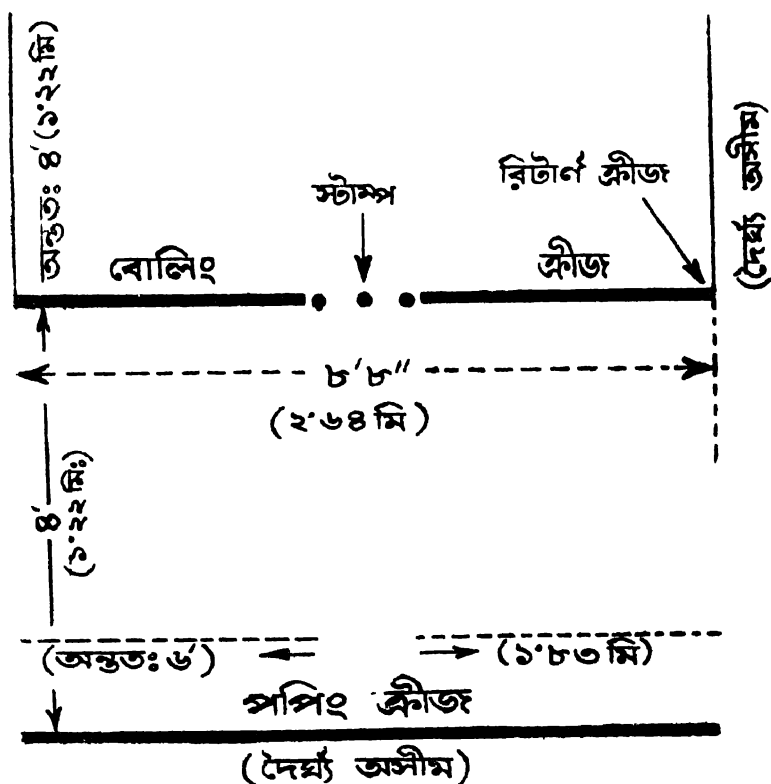
বিভিন্ন ক্রীজের অবস্থান ও মাপ

মাঝখানে থাকবে। বোলিং ক্রীজের ৪ ফুট (১.২২ মি) সামনে এবং

সমান্তরাল করে চিহ্নিত করতে হবে পপিং ক্রীজ যা স্টাম্পের লাইনের উভয় দিকে অন্ততঃ ৬ ফুট (১.৮৩ মি) বিস্তৃত থাকবে। বোলিং ক্রীজের উভয় প্রান্তে এবং তার সঙ্গে সমকোণ করে রিটার্ণ ক্রীজ আঁকতে হবে এবং একে সামনে বাড়িয়ে পপিং ক্রীজের সঙ্গে যুক্ত করতে ও উইকেটের পিছনে অন্ততঃ ৪ ফুট (১.২২ মি.) পর্যন্ত রাখতে হবে। রিটার্ণ ক্রীজ এবং পপিং ক্রীজ, উভয়েরই দৈর্ঘ্য অসীম বলে গণ্য হবে।

টীকা : ১। পপিং ক্রীজ থেকে উইকেটের দূরত্ব মাপা হয় স্টাম্পগুলির মাঝখান থেকে ক্রীজের ভিতর দিকের কিনারা পর্যন্ত টানা একটি রেখা থেকে।

২। যখনই সম্ভব, প্রতি বিরতিকালের মধ্যে পপিং ক্রীজ ও রিটার্ণ ক্রীজ নতুন করে চিহ্নিত করে নিতে হবে।

(সি) পিচের যত্ন এবং রক্ষণাবেক্ষণ

১০। **রোলিং, ঘাস ছাঁটাই এবং জল দেওয়া**—বিশেষ বিধি অনুযায়ী অনুমতি না মিললে প্রতি ইনিংসের এবং প্রতিদিনের খেলা শুরুর আগে ছাড়া কোনো খেলায় পিচ রোল করা যাবে না। তখন যদি ব্যাটিং-পক্ষের অধিনায়ক ইচ্ছা করেন অনধিক ৭ মিনিট পিচে ঝাঁট দেওয়া এবং রোল করা যেতে পারে। তিন দিনের কম সময়ের খেলা হলে খেলার সময়ের মধ্যে পিচের ঘাস ছাঁটাই করা যাবে না, যদি না বিশেষ বিধিতে তার ব্যবস্থা থাকে। তিন বা তার বেশি দিনের খেলা হলে খেলা আরম্ভের পর একদিন অন্তর করে দিনের খেলা শুরুর ঠিক আগে আম্পায়ারদের তদারকিতে পিচের ঘাস ছাঁটাই করাতে হবে; কিন্তু কোনো দিন খেলা না হওয়ার জন্য যদি ঐভাবে পিচের ঘাস ছাঁটাই না হয়ে থাকে, খেলা পুনরারম্ভের প্রথম দিনেই এবং তার পর একদিন অন্তর করে তা করাতে হবে। (এই আইনের উদ্দেশ্যে বিরতি দিবসকে খেলার দিন হিসাবে ধরা হয়। কোনো ক্ষেত্রেই খেলা চলাকালে পিচে জল দেওয়া যাবে না।

টীকা : ১। এই আইনে মঞ্জুর করা হয়েছে এবং ব্যাটিং-দলের অধিনায়কের অনুরোধে ঘটেছে এমন কোনরকম রোলিং প্রদত্ত বিধি অনুযায়ী হওয়ার এবং তা এমনভাবে সম্পূর্ণ করা যাতে খেলা নির্দিষ্ট সময়ে আরম্ভ হতে পারে, তার দায়িত্ব আম্পায়ারদের।

প্রতিদিনের খেলা শুরুর আগে স্বাভাবিক যে রোলিং হয় তা খেলা শুরু হবার আধঘণ্টার বেশি আগে আরম্ভ হবে না, কিন্তু ব্যাটিং-দলের অধিনায়ক ইচ্ছা করলে এই রোলিং খেলা শুরু হবার ১৪ মিনিট আগে পর্যন্ত স্থগিত রাখতে পারবেন।

২। কোনো অধিনায়ক যদি ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করেন হয়, (এ) কোনো দিন খেলা শুরুর আগে এত দেরী করে যে, অপর পক্ষের অধিনায়ক রোলিং সম্পর্কে এই আইন অনুযায়ী ইচ্ছা প্রয়োগের সুযোগ পান না, কিংবা, (বি) লাঞ্চের বিরতির মধ্যে, এই বিরতি শুরু হওয়ার ১৫ মিনিট পরে তা হলে রোলিং করতে যা সময় লাগবে তা খেলার সময় থেকেই নিতে হবে।

৩। যুক্তরাজ্য ছাড়া অন্যত্র, যদি বৃষ্টিতে ভেজা পিচের উপরে খেলার ফলে পিচ নষ্ট হয়. তাহলে যে-দিন পিচ নষ্ট হবে সেদিনের খেলার সমাপ্তি এবং খেলার পুনরারম্ভের মধ্যে যে কোনো সময়ে উপর্যুপরি ১০ মিনিট পিচ ঝাঁট দিতে এবং রোল করাতে হবে এই সর্তে যে :—

(১) বৃষ্টি পড়ার পর খেলার ফলেই পিচের এমন ক্ষতি হয়েছে যে, ১০নং আইনে বর্ণিত রোলিং ছাড়াও অতিরিক্ত রোলিং প্রয়োজন, এ বিষয়ে আম্পায়াররা একমত হলে তবেই তাঁরা গ্রাউণ্ডসম্যানকে পিচ ঝাঁট দিতে এবং রোল করতে নির্দেশ দেবেন।

(২) সবক্ষেত্রেই এই ধরনের রোলিং উভয় আম্পায়ারের ব্যক্তিগত তদারকিতে করতে হবে এবং এমন সময়ে ও এমন রোলার দিয়ে করাতে হবে যা গ্রাউণ্ডসম্যানের মতে পিচের ক্ষতি পূরণ করার পক্ষে সর্বোত্তম।

(৩) কোনো বিশেষ দিনে বৃষ্টির ফলে এই রোলিং একবারের বেশি করবার অনুমতি দেওয়া হবে না।

(৪) কোনো দিন খেলা শুরুর আগে যে রোলিংয়ের ব্যবস্থা ১০নং আইনে আছে তার অনুমতি দেওয়া হবে না, যদি সেই দিনই খেলা শুরুর নির্ধারিত সময়ের দু'ঘণ্টার মধ্যে এখানে বর্ণিত রোলিং হয়।

১১। **পিচ ঢাকা দেওয়া**—'বিশেষ বিধি' অনুযায়ী ব্যবস্থা না থাকলে খেলার দিনগুলিতে পিচ সম্পূর্ণভাবে ঢাকা দেওয়া যাবে না ; বোলারদের রান্-আপ রক্ষা করার জন্য ব্যবহৃত আচ্ছাদন পপিং ক্রীজ ছাড়িয়ে সামনে ৩½ ফুটের বেশি দূরে যাবে না।

টীকা : খেলা শুরুর আগে এবং খেলার দিনগুলিতে, রাতে এবং যখন প্রয়োজন, দিনেও এই অনুসারে বোলারদের রান্-আপ সাধারণতঃ রক্ষা করা হয়ে থাকে। প্রতিদিন ভোরে আবহাওয়া ভালো থাকলে আচ্ছাদনগুলি তুলে নেওয়া উচিত।

১২। **পিচের রক্ষণাবেক্ষণ**—ব্যাটসম্যান তার ব্যাট দিয়ে পিচ ঠুকতে পারে এবং অন্য খেলোয়াড়রা শক্তভাবে দাঁড়ানোর জন্যে তাদের পা-রাখার জায়গায় কাঠের গুঁড়ো ব্যবহার করতে পারে, যদি না তার ফলে ৪৬নং আইন লঙ্ঘিত হয়। ভিজে আবহাওয়ার দিনে, আম্পায়াররা লক্ষ্য রাখবেন, যেন বোলাররা এবং ব্যাটসম্যানরা যে-সব গর্ত করেছেন সেগুলি খেলার সুবিধার জন্য যখনই প্রয়োজন তখনই সমান করা এবং শুকিয়ে নেওয়া হয়।

(ডি) খেলার পরিচালনা

১৩। **ইনিংস**—প্রতি দল দু'টি করে ইনিংস পাবে এবং ১৪নং আইনে বর্ণিত ব্যবস্থা বাদে ইনিংসগুলি পালা অনুসারে নেবে। খেলার মাঠে টসের সাহায্যে ইনিংস বেছে নেওয়ার ব্যাপারটি নিষ্পন্ন হবে।

টীকা : ১। খেলা শুরু হবার নির্ধারিত সময়ের ১৫ মিনিট আগে অধিনায়করা ইনিংসের জন্য টস্ করবেন, তার পরে নয়। যিনি টসে জিতেছেন, তাঁর ব্যাটিং বা ফিল্ডিং নেবার সিদ্ধান্ত বিপক্ষের অধিনায়ককে একবার জানিয়ে দেওয়ার পর আর বদলাতে পারবেন না।

২। একদিনের যে খেলায় উভয় দলের প্রথম ইনিংস সম্পূর্ণ হওয়ার পরও খেলা চলে, সেই খেলার ক্ষেত্রেও এই আইন প্রযোজ্য।

১৪। **ইনিংস ফলো করানো**—যে দল প্রথমে ব্যাট করার পর পাঁচ বা তার বেশি দিনের খেলায় ২০০ রানে, তিন দিনের বা চার দিনের খেলায় ১৫০ রানে, দু'দিনের খেলায় ১০০ রানে এবং এক দিনের খেলায় ৭৫ রানে এগিয়ে

থাকবে, সেই দল ইচ্ছা করলে অপর দলকে তাদেরই ইনিংসের পর আবার ইনিংস নিতে বাধ্য করাতে পারবে।

১৫। **ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা**—খেলাটি যতদিনের হোক না কেন, খেলা চলার মধ্যে ব্যাটিং-পক্ষের অধিনায়ক যে কোনো সময় ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করতে পারবেন।

টীকা ঃ কোনো অধিনায়ক তাঁর দ্বিতীয় ইনিংস একেবারে ছেড়ে দিতে পারেন। এই ক্ষেত্রে দুই ইনিংসের মধ্যে ১০ মিনিটের ব্যবধান থাকবে এবং তাঁর সিদ্ধান্ত বিপক্ষের অধিনায়ককে এবং আম্পায়ারদের যথেষ্ট সময় থাকতে জানাতে হবে যাতে ৭ মিনিট পিচ রোল করার সুযোগ পাওয়া যায়।

১৬। যদি আবহাওয়ার জন্য খেলা শুরু হতে দেরি হয়, খেলার প্রকৃত আরম্ভ থেকে যে ক'দিন বাকি থাকে সেই হিসাবে ১৪নং আইনের প্রয়োগ হবে।

১৭। **খেলার শুরু ও সমাপ্তি এবং বিরতি**—আহারাদির জন্য যে যে বিরতিকাল স্থির করা হয়েছে সেইমত, এক ইনিংস ও তার পরবর্তী ইনিংসের মধ্যে ১০ মিনিটের এবং প্রতি নতুন ব্যাটসম্যান মাঠে নামার জন্যে অনধিক ২ মিনিটের বিরতি আম্পায়াররা অবশ্যই দেবেন। প্রতি ইনিংসের এবং প্রতি দিনের খেলার শুরুতে এবং প্রতিটি বিরতির শেষে বোলারের প্রান্তের আম্পায়ার 'প্লে' ডাকবেন এবং তখন যে দল খেলতে রাজী হবে না তাদের পরাজিত বলে ধরে নেওয়া হবে। 'প্লে' ডাকা হবার পর কোনো খেলোয়াড়কে ট্রায়াল বল দেওয়া হবে না এবং যখন দুই ব্যাটসম্যানের মধ্যে একজন আউট হবে পরবর্তী ব্যাটসম্যান মাঠে আসা পর্যন্ত কোনো খেলোয়াড়কে ব্যাট ব্যবহার করার অনুমতি দেওয়া হবে না।

টীকা ঃ ১। আম্পায়াররা এই আইন অনুসারে কোনো খেলা সম্পর্কে চূড়ান্ত রায় ঘোষণা করতে পারেন না, যদি না (এক) এমনভাবে 'প্লে' ডাকা হয়ে থাকে যাতে দু'দলই পরিষ্কার বুঝতে পারে যে খেলা শুরু হবে, (দুই) সেজন্যে আবেদন করা হয়ে থাকে, এবং (তিন) একটি দল খেলা চালিয়ে যাবে না বা যেতে পারবে না, এ বিষয়ে তাঁরা নিশ্চিত হন।

২। বহির্গামী ব্যাটসম্যান মাঠ ছেড়ে বেরিয়ে যাবার আগেই যাতে তাকে, খেলতে যে আসছে সে অতিক্রম করে, তার ব্যবস্থা করা অধিনায়কদের অত্যাবশ্যকীয় কর্তব্য। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিলম্ব সমগ্র ব্যাটিং-দলের খেলতে অনিচ্ছা বোঝাচ্ছে কিনা সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার দায়িত্ব আম্পায়ারদের বলেই এর গুরুত্ব আরও বেড়ে যাচ্ছে।

৩। আগে থেকে অন্যরকম কিছু স্থির না করা থাকলে লাঞ্চের বিরতি ৪৫ মিনিটের বেশি হবে না (কিন্তু ১০নং আইনের ২নং টীকা দ্রষ্টব্য)। লাঞ্চ বা চা-পানের বিরতি শুরুর নির্দিষ্ট সময়ের ২ মিনিট বাকি থাকতে শেষ উইকেট পড়লে আর পৃথকভাবে দুই ইনিংসের মধ্যে ১০ মিনিট সময় দেওয়া হবে না, খেলা নির্দিষ্ট সময়েই আরম্ভ হবে।

৪। খেলা চলার মধ্যে কোনো সময়েই পিচের উপর বোলিং অনুশীলন করা চলবে না।

৫। খেলার কোনও ভাগে প্লে ডাকা হবার পর কোনো বোলার দৌড়ের 'ট্রায়াল' দিতে পারবে না ; এর ব্যতিক্রম হবে উইকেট পড়লে ; তখন আম্পায়ার ট্রায়াল দৌড়তে দেবেন, যদি তিনি সন্তুষ্ট হন যে, তাতে সময় নষ্ট হবে না।

১৮। কোনো পূর্ব-নির্ধারিত বিরতির জন্য খেলা বন্ধ হলে, প্রতিদিনের খেলার শেষে এবং খেলার সমাপ্তিতে আম্পায়াররা 'টাইম' ডাকবেন এবং সাথে সাথে দু'দিকেও উইকেট থেকে বেলগুলি তুলে নেবেন। 'টাইম' না হলে সব সময়েই 'ওভার' আরম্ভ করতে হবে এবং আরব্ধ ওভার সম্পূর্ণও করতে হবে, যদি না খেলার কোনো ভাগের সমাপ্তির ২ মিনিট থাকতে কোনো ব্যাটসম্যান 'আউট' হয় বা 'অবসর' নেয়। কিন্তু খেলার শেষদিন খেলার শেষ মুখে যে 'ওভার' চলছে, 'টাইম' হবার পর উইকেট পড়লেও তাকে সম্পূর্ণ করতে হবে যদি দুই অধিনায়কের যে কেউ সেজন্যে অনুরোধ করেন।

টীকা : ১। যদি খেলার কোনো ভাগের শেষ ওভার সমাপ্ত হতে হতে খেলোয়াড়রা মাঠ ছেড়ে বেরিয়ে যায়, তাহলে আম্পায়াররা 'টাইম' ডাকবেন। খেলার শেষ ওভারে এইরকম ঘটলে খেলা আর আরম্ভ হবে না এবং তা শেষ হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হবে।

২। যদি 'টাইম' হবার আগে স্কোয়ার-লেগের আম্পায়ার তাঁর স্বাভাবিক পদক্ষেপে হেঁটে বোলারের প্রান্তে স্টাম্পের পিছনে তাঁর জায়গায় পৌঁছতে পারেন তবেই বিরতির বা দিনের খেলা শেষ হওয়ার আগের শেষ ওভারটি আরম্ভ করা হবে। শেষদিন খেলা শেষ হতে দু'মিনিটেরও কম বাকি থাকতে যদি ব্যাটসম্যান ওভারের শেষ বলে আউট হয় বা বলটি খেলে অবসর নেয় তা হলেও উপরের ব্যবস্থা খাটবে।

খেলার শেষ ওভারের মধ্যে যদি কোনো বোলার অসমর্থ হয়ে পড়ে এবং ওভার সম্পূর্ণ করতে অক্ষম হয় তা হলে অন্য বোলার সেই ওভারের অবশিষ্ট বলগুলি করবে।

৩। কোনো খেলার শেষ পর্যায়ে আম্পায়াররা জানিয়ে দেবেন কখন খেলার আর এক ঘণ্টা সময় বাকী থাকছে (খেলার স্বীকৃত সময় অনুযায়ী)। সেই মুহূর্ত থেকে এবং আগেই যদি মীমাংসা না হয়ে গিয়ে থাকে, খেলাটি কমপক্ষে ছয় বলের ২০ ওভার (৮ বলের ১৫ ওভার) চালাতেই হবে।

খেলায় ছেদ পড়লে (বিরতি কিংবা বৃষ্টি, আলোকাভাব ইত্যাদি সহ) করণীয় ওভারের সংখ্যা নষ্ট সময়ের অনুপাতে কমে যাবে এই হারে : তিন মিনিট বা তার অংশ নষ্ট সময়ের জন্য এক ওভার (৮ বলের ওভারের ক্ষেত্রে চার মিনিট)।

যদি খেলার শেষ ঘণ্টায় কোনো নতুন ইনিংস শুরু হয় তাহলে আবশ্যিক ন্যূনতম ওভারের সংখ্যা হিসাব করতে হবে এইভাবে— যখন ইনিংস শুরু হয় তখন থেকে খেলার যতটা বাকী আছে তার প্রতি তিন মিনিট বা তিন মিনিটের অংশ-পিছু এক ওভার (৮ বলের ওভারের ক্ষেত্রে চার মিনিট)।

খেলা শেষ হবার স্থিরীকৃত সময়ের আগেই যদি ন্যূনতম ওভার বল করা হয়ে যায়, খেলা (আগেই মীমাংসা না হয়ে গেলে) শেষ হবার স্থিরীকৃত সময় পর্যন্ত চলবে।

(এই টীকার শর্তগুলি বাদ দেবার ব্যাপারে উভয় অধিনায়ক খেলার আগে একমত হতে পারেন, অবশ্য যদি বিশেষ বিধিতে এইরকম ঐকমত্যের মঞ্জুরী থাকে।)

১৯। **স্কোরিং**—স্কোরের হিসাব হবে রাণ দিয়ে। রাণ স্কোর হয়ঃ প্রথমতঃ, হিটের পর বা বল খেলার মধ্যে থাকা অবস্থায় যে কোনো সময় ব্যাটসম্যানরা যতবার পরস্পরকে অতিক্রম করে একপ্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত সবটা জায়গা ঠিকমত যেতে পারবে তত; কিন্তু যদি দুই ব্যাটসম্যানের কেউ একটি অসম্পূর্ণ রাণ করে, আম্পায়ার 'ওয়ান শর্ট'-এর ডাক এবং সঙ্কেত দেবেন এবং ঐ রাণটি স্কোরের মধ্যে ধরা হবে না। স্ট্রাইকারের হিট করা বলটি ধরে ফেলা হলে কোনো রাণ স্কোরের মধ্যে ধরা হবে না; কোনো ব্যাটসম্যান রাণ-আউট হলে যে রাণটি নেবার চেষ্টা করা হচ্ছিল, সেটি ধরা হবে না। দ্বিতীয়তঃ, ২১, ২৭, ২৯ এবং ৪৪নং আইনে বর্ণিত দণ্ডগুলির এবং ২০নং আইন অনুসারে বাউণ্ডারীর ক্ষেত্রে।

টীকাঃ ১। যদি বল খেলার মধ্যে থাকতে থাকতে ব্যাটসম্যানদ্বয় পরস্পরকে অতিক্রম করে, তা হলে ছেড়ে আসা উইকেটে কাউকেই ফিরে আসতে হবে না—বাউণ্ডারী মারের বা অতিরিক্ত রাণ থেকে বাউণ্ডারীর বা ৩০নং আইনের ১নং টীকায় এবং ৪৬নং আইনের ৪ (vii) নং টীকায় বর্ণিত ক্ষেত্রগুলি ছাড়া। যদি শর্ট রাণ ডাকা হয়ে থাকে কিংবা যদি কোনো রাণ ধরা না হয়, যেমন ক্যাচের ক্ষেত্রে, তা হলেও এই নিয়ম খাটবে।

২। কোনো রাণকে শর্ট ধরা হবে যদি যে কোনো একজন ব্যাটসম্যান বা দু'জনই আবার রাণ নেবার জন্য ঘুরতে গিয়ে পপিং ক্রীজের পিছনের জমিতে তার ব্যাট বা দেহের কোন অংশ স্পর্শ করাতে না পারে। যদিও এই রকম শর্ট রাণ পরের রাণটিকেই সংক্ষিপ্ত করছে, পরের রাণটি সম্পূর্ণ করা হলে তাকে ধরতে হবে। সেই রকম, যদি কোনো ব্যাটসম্যান তার পপিং ক্রীজের সামনে স্টান্স নেয়, সে সেখান থেকেই ছুটলে কোনও জরিমানা হবে না।

৩। (এক) যদি একটি এবং একই রাণে উভয় ব্যাটসম্যানই শর্ট থাকে তাহলে মাত্র এক রাণ বাদ দেওয়া হবে। (দুই) তিন বা তার বেশি রাণ নেবার চেষ্টা করা হলে তবেই একাধিক রাণ 'শর্ট' হতে পারে এবং তাহলে উপরের [এক]-সাপেক্ষে

যে ক'টি রাণকে শর্ট ডাকা হয়েছে সে সবগুলিকেই বাতিল করতে হবে। (তিন) যদি যে কোনো ব্যাটসম্যান বা উভয়েই ইচ্ছা করে শর্ট রাণ করে তা হলে আম্পায়ার যখনই দেখবেন যে, ফিল্ডিং-দল আইন-অনুসারে ব্যাটসম্যানদ্বয়ের কাউকে আউট করার সুযোগ পাচ্ছে না তখনই তিনি 'ডেড্ বল' ডেকে যে সব রাণ নেওয়ার চেষ্টা হয়েছে বা নেওয়া হয়েছে সে-গুলি বাতিল করতে পারবেন।

৪। বল 'ডেড্' হয়ে গেলে আম্পায়ার শর্ট রাণের সঙ্কেত জানাতে হাতটি পাশে উঁচু করে কনুই ভেঙে আঙুলের ডগা দিয়ে কাঁধ ছোঁবেন। একের বেশি শর্ট রাণ হয়ে গেলে কতগুলি রাণ বাতিল করা হবে সে বিষয়ে অবশ্যই আম্পায়াররা স্কোরারদের নির্দেশ দেবেন। (৪নং আইনের ১নং টীকা দ্রষ্টব্য।)

২০। **বাউণ্ডারী**—ইনিংসের জন্য টস্ করার আগে আম্পায়াররা দু'দলের সঙ্গে খেলার বাউণ্ডারীর বিষয়ে এবং সে জন্য কত রাণ ধরা হবে সে সম্পর্কে একমত হয়ে নেবেন। যে পিচে খেলা হচ্ছে তার ঠিক মধ্যস্থল থেকে যে কোনো দিকে সর্বাধিক ৭৫ গজই বাউণ্ডারী সীমা হবে। আম্পায়ারের মতে খেলার মধ্যে থাকা অবস্থায় যখনই বল বাউণ্ডারী স্পর্শ বা অতিক্রম করে বা তার উপর দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় তখনই তিনি বাউণ্ডারী ডাকবেন বা সঙ্কেতিত করবেন। যে-মুহূর্তে বল বাউণ্ডারীতে পৌঁছায় সে পর্যন্ত সম্পূর্ণ রাণগুলি বাউণ্ডারীর জন্য নির্দিষ্ট রাণসংখ্যার বেশি হলে তবেই তাদের ধরা হবে। কিন্তু 'ওভার-থ্রো' বা কোনো ফিল্ডসম্যানের ইচ্ছাকৃত কাজের জন্য বাউণ্ডারী হয়ে গেলে আগে-করা রাণ এবং বাউণ্ডারীর জন্য নির্দিষ্ট রাণ, দুই-ই স্কোরের সঙ্গে যুক্ত হবে।

টীকা: ১। বাউণ্ডারী চিহ্নিত করার জন্যে পতাকা বা খুঁটি ব্যবহৃত হলে এই বিন্দুগুলিকে যে প্রকৃত বা কল্পিত লাইন যুক্ত করে তাকেই বাউণ্ডারী বলে ধরে নিতে হবে; সম্ভব হলে সাদা লাইন দিয়ে বাউণ্ডারী চিহ্নিত করা উচিত।

২। বাউণ্ডারীর জন্য কত রাণ নির্দিষ্ট করা হবে তা নির্ধারণ করতে গিয়ে আম্পায়াররা মাঠের প্রচলিত রীতি-নীতির কথা মনে রাখবেন।

৩। বল কোনো বাউণ্ডারী লাইন স্পর্শ করলে বা কোনো ফিল্ডস-ম্যান যদি বল হাতে-থাকা অবস্থায় তার শরীরের কোনো অংশ ঐ লাইনের উপরে রাখে বা উপর দিয়ে নিয়ে যায় তা হলেই বাউণ্ডারী হবে। কিন্তু কোনো ফিল্ডসম্যান বল ফিল্ড করার সময় খেলার এলাকার মধ্যে দাঁড়িয়ে বাউণ্ডারী বেড়া ছুঁয়ে বা তার উপর ঠেস দিয়ে থাকতে পারে। (এ ছাড়াও ৩৫নং আইনের ৫নং টীকা দ্রষ্টব্য।)

৪। খেলার এলাকার মধ্যে কোনো বাধাকে বা বাইরের লোককে বাউণ্ডারী হিসাবে গণ্য করা হয় না, যদি না আম্পায়াররা আগেই সেইরকম ঠিক করে থাকেন। আম্পায়ার বাউণ্ডারী নন কিন্তু খেলার এলাকার মধ্যে সাইট-স্ক্রীন থাকলে সেগুলিকে বাউণ্ডারী ধরতে হবে।

৫। বাউণ্ডারীর জন্য ৪ রাণ দেওয়াই প্রথা, কিন্তু যে সব হিট পরিষ্কারভাবে শূন্যে বাউণ্ডারী লাইন বা বেড়া অতিক্রম করবে সেই হিটগুলিতে ৬ রাণ দেওয়া হবে (এমন কি যদিও আগে বল কোনো ফিল্ডসম্যান ছুঁয়ে থাকে)। কিন্তু হিটের পর বল ফুল পিচে সাইট-স্ক্রীনে গিয়ে লাগলে সাধারণতঃ ৬ রাণ দেওয়া হয় না, যদি সাইট-স্ক্রীন উপরে বা ভিতরে থাকে।

৬। ওভার-থ্রো থেকে বা ফিল্ডসম্যানের ইচ্ছাকৃত কাজের ফলে বাউণ্ডারী হলে, যে রাণটি নেওয়া হচ্ছিল সেটি ধরা হবে যদি বল ছোঁড়ার বা সেই কাজের মুহূর্তে ব্যাটসম্যানদ্বয় পরস্পরকে অতিক্রম করে থাকে।

৭। বাউণ্ডারীর সঙ্কেত দিতে আম্পায়ার সামনে একটি হাত তুলে একপাশ থেকে আর একপাশ ঘোরাবেন বা বাউণ্ডারী '৬'-এর সঙ্কেত জানাতে মাথার উপর দু'টি হাতই তুলবেন।

২১। **লস্ট বল**—বল খেলার মধ্যে থাকা অবস্থায় যদি সেটিকে খুঁজে না পাওয়া যায় বা তার পুনরুদ্ধার সম্ভব না হয় তা হলে যে কোনো ফিল্ডসম্যান 'লস্ট বল' ডাকতে পারেন এবং তখন স্কোরের সঙ্গে ৬ রাণ যোগ করতে হবে, কিন্তু 'লস্ট বল' ডাকা হবার আগে ৬-এর বেশি রাণ করা হলে যতগুলি রাণ নেওয়া হয়েছে সবগুলিই স্কোরের সঙ্গে যুক্ত হবে।

২২। **ফল**—যে দলের মোট রাণ বিপক্ষের দু'টি সম্পূর্ণ ইনিংসে করা মোট রাণের বেশি হবে সেই দলই খেলায় জিতবে। একদিনের খেলায় এইরকম-ভাবে ফল হওয়া পর্যন্ত খেলা সম্পূর্ণ না হলে, প্রথম ইনিংসের ফলে মীমাংসা হবে। কোনো পক্ষ হার মেনে নিয়ে আর না খেললেও অথবা ১৭নং আইনের অধীন ক্ষেত্র অনুসারেও খেলার ফল নির্ধারিত হতে পারবে। এই সব পদ্ধতির যে কোনোটি অনুসারে খেলার মীমাংসা না হলে খেলাটি 'ড্র' হয়েছে বলে ধরা হবে।

টীকা: ১। খেলা শেষ হবার পর স্কোরের যাথার্থ্য সম্পর্কে নিজেদের সন্তুষ্ট করার দায়িত্ব অধিনায়কদের।

২। খেলার মীমাংসা হয়ে যাবার পর কোনো দলকেই খেলা চালিয়ে যেতে বাধ্য করা যায় না, যদি আম্পায়াররা মনে করেন যে, যতটা সময় বাকি আছে তাতে খেলা চালিয়ে গিয়ে আরও পরিষ্কার ফল করানোর সম্ভাবনা আছে তা হলে একদিনের খেলার মীমাংসা প্রথম ইনিংসের ফলের উপর হবে না।

৩। মীমাংসা-হওয়া খেলার ফলাফলকে রাণে জয় বলে প্রকাশ করা হয় এই ব্যতিক্রম ছাড়া—যে দল শেষে ব্যাট করেছে তারা জয়ী হবে তখনও যতগুলি উইকেট পড়তে বাকি তত উইকেটে। যে একদিনের খেলায় দ্বিতীয় ইনিংসের খেলার দ্বারা ফল নির্ধারিত হয় না, সে ক্ষেত্রেও প্রথম ইনিংসের খেলার ভিত্তিতে ফল নির্ধারিত হবার সময় যে অবস্থা থাকে তার সম্পর্কে এই নিয়ম প্রযোজ্য।

৪। 'ড্র'কে 'টাই' বলে গণ্য করা হয় যদি খেলার শেষে দু'দলের স্কোর সমান হয়, কিন্তু খেলাটি সম্পূর্ণ হলে তবেই। একদিনের খেলায় যদি দু'দলের সম্পূর্ণ প্রথম ইনিংসের স্কোর সমান হয় তা হলে সেটি 'টাই', কিন্তু ফল নির্ধারণের জন্য খেলাটিকে আরও না বাড়ানো হলে তবেই।

২৩। **ওভার**—প্রতি উইকেট থেকে পর্যায়ক্রমে ৮ বা ৬ বলের ওভারে—খেলার পূর্ব-স্বীকৃত শর্ত অনুসারে—বল দিতে হবে। নির্দিষ্টসংখ্যক বল হয়ে যাবার পরে যখন বোলারের প্রান্তের আম্পায়ার বুঝবেন যে, দু'দলই বলটিকে আর খেলার মধ্যে ধরছে না তখন পরিষ্কারভাবে 'ওভার' ডেকে আম্পায়ার

উইকেট ছেড়ে যাবেন। 'নো বল' বা 'ওয়াইড বল'কে ওভারের বলের মধ্যে ধরা হবে না।

টীকা: যুক্তরাজ্যে 'ওভার' ৬ বলের হবে—অবশ্য আগে বিপরীত কিছু চুক্তি না হয়ে থাকলে।

২৪। যে 'ওভার'টি চলছে বোলার সেটি অবশ্যই শেষ করবে যদি না সে অসমর্থ হয়ে পড়ে বা দোষযুক্ত ভাবে খেলার জন্য তাকে অপসারণ করা হয়। সে যতবার খুশি প্রান্ত পরিবর্তন করে বল করতে পারবে—মাত্র এই শর্তসাপেক্ষে যে, একই ইনিংসে পর-পর দু'ওভার বল করতে পারবে না। যেদিকের উইকেট থেকে বোলার বল করছে সেদিকের ব্যাটসম্যানকে প্রয়োজনে সে উইকেটের যে কোনও পাশে দাঁড় করাতে পারে।

২৫। **'ডেড্' বল**—বলকে 'ডেড্' গণ্য করা হবে সেটি আম্পায়ারের মতে উইকেটকীপারের বা বোলারের হাতে স্থায়িভাবে জমা পড়া মাত্র অথবা বল বাউণ্ডারীতে পৌঁছানো কিংবা শূন্যে বাউণ্ডারীর উপর দিয়ে চলে যাওয়া মাত্র; অথবা, বলটি খেলা হোক আর না-ই হোক, সেটি কোনো ব্যাটসম্যান বা আম্পায়ারের পোশাকে আটকে যাওয়া মাত্র; অথবা, আম্পায়ার 'ওভার' বা 'টাইম' ডাকা মাত্র; অথবা, কোনো ব্যাটসম্যান কোনো কারণে আউট হওয়া মাত্র; অথবা, ২১ বা ৪৪নং আইনের অধীনে কোনো দণ্ড হওয়া মাত্র। দোষযুক্ত খেলার ক্ষেত্রে, ৪৬ নং আইন অনুযায়ী, বা কোনো খেলোয়াড়ের বড় রকমের আঘাতের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে অথবা স্ট্রাইকার বোলারের কাছ থেকে বল পাবার আগে খেলা থামাবার প্রয়োজন মনে করলে আম্পায়ার 'ডেড্, বল ডাকবেন। বোলার বল করার জন্য দৌড় আরম্ভ বা বোলিং-এর কাজ আরম্ভ করলে বলের 'ডেড্' অবস্থার অবসান ঘটবে।

টীকা: ১। বল 'স্থায়িভাবে জমা পড়েছে' কিনা সেটা একটি ঘটনার প্রশ্ন এবং শুধু আম্পায়ারই এ-সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবেন।

২। স্ট্রাইকার বোলারের কাছ থেকে কোনো বল পাবার আগেই আম্পায়ার ন্যায়সঙ্গতভাবে খেলা স্থগিত রাখতে পারেন নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রগুলির যে কোনোটিতে:

(এক) যদি তিনি নিশ্চিত হন যে, কোনো উপযুক্ত কারণে স্ট্রাইকার বলের মুখোমুখি হবার জন্য প্রস্তুত হয়নি এবং বল খেলার কোনো চেষ্টাও করেনি;

(দুই) যদি দেবার আগে বলটি বোলারের হাত থেকে আকস্মিকভাবে পড়ে যায়, অথবা যদি বলটি কোনো কারণে তার হাত থেকে না বেরোয়;

(তিন) যদি বোলারের কাছ থেকে বল পাবার আগে স্ট্রাইকারের উইকেটের একটি বা দু'টি বেল পড়ে যায়।

এইসব ক্ষেত্রে সবশেষে খেলার মধ্যে আসার সময় থেকে বল 'ডেড্' ধরা হয়।

৩। বল আম্পায়ারকে আঘাত করলে (অবশ্য তাঁর পোশাকে আটকে না গেলে), উইকেট ভেঙে গেলে বা ফেলে দেওয়া হলে (অবশ্য তাতে কোনও ব্যাটসম্যান আউট না হলে) বা আউটের আবেদন নিষ্ফল হলে বল 'ডেড্' হয় না।

৪। এই আইন এবং অন্যান্য আইনের প্রয়োজনে 'পোশাক' শব্দটির মধ্যে খেলোয়াড়রা এবং আম্পায়াররা যেসব সাজ-সরঞ্জাম এবং পরিচ্ছদ সাধারণতঃ পরে সেগুলি অন্তর্ভুক্ত।

২৬। **নো বল**—ডেলিভারী নির্দোষ হতে হলে বলটি অবশ্যই সঠিকভাবে ব্যাটসম্যানের কাছে ক্ষেপণ করতে হবে, ছুঁড়লে চলবে না। দুই আম্পায়ারের কেউ এই ব্যাপারে ডেলিভারীর পূর্ণ দোষহীনতা সম্পর্কে পুরোপুরি সন্তুষ্ট না হতে পারলে তিনি ডেলিভারীর সঙ্গে সঙ্গেই 'নো বল' ডাকবেন এবং সঙ্কেতিত করবেন। **বোলারের উইকেটের প্রান্তের আম্পায়ার 'নো বল' ডাকবেন এবং সঙ্কেতিত করবেন যদি ডেলিভারী-মুহূর্তের পদক্ষেপে বোলারের সামনের পায়ের পাতার কিছু না কিছু অংশ পপিং ক্রীজের পিছনে মাটিতে বা শূন্যে না থাকে, কিংবা, বোলারের পিছনের পা রিটার্ণ ক্রীজের বা তা সম্মুখের দিকের বিস্তৃতির মধ্যে থাকা এবং কোনোটিকেই ছুঁয়ে না থাকা সম্পর্কে যদি তিনি সন্তুষ্ট না হন।**

টীকা: ১। আম্পায়াররা অবশ্যই নিঃসন্দিগ্ধভাবে সন্তুষ্ট হবেন যে, বলটি সঠিকভাবে ক্ষেপণ করা হয়েছে যদি তাঁদের সেই সন্তুষ্টি আসে, তা হলে আর কোনো কথাই উঠছে না।

২। স্ট্রাইকারের জানার অধিকার আছে বোলার কীভাবে বল করবে—'ওভার দি উইকেট' না 'রাউণ্ড দি উইকেট', 'ওভার আর্ম' না 'আণ্ডার আর্ম', ডান হাতে না বাম হাতে। না জানিয়ে

ডেলিভারীর কায়দার পরিবর্তন করলে আম্পায়ার সেটিকে 'অন্যায়' মনে করতে পারেন, এবং তা করলে তিনি 'নো বল' ডাকবেন।

৩। যদি ডেলিভারীর আগেই বোলার স্ট্রাইকারের উইকেট লক্ষ্য করে বল ছুঁড়ে দেয়, এমন কি তাকে রাণ-আউট করার চেষ্টাতেও, তাহলে সেটি নো বল। (৪৬নং আইনের ৪নং টীকার 'vii' অংশ দ্রষ্টব্য।)

৪। ডেলিভারীর মধ্যে যদি বোলার শরীরের কোনো অংশ দিয়ে নিকটতর উইকেট ভেঙে ফেলে তাহলে শুধু সেই কাজটির জন্যই নো বল হয় না।

৫। আম্পায়ার একটি বাহু আড়াআড়িভাবে প্রসারিত করে নো বল সঙ্কেতিত করবেন।

৬। দুই আম্পায়ারের যে কোনো একজনের মতে বল হস্তচ্যুত হওয়ার ঠিক আগেই ডেলিভারীর যে পর্বে হাতটি ঘুরিয়ে উপর দিকে তোলা হয়, সেই পর্বে যদি বল করার বাহুটি সোজা হয়ে যায়, আংশিকভাবেই হোক বা সম্পূর্ণভাবেই হোক, তা হলে বলটি ছোঁড়া হয়েছে বলে ধরা হবে।

এই সংজ্ঞা বোলারকে ডেলিভারীকালীন হাত ঘোরানোর মধ্যে কব্জির ব্যবহার থেকে নিবৃত্ত করতে পারবে না।

২৭। 'নো বল' ডাকা হলেই বলটি 'ডেড্' হয়ে যায় না। স্ট্রাইকার নো বল মারতে পারে এবং তার ফলে যতগুলি রাণই হোক সব তার স্কোরের সঙ্গে যুক্ত হবে, কিন্তু অন্যভাবে নো বল থেকে যে-সব রাণ হয় স্কোরে সেগুলি নো বল হিসাবে লিখতে হবে এবং কোনো রাণ না হলে স্কোরে এক রাণ লিখতে হবে। নো বল থেকে স্ট্রাইকার আউট হবে যদি সে ৩৭নং আইন ভঙ্গ করে, এ ছাড়া, যে কোনো ব্যাটসম্যানকে রাণ-আউট করা যাবে অথবা ৩৬নং বা ৪০নং আইন ভঙ্গ করলে তাকে আউট দেওয়া যাবে।

টীকা: ১। নো বল থেকে অন্য কোনো রাণ না হলে শুধু নো বলের জন্য জরিমানাটুকুই স্কোরে লেখা হবে।

২। বল ডেলিভারীর আগেই রাণ নেওয়ার চেষ্টার বিষয়ে ৪৬নং আইনের ৪নং টীকার (vii) অংশের মধ্যেই আসছে। কিন্তু

যদি নন-স্ট্রাইকার অন্যায়ভাবে খুব তাড়াতাড়ি তার জায়গা ছেড়ে বেরোয় তা হলে ফিল্ডিং-পক্ষ কোনো স্বীকৃত পদ্ধতিতে বোলারের প্রান্তে তাকে রাণ-আউট করতে পারে। বোলার কাছের উইকেটে বল ছুঁড়ে দিলে আম্পায়ার নো বল ডাকবেন না, যদিও এই ছুঁড়ে দেওয়ার ফলে রাণ হলে সেগুলি স্কোরে লিখতে হবে। থ্রো-টি অবশ্য ওভারের মধ্যে ধরা হবে না।

২৮। **ওয়াইড বল**—বোলার যদি উইকেটের এমন উপর দিয়ে বা এমন বাইরে দিয়ে বল করে যে, আম্পায়ারের মতে তা স্ট্রাইকারের নাগালের বাইরে চলে যায় এবং সে স্বাভাবিকভাবে উইকেট গার্ড নিয়ে দাঁড়ালে বলটি তার নাগালে আসতো না, তা হলে বলটি স্ট্রাইকারকে অতিক্রম করা মাত্র আম্পায়ার ওয়াইড বল ডাকবেন এবং সঙ্কেতিত করবেন।

টীকা ঃ ১। ঠিকভাবে ডেলিভারী করা হয়েছে বলে আম্পায়ার মনে করেন এমন কোনো বল যদি স্ট্রাইকারের সামনে এসে জমে যায় তা হলে 'ওয়াইড' ডাকা হবে না এবং স্কোরেও কোনো রাণ যোগ করা হবে না, যদি না স্ট্রাইকার সেই বল মারার ফলে রাণ হয়—ফিল্ডিং-পক্ষের কাছ থেকে বাধা না পেয়ে এ কাজ করার অধিকার স্ট্রাইকারের আছে। ফিল্ডিং-পক্ষ বাধা সৃষ্টি করলে বলটি যেখানে জমে গিয়েছিল সেখানে বলটিকে রেখে দেবার এবং ডেলিভারীর আগে ফিল্ডসম্যানরা যে যেখানে ছিল সেই সেই জায়গায় তাদের দাঁড়াবার নির্দেশ আম্পায়ার দিতে পারবেন।

২। উভয় বাহু আড়াআড়িভাবে প্রসারিত করে আম্পায়ার 'ওয়াইড' বলের সঙ্কেত দেবেন।

৩। 'ওয়াইড' ডাকা বল স্ট্রাইকার হিট করলে আম্পায়ার ডাকটি প্রত্যাহার করে নেবেন।

২৯। 'ওয়াইড বল' ডাকের সঙ্গে সঙ্গেই বলটি 'ডেড' হয়ে যায় না। ওয়াইড বল থেকে যত রাণ হবে সব ওয়াইড বল হিসাবে স্কোরে লিখতে হবে, কিংবা কোনো রাণ না হলে ঐ হিসাবে এক রাণ লিখতে হবে। ওয়াইড বল থেকে স্ট্রাইকার আউট হবে যদি সে ৩৮নং বা ৪২নং আইন ভঙ্গ করে, যে কোনো ব্যাটসম্যানকে রাণ-আউট করা যাবে কিংবা কেউ ৩৬নং বা ৪০নং আইন ভঙ্গ করলে তাকে আউট দেওয়া যাবে।

৩০। **বাই ও লেগ বাই**—'ওয়াইড' বা 'নো বল' ডাকা হয়নি এমন কোনো বল যদি স্ট্রাইকারের ব্যাট বা শরীরের কোনো অংশ না ছুঁয়ে তাকে অতিক্রম করে যায় এবং কোনো রাণ হয় আম্পায়ার 'বাই' ডাকবেন বা সঙ্কেতিত করবেন ; কিন্তু যদি বলটি স্ট্রাইকারের পোশাকে বা ব্যাট-ধরা-হাত বাদে তার শরীরের কোনো অংশ ছুঁয়ে যায় এবং কোনো রাণ হয় তাহলে আম্পায়ার 'লেগ বাই' ডাকবেন বা সঙ্কেতিত করবেন ; এই সব রাণকে যথাক্রমে 'বাই' এবং 'লেগ বাই' হিসাবে স্কোরে লিখতে হবে।

টীকা ঃ ১। 'লেগ বাই' হবে মাত্র তখনই যদি আম্পায়ারের মতে স্ট্রাইকার (এ) ব্যাট করে বলটি খেলার চেষ্টা করেছে, অথবা, (বি) বলটি থেকে আঘাত এড়াতে চেষ্টা করেছে। (এ) বা (বি)-তে বর্ণিত উপায় ছাড়া অন্য কোনও ভাবে স্ট্রাইকারের দেহে লেগে বলের গতিপথ পরিবর্তিত হলে, একটি রাণ সম্পূর্ণ হওয়া বা বলটি বাউণ্ডারীতে পৌছানো মাত্রই আম্পায়ার 'ডেড্ বল' ডাকবেন এবং এই ধরনের রাণ বাতিল হবে।

২। আম্পায়ার খোলা একটি হাত মাথার উপর তুলে 'বাই' এবং একটি হাঁটু তুলে তা হাত দিয়ে ছুঁয়ে 'লেগ বাই' সঙ্কেতিত করবেন।

৩১। **দি উইকেট ইজ ডাউন**—বল অথবা স্ট্রাইকারের ব্যাট বা শরীর স্টাম্পের উপর থেকে যে কোনও একটি বেল সম্পূর্ণভাবে সরিয়ে দিলে কিংবা, দু'টি বেলই আগে থেকে না থাকলে, যদি একটি স্টাম্পকে আঘাত করে ভূমিচ্যুত করে তা হলে উইকেট 'ডাউন' ধরা হবে। উইকেট ডাউন করবার জন্যে যে কোনো খেলোয়াড় তার হাত বা বাহু ব্যবহার করতে পারে, কিংবা আগে থেকেই বেল দু'টি না থাকলেও, একটি স্টাম্প উপড়ে ফেলতে পারে, অবশ্য এ-ক্ষেত্রে সব সময়েই কাজে-লাগানো হাতে বা দু'হাতে বলটি ধরে থাকা চাই।

টীকা ঃ ১। একটি বেল মাত্র নড়ে উঠলেই উইকেট 'ডাউন' হয় না, 'ডাউন' হয় যদি একটি বেল উইকেট থেকে পড়ে যে কোনো দু'টি স্টাম্পের মধ্যে আটকে যায়।

২। যদি আগে থেকেই একটি বেল না থাকে, তবে এই আইনের প্রয়োজন মেটাতে বর্ণিত যে কোনো উপায়ে অবশিষ্টটিকে

স্থানচ্যুত করলে বা তিনটি স্টাম্পের কোনো একটিকে আঘাত করে ভূমিচ্যুত করলেই যথেষ্ট।

৩। জোর বাতাসের জন্যে যদি অধিনায়করা বেল ব্যবহার না করেই খেলতে রাজী হয়ে থাকেন (৮নং আইনের ২য় টীকা দ্রষ্টব্য) তাহলে কখন উইকেট ডাউন হয় সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত দুই আম্পায়ারের একজন তাঁদের সামনে হওয়া ঘটনার ভিত্তিতে নেবেন। এই সব ক্ষেত্রে কোনো স্টাম্পকে আঘাত করে ভূমিচ্যুত করা না হলেও উইকেট 'ডাউন' বলে ধরা হবে।

৪। যদি বল খেলার মধ্যে থাকা অবস্থায় উইকেট ভেঙে ফেলা হয় তা হলে যতক্ষণ না বল 'ডেড' হচ্ছে সে পর্যন্ত আম্পায়ারের কাজ নয় সেই উইকেট যথাবিধি সাজিয়ে দেওয়া; তবে এসব ক্ষেত্রে কোনো ফিল্ডস্‌ম্যান উইকেট সাজিয়ে নিতে পারে।

৫। এই এবং অন্যান্য আইনের প্রয়োজনে 'শরীর' শব্দটির মধ্যে খেলোয়াড়ের পোশাকও, ২৫নং আইনের ৪র্থ টীকায় যেভাবে তার সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, ধরতে হবে।

৩২। **আউট অব হিজ গ্রাউণ্ড**—ব্যাটসম্যানকে 'আউট অব হিজ গ্রাউণ্ড' ধরা হবে যদি না তার হাতে থাকা ব্যাটের বা শরীরের কোনো অংশ পপিং ক্রীজের পিছনে মাটির উপর রাখা থাকে।

৩৩। **ব্যাটসম্যান রিটায়ারিং**—কোনো ব্যাটসম্যান যে কোনো সময় অপসৃত হতে পারে, কিন্তু বিপক্ষের অধিনায়কের সম্মতি ছাড়া তার ইনিংস আবার শুরু করতে পারবে না, এবং সে ক্ষেত্রেও, কোনো উইকেট পড়ার পর মাত্র।

টীকা: যখন কোনো ব্যাটসম্যান অসুস্থতা, আঘাত বা অন্য কোনো অনিবার্য কারণে অপসৃত হয়েছে, তার ইনিংস 'রিটায়ার্ড নট আউট' হিসাবে লিখতে হবে; কিন্তু অন্যথায় সম্পূর্ণ করা হলে সেটিকে 'রিটায়ার্ড আউট' হিসাবে লিখতে হবে।

৩৪। **বোল্ড**—স্ট্রাইকার 'বোল্ড' আউট হবে—যদি বল করে উইকেট 'ডাউন'* করে দেওয়া যায়, এমন কি বল প্রথমে তার ব্যাট বা শরীর স্পর্শ করে থাকলেও।

---

*বলা বাহুল্য, এক্ষেত্রে অন্ততঃ একটি বেল উইকেটচ্যুত হতে হবে। ৩১নং আইন দ্রষ্টব্য। আসলে ৩৪নং আইনটি ৩১নং আইনের অধীন। 'ডাউন' শব্দটির প্রয়োগ ঐ উদ্দেশ্যেই করা হয়েছে।

টীকা: ১। স্ট্রাইকার বলটি খেলার পর যদি স্ট্রোক সম্পূর্ণ হবার আগেই সেটিকে লাথি মেরে বা হিট করে সোজা উইকেটে পাঠিয়ে দেয় তাহলে সে 'বোল্ড' আউট হবে।

২। যদি বল স্ট্রাইকারের শরীরে লেগে তার গতিপথ পরিবর্তন করে উইকেটে যায়, তা হলে স্ট্রাইকার 'বোল্ড' আউট হবে, যদিও সেক্ষেত্রে তার বিরুদ্ধে ৩৯নং আইন অনুসারে এল. বি. ডব্লিউ.-এর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাও যুক্তিযুক্ত হবে।

৩৫। **কট্**—স্ট্রাইকার 'কট্' আউট হবে—বলটি ব্যাটে খেলার পর বা কব্জি ছাড়া ব্যাট-ধরা-হাতে লাগার পর মাটি স্পর্শ করার আগেই যদি কোনো ফিল্ডসম্যান সেটি ধরে ফেলে, এমন কি বলটি যদি সে শরীরের সঙ্গে জড়িয়ে ধরে, বা তার পোশাকে আকস্মিকভাবে আটকে যায় তাহলেও। ক্যাচ সম্পূর্ণ হওয়ার মুহূর্তে অবশ্যই ফিল্ডসম্যানের উভয় পায়ের পাতা পুরোপুরিভাবে খেলার এলাকার মধ্যে থাকতে হবে।

টীকা: ১। ক্যাচ ঘটাতে গিয়ে যে হাতে বল ধরা হয়েছে সে হাতটি মাটি স্পর্শ করতে পারে, বলটি না করলেই হলো।

২। বলটি মাটি স্পর্শ করেছে বা বাউণ্ডারী-লাইনের উপর দিয়ে বয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এ ঘটনা আম্পায়ার সঙ্গতভাবে অগ্রাহ্য করতে পারবেন যদি ক্যাচটি প্রকৃতপক্ষে এই ব্যাপারের আগে সম্পূর্ণ হয়ে থাকে।

৩। বলটি স্ট্রাইকারের ব্যাট স্পর্শ করার আগে বা পরে তার শরীর স্পর্শ করেছে, এই ঘটনা ক্যাচকে অসিদ্ধ করে দেয় না।

৪। ফিল্ডসম্যান একেবারেই হাতে করে বল না ছুঁলেও স্ট্রাইকার 'কট্' হতে পারে, এর মধ্যে উইকেটকীপারের প্যাডে বল আটকে যাওয়াও আছে।

৫। খেলার এলাকার মধ্যে দাঁড়ানো ফিল্ডসম্যান বল ধরার জন্যে কোনো বাউণ্ডারীতে ঠেস দিতে পারে এবং বলটি বাউণ্ডারী সীমানা পার হয়ে গেলেও তা করা চলবে।

৬। স্ট্রাইকার আইনসম্মতভাবে বলটি দ্বিতীয়বার খেলে থাকলেও*

---

*৩৭নং আইন দ্রষ্টব্য।

তাকে এই আইন অনুযায়ী আউট করা যেতে পারে, **অবশ্য যদি** প্রথম বার মারার পর বলটি মাটি স্পর্শ না করে থাকে।

৭। স্ট্রাইকারের মারা বলটি খেলার এলাকার মধ্যে কোনো বাধায় লাগলে তার পরেও তাকে কট্ করা যেতে পারে, অবশ্য যদি বাধ'টিকে আগে থেকেই বাউণ্ডারী হিসাবে ধরে নেওয়া না হয়ে থাকে।

৩৬। **হ্যাণ্ডলড্ দি বল**—দুই ব্যাটসম্যানের যে কেউ 'হ্যাণ্ডলড্ দি বল' আউট হবে—যদি সে বলটি খেলার মধ্যে থাকা অবস্থায় সেটিকে হাত দিয়ে স্পর্শ করে; অবশ্য কাজটি বিপক্ষের অনুরোধে করা হয়ে থাকলে নয়।

টীকা: ১। যে হাতে ব্যাট ধরা আছে ৩৬, ৩৭ এবং ৩৯নং আইনগুলির প্রয়োজনে ব্যাটকে সেই হাতের অংশ বলে ধরা হবে।

২। কোনো ব্যাটসম্যানকে এই আইনবলে আউট দেওয়া হলে, সঠিকভাবে লিখতে গেলে স্কোর-বুকে 'হ্যাণ্ডলড্ দি বল' লিখতে হবে; এবং উইকেটটির জন্য বোলার কৃতিত্ব পাবে না।

৩৭। **হিট দি বল টোয়াইস**—স্ট্রাইকার 'হিট দি বল টোয়াইস' আউট হবে—যদি তার শরীরের কোনো অংশ দিয়ে বলটিকে আঘাত করার বা থামানোর পর সে একমাত্র তার উইকেট বাঁচানো ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে বলটিকে ইচ্ছা করে আবার মারে; ব্যাট দিয়ে কিংবা শরীরের হাত ছাড়া অপর কোনও অংশ দিয়ে সে উইকেট বাঁচানোর কাজটি করতে পারবে। 'ওভার-থে_া'-এর জন্য যে রাণগুলি হবে সেগুলি ছাড়া বৈধভাবে দু'বার মারা বল থেকে কোনও রাণ নেওয়া যাবে না।

টীকা: ১। দ্বিতীয়বার বলটিকে উল্লেখিতভাবে মারাটা বৈধ হয়েছে কি হয়নি সেটা আম্পায়ারেরই বিচার্য। রাণ নেওয়ার চেষ্টা করা হলে—ব্যাপারটিকে আম্পায়ার ব্যাটসম্যানের দ্বিতীয় মারের সুযোগ নেবার অভিপ্রায়ের প্রমাণ বলে ধরে নিতে পারেন, যদিও সেটাই চূড়ান্ত নয়।

২। দ্বিতীয়বার বল মারতে যাওয়াটা যদি ক্যাচ করতে উদ্যত উইকেটকীপার বা অন্য কোনো ফিল্ডসম্যানের বাধা হয়, তাহলে ব্যাটসম্যান সে চেষ্টা করবে না।

৩ বল খেলার পর স্ট্রাইকার বিপক্ষ কর্তৃক অনুরুদ্ধ না হয়ে যদি

বলটি ব্যাট করে মেরে কোনো ফিল্ডসম্যানকে ফেরৎ দেয় তাহলে এই আইন লঙ্ঘিত হচ্ছে।

৪। এই আইনবলে স্ট্রাইকারকে আউট দেওয়া হলে, স্কোর-বুকে সঠিক হিসাব লিখতে হবে 'হিট দি বল টোয়াইস' এবং উইকেটটির জন্য বোলার কৃতিত্ব পাবে না।

৩৮। **হিট উইকেট**—স্ট্রাইকার 'হিট উইকেট' আউট হবে—যদি সে নিম্নলিখিত অবস্থায় তার ব্যাট বা তার শরীরের কোনো অংশ দিয়ে আঘাত করে তার উইকেটটি ভেঙে ফেলে: (এক) যে কোনো সময়েই, বলটি খেলতে গিয়ে; (দুই) বলটি খেলার অব্যবহিত পরেই তার প্রথম রাণের উদ্দেশ্যে উইকেট ছেড়ে বেরোতে গিয়ে।

টীকা: ১। 'বলটি খেলতে গিয়ে'-র মধ্যে উইকেট থেকে বল দূরে রাখার জন্যে ব্যাটসম্যানের দ্বিতীয়বার বল মারাকেও ধরতে হবে।

২। ব্যাটসম্যানের পোশাকের যে কোনো অংশ তার শরীরের অংশ বলে গণ্য হবে।

৩। রাণ-আউট বা স্টাম্পড্ হওয়া এড়াতে গিয়ে যদি কোনো ব্যাটসম্যান তার উইকেট ভেঙে ফেলে তাহলে সে 'নট আউট' থাকবে।

৪। যদি কোনো ঘটনার দরুন বল ডেলিভারী না হয়, তাহলে ব্যাটসম্যানকে হিট উইকেট আউট ঘোষিত করার সিদ্ধান্তটি সংশোধন করার সুযোগ আম্পায়ারকে দিতে হবে।

৩৯। **এল. বি. ডব্লিউ**—স্ট্রাইকার 'লেগ বিফোর উইকেট' আউট হবে—যদি উইকেট-থেকে-উইকেট টানা সরলরেখার* মধ্যে তার শরীরের হাত ছাড়া অপর কোনো অংশ থাকতে থাকতে তাই দিয়ে সে এমন এক বলের গতিরোধ করে যা প্রথমে তার ব্যাট বা হাত স্পর্শ করেনি ও আম্পায়ারের মতে যা বোলারের উইকেট থেকে স্ট্রাইকারের উইকেট পর্যন্ত সরলরেখায় পড়ত বা পড়বে বা স্ট্রাইকারের উইকেটের অফের দিকে পড়বে, এবং যদি সব ক্ষেত্রেই বলটি উইকেটে গিয়ে আঘাত করত তা হলে, এমন কি বলটির সঙ্গে শরীরের সংঘর্ষ বেল ছাড়িয়ে উঁচুতে হলেও।

* বলা বাহুল্য, এটা কাল্পনিক। এরকম কোনো রেখা নেই।

টীকা : ১। এই আইনে 'হাত' শব্দটি 'ব্যাট-ধরা হাত' অর্থে বুঝতে হবে। যদি আম্পায়ার মনে করেন যে, স্ট্রাইকার তার ব্যাট দিয়ে বলটি খেলার কোনো আন্তরিক চেষ্টা করেনি, তাহলে আবেদন করা হলে তিনি স্ট্রাইকারকে এল. বি. ডব্লিউ. আউট দেবেন—যদি তিনি সন্তুষ্ট হন যে, বলটি অফ-স্টাম্পের বাইরে পড়লেও স্টাম্পে গিয়ে লাগত এবং যদিও বলের গতিরোধ অফ-স্টাম্পের বাইরেই করা হয়েছিল।

২। যদি নিম্নলিখিত চারটি প্রশ্নেরই উত্তর ইতিবাচক হয় তবেই কোনো ব্যাটসম্যানকে এই আইনবলে আউট দেওয়া যাবে—(এক) বলটি কি উইকেটে লাগত? (দুই) বলটি কি উইকেট-থেকে-উইকেট টানা সরলরেখার উপরে পড়েছিল (এবং এর মধ্যে স্ট্রাইকার কর্তৃক গতিরুদ্ধ হয়েছে এমন ফুলপিচ বলও ধরতে হবে), কিংবা বলটি স্ট্রাইকারের উইকেটের অফের দিকে পড়েছিল? (তিন) যা প্রথমে বলটির গতিরোধ করেছিল তা কি স্ট্রাইকারের হাত ছাড়া শরীরের অন্য কোনো অংশ? (চার) সংঘর্ষের বিন্দুর উচ্চতা যা-ই হোক না কেন, সংঘর্ষের মুহূর্তে স্ট্রাইকারের শরীরের সেই অংশটি কি উইকেট-থেকে-উইকেট টানা সরলরেখার মধ্যে ছিল?

৪০। **অবস্ট্রাক্টিং দি ফিল্ড**—উভয় ব্যাটসম্যানের যে কেউ 'অবস্ট্রাক্টিং দি ফিল্ড' আউট হবে—যদি সে ইচ্ছা করে বিপক্ষকে বাধা দেয়; যে কোনো ব্যাটসম্যানের দ্বারা এই ধরনের ইচ্ছাকৃত বাধাদানের ফলে যদি বল লোফার কাজ ব্যাহত হয়, তা হলে আউট হবে স্ট্রাইকার।

টীকা : ১। বাধাদান 'ইচ্ছাকৃত' ছিল কিনা তা অবশ্যই আম্পায়ার স্থির করবেন। বল ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছে, এমন সময় ছুটতে গিয়ে যদি ব্যাটসম্যান অনিচ্ছাকৃতভাবে বলের গতিরোধ করে ফেলে, তবে সেটা অপরাধ হবে না।

২। এই আইনবলে ব্যাটসম্যানকে আউট দেওয়া হলে স্কোর-বুকে সঠিক হিসাব লিখতে হবে 'অবস্ট্রাক্টিং দি ফিল্ড' এবং উইকেটের জন্য বোলার কৃতিত্ব পাবে না।

৪১। **রান-আউট**—দুই ব্যাটসম্যানের যে কেউ 'রান-আউট' হয়ে

আউট হবে যদি দৌড়বার সময় বা বল খেলার মধ্যে থাকতে থাকতে যে কোনো সময় সে 'আউট অব হিজ গ্রাউণ্ড' হয়ে যায় এবং বিপক্ষের কোনো খেলোয়াড় তার উইকেট ভেঙে দেয়। দুই ব্যাটস্‌ম্যান পরস্পরকে অতিক্রম করে থাকলে ভেঙে-দেওয়া উইকেটের উদ্দেশ্যে যে দৌড়য় সে রাণ-আউট, তারা অতিক্রম না করে থাকলে ভেঙে-দেওয়া উইকেটটি যে ছেড়ে এসেছে সে রাণ-আউট। কিন্তু স্ট্রাইকার যদি রাণ নেবার চেষ্টা না করে তাহলে ৪২নং আইনে বর্ণিত অবস্থায় তাকে 'রাণ-আউট' দেওয়া যাবে না, এমন কি নো বল ডাকা না হলেও।

টীকা: ১। যদি বলটি খেলার ফলে উল্টোদিকের উইকেটে গিয়ে লাগে, কোনো ব্যাটস্‌ম্যানই রাণ-আউট হবে না, যদি না বল লেগে উইকেটটি ভাঙবার আগে কোনো ফিল্ডসম্যান বলটি স্পর্শ করে থাকে।

৪২। **স্টাম্পড্**—স্ট্রাইকার 'স্টাম্পড্' আউট হবে—যদি নো বল নয়, ডেলিভারী করা এমন কোনো বল পেতে গিয়ে সে রাণ করার চেষ্টা করা ছাড়া অন্যভাবে 'আউট অব হিজ গ্রাউণ্ড' হয়ে যায়, এবং অপর ফিল্ডস্‌ম্যানের হস্তক্ষেপ ছাড়াই উইকেটকীপার উইকেট ভেঙে দেয়। যখন বলটি স্ট্রাইকারের ব্যাট বা শরীর স্পর্শ করবে, মাত্র তখনই উইকেটকীপার ঐ উদ্দেশ্যে বলটি উইকেটের সামনে থেকে নিতে পারবে।

টীকা: ১। যদি উইকেটকীপারের শরীরে প্রতিহত হয়ে ফিরে এসে বল উইকেট ভেঙে দেয় তা হলেও স্ট্রাইকার 'স্টাম্পড্ আউট' হতে পারবে।

৪৩। **উইকেটকীপার**—যতক্ষণ না বোলারের ডেলিভারী করা বল স্ট্রাইকারের ব্যাট বা শরীর স্পর্শ করছে বা উইকেট ছাড়িয়ে চলে যাচ্ছে বা যে পর্যন্ত না স্ট্রাইকার রাণ নিতে চেষ্টা করছে ততক্ষণ উইকেটকীপার পুরোপুরি-ভাবে উইকেটের পিছনে থাকবে। যদি উইকেটকীপার এই আইন লঙ্ঘন করে তা হলে স্ট্রাইকার আউট হবে না, ৩৬, ৩৭, ৪০ ও ৪১নং আইনবলে ছাড়া, এবং সে ক্ষেত্রেও শুধু ৪৬নং আইনসাপেক্ষে।

টীকা: ১। স্ট্রাইকারের বল খেলার এবং উইকেটকীপারের কাছ থেকে বাধা না পেয়ে উইকেট রক্ষা করার অধিকার সুরক্ষিত করার জন্যেই এই আইনের ব্যবস্থা। যদি বৈধভাবে তার উইকেট রক্ষা

করতে গিয়ে স্ট্রাইকার উইকেটকীপারের কাজে বাধা দেয় তা হলে তাকে দণ্ড দেওয়া যাবে না, অবশ্য ৩৭নং আইনের ২নং টীকায় বর্ণিত ব্যবস্থায় ছাড়া।

৪৪। **ফিল্ডসম্যান**—ফিল্ডসম্যান শরীরের যে কোনো অংশ দিয়ে বল থামাতে পারবে, কিন্তু যদি সে ইচ্ছাকৃতভাবে অন্য কোনো উপায়ে বল থামায়, তবে আগেই যে বা যে-সব রাণ হয়েছে তার সঙ্গে পাঁচ রাণ যুক্ত করতে হবে, কোনো রাণ না হয়ে থাকলে হিসাবে পাঁচ রাণ লেখা হবে। যদি স্ট্রাইকার বলটি মেরে থাকে তবে জরিমানার রাণ তার স্কোরে যুক্ত হবে, কিন্তু অন্যথায় তা ক্ষেত্রানুসারে বাই, লেগ বাই, নো বল, ওয়াইডের স্কোরে যুক্ত হবে।

টীকা: ১। বল ফিল্ড করার উদ্দেশ্যে ফিল্ডসম্যান তার ক্যাপ ইত্যাদি ব্যবহার করবে না।

২। রাণ পাঁচটি জরিমানা হিসাবে, সুতরাং ব্যাটস্‌ম্যানদের প্রান্ত পরিবর্তন করতে হবে না।

৩। বোলারের ডেলিভারী মুহূর্তে পপিং ক্রীজের পিছনে অনসাইড ফিল্ডারের সংখ্যা দু'য়ের বেশি হবে না। ফিল্ডিং-পক্ষ এই আইন লঙ্ঘন করলে স্কোয়ারলেগ আম্পায়ার নো বল ডাকবেন।*

(ই) আম্পায়ারদের কর্তব্য

৪৫। ইনিংসের জন্য টসের আগে, আম্পায়াররা কোনো 'বিশেষ বিধি' থাকলে সেগুলি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হয়ে নেবেন এবং খেলার পরিচালনাকে প্রভাবিত করে এ-রকম অন্য শর্তাদি সম্পর্কে উভয় অধিনায়কের সঙ্গে একমত হয়ে নেবেন; উইকেটগুলি ঠিকভাবে তৈরি করা হয়েছে কি না এ বিষয়ে

* প্রস্তাবিত নূতন আইনে 'লেগে' সর্বাধিক পাঁচজন ফিল্ডারের কথা বলা হয়েছে। অবশ্য, এই আইন শেষ পর্যন্ত গৃহীত হবেই—একথা জোর করে বলা যায় না। আইনটি নিয়ে এখনও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে।

নিজেদের সন্তুষ্ট করবেন, এবং খেলার সময় কোন্ হাত-ঘড়ি বা বড় ঘড়ি অনুসরণ করা হবে সে সম্পর্কে নিজেরা একমত হবেন।

টীকা : ১। 'বিশেষ বিধি' ছাড়াও, আইনের কাঠামোর মধ্যেই খেলার অন্য অনেক শর্ত প্রায়ই দরকার হয়ে পড়ে, যেমন খেলার সময়, বিরতি ইত্যাদি।

২। কোন্ ঘড়ি বা হাত-ঘড়ি অনুসারে খেলার সময় অনুসরণ করা হবে তা জানবার অধিকার অধিনায়কদের আছে।

৪৬। খেলার আগে এবং মধ্যে আম্পায়াররা এ-বিষয় নিশ্চিত করবেন যে, খেলার পরিচালনা এবং ব্যবহৃত সরঞ্জামাদি যেন যথাযথভাবে আইন-অনুযায়ী হয়, খেলা নির্দোষ না দোষযুক্ত, তা বিচার করবেন তাঁরাই, সিদ্ধান্ত গ্রহণ তাঁদের উপর ছেড়ে দেওয়া হলে মাঠের, আবহাওয়ার এবং খেলার জন্য আলোর উপযুক্ততা সম্পর্কে তাঁরাই শেষ কথা বলার অধিকারী; সমস্ত বিরোধের মীমাংসা করবেন তাঁরা এবং তাঁরা একমত হতে না পারলে স্থিতাবস্থাই চলবে। প্রতি দল একটি করে ইনিংস নেওয়ার পর আম্পায়াররা পরস্পর প্রান্ত-পবিবর্তন করে নেবেন।

টীকা : ১। আম্পায়ার দাঁড়াবেন এমন জায়গায় যেখান থেকে তিনি যে কোনো ব্যাপার সব চেয়ে ভালোভাবে দেখতে পান, যাব ভিত্তিতে তাঁর সিদ্ধান্ত প্রয়োজন হতে পারে। সর্বথা প্রযোজ্য এই বিবেচনা সাপেক্ষে বোলারের প্রান্তের আম্পায়ার এমন জায়গায় দাঁড়াবেন যেখানে তিনি বোলারের দৌড়ে আসা বা স্ট্রাইকারের দেখা, কোনোটিরই ব্যাঘাত ঘটাবেন না। অপর আম্পায়ার যদি পিচের লেগের দিকের বদলে অফে দাঁড়াতে ইচ্ছা করেন, তিনি ফিল্ডিং-দলেব অধিনায়কের অনুমতি নেবেন এবং ব্যাটসম্যানকে জানাবেন।

২। আম্পায়াররা অবশ্যই খেলোয়াড়দের বা দর্শকদের আচরণের দ্বারা তাঁদের আইনানুগ সিদ্ধান্তগুলি প্রভাবিত হতে দেবেন না।

৩। সংশ্লিষ্ট আইনগুলিব টীকার মধ্যেই আম্পায়ারদের সঙ্কেতবিধি দেওয়া হয়েছে; কিন্তু, খেলোয়াড় এবং স্কোরারকে জানাবার জন্যে, প্রয়োজন হলে, সঙ্কেত করা ছাড়াও আম্পায়ার অবশ্যই মুখে বলবেন।

৪। নির্দোষ এবং দোষযুক্ত খেলা—(i) আবেদন না করা হলেও দোষযুক্ত ক্রীড়াকৌশলের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপের অধিকার আম্পায়ারদের আছে, কিন্তু আইনের প্রয়োজন ছাড়া অন্য কোনো কারণে তাঁরা খেলার গতিতে বাধা দেবেন না।

(ii) কোনো খেলোয়াড় কোনো আম্পায়ারের নির্দেশ মান্য করতে অস্বীকৃত হলে বা তাঁর সিদ্ধান্তের সমালোচনা করলে,
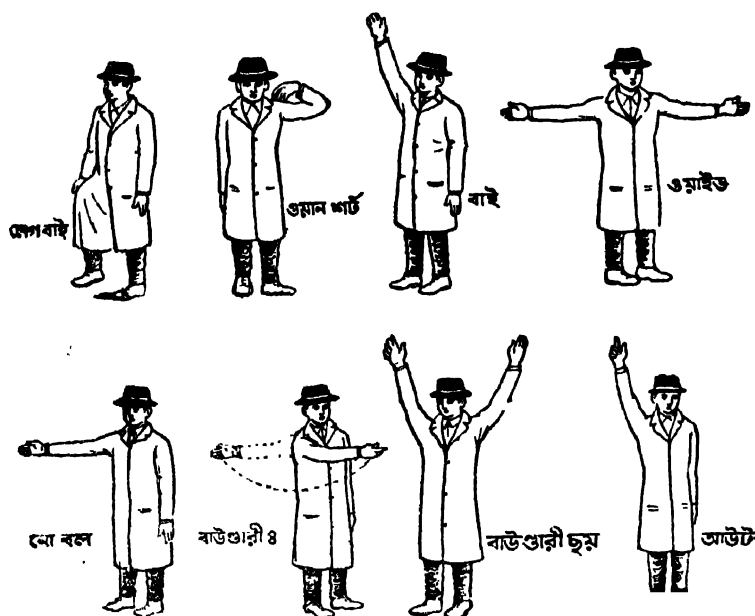
আম্পায়ারের বিভিন্ন সংকেত

আম্পায়াররা প্রথমে অধিনায়কদের তার ব্যবস্থা করার জন্য অনুরোধ করবেন, এবং সেটা ফলপ্রসূ না হলে খেলায় অংশগ্রহণকারী দল দু'টির কর্মকর্তাদের কাছে সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপারটি জানাবেন।

(iii) ভালোভাবে বল ধরবার উদ্দেশ্যে কোনো খেলোয়াড়ের পক্ষে বলের সেলাই উঠিয়ে ফেলা বে-আইনী। এ-ক্ষেত্রে প্রয়োজন হলে, আম্পায়ার বল বদলে অনুরূপ ক্ষয়ে-যাওয়া বলের ব্যবস্থা করবেন এবং অধিনায়ককে সতর্ক করে দেবেন যে, ঐরকম কাজ

দোষণীয়। বোলাররা রজন, মোম ইত্যাদি ব্যবহার করলেও তা দোষণীয়, কিন্তু বল ভিজে গেলে বোলার তোয়ালের উপর রেখে বা কাঠের গুঁড়ো দিয়ে শুকিয়ে নিতে পারবে।

(৮) আম্পায়ারদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে, যে-কোনো রকমের সময় নষ্ট করা—দোষণীয় ক্রীড়াকৌশলের অন্তর্ভুক্ত। (সময় নষ্ট করার বিভিন্ন কৌশলের উদাহরণ: বোলারের বল করতে সময় নষ্ট করা, দু'ওভারের মধ্যে এবং বামহাতের ব্যাটস্‌ম্যানের জন্য স্থানপরিবর্তন করতে গিয়ে ফিল্ডাররা, বল ডেলিভারীর অব্যবহিত পরেই বোলার তার চিহ্নমত জায়গায় ফিরে যাওয়ার জন্য হাঁটতে শুরু করেছে এই ক্ষেত্র ছাড়া বোলারকে দেবার আগে ফিল্ডারদের একে অন্যে বল ছোঁড়া-ছুঁড়ি, ফিল্ডিং সাজাতে গিয়ে অধিনায়কদের অযথা ধীর হওয়া এবং নতুন ব্যাটস্‌ম্যান উইকেটে পৌছানো পর্যন্ত ফিল্ডিং না সাজানো, যে ব্যাটস্‌ম্যান আসছে তার উইকেটে আসতে অত্যন্ত দীর্ঘ সময় নেওয়া—ইত্যাদি।)

যদি কোনো বোলার এক ওভার বল দিতে অপ্রয়োজনীয়-ভাবে বেশি সময় নেয়, বোলারের প্রান্তের আম্পায়ার অপর আম্পায়ারের সঙ্গে পরামর্শ করে নিম্নবর্ণিত ব্যবস্থা অবিলম্বে নেবেন—

(১) বোলারকে সংকেত করে দেবেন এবং ফিল্ডিং-পক্ষের অধিনায়ককে জানিয়ে দেবেন যে, তিনি তা করেছেন।

(২) এই সতর্কীকরণ ফলপ্রসূ না হলে—

(এ) যে ওভার চলছে সেই ওভারের শেষে ফিল্ডিং-পক্ষের অধিনায়ককে নির্দেশ দেবেন ঐ বোলারকে সরিয়ে নিতে। অধিনায়ক নির্দেশমত বোলারকে সরিয়ে নেবেন।

(বি) খেলার কোনো বিরতি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ব্যাটিং-পক্ষের অধিনায়ককে ব্যাপারটি জানাবেন।

যে বোলারকে উপরিলিখিত মত সরিয়ে নেওয়া হবে, সে সেই ইনিংসেই আর বল করতে পারবে না।

(v) বোলারদের সাহায্য করতে পারে এমন পিচকে ক্ষতিগ্রস্ত করা হলে হস্তক্ষেপ করা এবং খেলোয়াড়দের নিবৃত্ত করা আম্পায়ারদের কর্তব্য। এক্ষেত্রে আম্পায়ার (এ) প্রথমে বোলারকে সতর্কিত করবেন ; (বি) যদি এই সতর্কীকরণ ফলপ্রসূ না হয়, ফিল্ডিং-পক্ষের অধিনায়ককে এবং অপর আম্পায়ারকে জানিয়ে দেবেন কী ঘটেছে ; (সি) উপরের ব্যবস্থাও নিষ্ফল প্রতিপন্ন হলে বোলারের দিকের আম্পায়ার অবশ্যই (১) আবার একবার কাজটি করা হলেই ওভার সম্পূর্ণ হওয়ার পর ডেড্ বল ডাকবেন ; (২) ফিল্ডিং-দলের অধিনায়ককে সেই বোলারকে সঙ্গে সঙ্গে সরিয়ে নিতে নির্দেশ দেবেন ; (৩) খেলার যখনই কোনো বিরতি হবে তখনই ঘটনাটি ব্যাটিং-পক্ষের অধিনায়ককে জানাবেন। কোনো বোলার, যাকে উপরিবর্ণিত উপায়ে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে, ঐ ইনিংসেই আর বল করতে পারবে না।

(সম্পূর্ণ নির্দেশিকা হিসাবে এই প্রস্তাব উত্থাপিত করা যাচ্ছে যে, বিপজ্জনক এলাকা হল পপিং ক্রীজ থেকে চার ফুট দূরে তার সমান্তরাল করে টানা একটি কাল্পনিক লাইন, এবং মিডল স্টাম্পের উভয় পাশে এক ফুট তফাতে ও পপিং ক্রীজ থেকে ৪ ফুট দূরে পিচের উপর লম্বালম্বি টানা কাল্পনিক ও সমান্তরাল লাইন দু'টি দিয়ে ঘেরা এলাকা।)

(vi) যদি বোলারের প্রান্তের আম্পায়ারের মতে, ব্যাটস্ম্যানের প্রতি বার বার ফাস্ট, শর্ট-পিচ্ বল দেওয়াটা সুপরিকল্পিতভাবে ভয় দেখানো, তবে সেটা দোষণীয় গণ্য হবে। এক্ষেত্রে তিনি নিম্নলিখিত ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন :

(এ) যখন তিনি সিদ্ধান্ত নেন যে, নিষেধ সত্ত্বেও এই ধরনের বোলিং আবার করা হচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে বোলারকে সতর্কিত করবেন ; (বি) যদি এই সতর্কীকরণ ইত্যাদি* (*হুবহু পূর্ববর্তী টীকায় বর্ণিত ব্যবস্থার মত।)।

(vii) বোলারের দৌড়ের মধ্যে ব্যাটস্ম্যানরা 'রাণ চুরি' করার

চেষ্টা করলে সেটা দোষণীয়। এই রকম রাণ নেওয়ার উদ্দেশ্যে ব্যাটস্‌ম্যানরা পরস্পরকে অতিক্রম করা মাত্রই আম্পায়ার ডেড্ বল ডাকবেন, যদি না বোলার কোনো উইকেটে বলটি ছুঁড়ে দিয়ে থাকে (২৬নং আইনের ৩নং টীকা এবং ২৭নং আইনের ২নং টীকা দ্রষ্টব্য)। এরপর ব্যাটস্‌ম্যানরা নিজ নিজ উইকেটে ফিরে যাবে।

(viii) যখন প্রকৃতপক্ষে খেলা চলছে তখন কোনো খেলোয়াড় মালিশ বা স্নানের উদ্দেশ্যে মাঠ ছেড়ে যেতে পারবে না।

৫। মাঠ, আবহাওয়া এবং আলো—(i) খেলার আগে অন্যরকম কিছু স্থির করা না হয়ে থাকলে অধিনায়করা (খেলা যখন চলছে তখন উইকেটে অবস্থানরত ব্যাটস্‌ম্যানরা তাদের অধিনায়কের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে) ইচ্ছা করলে মাঠের আবহাওয়ার বা খেলার জন্য আলোর উপযুক্ততা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে পারবে ; অন্যথায় বা মতপার্থক্য ঘটলে, সিদ্ধান্ত নিতে হবে আম্পায়ারদের।

(ii) মাত্র তখনই খেলা স্থগিত রাখা হবে যখন অবস্থা এত খারাপ যে, খেলা চালিয়ে যাওয়াটা অযৌক্তিক বা বিপজ্জনক। মাঠকে খেলার অযোগ্য গণ্য করা হবে যদি মাঠের উপর জল দাঁড়িয়ে যায় বা যদি মাঠ এত ভিজে বা পিছল হয় যে, ব্যাটস্‌ম্যানরা বা বোলাররা যেটুকু যুক্তিযুক্ত ততটুকুও পা রাখতে বা ফিল্ডস্‌ম্যানরা অবাধে চলাফেরা করতে পারছে না। মাঠের ঘাস ভিজে এবং বল পিছল হয়ে গেছে, মাত্র এই কারণেই খেলা বন্ধ করা যাবে না।

(iii) কোনো কারণে খেলা বন্ধ হওয়ার পর অবস্থার উন্নতি হওয়া মাত্রই অধিনায়করা বা, আম্পায়ারদের উপর সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা ন্যস্ত হলে তাঁরা, কোনো খেলোয়াড়কে সঙ্গে না নিয়ে এবং আর কোনোরকম নির্দেশ ছাড়াই পর্যবেক্ষণ করতে বেরোবেন এবং মাঝে মাঝে তা করে যাবেন। যখনই ক্ষমতা-প্রাপ্ত পক্ষরা স্থির করবেন যে, খেলা সম্ভব, তাঁরা অবশ্যই খেলা আবার আরম্ভ করার জন্য খেলোয়াড়দের ডাকবেন।

৪৭ আপীল—যতক্ষণ না অপর পক্ষ তাঁর কাছে আবেদন করছে ততক্ষণ আম্পায়ার কোনো ব্যাটস্‌ম্যানকে আউট ঘোষণা করবেন না, এবং আবেদন করতে হবে পরবর্তী বলটি ডেলিভারী হওয়ার আগে এবং ১৮নং আইন অনুসারে 'টাইম' ডাকা হওয়ার আগে। ৩৮নং বা ৪২নং আইন থেকে এবং ৪:নং আইন থেকে উদ্ভূত স্ট্রাইকারের উইকেটে রাণ-আউটের আবেদন ছাড়া আর সমস্ত ক্ষেত্রেই আবেদনের উত্তর বোলারের প্রান্তের আম্পায়ার অপর আম্পায়ারের আগে দেবেন। যে ক্ষেত্রে কোনো আম্পায়ার সিদ্ধান্ত জানাতে অক্ষম, তিনি সিদ্ধান্ত জানাতে অনুরোধ করবেন অপর আম্পায়ারকে, যাঁর সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হবে।

টীকা: ১। 'হাউজ স্থাট' আবেদনের মধ্যে সব রকমেরই আউট হওয়া পড়ছে (যে আম্পায়ারের কাছে আবেদন করা হয়েছে তাঁর এক্তিয়ারের মধ্যে)। অবশ্য যে ব্যক্তি আবেদন করছে সে যদি আউট করার কোনো বিশেষ পদ্ধতির কথা বলে, সেকথা আলাদা। যখন যে কোনো একজন আম্পায়ার ব্যাটসম্যানকে 'নট আউট' ঘোষণা করেন, অপর আম্পায়ারের কাছে তাঁর এক্তিয়ারের মধ্যে আবেদন করা হলে তিনি তার উত্তর দিতে পারেন, অবশ্য সেই আবেদন যদি সময় থাকতে করা হয়ে থাকে।

২। আম্পায়ার আউটের সঙ্কেত দেন তর্জনীটি মাথার উপর তুলে। যদি ব্যাটস্‌ম্যান আউট না হয় তা হলে আম্পায়ার ঘোষণা করেন 'নট আউট'।

৩। কোনো আম্পায়ার তাঁর সিদ্ধান্ত পাল্‌টাতে পারেন, অবশ্য যদি এই পরিবর্তন অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে হয়।

৪। কোনো আম্পায়ার তাঁর সিদ্ধান্ত জানাবার আগে অপর আম্পায়ারের সঙ্গে কোনো ঘটনাগত বিষয় নিয়ে—যে ঘটনাটি শেষোক্ত ব্যক্তির পক্ষেই বেশি ভালোভাবে দেখে থাকা সম্ভব—আলোচনা করতে পারবেন না, এই আইনে এমন কিছু নেই। যে-সব ক্ষেত্রে একজন আম্পায়ার নিজেই সিদ্ধান্ত জানাতে পারেন, সে-সব ক্ষেত্রে তিনি 'সিদ্ধান্ত জানাতে অনিচ্ছুক', মাত্র এই কারণেই তিনি অপর আম্পায়ারকে সিদ্ধান্ত জানাবার

অনুরোধ করবেন না। যদি পরামর্শ করার পরেও তাঁর মনে কোনো রকম সন্দেহ থাকে তাহলে ৪৬নং আইনে প্রদত্ত ব্যবস্থা প্রযোজ্য হচ্ছে, এবং সিদ্ধান্তটি ব্যাটস্‌ম্যানের অনুকূলে যাবে।

৫। যাকে আউট ঘোষণা করা হয়নি এমন ব্যাটস্‌ম্যান তার উইকেট ছেড়ে চলে গেছে ভুল বুঝে, এ ব্যাপারে সন্তুষ্ট হলে আম্পায়াররা হস্তক্ষেপ করতে পারেন।

৬। ২৫নং আইন অনুসারে 'ওভার' ডাকা মাত্র বল 'ডেড' হয়ে যায়। কিন্তু এর দরুন পরের ওভারের প্রথম বলের আগে আবেদন করলে তা অসিদ্ধ হয়ে যাবে না—অবশ্য যদি না 'টাইম' ডেকে আম্পায়াররা বেলগুলি সরিয়ে নিয়ে গিয়ে থাকেন।

ভলিবল

কোর্ট: ভলিবল কোর্ট দৈর্ঘ্যে ১৮ মিটার ও প্রস্থে ৯ মিটার হবে এবং মাটি থেকে ৭ মিটার উঁচু পর্যন্ত আচ্ছাদনমুক্ত থাকে। কোর্টের চারদিকের লাইনগুলি ৫ সেন্টিমিটার মোটা হয় এবং লাইনের বাইরে ৩ মিটার পর্যন্ত বাধামুক্ত রাখাই বিধি। তবে নেটের নীচে ৫ সেন্টিমিটার মোটা যে লাইনটি থাকে, সেটি কোর্টকে দু'ভাগে বিভক্ত করে। একে সেন্টার-লাইন বলা হয়। এই মোটা লাইন থেকে উভয় পাশে ৩ মিটার দূরে প্রস্থের সমান্তরাল দু'টি লাইন টানা হয়। ওই দু'টিকে আক্রমণ-রেখা বা অ্যাটাক-লাইন বলে। উভয় কোর্টের ২০ সেন্টিমিটার পিছনে ১৫×৫ সেন্টিমিটারের দু'টি লাইন সার্ভিস এলাকা ভাগ করে। দু'টি কোর্টের ডান দিকে সাইড-লাইন বরাবর এবং বাঁদিকে ৩ মিটার জুড়ে সার্ভিস এলাকা, তবে তা যেন কখনও ২ মিটারের কম না হয়।

নেট: দুই দলের মাঝে যে নেট বা জাল ব্যবহার করা হয় তার দৈর্ঘ্য ৯.৫০ মিটার ও প্রস্থ ১ মিটার। জালের ফোকরগুলি সাধারণতঃ ১০ বর্গ সেন্টিমিটার হয়। জালটিকে উপরে ও নীচে শক্ত দড়ি দিয়ে দু'দিকের পোস্টের সঙ্গে বাঁধা হয়।

ছেলেদের খেলায় জালের নিম্নাংশ মাটি থেকে ২ ৪৩ সেন্টিমিটার উঁচুতে থাকে, আর মেয়েদের বেলায় উচ্চতা হয় ২.২৪ সেন্টিমিটার। সাইড-লাইন

বরাবর জালের উপরের দিকে ৫ সেন্টিমিটার এমন কোনো (আমাদের এখানে
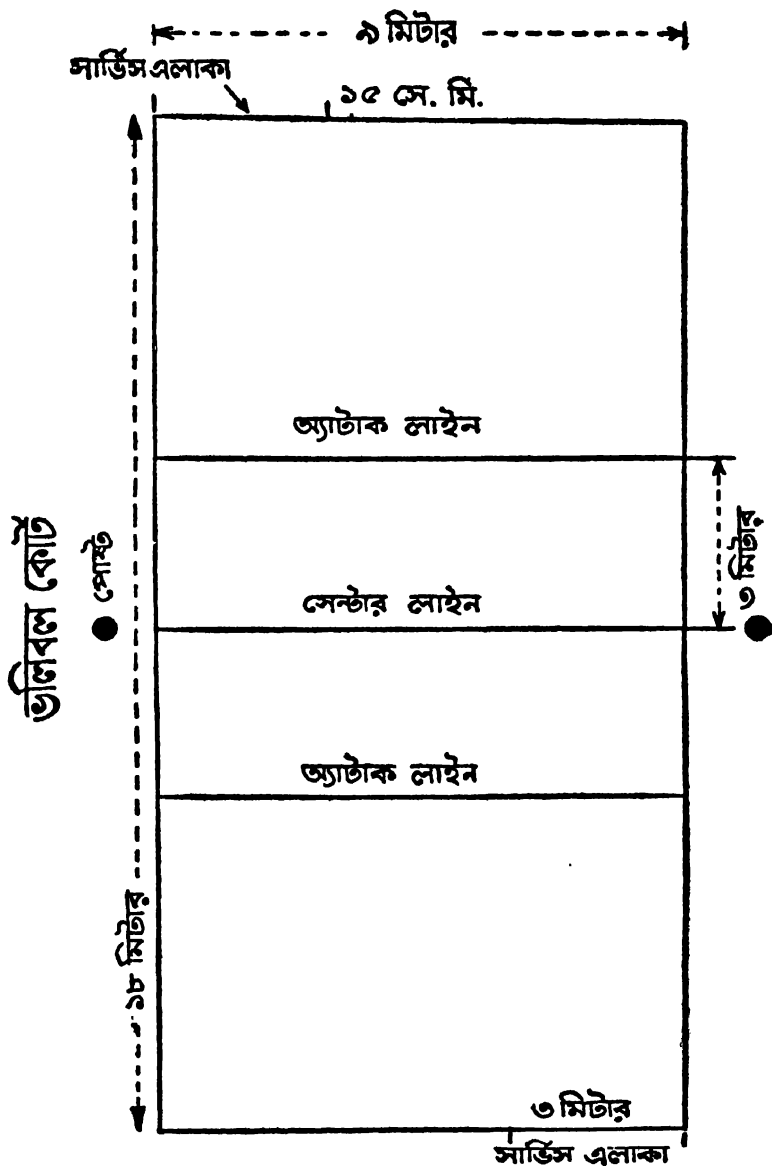
ভলিবল খেলার কোর্ট

পাতলা রঙিন পাটকাঠি বা হাল্‌কা কিছু আটকানো হয়) চিহ্ন দেওয়া দরকার

যাতে বোঝা যায় কোর্টের সীমানা দু'দিকে কতদূর। ওই চিহ্ন থেকে দু'দিকের পোস্টের দূরত্ব রাখা হয় অন্ততঃ ৫০ সেন্টিমিটার।

খেলোয়াড়দের কর্তব্য ও দায়িত্ব : প্রত্যেক খেলোয়াড় খেলার নিয়মাবলী জেনে তা যেন যথাযথ পালন করে। খেলা চলাকালে অধিনায়কের মাধ্যমেই রেফারীর সঙ্গে আলোচনা করাই বিধি। অর্থাৎ প্রয়োজনে একমাত্র অধিনায়কই রেফারী বা আম্পায়ারের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে পারে।

তবে রেফারী বা আম্পায়ারকে লক্ষ্য করে ঘন ঘন কোনো অভিযোগ পেশ করলে দণ্ড বা শাস্তি পেতে হয়; পরিচালকের সঙ্গে অশোভন আচরণ চলবে না; বিপক্ষ সম্পর্কে বা তাদের কোনো খেলোয়াড়ের প্রতি কটূক্তি দণ্ডনীয়। খেলা চলাকালে কোর্টের পাশ থেকে ইচ্ছাকৃত কোচিং নিয়ম-বহির্ভূত বলে গণ্য হয়। বিরতি বা টাইম-আউট ব্যতীত অন্য সময়ে রেফারীর বিনা অনুমতিতে কেউ কোর্ট ত্যাগ করতে পারে না।

দণ্ড : (ক) বিপক্ষীয় খেলোয়াড়, দর্শক বা ক্রীড়া-পরিচালকের সঙ্গে কথা-কাটাকাটি, চীৎকারে সামান্য দণ্ড বা শাস্তি দেওয়া হয়। নিষেধ সত্ত্বেও কেউ এই সব অপরাধের পুনরাবৃত্তি করলে স্কোরশীটে পার্সোনাল ওয়ার্নিং লিপিবদ্ধ হয় এবং এজন্য সংশ্লিষ্ট দল পয়েণ্ট বা সার্ভিস খোয়ায়।

(খ) স্কোরশীটে ওয়ার্নিং লিপিবদ্ধ হওয়ার ঘটনার পুনরাবৃত্তি করলে রেফারী সংশ্লিষ্ট খেলোয়াড়কে সেট বা গেম থেকে বাতিল করে দিতে পারেন। কোনো খেলোয়াড় যদি ক্রীড়া-পরিচালক, বিপক্ষীয় খেলোয়াড় অথবা দর্শকদের সম্পর্কে কটূক্তি করে তাহলে গুরু দণ্ড স্বরূপ সতর্কীকরণ ছাড়াই রেফারী তাকে খেলা থেকে বঞ্চিত করতে পারেন।

খেলোয়াড়দের সরঞ্জাম : খেলোয়াড়রা জার্সি, প্যাণ্ট ও হাল্কা জুতো পরবে। শিরস্ত্রাণ বা (গহনা, ব্রেসলেটও নিষিদ্ধ) এমন কিছু পরবে না যা অপরকে আহত করে খেলার সময় ধাক্কা লেগে বা পড়ে গিয়ে। প্রত্যেকের বুকে ও পিঠে নম্বর লেখা থাকা অত্যাবশ্যক। প্রত্যেক খেলোয়াড়কে কোর্টে আসতে হয় পরিষ্কার পোশাকে এবং একই দলের এক ধরনের পোশাক বাঞ্ছনীয়।

দল ও বদলী খেলোয়াড় : প্রতিটি দল গঠিত হয় ৬ জন খেলোয়াড় নিয়ে। তবে বদলীসহ দলে সর্বাধিক ১২ জন খেলোয়াড় থাকতে পারে। খেলা শুরুর আগে বদলীসহ সব খেলোয়াড়ের নাম স্কোরশীটে লিপিবদ্ধ করাতে হয়। এই বদলী খেলোয়াড়রা ও কোচ রেফারীর বিপরীত দিকে কোর্টের ধারে

বসে থাকে। অধিনায়ক অথবা কোচের অনুরোধে খেলোয়াড় বদল করতে হয়। একটি খেলায় ৬ জনের বেশি বদলী খেলোয়াড় নেওয়া যায় না।

ভলিবলের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল খেলোয়াড়দের স্থান বা পজিশন। প্রতিটি কোর্টে প্রতিটি দল ৩+৩ করে দু'টি লাইনে বিভক্ত থাকে। ভাঙা লাইনও হতে পারে। নেট বা জালের কাছের ৩ জন হল ফ্রন্ট-লাইন বা সামনের সারির খেলোয়াড়, বাকি ৩ জন ব্যাক-লাইন বা পিছনের সারির। ডান থেকে বাঁ দিকে তারা স্থান নেয়। যথা—২, ৩, ৪ সামনের সারিতে এবং ১, ৬ ও পিছনে। বল সার্ভ করার সঙ্গে সঙ্গে যে কোনো খেলোয়াড় তার কোর্টে যে কোনো জায়গায় দাঁড়াতে পারে। স্কোরশীটে যেভাবে চক্র বা 'রোটেশন' লেখানো থাকে সেট শেষ হওয়া পর্যন্ত তা মেনে চলতে হয়।

খেলার নিয়মাবলী: আন্তর্জাতিক আইনানুসারে জয়-পরাজয় নির্ধারণের জন্য ৫টি বা ৩টি সেট খেলা হয়ে থাকে। এখানেও দুই দলের অধিনায়ক টসের মাধ্যমে কোর্ট বেছে নেয়, তবে জয়-পরাজয় নিষ্পত্তির সেটে রেফারী কোর্ট পছন্দের জন্য বা কারা আগে সার্ভিস করবে তা স্থির করতে আবার টস্ করতে পারেন। এছাড়া, প্রতিটি গেমের পর কোর্ট বদল হয়।

বল 'ডেড্' হলেই রেফারী ও আম্পায়ার টাইম-আউটের অনুমতি দেন। টাইম-আউটের সময় কোনো খেলোয়াড় কোর্ট ত্যাগ করতে পারে না। তখন ওরা কেবল কোচের পরামর্শ নেয়। আবার, প্রতিটি দল একটি সেটে ২ বারের বেশি টাইম-আউট পায় না। এই টাইম-আউট বা বিশ্রাম ৩০ সেকেণ্ডের বেশিও হয় না। তবে খেলোয়াড় আহত হলে ৩ মিনিট টাইম-আউট দেওয়া হয় এবং সেই সময় বিশ্রামের মধ্যে ধরা হয় না।

যতক্ষণ রেফারী একটি দলের ভুল (ফল্ট) না ধরছেন, ততক্ষণ সেই দলের একই খেলোয়াড় সার্ভিস করবে।

সার্ভিসে ভুল হয়: যদি বল নেট স্পর্শ করে, বল যদি নেটের নীচ দিয়ে যায়, বা উপর দিয়ে গিয়ে কোর্টের বাইরে পড়ে, যদি বল বিপক্ষ কোর্টে পৌছানোর আগে সার্ভিসকারীর নিজদলের কাউকে স্পর্শ করে। সার্ভিস পরিবর্তন হয় একটি দল ভুল করলে বা রেফারী 'সাইড-আউট' ঘোষণা করলে।

একটি দলের ভুলের জন্য দ্বিতীয় দল বল পেলেই প্রত্যেকটি খেলোয়াড় স্থান পরিবর্তন করে ঘড়ির কাঁটার মত (clock-wise) ঘোরে। প্রতিটি সেটের শুরুতেই স্থান পরিবর্তন করা হয়।

খেলার সময়ে হাত বা শরীরের কোনো অংশ দ্বারা বলকে বিশ্রাম দেওয়া বা ধরে রাখা হচ্ছে এমন কিছু করলেই তা 'হোল্ডিং' বলে ঘোষিত হয়।

ভলিবলে একাধিক খেলোয়াড় শরীরের কোমরের উপরের যে-কোনো অংশ দিয়ে প্রতিপক্ষের বল আটকাতে পারে। একে 'ব্লক' বলা হয়। তবে ব্লকসহ কোনো দল তিনবারের বেশি বল স্পর্শ করতে পারে না।

ফুটবলের খেলোয়াড়দের মত খুশিমত নম্বর লাগানো চলে না। খেলোয়াড় দাঁড়াবে সামনের সারিতে ডান থেকে বাঁয়ে ২, ৩, ৪ ও পিছনে ১, ৬, ৫। খেলা শুরু হয় এইভাবে দাঁড়ানোর পর।

কোনো একটি দলের যদি ১৫ পয়েন্ট হয় ও বিপক্ষের যদি অন্ততঃ ২ পয়েন্ট কম থাকে তখনই খেলার নিষ্পত্তি হয়। প্রথম দল বিজয়ী ঘোষিত হয়। কিন্তু ১৪-১৪তে ডিউস হলে তারপরও খেলা চলবে এবং ১৬-১৪, ১৭-১৫, ১৮-১৬ বা ১৯-১৭—এই রকমের হলেই খেলার নিষ্পত্তি হতে পারে। অর্থাৎ দু'পয়েন্টের ব্যবধান থাকতেই হবে।

বাস্কেটবল

বল : ফুটবলের মত হলেও এই খেলায় বলের পরিধি ৭২ সেন্টিমিটারের কম ও ৭৮ সেন্টিমিটারের বেশি হবে না। ওজন ৬০০ থেকে ৬৫০ গ্রামের মধ্যে। রেফারীর অনুমতিক্রমেই নতুন বা পুরনো বল নিয়েও খেলা শুরু হতে পারে। ৫ + ৫ = ১০ জন নিয়ে দু'টি দল খেলবে। প্রত্যেকের উদ্দেশ্য বাস্কেটের ভিতরে বল গলানো। এজন্য খেলোয়াড়রা হাত দিয়ে পাস করতে পারে, ছুঁড়তে পারে, বল ড্রিব্‌লও করে। বলে লাথি বা ঘুঁষি মারলে নিয়ম লঙ্ঘনের শাস্তি পেতে হয়।

কোর্ট : দৈর্ঘ্য ২৬ মিটার, প্রস্থ ১৪ মিটার। কোর্ট সর্বদাই ঘাসহীন থাকবে। ঢাকা কোর্টের সিলিং অন্ততঃ ৭ মিটার উঁচু হবে। বাউণ্ডারি লাইনগুলি অত্যন্ত স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। সাইড-লাইন ও এণ্ড-লাইন থেকে দর্শকরা অন্ততঃ ২ মিটার দূরে থাকবেন। বাস্কেটবল কোর্টের ঠিক মাঝে ১.৮০ মিটার ব্যাসার্ধের বৃত্ত থাকবে। এই বৃত্তের মাঝে সাইড-লাইনের সমান্তরাল করে সেণ্টার-লাইন টানতে হবে।

এণ্ড-লাইনের ৫.৮০ মিটার দূরে ওরই সমান্তরালে কোর্টের উভয় দিকে 'ফ্রী

'থ্রো' লাইন টানতে হবে। এণ্ড-লাইনের মাঝামাঝি জায়গায় এই লাইনটি
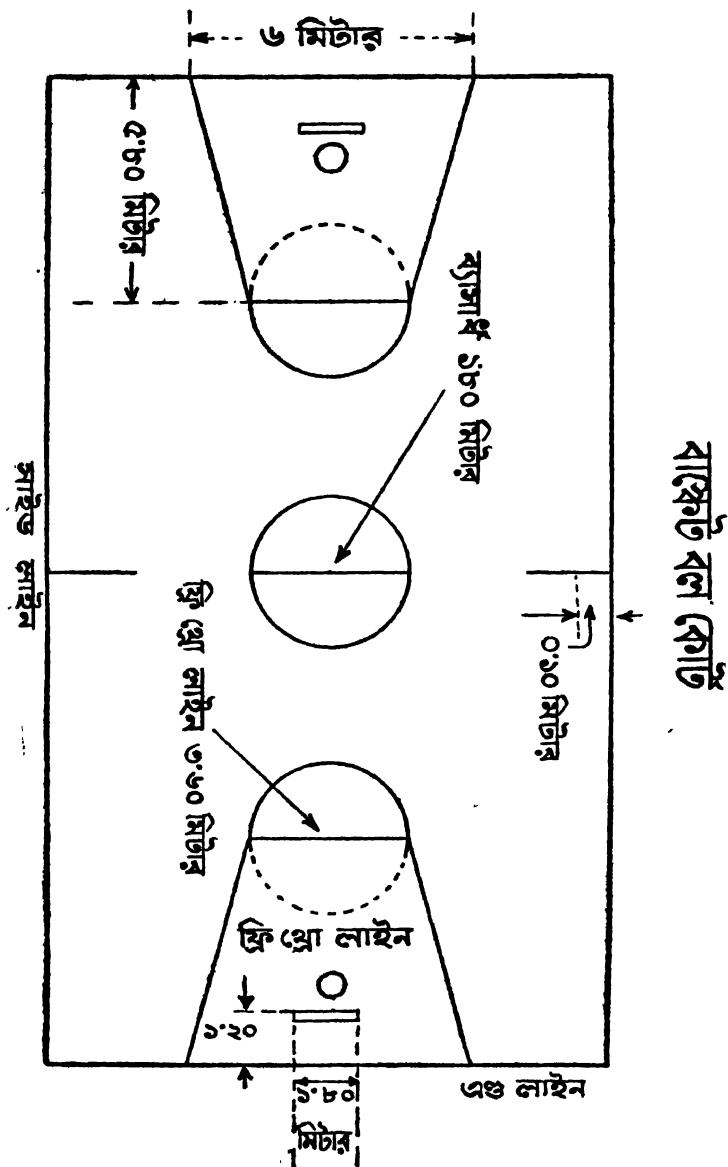
বাস্কেটবল খেলার কোর্ট

কোনোক্রমেই ৩.৬০ মিটারের বেশি যেন না হয়।

বাস্কেটবোর্ড : দু'টি বাস্কেটবোর্ডই হবে ৩ সেন্টিমিটার পুরু শক্ত কাঠের। দৈর্ঘ্য ১.৮০ মিটার, প্রস্থ ১.২০ মিটার। প্রতিটি বোর্ডের সম্মুখভাগে সাদা রঙ থাকা বাঞ্ছনীয়। ব্যাকবোর্ডের বর্ডার বরাবর মোটা (৫ সেন্টিমিটার) লাইন টানতে হবে অন্য রঙে। কালো হলেই ভাল। ব্যাকবোর্ড দু'দিকের এণ্ড-লাইনের সমান্তরালে বসাতে হবে। এর নীচের দিকটা মাটি থেকে ২.৭৫ মিটার উঁচুতে থাকবে।

বাস্কেট : বাস্কেট অবশ্যই সাদা দড়ির ও ৪৫ সেন্টিমিটার ব্যাসের হবে,
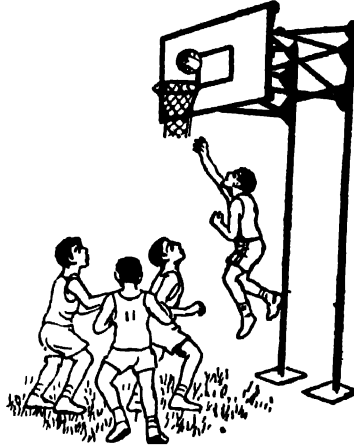
বাস্কেটে বল ঢুকছে

লম্বায় ৪০ সেন্টিমিটার। নেট তৈরির পর দেখা দরকার বল ওর ভিতর দিয়ে গলে যায় কিনা।

বাস্কেটের রিং ব্যাকবোর্ডের গায়ে মাটি থেকে ৩.০৫ মিটার উঁচুতে থাকবে।

ঘড়ি : এর পরই বাস্কেটবলের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ঘড়ি। একটি গেম ওয়াচ, অপরটি টাইমআউট ওয়াচ। টাইমকীপারের অন্ততঃ দুটি স্টপওয়াচ প্রয়োজন। ঘড়িগুলি কোর্টের ধারে টেবলে এমনভাবে থাকবে যে, টাইমকীপার ও স্কোরার উভয়ে দেখতে পারেন। কোর্টের বাইরে দুই কোণে স্কোরবোর্ড দু'টি যেন সকলেই দেখতে পান। স্কোরার যেন ১ থেকে ৫ পর্যন্ত নম্বর দেখতে পান। কোনো খেলোয়াড় ফাউল করলে স্কোরার সংকেত দেন ও নম্বর দেখান। কে কতবার ফাউল করল তিনি তাও জানিয়ে দেন। একই খেলোয়াড় পঞ্চমবার ফাউল করলে লাল সংকেত দেখানো হয়

দল : প্রতিটি দলে ৫ জন খেলোয়াড় থাকবে এবং প্রত্যেক দল ৭ জন বদলী খেলোয়াড় নামাতে পারে। খেলোয়াড়দের জার্সির সামনে ও পিছনে বড় বড় অক্ষরে নম্বর লিখতে হয়। একটি দলে যেন কেউ একই নম্বরের জার্সি না পরে।

কোর্ট পরিত্যাগ : আইন-সিদ্ধ হলেই তবে কোনো খেলোয়াড় অনুমতি নিয়ে কোর্ট ত্যাগ করতে পারে।

অধিনায়কের দায়িত্ব : দলকে নিয়ন্ত্রণ করে দলের অধিনায়ক। দলের পক্ষে সে খেলা-পরিচালকের কাছে প্রয়োজনীয় তথ্য জানাবে। কোনো খেলোয়াড় কোর্ট ছেড়ে যেতে চাইলে অধিনায়কই তা রেফারীকে জানাবে। বদলী খেলোয়াড়ের কথাও জানাবে অধিনায়ক।

কোচের কর্তব্য : কোচকে অবশ্যই খেলার পোশাক পরে থাকতে হবে, যাতে তাঁকে চেনা যায় যে, তিনি সংশ্লিষ্ট দলেরই কেউ। খেলা শুরুর আগে কোচই দলের সকলের নাম (নম্বর সহ) স্কোরারের কাছে দেন। খেলার সময় খেলোয়াড় বদল হলে স্কোরার ও রেফারীকে তিনি তা জানান। কেবল কোচই খেলোয়াড় বদলী করবেন। অনেক সময় অধিনায়কও কোচের দায়িত্ব নেয়। কোর্ট থেকে অর্থাৎ খেলা থেকে অবসর নিলেও অধিনায়ক কোচের কাজ চালিয়ে যেতে পারে। অধিনায়ক আহত হয়ে চলে গেলে তার বদলী কেউ দায়িত্ব নিতে পারে।

পরিচালকদের দায়িত্ব : বাস্কেটবল খেলার পরিচালকমণ্ডলীর মধ্যে থাকেন একজন রেফারী ও একজন আম্পায়ার। এঁদের সাহায্য করেন একজন টাইমকীপার, একজন স্কোরার ও একজন ৩০-সেকেণ্ড অপারেটার। রেফারী ও আম্পায়ারকে অবশ্যই নিরপেক্ষ হতে হবে। এঁরা যেন ক্রীড়ারত দুই দলের সঙ্গে সম্পর্কহীন হন। এই কর্মকর্তারা কিন্তু আইন পরিবর্ধন বা পরিবর্জন করতে পারেন না। কর্মকর্তারা ট্রাউজারস, শার্ট অথবা পুল-ওভার পরেন।

খেলার আগে রেফারী সমস্ত সরঞ্জাম পরীক্ষা করেন। তিনি দেখেন কোনো খেলোয়াড় বিপজ্জনক কিছু পরেছে কিনা।

সেণ্টারে খেলা শুরু করান রেফারী। কর্মকর্তাদের মধ্যে মতৈক্য না হলে তিনিই গোল সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেন, টাইমকীপার ও স্কোরারের মতদ্বৈধতার নিষ্পত্তি করেন। প্রতি অর্ধের পর বা প্রতি অতিরিক্ত অর্ধের পর স্কোরশীট

পরীক্ষার পর তা অনুমোদন করেন। খেলাশেষে তাঁর অনুমোদনের সঙ্গে সঙ্গে সেই খেলায় নিযুক্ত কর্মকর্তাদের কার্যকাল শেষ হয়।

ফাউল করলে পরিচালক দোষী খেলোয়াড়ের নম্বর জানাবেন আঙুলের সংকেত দ্বারা। ফ্রী থ্রো পেনাল্টি হলে তাও পরিষ্কারভাবে জানাতে হবে। সংকেত দিতে হবে কে ফ্রী থ্রো করবে।

স্কোরারের কাজ কে কত পয়েন্ট করল তার পরপর বিবরণ রাখা। কিন্তু গোল, ফ্রী থ্রো তাঁর স্কোরশীটে তিনি লিখবেন খেলোয়াড়দের নাম ও নম্বর সহ।

টাইমকীপার নোট করবেন কখন প্রতিটি অর্ধ শুরু হচ্ছে। খেলা শুরুর তিন মিনিট আগে তিনি রেফারীকে সময় সম্পর্কে অবহিত করবেন। স্কোরারকে সংকেত দেবেন দু'মিনিট আগে। খেলা শুরুর সময়-সংকেত জানাবেন টাইমকীপার।

৩০-সেকেণ্ড অপারেটর দেখবেন যাদের দখলে বল রয়েছে, তারা ৩০ সেকেণ্ডের মধ্যে গোল দেওয়ার চেষ্টা করছে কিনা। তারা তা না করলে আইন লঙ্ঘন করা হবে।

খেলা ঃ খেলা হবে দুই অর্ধে ২০+২০=৪০ মিনিট এবং ১০ মিনিট বিরতি।

সেণ্টার সার্কলের মধ্যে রেফারী দু'দলের খেলোয়াড়দের মাঝে সেণ্টার-জাম্পের মাধ্যমে খেলা শুরু করবেন। বিরতির পর দ্বিতীয়ার্ধে বা অতিরিক্ত সময়ের খেলার শুরুতেও অনুরূপভাবেই খেলা আরম্ভ হয়। সবার আগে বাস্কেটের জন্য টস্ হয়। দ্বিতীয়ার্ধে বাস্কেট পরিবর্তন করাই নিয়ম।

নির্দিষ্ট সময়ের ১৫ মিনিটের মধ্যে যদি দু'টি দলের একটি উপস্থিত না হয়, তবে উপস্থিত দলকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়।

জাম্পবল ঃ যখন পরিচালক দু'দলের দু'জনের মাঝে বল টস্ করেন, তখনই তাকে জাম্পবল বলা হয়। জাম্পবলের সময় দুই জাম্পার সেণ্টার সার্কলের উভয় অর্ধে নিজ নিজ এলাকায় দাঁড়িয়ে থাকে, পরিচালক বলটি উপরে ছুঁড়ে দেন। বলটি মাটিতে পড়ার আগে যদি দু'জনের কেউ আঘাত করতে না পারে তবে আবার জাম্পবল করা হয়। বল সর্বোচ্চ স্থানে পৌঁছবার আগে ছুঁলে চলবে না। এবং বল ছোঁয়ার বা আঘাতের আগে দুই জাম্পারের কেউ

স্থান ত্যাগ করতে পারবে না। জাম্পবলের সময় পরিচালকদের লক্ষ্য থাকে যেন জাম্পার দু'জন বাদে আর কেউ এসে বল স্পর্শ না করে।

গোল : উপর থেকে বল বাস্কেটের মধ্যে গলে গেলে বা বাস্কেটের উপরে আটকে থাকলেও গোল হবে। কোর্ট থেকে সরাসরি গোল হলে ২ পয়েণ্ট হয় —একে 'ফিল্ড গোল' বলে। ফ্রী থ্রো থেকে গোল হলে ১ পয়েণ্ট হয়।

রিং-এর উচ্চতা থেকে বল যখন নিম্নমুখী হয়, তখন আক্রমণকারী খেলোয়াড় সীমাবদ্ধ গণ্ডীতে বল ছুঁতে বা লুফতে পারবে না—তা তখন গোলের চেষ্টা বা পাস যাই হোক। এই নিয়ম প্রযোজ্য তখনই, যখন বল রিং বা ব্যাকবোর্ড স্পর্শ করে। কিন্তু গোলের সময় কোনো আক্রমণকারী খেলোয়াড় বিপক্ষের বাস্কেট বা ব্যাকবোর্ড স্পর্শ করতে পারবে না।

আবার রক্ষণকারী খেলোয়াড়ও বল ছুঁতে বা লুফতে পারে না—যদি বিপক্ষের থ্রো রিং বা ব্যাকবোর্ডে ছুঁয়ে নিচে পড়তে থাকে। নিজেদের বাস্কেটের মধ্যে বল পড়তে থাকলে সেই দলের রক্ষণভাগের কেউ ব্যাকবোর্ড বা বাস্কেট ছুঁতে পারে না।

গোলের পরে : যারা গোল খায়, তারা নিজের দিকের এণ্ড-লাইনের পিছন থেকে বল ছুঁড়তে পারে, পাসও দিতে পারে সতীর্থ খেলোয়াড়কে।

খেলা শেষ : খেলায় বিজয়ী হয় তারাই, যারা সমাপ্তি সময়ে পয়েণ্টে এগিয়ে থাকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যদি সমান পয়েণ্ট হয় তবে পয়েণ্টের ব্যবধান হওয়া পর্যন্ত ৫ মিনিট করে অতিরিক্ত সময় খেলানো হতে পারে। তবে প্রথম অতিরিক্ত সময়ে আবার টস করা হয়। ৫+৫=১০ মিনিট অতিরিক্ত সময়ের মাঝে বিরতি থাকে ২ মিনিটের।

টাইম-আউট : বাস্কেটবলে টাইম-আউট একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পরিচালকের সংকেতে গেম-ওয়াচ বন্ধ বা থামানো হয়। এই টাইম-আউট নানা কারণে হয়। যথা: নীতি লঙ্ঘন, ফাউল, বল ধরে রাখা, খেলা শুরু করতে দেরী হওয়ায়, আহত হয়ে খেলা বন্ধ হলে ও খেলোয়াড় বদলের সময়। কিংবা অন্য কোনো কারণে খেলা বন্ধ বা সাময়িক স্থগিত থাকলে এবং ৩০-সেকেণ্ড সংকেতে।

স্কোরারকে অনুরোধ জানিয়ে কোচ দু'হাত উঁচিয়ে 'চার্জড্-টাইম-আউট' চাইতে পারেন। গেম-ওয়াচ থেমে গেলে বা বল 'ডেড্' (গোল বা ফাউল হলে) চার্জড্-টাইম-আউট চান। খেলোয়াড় বদলের ক্ষেত্রেও এই বিধি

প্রযোজ্য। প্রতি দল প্রতি অর্ধে দু'বারের বেশি চার্জড্-টাইম-আউট পায় না। টাইম-আউটের পর খেলা শুরু হয় যেদিকে বল থেমে (বা ডেড্ হয়ে) গিয়েছিল, সেই দিকে সাইড-লাইনের থ্রো থেকে। তা না হলে যেখানে ডেড হয়েছিল তার কাছাকাছি জাম্পের মাধ্যমে।

খেলোয়াড় বদল : খেলোয়াড় বদলের আগে স্কোরারকে জানাতে হবে নাম ও নম্বর। বল ডেড্ হলে বদল করা যায় না। এবং ২০ সেকেণ্ডের মধ্যেই তা করতে হয়।

আইন-ভঙ্গের শাস্তি : বাস্কেটবল কোর্টে নানা কারণে খেলোয়াড়কে শাস্তি পেতে হয়। একদলের খেলোয়াড় বিপক্ষের কারো সঙ্গে ধাক্কা-ধাক্কি করলে বা অশোভন আচরণ করলে তার বিরুদ্ধে ফাউল দেওয়া হয়।

ফাউলের জন্য বিপক্ষ দল বাউণ্ডারি-লাইন থেকে থ্রো পেতে পারে ; যে কোনো সার্কলে জাম্পবল দেওয়া হতে পারে, দেওয়া হতে পারে একাধিক ফ্রী থ্রো।

ফাউল হলে সংশ্লিষ্ট খেলোয়াড় স্কোরারের টেবলের দিকে তাকিয়ে হাত তুলবে। যদি কেউ বিপক্ষের খেলোয়াড়ের (যে শুট করতে উদ্যত নয়) সঙ্গে ফাউল করে তবে নিকটবর্তী সাইড-লাইন থেকে বিপক্ষ থ্রো-ইন পায়।

ফ্রী থ্রো : রেফারী তখনই ফ্রী থ্রো-র নির্দেশ দেন, যখন 'পার্সোনাল ফাউল' হয়। কেউ বাধা দিলে বা ধরে রাখলে এই শাস্তি। যার উপর ফাউল হয়েছে তাকেই থ্রো করতে বলা হয়। আর কেউ ফ্রী থ্রো করতে পারে না, তবে আহত হয়ে সে বাইরে গেলে তার বদলী খেলোয়াড়ের উপর তার দায়িত্ব বর্তায়। বদলী কেউ না থাকলে অধিনায়ক ওই থ্রো করে। টেকনিক্যাল ফাউলে ফ্রী থ্রো হলে যে কেউ থ্রো করে থাকে।

প্রতিটি ফ্রী থ্রো-র জন্য ৫ সেকেণ্ড সময় বরাদ্দ। ফ্রী থ্রো বা সংরক্ষিত এলাকায় পরিচালকরা থাকতে পারেন না। ব্যাকবোর্ডের পিছনেও না।

তবে বাস্কেটের কাছে বিপক্ষের দু'জন থাকে। অন্যরা অন্যত্র। কেউ ফ্রী থ্রোয়ারের কোনো রকম বাধা সৃষ্টি করতে পারে না। তারা নড়াচড়াও করে না।

ফ্রী থ্রো-য় গোল না হলে যেখানে ফাউল হয়েছিল সেখান থেকে খেলা শুরু হবে। কিন্তু বল যদি রিং বা ব্যাকবোর্ড পর্যন্ত না পৌঁছে বাউণ্ডারির

বাইরে যায় তবে সাইড-লাইন থেকে বিপক্ষ খেলবে। বল বাউণ্ডারির মধ্যে পড়লে কোনো দলের খেলোয়াড় তৎক্ষণাৎ খেলতে পারবে না। সাইড-লাইন থেকে বিপক্ষ খেলা শুরু করবে।

কোচ বা পরিবর্ত খেলোয়াড় খেলা চলাকালে বাউণ্ডারির বাইরে থাকেন। তাঁরা কোনো কারণেই কোর্টে প্রবেশ করতে পারেন না। তবে চার্জড্-টাইম-আউটের সময় কোচ খেলোয়াড়দের পরামর্শ দিতে পারেন। অবশ্য খেলোয়াড়রা বাউণ্ডারি অতিক্রম করে না। এই সময়ও বদলীরা বাইরে দাঁড়িয়ে পরামর্শ শুনতে পারে।

আগেই বলেছি, বাস্কেটবলে পার্সোনাল বা ব্যক্তিগত ফাউল হয় তখনই, যখন বল নিয়ে আগুয়ান খেলোয়াড়কে বিপক্ষের কেউ বাধা দেয়। কিন্তু বিপক্ষের কেউ বল কেড়ে নিতে গিয়ে হাতে হাতে সংঘর্ষ হলে ফাউল হয় না। দেখতে হবে কাঁধ, হাত, পা, কোমর ইত্যাদি দিয়ে অস্বাভাবিক কিছু করছে কিনা। সে ইচ্ছাকৃত বাধা দিচ্ছে কিনা।

শেষ তিন মিনিট : দ্বিতীয়ার্ধের শেষ তিন মিনিট অথবা অতিরিক্ত সময়ের শেষ তিন মিনিটে পার্সোনাল ফাউল হলে বাধাপ্রাপ্ত দলের উপর বিবেচনার জন্য ছেড়ে দেওয়া হয় এইজন্য যে, তারা দু'টি ফ্রী থ্রো করবে, কিংবা বাউণ্ডারির বাইরে কোর্টের মাঝামাঝি জায়গা থেকে সাইড-লাইন থেকে খেলবে। সংশ্লিষ্ট দল কী করবে সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবে তাদের অধিনায়ক। বাউণ্ডারির বাইরে থেকে খেলতে চাইলে সংশ্লিষ্ট খেলোয়াড় কোর্টের যে-কোনো জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকা তার সতীর্থকে বল পাস দিতে পারে।

কবাডি

সম্পূর্ণ ভারতীয় খেলা কবাডি মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, গুজরাটে 'হুটুটু' নামে পরিচিত। তামিলনাড়ু ও মহীশূরে একে বলা হয় 'চেডু-গুডু', কেরালায় 'ওয়াণ্ডিকালি', পাঞ্জাবে 'জাবর গণনা', বাংলায় 'হা-ডু-ডু' এবং উত্তর-ভারতে 'কবাডি' কবাডিই।

কবাডি খুবই স্বল্পব্যয়ে খেলা যায়। দরকার শুধু একখণ্ড জমি এবং লাইন টানার জন্য কিছু চুন।

মাঠ বা কোর্ট : ষোল বছরের উর্ধ্বে ছেলেদের আয়তক্ষেত্রাকার কোর্টের দৈর্ঘ্য ১২.৫ মিটার ও প্রস্থ ১০ মিটার। আড়াআড়িভাবে একে

সমদ্বিখণ্ডিত করা হয়। দেখতে হবে ৬.২৫ মিটার × ১০ মিটার যেন থাকে।
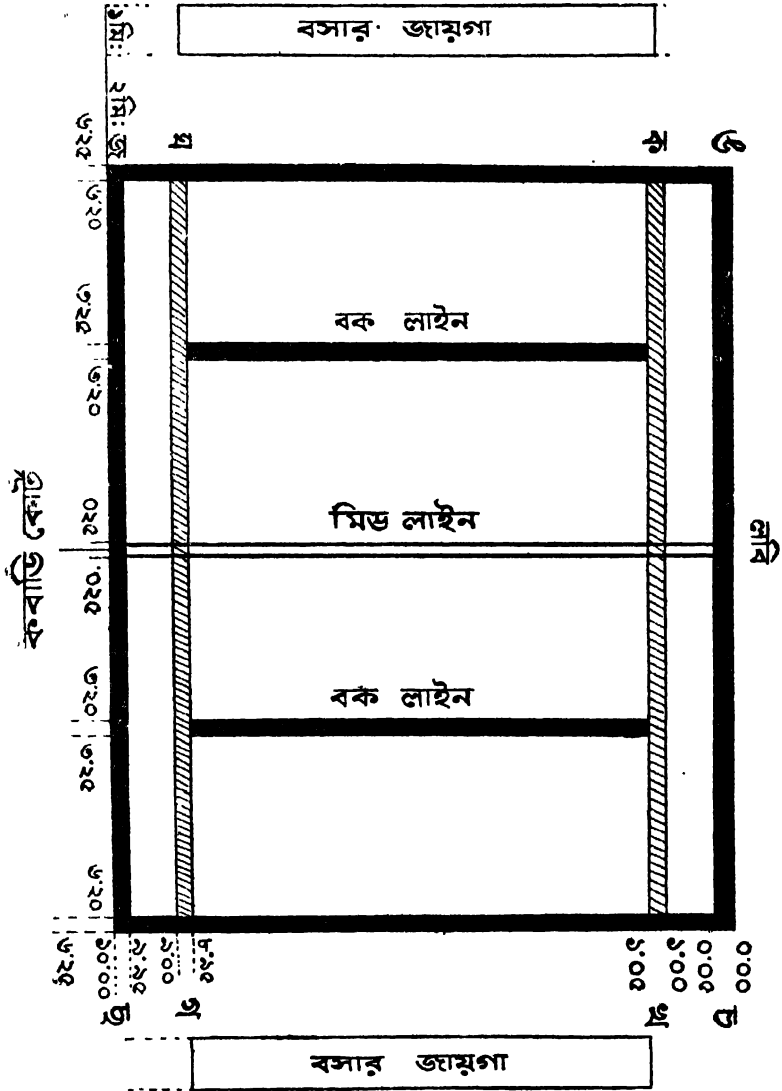
কবাডি খেলার মাঠ

মেয়ে এবং ১৬ বছরের কম ছেলেদের কোর্টের আয়তন। ১১ মিটার × ৮ মিটার

হয়, দ্বিখণ্ডীকরণের পর যেন ৫.৫ মিটার × ৮ মিটার থাকে। লাইনগুলি চুন দিয়ে ৫ সেন্টিমিটার মোটা করে টানতে হবে। কখ, খগ, গঘ ও ঘক হল বাউণ্ডারি লাইন। এই কখ ও ঘগ বাউণ্ডারি লাইন বরাবর এক মিটার দূরে দু'টি লাইন টানা হয়। একে বলে 'লবি'।

মধ্যবর্তী লাইনের দু'দিকে ৩.২৫ মিটার দূরে উভয় কোর্টে যে দু'টি লাইন টানা হয় তাকে 'বক' লাইন বা কোল্-চড়াই বলে। মেয়ে ও ১৬ বছরের কম ছেলেদের জন্য 'বক' লাইন থাকে ২.৫ মিটার দূরে।

খেলা ঃ প্রতি দলের খেলোয়াড় 'কবাডি' 'কবাডি' 'কবাডি' বলতে শুরু করে মধ্যবর্তী লাইন পার হবার সময়ে। তারপর বিপক্ষের কোর্টে থাকতে পারে যতক্ষণ এক-দমে 'কবাডি' 'কবাডি' বলতে পারে। মধ্যবর্তী লাইনে ফিরে আসা পর্যন্ত এই 'কবাডি' 'কবাডি' করতে হয়।

যে খেলোয়াড় বিপক্ষ কোর্টে 'কবাডি' 'কবাডি' শব্দ করতে করতে প্রবেশ করে তাকে বলা হয় 'রেডার' বা হানাদার। যাদের কোর্টে যাওয়া হয় তারা 'অ্যান্টি-রেডার', অ্যান্টি বা হানাদার-বিরোধী।

বিপক্ষ কোর্টে গিয়ে কোনো হানাদার বিপক্ষের এক বা একাধিক খেলোয়াড়ের শরীরের বা পোশাকের যে কোনো অংশ স্পর্শ করলেই সে বা তারা 'মরে' যায়। তাকে বা তাদের কোর্টের বাইরে যেতে হয়। এইভাবে, একজনকে আউট (বা মরে গেলে) করতে পারলে আউটকারী দল একটি পয়েণ্ট পায়। যতজন আউট হয় তত পয়েণ্ট পাওয়া যায়। আবার হানাদারকে নিজেদের কোর্টে ধরে রাখতে পারলে যারা ধরে তাদের অনুকূলেই পয়েণ্ট যোগ হয়। হানা দিয়ে নিজের কোর্টে ফেরার আগে 'কবাডি' 'কবাডি' দম ফুরোলেই বিপক্ষ পয়েণ্ট পায়। হানাদারকে বিপক্ষের বক লাইন ছুঁতে হবে। তা না হলে বিপক্ষ ১ পয়েণ্ট পাবে।

খেলা শুরু হয় টসের মাধ্যমে। টসে বিজয়ী দলের অধিনায়ক পছন্দ করে কোন্ কোর্ট সে নেবে। এরাই প্রথম হানাদার পাঠায় বিপক্ষ কোর্টে। খেলা হয় দুই অর্ধে ২০+২০ মিনিট করে। এর মাঝে ৫ মিনিট বিরতি থাকে। মেয়ে বা কমবয়সী ছেলেদের সময় ১৫+১৫ মিনিট ও ৫ মিনিট বিরতি। দুই দলে ৭+৭=১৪ জনে খেলা হলেও উভয়ে অতিরিক্ত ৫ জন করে দল গঠন করে। অর্থাৎ ১২ জনের দল নিয়ে খেলা হয়। প্রয়োজনে অতিরিক্তদের থেকে ৩ জন বদলী খেলোয়াড় নামানো যায়।

এই খেলায় শারীরিক দক্ষতা, দম ও বুদ্ধির প্রয়োজন। হানাদার সর্বদা লক্ষ্য রাখে কিভাবে অ্যান্টিকে ছোঁবে। আর অ্যান্টিরা চেষ্টা করে কেমন-ভাবে কোথায় ধরলে হানাদারকে কাবু করা যাবে। আবার হানাদার ধরা পড়েও প্রচণ্ড শক্তি প্রয়োগে দমসুদ্ধই মাঝ-লাইন স্পর্শ করলেই এক বা একাধিক বিরোধী 'মরে' যায় ও হানাদার দল পয়েণ্ট সংগ্রহ করে। কেউ যে কোনো কারণে বাউণ্ডারির বাইরে গেলেই বিপক্ষ পয়েণ্ট লাভ করে।

লোনা ঃ কোনো দলের খেলোয়াড়রা আউট বা 'মরতে' 'মরতে' যদি নিঃশেষ হয়ে যায় তবে বিপক্ষ 'লোনা' পায়। বিপক্ষকে সম্পূর্ণ আউট করার পুরস্কারস্বরূপ মেলে অতিরিক্ত ২ পয়েণ্ট। অনেক সময় কোনো দল সময় নষ্ট না করে দু'একজন বেঁচে থাকতেও আত্মসমর্পণ করে লোনা দেয় বিপক্ষকে। লোনা হওয়ার দশ সেকেণ্ডের মধ্যে উভয় দল সমস্ত খেলোয়াড় নিয়ে আবার মাঠে আসবে। লোনা যারা পায় তারা অতিরিক্ত ২ পয়েণ্ট তো পায়ই, আবার আত্মসমর্পণের সময় যদি কোর্টে এক বা একাধিক খেলোয়াড় বেঁচে থাকে তবে তাদের জন্য মাথাপিছু ১ পয়েণ্ট বিপক্ষ পাবে।

খেলা শেষে যাদের পয়েণ্ট বেশি থাকে তাদেরই বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। সমান পয়েণ্ট হলে ৫+৫=১০ মিনিট অতিরিক্ত সময় খেলা হবে। তবে প্রথম পর্যায়ের দ্বিতীয়ার্ধে যে ক'জন খেলেছিল, অতিরিক্ত সময়ে সেই ক'জনই খেলে। আবার ৫০ মিনিট (বড়দের) বা ৪০ মিনিট (মেয়ে ও কমবয়সী ছেলেদের) পরেও যদি সম পয়েণ্ট হয় তা হলে যারা প্রথম পয়েণ্ট স্কোর করে তাদেরই অনুকূলে রায় যায়, অর্থাৎ তাদেরই বিজয়ী ঘোষণা করা হয়।

অধিনায়কের আবেদনে রেফারী 'টাইম-আউট' বা খেলোয়াড়দের মধ্যে সলাপরামর্শের জন্য বিরতি দিতে পারেন। তবে তা যেন ২ মিনিটের বেশি না হয়। এই সময় খেলোয়াড়রা কোর্টের বাইরে যেতে পারে না। 'টাইম-আউটে' যে সময় নষ্ট হয় তা খেলার জন্য নির্দিষ্ট সময়ের সঙ্গে যোগ হয় না।

অন্যান্য খেলার মত কবাডিতেও ডোপিং করা অর্থাৎ উত্তেজক ওষুধ বা ওই ধরনের কিছু খাওয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। প্রত্যেকের নখ ছোট করে কাটতে হবে। খেলোয়াড়দের পোশাকে, পিঠে ও বুকে বড় অক্ষরে নম্বর লিখতে হয়। গায়ে তেল বা ওই ধরনের কিছু মাখা নিষেধ।

পরিচালক ঃ কবাডির জন্য একজন রেফারী, দু'জন আম্পায়ার, দু'জন লাইন্সম্যান, স্কোরার ও দু'জন সহকারী স্কোরার প্রয়োজন।

সাধারণতঃ আম্পায়ারদ্বয়ের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হয়। তবে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে খেলার স্বার্থে রেফারী সিদ্ধান্ত নেন। দুই আম্পায়ারে কোনো কারণে মতভেদ হলেও রেফারীর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত গণ্য হবে।

দণ্ড ঃ যদি কোনো খেলোয়াড় বিপক্ষের হানাদার খেলোয়াড়ের মুখ আটকে ধরে বা অন্য কোনোভাবে দম ('কবাডি' 'কবাডি') বন্ধ করে দেয় ;

যদি কাউকে ছুঁতে গিয়ে বা ধরার সময় আঘাত করার চেষ্টা হয় ;

যদি কোনো দল হানাদার পাঠাতে ৫ সেকেণ্ডের বেশি দেরি করে ;

যদি কোনো দলের খেলোয়াড় বা কোচ বাইরের থেকে কোচিং করার চেষ্টা করেন—তবে রেফারী বা আম্পায়ার সতর্ক করেন বা খেলা থেকে সেই দলকে বাতিল করতে পারেন কিংবা বিরোধী দলকে পয়েণ্ট দিতে পারেন।

রেফারী টস্ করান। খেলা শেষে দুই দলের পয়েণ্ট ঘোষণা করেন। খেলা শুরু ও শেষ করেন বাঁশি বাজিয়ে। বদলী খেলোয়াড়ের নাম বা নম্বর জানান। স্কোরার ও সহকারী স্কোরাররা স্কোরশীটে পয়েণ্ট লেখেন।

খো-খো

মাঠের বিবরণ ঃ আয়তক্ষেত্রাকার মাঠের দৈর্ঘ্য ৩৪ মিটার ও প্রস্থ ১৬ মিটার। এরই মধ্যে দু'দিকে দু'টি আয়তক্ষেত্র (১৬ × ৪.৮ মিটার) এবং এই আয়তক্ষেত্র বাদ রেখে দু'দিকে দু'টি কাঠের দণ্ড বা খুঁটি থাকে। এই দুই খুঁটিতে সংযোগকারী কেন্দ্রপথ মাঠের মধ্যবর্তী স্থান দিয়ে যায়। কেন্দ্রপথের দৈর্ঘ্য ২৪.৪ মিটার ও প্রস্থ ৩০ সেণ্টিমিটার। এই পথের উপরেই ৩০ × ৩০ সেণ্টিমিটারের ৮টি কোট বা ক্ষেত্র তৈরি করতে হবে। তবে প্রতিটি বর্গক্ষেত্রের অবস্থান যেন আর একটি থেকে ২.৭ মিটার দূরে রাখা হয়।

কেন্দ্রপথের সমকোণে এবং সমান দু'ভাগে বিভক্ত ৮টি এড়োপথ (১৬ মিটার × ৩০ সেণ্টিমিটার) ছোট বর্গক্ষেত্রগুলির উপর দিয়ে অতিক্রম করে এবং দু'দিকে ৭.৮৫ মিটারে সীমারেখা পর্যন্ত যায়।

দু'দিকে যে দু'টি কাঠের দণ্ড বা খুঁটি থাকে তা মাটি থেকে ১.২ মিটার উঁচু হবে এবং মোটা বা পরিধি ৩০ থেকে ৪০ সেণ্টিমিটারের মধ্যে রাখা হয়।

ধাবক ও অনুধাবক ঃ খো-খো খেলায় একদল ধাবক ও অন্যদল

প
ফ
১৬ মিটার
লবি
৩০০ সে.মি.
গ
ঘ
ধ
৪৭০ সে.মি.
ট
দণ্ড
২৬০ সে.মি.
২৪০ সে.মি.
৭৮.৫ সে.মি.
৩৪ মিটার
ঙ
ক
খ
দণ্ড
ঠ
দ
লবি
৩০০ সে.মি.
ও
চ
১৬ মিটার
লবি
ব
ভ

খো-খো খেলার কোর্ট
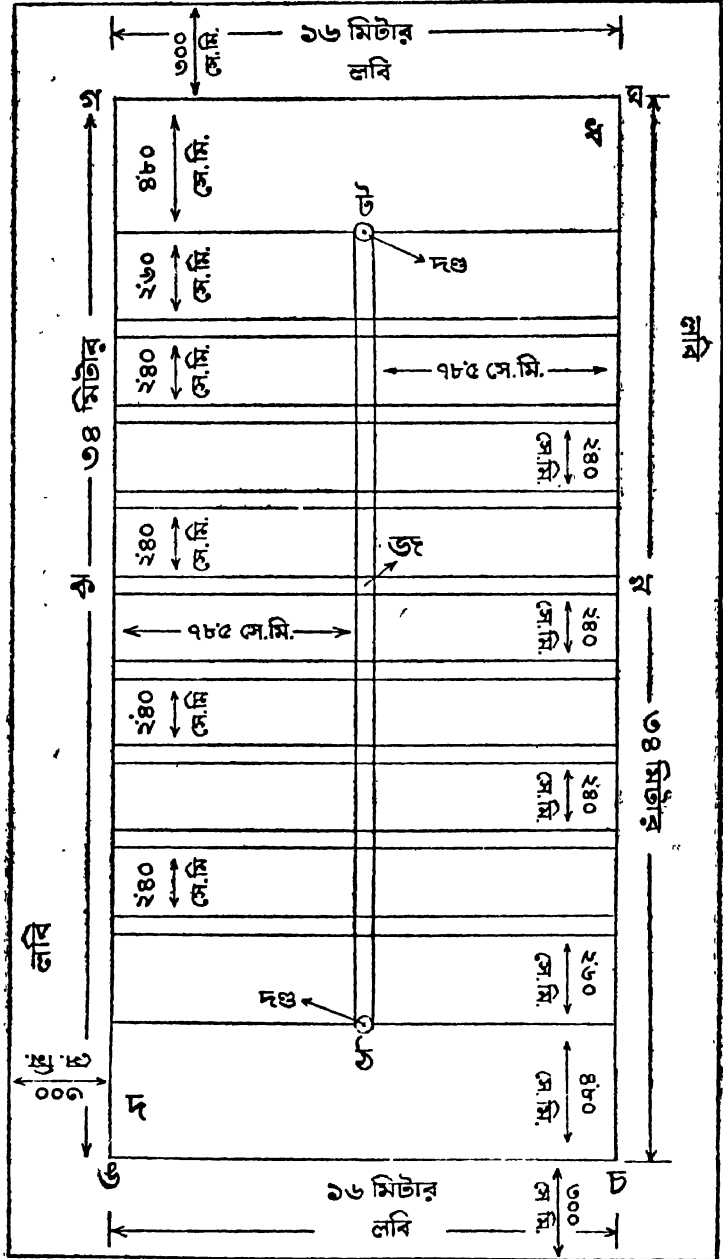
অনুধাবক। বর্গক্ষেত্রের উপর যারা বসে থাকে, তারাই অনুধাবক। তারা বিপক্ষের খেলোয়াড়দের ধাওয়া করে ও ছুটে ছুঁয়ে দিলে 'মর' বা আউট হয়। যাদের আউট করার জন্য বা যাদের পিছনে অনুধাবকরা ছুটে যায় তারাই ধাবক। যে অনুধাবক যখন দৌড়তে থাকে তখনই সে সক্রিয় অনুধাবক।
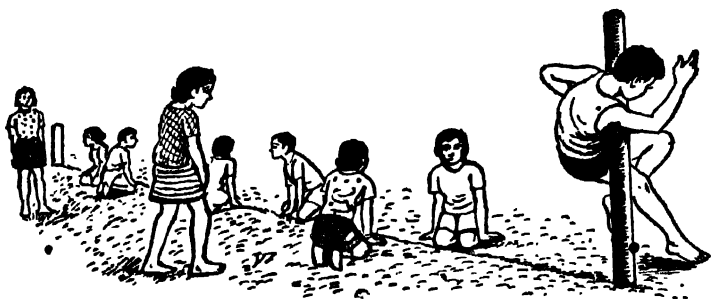
খো-খো খেলায় ধাবক ও অনুধাবক

খো দেওয়া ঃ সক্রিয় অনুধাবক বসে থাকা অনুধাবককে ছুঁয়ে দেয় ও উচ্চৈঃস্বরে 'খো' শব্দ করে। যাকে ছোঁয়া বা স্পর্শ করা হয় সে তৎক্ষণাৎ সক্রিয় অনুধাবক হয়।

খেলার নিয়ম ঃ প্রতি দলে ৯ জন করে খেলোয়াড় থাকে। এখানেও আহত খেলোয়াড়ের পরিবর্তে বদলী খেলোয়াড় নামানো যায়। দুই ইনিংস খেলা হয়। একটি ইনিংস আবার দু'টি টার্ন বা আবর্তে বিভক্ত। প্রতিটি আবর্তে ৭ মিনিট করে খেলা হয়ে থাকে। এক একটি আবর্তের পর ২ মিনিট ও একটি পর্যায়ের পর ৫ মিনিট বিরতি রাখা হয়।

ধাবক দলের অধিনায়ক তার দলের খেলোয়াড়দের ৩টি উপদলে ভাগ করে। শুরুতে তিনজন মাঠে আসে। প্রথম তিনজন 'মর' বা 'আউট' হলে পরবর্তী তিনজন মাঠে প্রবেশ করে। একটি উপদলের শেষ ধাবককে যে সক্রিয় অনুধাবক আউট করে দেয় সে অন্য অনুধাবককে 'খো' দেওয়ার আগেই নতুন উপদল মাঠে আসবে। না এলে তারা 'আউট' বলে গণ্য হবে। আবার নিজের পালা আসার আগে উপদলের কেউ মাঠে ঢুকলে 'আউট' হবে। যে সক্রিয় অনুধাবক উপদলের সর্বশেষ ধাবককে 'আউট' করে সে নতুন উপদলের ধাবককে তাড়া বা পিছু ধাওয়া করতে পারে না। অর্থাৎ বসে-থাকা অনু-

ধাবককে 'খো' দিতে হবে। ৭ মিনিট বা আবর্ত শেষ হওয়া পর্যন্ত এইভাবে চলবে। ধাবকরা একটি দিক দিয়েই মাঠে ঢোকে।

আবর্ত শেষে বা ৭ মিনিটের আগেই অনুধাবকরা অধিনায়কের মারফৎ রেফারীকে জানিয়ে তার অনুমতিতে খেলা বন্ধ করতে পারে।

অনুধাবকরা যতজন ধাবককে আউট করে তারা তত পয়েণ্ট পায়। আর আবর্ত শেষ হওয়ার আগে সকলকে আউট করতে পারলে বিশেষ কৃতিত্ব হিসাবে 'লোনা' পায়। তবে এজন্যে পয়েণ্ট পাওয়া যায় না।

যদি কোনো দল ১২ বা তার চেয়ে বেশি পয়েণ্ট পায় তবে প্রতিদ্বন্দ্বী দলকে ফলো-অন করায়। প্রতিদ্বন্দ্বী দল বেশি পয়েণ্ট পেলে আগের দল পরিত্যক্ত অনুধাবন আবর্তটি আবার খেলতে পারবে।

লীগ-পদ্ধতির খেলায় বিজয়ীরা নক-আউটে ২টি লীগ পয়েণ্ট পায়, কিন্তু নক-আউটে পয়েণ্ট সমান হলে অতিরিক্ত একটি ইনিংস খেলা হয়ে থাকে তবুও অমীমাংসিত থাকলে নতুন করে খেলা হয়।

টসের পরে: টসে জিতে অধিনায়ক স্থির করে ধাবক না অনুধাবক হবে। অনুধাবক দলের ৮ জন পরস্পর মুখোমুখি হয়ে বর্গক্ষেত্রে বসে। আর নবম অনুধাবক সক্রিয় অনুধাবক হয়ে ধাবকদের অনুসরণের জন্য যে কোনো একটি দণ্ড ধরে দাঁড়ায়। সে কোনো কেন্দ্রপথ অতিক্রম করে এদিক-ওদিক যেতে পারে না।

সক্রিয় অনুধাবক 'খো' দেয়, উপবিষ্ট কোনো অনুধাবকের পিছন দিক স্পর্শ করে। 'খো' পেলেই বসে-থাকা অনুধাবক ওঠে ও আগের অনুধাবক তার জায়-গায় বসে পড়ে। সক্রিয় অনুধাবক সর্বদাই সম্মুখে দৌড়য় এবং পূর্ববর্তী সক্রিয় অনুধাবক যে এড়োপথে ছিল তা পরিত্যাগ করে তাকে ধাবকের পথে অনুসরণ করতে হবে—বিপরীত দিক দিয়ে নয়। বসে-থাকা অনুধাবকরা কখনও ধাবককে বাধা দিতে পারে না। আবার ধাবকদেরও তাদের স্পর্শ করা নিয়ম-বিরুদ্ধ। কোনো ধাবকের দুটি পা সীমানার বাইরে গেলে 'মর' বা 'আউট' হয়।

কোনো দিকে যাওয়ার সময় সক্রিয় অনুধাবক সমকোণের বেশি ঘুরতে পারে না।

খো-খো পরিচালনার জন্য একজন রেফারী, দু'জন আম্পায়ার, একজন সময়রক্ষক ও একজন গণনাকারী প্রয়োজন।

আম্পায়ারদ্বয় কেন্দ্রপথের দু'দিকে (লবিতে) দুই প্রান্তে থাকেন।

প্রয়োজনে বাঁশি বাজান। এঁদের সাহায্যের জন্য নিয়মাবলী লঙ্ঘন ইত্যাদির ব্যাখ্যা করেন আম্পায়ার। তিনিই খেলা শেষে কার কত পয়েন্ট হল তা ঘোষণা করেন, অনেক সময় বাঁশি বাজিয়ে আবর্ত শুরু করেন। গণনাকারী বা স্কোরার ধাবক দলের অধিনায়কের কাছ থেকে উপদলের পর্যায়ক্রম নাম, নম্বর ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করেন।

সফ্‌ট্‌বল

কিছুটা রাউণ্ডার্স, কিছুটা ক্রিকেট মিশিয়ে বেসবল খেলা, এ-কথা বলা যায়। আবার এই বেস্‌বলের সামান্য পরিবর্তিত রূপ সফ্‌ট্‌ বল। উভয় খেলাতেই খেলোয়াড়ের সংখ্যা, এমন কি খেলোয়াড়দের অবস্থানের নাম একই এবং শুধু তাই নয়, খেলার মূল নিয়মগুলি ও পরিভাষা একই। সফ্‌ট্‌বল বেসবলের থেকে আকারে ঈষৎ বড়, কিন্তু সফ্‌ট্‌বল মাঠের মাপ মূল খেলার অর্থাৎ বেস্‌বলের মাঠের থেকে ছোট। কিন্তু সবচেয়ে বড় পার্থক্য হল বেসবল খেলায় যেখানে স্বাভাবিক 'ওভারহ্যাণ্ড' বল দেওয়া হয়, সফ্‌ট্‌বলে আণ্ডারহ্যাণ্ড বল ছাড়া অন্যরকম বল করা আইন-বিরুদ্ধ। সফ্‌ট্‌বল বেসবলের তুলনায় কম সময় খেলা হয়—বেসবলে যেখানে প্রতি দল ৯ ইনিংস খেলে, সফ্‌ট্‌বলে ৫ ইনিংস। এইসব সাদৃশ্য এবং পার্থক্যের ভিত্তিতে যদি বলা হয় সফ্‌ট্‌বল আসলে 'আণ্ডারহ্যাণ্ড বেসবল' খেলা, তাহলে নিশ্চয়ই কারও আপত্তি হবে না।

প্রদত্ত নকশা থেকে সফ্‌ট্‌বল **মাঠের পরিকল্পনা এবং ফিল্ডিং দলের অবস্থান** বোঝা যাবে। মাঠটি দু'ভাগে বিভক্ত 'ইনফিল্ড', বা 'ডায়মণ্ড', এবং 'আউটফিল্ড'। বলা বাহুল্য, এই ইন্‌ফিল্ডই মাঠের মূল অংশ। এটি 'রুইতন' বা 'ডায়মণ্ড' আকৃতি বলে সফ্‌ট্‌বল মাঠকে 'সফ্‌ট্‌বল ডায়মণ্ড' বলে। জ্যামিতিক পরিভাষায় বলা যায়, এই মাঠ অতি সামান্য চ্যাপ্টা রম্বসের আকৃতি-বিশিষ্ট। ডায়মণ্ডের চার কোণে চারটি 'বেস' থাকে, এক বেসের সঙ্গে আর এক বেসকে যুক্ত করছে যে বেস-লাইন, তার দৈর্ঘ্য (বা অন্যভাবে বলতে গেলে সফ্‌ট্‌বল ডায়মণ্ডের বা রম্বসের প্রতিটি বাহুর দৈর্ঘ্য) ৬০ ফুট। হোম প্লেট, ফার্স্ট বেস ও থার্ড বেস ডায়মণ্ডের সম্পূর্ণ ভিতরে, হোম প্লেটের ঠিক বিপরীত দিকে দুই বেসলাইনের সংযোগস্থলে থাকে সেকেণ্ড বেস যার অধিকাংশই ডায়মণ্ডের

বাইরে। হোম প্লেট হল রবারের (বা অনুরূপ উপকরণে তৈরি) একটি পাত। হোম প্লেট পঞ্চভুজাকৃতি এবং এর যে লাইনটি পিচারের মুখোমুখি সেটি ১৭ ইঞ্চি চওড়া। আর দুটি বাহু, ব্যাটার্স বক্সের যে লাইনগুলি ডায়মণ্ডের ভিতরে পড়ছে তাদের সমান্তরাল করে এবং লম্বায় ৮½ ইঞ্চি টানতে হবে। বাকি থাকছে ক্যাচারের দিকের বিন্দু-সংলগ্ন দুই বাহু, এগুলি ১ ফুট করে লম্বা।
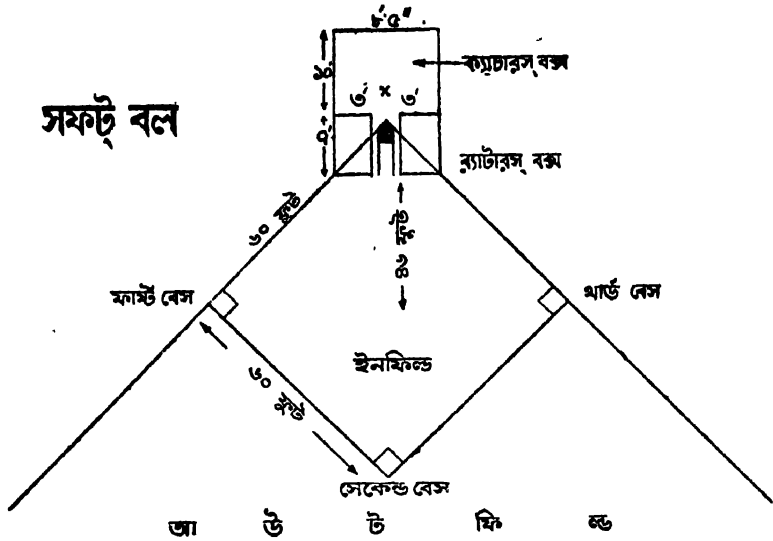
সফ্‌ট্‌বল মাঠ

বেস তিনটি সাদা ক্যানভাস বা অন্য কোনও ঐ ধরনের জিনিস এবং এগুলির মাপ ১৫ ইঞ্চি বর্গ, এগুলি ভালোভাবে বেঁধে রাখতে হয়, যাতে যথাস্থানে থাকে। ডায়মণ্ডের যে দু'টি সীমারেখা হোম প্লেটে এসে মিলিত হচ্ছে এবং ফার্স্ট বেস ও থার্ড বেস ছাড়িয়ে যাদের দৈর্ঘ্য সীমাহীন, তাদের বলা হয় 'ফাউল লাইন', কারণ, কতকগুলি ব্যতিক্রম ছাড়া, ফাউল লাইনের যেদিক ডায়মণ্ডের ভিতরে সেই দিকে বল না মারলে বল 'ফেয়ার বল' হবে না, হবে 'ফাউল বল'। হোম প্লেট থেকে ৪৬ ফুট দূরে (মেয়েদের খেলায় ৪০ ফুট) ডায়মণ্ডের অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ কর্ণটির (diagonal) উপর কাঠ বা রবার দিয়ে তৈরি পিচারের প্লেট বা 'পিচার্স প্লেট', যা লম্বায় ২ ফুট এবং চওড়ায় ৬ ইঞ্চি। পিচার্স প্লেটের উপরের দিক মাঠের সঙ্গে এক সমতলে থাকে। হোম প্লেটের দু'ধারে 'ব্যাটার' বা ব্যাটস্‌ম্যানের দাঁড়ানোর যে দু'টি জায়গা—ব্যাটার্স বক্স, তাদের যে কোনোটিতে ব্যাটার দাঁড়াতে পারে।

খেলা হয় দু'দলের মধ্যে, প্রতি দলে ৯ জন করে খেলোয়াড় থাকে। সম্পূর্ণ গেমে প্রতি দল পাঁচটি ইনিংস খেলে। ব্যাটিং পক্ষের কেউ সব ক'টি বেস একবার ঘুরে আসতে পারলে তাদের একটি রাণ হয়।

এই খেলার বল ক্রিকেটের বলের থেকে সামান্য বড় হয়, পরিধি ১১৳ ইঞ্চির কম বা ১২৳ ইঞ্চির বেশি হলে চলবে না। ওজনেও ক্রিকেট বলের থেকে সামান্য ভারী,—ক্রিকেট বলের ওজন যেখানে ৫¾ আউন্সের বেশি হতে পারে না, সফ্‌ট্‌ বলের ওজন কমপক্ষে ৬ আউন্স হবে, অবশ্য ৬¾ আউন্সের বেশি হবে না। সফ্‌ট্‌বলের ব্যাট আসলে মজবুত কাঠ দিয়ে তৈরি একটি বেলনাকার মুগুর, লম্বায় অনধিক ৩৪ ইঞ্চি। এর সব থেকে মোটা জায়গাটির পরিধি ২¼ ইঞ্চি অতিক্রম করবে না।

সফ্‌ট্‌বলে পিচারের ভূমিকা ক্রিকেটের বোলারের অনুরূপ। পিচার দু'টি পা মাটিতে এবং পিচার্স প্লেটের সংস্পর্শে রেখে বল ডেলিভারী করবে বা 'পিচ্‌' করবে। এর কতকগুলি নিয়ম আছে। পিচিং-এর আগে পিচারকে দুহাতে সামনের দিকে বল ধরে, ব্যাটারের দিকে মুখ করে এবং দুই কাঁধ ফার্স্ট বেস ও থার্ড বেসের লাইনে রেখে অন্ততঃ ১ সেকেণ্ড (কিন্তু কোনো ক্রমেই ২০ সেকেণ্ডের বেশি নয়) থাকতে হবে, তারপর বল থেকে একটি হাত তুলে নিয়ে অপর হাতটির সাহায্যে আণ্ডারহ্যাণ্ড বল দিতে হবে। বল ডেলিভারীর সময় বল দিতে দিতে পিচার সামনের দিকে, ব্যাটারের দিকে এক পা এগিয়ে যেতে পারবে, তার বেশি নয়। এই সময় ক্যাচার তার নির্দিষ্ট জায়গা অর্থাৎ ক্যাচার্স বক্সে না থাকলে চলবে না। পিচারের দু'টি প্রধান উদ্দেশ্য হল: (১) বলটি যেন 'স্ট্রাইক' হয়, অর্থাৎ যে কোনো উচ্চতা দিয়ে হোম প্লেটের উপর দিয়ে গিয়ে ব্যাটারের হাঁটু এবং কাঁধের মাঝখান দিয়ে চলে যায়, সেদিকে দৃষ্টি রাখা এবং (২) ব্যাটার যাতে বল ফস্‌কায় সেই চেষ্টা করা।

ব্যাটারের পিছনে দাঁড়ায় ক্যাচার, যার দায়িত্ব ক্রিকেটের উইকেটকীপারের অনুরূপ। ক্যাচারকে সব সময় সজাগ থাকতে হয় যাতে সে বল থামাতে পারে এবং বিশেষ করে, যাতে বলের তৃতীয় 'ফেয়ার' বা আইনসম্মত ডেলিভারীটি ব্যাটার ফস্‌কালে তা' লুফে নিয়ে সে ব্যাটারকে 'আউট' করতে পারে। ব্যাটারের চালানো ব্যাট লেগে আহত হবার সম্ভাবনা থাকায় ক্যাচারদের একরকম পাগড়ি পরা বাধ্যতামূলক। এই পাগড়িগুলি দেখতে অনেকটা ফেন্সিং (অসিক্রীড়া)-এর মুখোসের মত। মহিলা ক্যাচারদের এই

পাগড়ি ছাড়াও শরীর বাঁচাবার জন্য শরীরে প্যাড পরে খেলা বাধ্যতামূলক। মোটের উপর ক্যাচারের ভূমিকা উইকেটকীপারের থেকে কোনো অংশে কম নয়, বরং বলা যেতে পারে যে, তার ঝুঁকি অনেক বেশি।

পিচার ও ক্যাচার 'ব্যাটারী'র ফিল্ডার। তিন বেসম্যান ও সর্ট স্টপ হল, ইনফিল্ডের ফিল্ডার। প্রথম বেসে বা তার কাছাকাছি জায়গায় দাঁড়ায় ফার্স্ট বেসম্যান, প্রথম ও দ্বিতীয় বেসের মাঝামাঝি সেকেণ্ডম্যান, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বেসের মাঝামাঝি সর্ট স্টপ এবং তৃতীয় বেসে বা তার কাছাকাছি থার্ড বেস-ম্যান। বেসম্যানদের কাজ হল বেস-রাণারদের বেসে পৌঁছানো আটকানো এবং অন্যান্য বেসম্যানদের নিজ নিজ বেস সুরক্ষিত রাখার ব্যাপারে সাহায্য করা। বাকি থাকছে আউটফিল্ডের ফিল্ডার তিনজন। আউটফিল্ডের যেমন জায়গায় যে দাঁড়াবে—ডান, মাঝ বা বাম, সেই অনুসারে তাকে বলা হবে রাইট ফিল্ডার, সেণ্টার ফিল্ডার বা লেফ্‌ট্‌ ফিল্ডার। এদের কাজ প্রধানত বল থামানো বা কুড়িয়ে আনা এবং যেখানে বলের দরকার হচ্ছে সেখানে বল ছুঁড়ে দেওয়া।

খেলা শুরুর আগে টসের সাহায্যে ঠিক করে নেওয়া হয় ইনিংসে প্রথম বা শেষে ব্যাট করবে কোন্ পক্ষ; জয়ী পক্ষ যা খুশি করতে পারে। ব্যাটার যদি 'ফেয়ার' হিট করে কিংবা তৃতীয় স্ট্রাইক ফস্‌কায় তাহলে তাকে সরাসরি ছুটতে হবে। আগেই বলা হয়েছে, তৃতীয় স্ট্রাইকে বলটি মাটিতে পড়ার আগেই ক্যাচার সেটি লুফে ফেললেই ব্যাটার আউট হয়ে যাবে। কিংবা, ক্যাচার বলটি পাঠিয়ে দেবার পর ব্যাটার এসে শরীরের কোনো অংশ দিয়ে ফার্স্ট বেস স্পর্শ করার আগেই যদি ফার্স্ট বেসম্যান হাতে বল ধরা অবস্থায় সেই কাজ করতে পারেন তাহলেও ব্যাটার আউট হবে।

ক্রিকেটে ব্যাটে লাগা ক্যাচের বলের মত সফ্‌টবলেও 'ফ্লাই' বল আছে, এবং 'ফাউল ফ্লাই' অর্থাৎ যে 'ফ্লাই' ফাউল এলাকায় পড়ছে সে ফ্লাই কেউ লুফে ফেললেও ব্যাটার আউট হবে। কোনও ফিল্ডার বল ধরে সেই বল দিয়ে বেস-রাণারকে স্পর্শ করলে তবেই বেস-রাণার আউট হবে। রাণ করবার সময় বেস-রাণাকে বেস সংযোগকারী লাইনগুলির ৩ ফুটের মধ্যে থাকতে হয়। কিন্তু যখনই ব্যাটারের তৃতীয় স্ট্রাইকের সঙ্গে সঙ্গে তাকে এক বেস এগিয়ে যেতে হচ্ছে অথচ তার অভীষ্ট বেসটি যে বেসম্যান আগলাচ্ছে তার হাতেই বল, তখন কাজটি খুবই শক্ত হয়ে যায়। আবার বলের স্পর্শ এড়ানোর জন্য উল্টো দিকেও সে আইনতঃ ছুটতে পারে না, ছুটলে আউট হবে। ব্যাটার ফার্স্ট

বেসে গেলে সে-ই বেস-রাণার হয়। যদি পিচার চারটি 'বল' দেয়—তা হলেই ব্যাটার এক বেস এগিয়ে ফার্স্ট বেসে গিয়ে বেস-রাণার হবে। এই 'বল' কিন্তু আসলে বিধিবহির্ভূত বল, ক্রিকেটে যাকে 'নো বল' বলা হয়। যে পিচ্ করা বল ব্যাটারের কাঁধ এবং হাঁটুর মাঝখান দিয়ে হোম প্লেটের উপর দিয়ে যায় না বা হোম প্লেটে পৌছাবার আগেই মাটি স্পর্শ করছে এবং ব্যাটার যেটি মারেননি সেটাই 'বল'। আবার বল পিচ করার সময় পিচিং সংক্রান্ত বিধি ভঙ্গ করলেও 'বল' ডাকা হয়। বল ঠিক জায়গা দিয়ে গেলে তাকে 'স্ট্রাইক' বলা হয়, একথা আগেই বলেছি। যদি তৃতীয় স্ট্রাইকে ব্যাট চালিয়েও ব্যাটার বলটি ফসকে যায় এবং বলটি তার শরীরে কোনো অংশ স্পর্শ করে তা হলে ব্যাটার আউট হবে। এটা ক্রিকেটের এল. বি. ডব্লিউ.-এর মত। তিনজন আউট না হওয়া পর্যন্ত একটি দল ব্যাট করে; তৃতীয় আউটের সঙ্গে সঙ্গেই দলের ইনিংস শেষ হয়ে যায় এবং দলের পরবর্তী ইনিংস যখন আবার শুরু হবে তখন এই অবস্থা থেকেই হিসাব হবে। পাঁচ ইনিংসে যে দল রাণ বেশী করছে সেই দলই জয়ী হয়, তবে 'টাই' হয়ে গেলে যতক্ষণ না মীমাংসা হয় ততক্ষণ পর্যন্ত ইনিংস বাড়িয়ে খেলার ব্যবস্থা আছে।

সফ্‌টবলের স্কোর লেখার পদ্ধতি খুব জটিল। এখানে এইটুকুই বলা যেতে পারে যে, স্কোর-শীটে প্রত্যেকটি খেলোয়াড়ের কাজের হিসাব থাকে। ক্রিকেটে তো কেবল ফিল্ডিং-পক্ষের যারা উইকেট নেয়, বা ক্যাচ ধরে তাদের এবং স্টাম্প করলে উইকেটকীপারের কৃতিত্ব দেওয়া হয় ও স্কোর-বুকে নাম থাকে। কিন্তু সফ্‌টবলের স্কোর-শীটে কে ব্যাটারকে বা বেস-রাণারকে আউট করল, সেটা কার নিপুণ ফিল্ডিংয়ের জন্য সম্ভব হয়েছে, কার ভুলের বা খারাপ থ্রো-এর দরুণ বিপক্ষ একটি বেস করে ফেলেছে ইত্যাদি সব কিছুর রেকর্ড থাকে।

সফ্‌ট্‌বলের আর একটি অদ্ভুত ব্যাপার হল খেলার মাঝেই কোচিং। বেস-রাণারদের দলের দু'জন দু'টি বক্সে থাকে—ফার্স্ট বেস এবং থার্ড বেসের কাছে; এ দু'টিকে বলে কোচেস বক্স। পিচার, বেসম্যান এবং ফিল্ডারদের লক্ষ্য করে তারা উপদেশ দেয় কখন ছুটতে হবে, কখন হিট করতে হবে বা কখন 'বেস চুরি' করতে হবে। অনেক সময় কোচেরা নানা রকম সরস মন্তব্য করে ফিল্ডিং-পক্ষের খেলোয়াড়দের অন্যমনস্ক করে দেয় যাতে সেই সুযোগে চালাক বেস-রাণার দ্রুত ছুটে গিয়ে একটি বেস চুরি করতে পারে।

টেনিকয়েট

১। ডাবলস্ বা চারজন খেলোয়াড়ের খেলার জন্য আইনসম্মত কোর্ট লম্বায় ৪০ ফুট এবং চওড়ায় ১৮ ফুট (১২.২ × ৫.৫ মিটার) হবে, সিঙ্গলস্ বা দুই খেলোয়াড়ের জন্য হবে লম্বায় ৪০ ফুট এবং চওড়ায় ৯.ফুট (১২.২ মি. × ২.৮ মি.)। জালের উভয় দিকে ৩ ফুট (০.৯১ মিটার) করে চওড়া (মোট ৬ ফুট অর্থাৎ ১.৮৩ মিটার) অক্রিয় এলাকা (Neutral Ground) থাকবে।
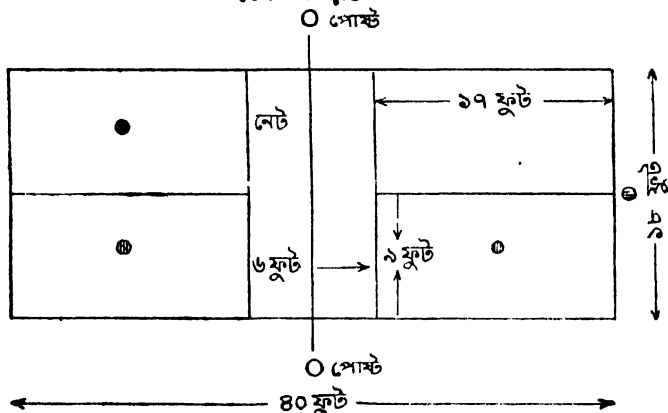
২। জাল হবে তামাটে রং করা বা আলকাতরা মাখানো দড়ির তৈরি, লম্বায় ১৯ ফুট থেকে ২০ ফুট (৫.৮৫ থেকে ৬.১ মিটার) এবং চওড়ায় ১৮ ইঞ্চি (৪৬ সেন্টিমিটার)। জালের মাথা পোস্টের কাছে মাটি থেকে ৫ ফুট (১.৫২ মিটার) উঁচুতে থাকবে এবং এর উপরের দিকটা দু'পিঠে সাদা ফিতে দিয়ে মোড়া থাকবে; ফিতের ভিতর দিয়ে একটি দড়ি দুই পোস্টের মাথায় বেঁধে জালটাকে আটকে লাগাতে হবে।

৩। পোস্ট ৫ ফুট (১.৫২ মিটার) উঁচু হবে এবং যথেষ্ট মজবুত হবে, যাতে জাল টান করে বেঁধে রাখা যায়। জালের মধ্যস্থল মাটি থেকে ৪ ফুট ৯ ইঞ্চি (১.৪৭ মিটার) উঁচুতে থাকবে।

৪। রিংয়ের ব্যাস ৭ ইঞ্চির (১৭.৮ সেন্টিমিটার) মত হবে, ঘনত্ব ১¼ ইঞ্চি (৩.২ সেন্টিমিটার) এবং ওজন ৭ থেকে ৯ আউন্স (১৯৮ থেকে ২৫৫ গ্রাম) হবে।

৫। প্রতি দিকে এক কিংবা দু'জন করে খেলোয়াড় খেলে।

টীকা: ডাবলসের খেলার কোর্টে, কোর্টের আধখানা নিয়ে সিঙ্গলস্ খেলা যাবে।

৬। কোন্ পক্ষ কোন্ কোর্ট বা প্রান্ত নিয়ে খেলবে সেটা টসের সাহায্যে স্থির হবে। পরাজিত পক্ষ প্রথমে সার্ভিস করবে। কিংবা কোন্ পক্ষ প্রথমে সার্ভিস করবে সেটা টসের সাহায্যে স্থির হলে পরাজিত পক্ষ প্রান্ত বেছে নেবে; যারা একটি গেম জিতবে, তারাই পরবর্তী গেম আরম্ভ করবে, কিন্তু তাদের যে কোনো খেলোয়াড় সার্ভ করতে পারবে।

৭। সিঙ্গলস্-এর খেলাতে ১৫ পয়েন্টে গেম, ডাবলস্-এর খেলাতেও তাই। কিন্তু যদি কোনো সময় স্কোর ১৪—১৪ হয়, তাহলে সেটকে দীর্ঘায়িত করতে হবে অর্থাৎ একপক্ষ যতক্ষণ না অপর পক্ষ থেকে দু'পয়েন্ট এগিয়ে যাচ্ছে ততক্ষণ খেলা চালাতে হবে, যেমন—১৭-১৫, ২৪-২২।

স্কোরের হিসাব টেনিস বা ভলিবলের পদ্ধতিতে রাখতে হবে।

৮। তিন গেমের মধ্যে সবচেয়ে বেশি গেম ('বেস্ট অব থ্রী') যে পক্ষ পাবে, তাদেরই রাবার হবে। প্রতি নতুন গেমের শুরুতে খেলোয়াড়রা প্রান্ত পরিবর্তন করে নেবে। এ ছাড়া তৃতীয় গেমে যখন অগ্রগামী পক্ষের ৮ পয়েন্ট তখনও প্রান্ত পরিবর্তন করতে হবে।

৯। ডাবলস্-এর খেলায়, যে পক্ষ প্রথম সার্ভ নেবে ('সাইড ইন'), তাদের একজন খেলোয়াড় ডান দিকের কোর্টের পিছনের লাইনের উপর বা পিছনে তার পছন্দমত যে কোনো জায়গা থেকে সার্ভ করে রিং কোণাকুণি-ভাবে বিপরীত কোর্টটিতে পাঠাবে (নকশায় সার্ভারের অবস্থান দ্রষ্টব্য) এবং তার সহ-খেলোয়াড় বাম দিকের কোর্টের যে কোনো জায়গায় দাঁড়াবে। যে বিপক্ষীয় খেলোয়াড়ের উদ্দেশ্যে ছোঁড়া হয়েছে কেবল সে-ই রিং ধরবে এবং ১০নং নিয়ম মেনে সে ঐ কাজ করলে, জালের উপর দিয়ে প্রতিপক্ষের সীমানার মধ্যে যে কোনো জায়গায় রিং ফেলবে। সেখানে ইন্ পক্ষের খেলোয়াড়দ্বয়ের যে কেউ রিং ধরে আবার বিপক্ষীয় খেলোয়াড়দ্বয়ের কারও দিকে পাঠিয়ে দেবে। এইভাবে খেলা চলবে যতক্ষণ না নিম্নলিখিত নিয়মগুলির কোনোটি অনুযায়ী রিং 'ডেড্' হয়। ইন্ পক্ষ প্রথমে পয়েন্ট করলে তাদের এক পয়েন্ট ধরা হবে, কিন্তু তাদের বিপক্ষ (আউট পক্ষ বা 'সাইড আউট') পয়েন্ট করলে ইন্ পক্ষ সার্ভিস হারাবে মাত্র, এবং সার্ভিস পাবে আউট পক্ষ, কোনো পক্ষেরই পয়েন্ট ধরা হবে না। এইভাবে

সার্ভিস পেয়ে 'আউট' পক্ষ হয়ে যাবে 'ইন্' পক্ষ এবং উল্লিখিতভাবে খেলা চালিয়ে যাবে। যদি 'ইন্' পক্ষ প্রথম পয়েণ্ট করে তাহলে এবং ফলে পক্ষে এক বিপক্ষে শূন্য পয়েণ্ট (বা 'ওয়ান, লাভ্') হয়, যে খেলোয়াড় সার্ভ করছিল সে-ই সার্ভ করে যাবে কিন্তু এবার বাঁদিকের কোর্টের পিছন থেকে এবং তার সহ-খেলোয়াড় যাবে ডান দিকের কোর্টে। তবে সার্ভিস আগের মতই সার্ভারের কোণাকুণি অবস্থিত বিপক্ষীয় খেলোয়াড়ের উদ্দেশ্যে করতে হবে। বলা বাহুল্য, সার্ভার শেষ যার দিকে সার্ভ করেছিল এবার সার্ভ করতে হবে তাকে বাদ দিয়ে অপরজনের দিকে, কারণ 'আউট' পক্ষের খেলোয়াড়রা যে-যার কোর্টে থাকবে, এবং যতক্ষণ না তারা 'ইন্' পক্ষ হচ্ছে ততক্ষণ নিজেদের মধ্যে কোর্ট বদল করবে না। যতক্ষণ 'ইন্' পক্ষ পয়েণ্ট জিতে যায় ততক্ষণ তাদের হাতে সার্ভিস থাকে, কিন্তু পয়েণ্ট হারালেই বিপক্ষের কাছে তারা সার্ভিস খোয়াবে, অবশ্য বিপক্ষের অনুকূলে কোনো পয়েণ্ট গোনা হবে না যতক্ষণ না তারা সার্ভিস পাবার পর পয়েণ্ট করতে পারবে। উদাহরণস্বরূপ, মনে করা যাক 'ইন্' পক্ষ চার—শূন্য ('ফোর, লাভ্') করে পরের পয়েণ্ট হারায়, তখন 'আউট' পক্ষ সেই পয়েণ্ট জিতে সার্ভ নেয় এবং শূন্য, চার ('লাভ্, ফোর') হয় এবং তারপর খেলা চলে। ডাবলস্-এর খেলায় কোনো পক্ষ সার্ভিস হারালে যে খেলোয়াড় সার্ভিস করছিল সে ডান দিকের কোর্টেই থাকবে এবং ফলে প্রতিপক্ষের প্রথম সার্ভিসটি ধরবে, তার সহ-খেলোয়াড় বামদিকের কোর্টে থাকছে এবং সম্ভবস্থলে দ্বিতীয় সার্ভিস ধরবে।

আউট পক্ষ যখন সার্ভিস জিতবে, তখন সার্ভিস করবে তাদের বাম দিকের কোর্টের খেলোয়াড় এবং যখন তারা সার্ভিস হারাবে, এই খেলোয়াড় ডান দিকের কোর্টে যাবে এবং সার্ভ করবে প্রতিপক্ষের বাম কোর্টের খেলোয়াড়, এইভাবে পর্যায়ক্রমে সার্ভিস নিতে হবে।

সিঙ্গলস্-এর খেলায় এক-একদিকে মাত্র একটি কোর্ট নিয়ে খেলোয়াড় থাকার জন্যে যেহেতু কোর্ট বদল অসম্ভব, তাই সার্ভিস হস্তান্তর হয় মাত্র।

সার্ভিস হওয়ার পর সার্ভার এবং অন্যান্য খেলোয়াড়রা নেটের তাদের প্রান্তে পছন্দমত যে কোনো জায়গায় থাকতে পারে, কোনো সীমারেখা থাকলেও। (১৬নং নিয়ম দ্রষ্টব্য)

১০। রিং অবশ্যই এক হাত দিয়ে ধরতে হবে, যে কোনো হাতই ব্যবহার করা যেতে পারে। দু'হাতে ধরা নিয়মবিরুদ্ধ এবং তা করলে পয়েণ্ট যাবে। খেলোয়াড় বা তার সহ-খেলোয়াড় হাতে করে শরীরের যে কোনো অংশে

আঁকড়ে বা যে কোনো অংশের উপর রিং ধরতে পারবে, রিং মাটি স্পর্শ না করলেই হল। কিন্তু সব সময় রিং অবশ্যই হাত দিয়ে ছুঁড়তে হবে। সার্ভিস থেকে পাওয়া বাদে খেলার অন্য সময় এক পক্ষের দুই খেলোয়াড়ই একই সময়ে রিংয়ে একটি হাত দিয়ে ধরলে ক্ষতি নেই, কিন্তু রিং ফেরৎ পাঠাবে একজন খেলোয়াড়ই ; আবার, একজনের ছোঁওয়া লাগার পর তার সহ-খেলোয়াড় রিং ধরতে পারবে, কিন্তু যে ধরবে সে-ই ফেরৎ পাঠাবে।

১১। সার্ভ করার সময় এবং খেলার সময় রিং অবশ্যই এমনভাবে ছাড়তে হবে যেন তার উপরের দিকে যাবার ঝোঁক থাকে এবং হস্তচ্যুত হওয়ার পর রিং অবশ্যই অন্ততঃ ৬ ইঞ্চি (১৫.২৪ সেন্টিমিটার) ওঠে। কোনো ধরনের 'ওভারহ্যাণ্ড ডেলিভারি' করা চলবে না, করলে পয়েণ্ট যাবে। এ ছাড়া কোনো ক্ষেত্রেই হাত নেট ছাড়িয়ে যাবে না।

সার্ভিসের সময় রিং এদিক-ওদিক নড়ানো চলবে না।

১২। খেলোয়াড় কোর্টের যেখানে রিং ধরেছে আনুমানিক সেই জায়গা থেকেই সে রিং ফেরৎ পাঠাবে। মাঝকোর্টে রিং ধরে, জাল পর্যন্ত হেঁটে গিয়ে রিংটি একরকম ফেলে দেওয়া—এই ধরনের জিনিস চলে না, এবং করলে পয়েণ্ট যাবে।

১৩। কোনো ধরনের প্রবঞ্চনামূলক কাজ করা চলবে না, করলে একটি পয়েণ্ট যাবে। এই ধরনের কাজের মধ্যে সব চেয়ে বেশি যা দেখা যায় তা হল রিং ধরে ছাড়ার ভান করে না ছাড়া।

১৪। সার্ভ করতে গিয়ে ইচ্ছা করলে সার্ভার কিছুটা ছুটে আসতে পারে, অবশ্য রিং তার হাত থেকে বেরোনোর সময় সে কোর্টের ব্যাক-লাইনের উপরে বা পিছনে থাকবে।

১৫। সার্ভার একবারই মাত্র সার্ভ করবে। ব্যতিক্রম—তবে যে ক্ষেত্রে সার্ভের পর রিং উপর দিয়ে যেতে যেতে নেট স্পর্শ করে (একে 'লেট' বলা হয়) কিন্তু তা ছাড়া সেটা 'দোষহীন'—সার্ভটি হিসাবের মধ্যে ধরা হবে না এবং আবার নতুন করে করতে হবে। যদি রিং উপর দিয়ে যেতে যেতে নেট স্পর্শ করে কিন্তু কোনো খেলোয়াড়ের স্পর্শ না পেয়ে ভুল কোর্টে পড়ে বা সীমানার বাইরে যায়, তাহলে সেটি 'ফাউল স্ট্রোক' গণ্য হবে এবং সার্ভিস স্বাভাবিক নিয়মে বিপক্ষের হাতে চলে যাবে। **সার্ভের সময় ছাড়া খেলার মধ্যে অন্য সময় নেটের উপর দিয়ে যেতে যেতে রিং নেট স্পর্শ করলে সেটা দণ্ডনীয় নয়।**

১৬। কোনো খেলোয়াড় অক্রিয় এলাকায় দাঁড়াতে পারবে না,—দাঁড়ালে পয়েণ্ট যাবে—বা রিং ঐ এলাকায় ফেলবে না। রিং ঐ এলাকায় পড়লে যে পক্ষ ছুঁড়েছে তাদের এক পয়েণ্ট যাবে।

টীকা :— কোনো লাইনের উপর পা পড়লে সেটা কোর্টের মধ্যেই গণ্য করা হয়, এবং দণ্ডনীয় নয়।

১৭। রিং অবশ্যই নেটের উপর দিয়ে খেলতে হবে এবং পোস্টের পাশ দিয়ে ঘুরে কোর্টের মধ্যে ঢুকলে চলবে না।

১৮। সার্ভের পর রিং 'ঠিক' কোর্টে পড়বার বা, সার্ভ-পরবর্তী খেলার ক্ষেত্রে, রিং কোর্টের এলাকার মধ্যে পড়বার আগে যদি কোনো খেলোয়াড়ের স্পর্শ না পায় তাহলে যে পক্ষ ধরতে পারল না তাদের পয়েণ্ট যাবে। সার্ভের পর 'ঠিক' কোর্টের বাইরে বা সার্ভ-পরবর্তী খেলায় সীমানার বাইরে রিং পড়ার আগে যদি কোনো খেলোয়াড়ের স্পর্শ না পায় তা হলে যে পক্ষ রিং ছুঁড়েছে তাদের পয়েণ্ট যাবে। (স্পর্শ পেলে কী হবে সে সম্পর্কে ২১নং নিয়ম দ্রষ্টব্য।)

১৯। রিং যে জায়গা স্পর্শ করে সেটাই মাটির সঙ্গে রিংয়ের প্রথম সংযোগস্থল গণ্য হবে, শেষ পর্যন্ত যে জায়গায় স্থির হয়ে যায় সেটা নয়। কোনো সীমানার লাইনে রিং পড়লে শেষ পর্যন্ত যেখানেই যাক না কেন, রিং কোর্টের মধ্যেই পড়েছে ধরা হবে।

২০। বিপক্ষ প্রস্তুত না হওয়া পর্যন্ত সার্ভার সার্ভ করবে না।

২১। কোনো খেলোয়াড় যেখানেই দাঁড়াক না কেন (অক্রিয় এলাকা ছাড়া) যদি সে রিং ধরে বা এমন কি শুধু স্পর্শও করে তা হলে ধরাটা আইন-সিদ্ধ বলে গণ্য হবে, অবশ্য যদি তা ১০নং নিয়ম অনুযায়ী হয়ে থাকে। যদি স্পর্শ করার পর রিং পড়ে যায়, তাহলে খেলোয়াড় ও রিং কোর্টের সীমানার বাইরে (অক্রিয় এলাকা বাদে) থাকলেও খেলোয়াড়টির পয়েণ্ট যাবে।

২২। যদি সার্ভিসে রিং উপর দিয়ে যেতে যেতে নেটের মাথা ছুঁয়ে যাবার পর সার্ভিস যে খেলোয়াড়ের উদ্দেশ্যে করা সে রিং ধরে, তাহলে ধরে নেওয়া হবে যে, রিং 'ঠিক' কোর্টেই পড়ত। ফলে, ১৫নং নিয়ম অনুযায়ী সার্ভিস লেট হয়ে যাবে এবং আবার করতে হবে।

২৩। রিং অবশ্যই সঙ্গে সঙ্গে ফেরৎ পাঠাতে হবে, হাতে রাখা চলবে না। হাতে রিং রাখলে তা ১৩নং নিয়মবলে 'প্রবঞ্চনা'র আওতায় পড়বে।

২৪। কোনো খেলোয়াড় 'ভুল' কোর্ট থেকে বা ক্রমের বাইরে বা ভুল

কোর্টে দাঁড়ানো প্রতিপক্ষকে সার্ভ করলে তার পক্ষে বা বিরুদ্ধে করা পয়েন্ট ধরা হবে না ; পরবর্তী সার্ভিস খেলা হওয়ার আগের সার্ভিস পর্যন্ত জেতা বা হারা পয়েন্ট গোনা হবে। তারপর সার্ভিসের ভুল সংশোধন করে নিয়ে খেলা আবার শুরু করতে হবে।

২৫। রিং যে-হাতে ধরা হয়েছে সেই হাত দিয়েই ফেরৎ পাঠাতে হবে।

ব্যাডমিণ্টন

কোর্ট ঃ স্থানাভাবে সিঙ্গলস্ কোর্ট করা হলে তার মাপ ঃ আয়তক্ষেত্রাকার কোর্টের দৈর্ঘ্য ১৩.৪০ মিটার ও প্রস্থ ৫.১৮ মিটার। এবং ব্যাক লাইনগুলো লং সার্ভিস লাইন হিসাবে গণ্য হবে। ব্যাক বাউণ্ডারি লাইন
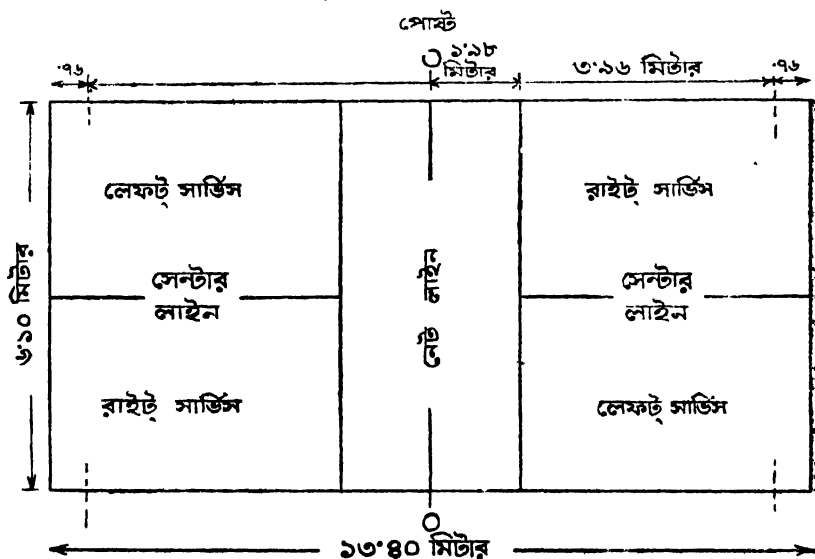
থেকে সর্ট সার্ভিস লাইনের দূরত্ব হবে ৪.৭২ সেন্টিমিটার। সেখান থেকে নেট বা নেটের দূরত্ব ১.৯৮ মিটার। দু'দিকেই সর্ট সার্ভিস লাইন থেকে নেটের দূরত্ব একই। কারণ, হয়তো সকলেরই জানা—নেট থাকে কোর্টের মাঝে আড়াআড়িভাবে। ব্যাক বাউণ্ডারি লাইন থেকে সর্ট সার্ভিস লাইন পর্যন্ত

কোর্টটিকে লম্বালম্বি দুই ভাগ করতে হয় সেণ্টার লাইনের মাধ্যমে নেটের দিকে মুখ করে। কোর্টের উভয় দিকে দাঁড়ালে ডান ও বাম সার্ভিস কোর্ট মুখোমুখি হয়। ডাবলসে কোর্টের দৈর্ঘ্য ১৩.৪০ মিটার এবং প্রস্থ ৬. ০ মিটার। সিঙ্গলসের সঙ্গে এর পার্থক্য শুধু প্রস্থে। অর্থাৎ সাইড-লাইন দু'দিকে সরবে ০.৪৬ মিটার করে। এবং মোট প্রস্থ দাঁড়ায় ৬.১০ মিটার। আর ব্যাক বাউণ্ডারি লাইন থেকে উভয় দিকে কোর্টের ০ ৭৬ মিটার ভিতরে ডাবলস-এর লং সার্ভিস লাইন টানা হয়।

আমাদের দেশে সিমেণ্ট বা মাটির কোর্টে খেলা হয়। কিন্তু উন্নত দেশ-গুলিতে কাঠের মেঝের বা রাবারাইজড্ কোর্টেও খেলা হচ্ছে। কোর্টটিতে সাদা বা কালো, যে কোনো রং দিয়ে ৪ সেণ্টিমিটার চওড়া লাইন টানাই বিধি। ইন্‌ডোর কোর্টের ছাদ ৮ মিটার উঁচু হবে। কোর্টের সীমানার বাইরে ১ ২ মিটার স্থানে কেউ বসবে না, বা বাধামুক্ত থাকবে।

পোস্ট ও জাল : কোর্টের মাঝে জাল টাঙানো হয় দু'টি পোস্টে, পোস্ট দু'টি দু'দিকের সাইড-লাইনে পোঁতা হয়। শক্ত কাঠ বা লোহার ওই পোস্ট দু'টি মাটি থেকে ১.৫৫ মিটার উঁচু হয়। ডাবলস্-এর কোর্টে পোঁতা পোস্ট সিঙ্গলস্-এর কোর্টেও ব্যবহার করা যায়। নেট বা জালের ঘর ২ বর্গ সেণ্টিমিটার হয়। ৭৬ সেণ্টিমিটার চওড়া ওই জালের নীচের অংশ মাটি থেকে ১ ৫৫ মিটার উঁচুতে থাকে। জালের উপরের দিকে ৭.৬ সেণ্টিমিটার সাদা ফিতেয় মোড়া হয়।

বল বা শাটল্ : ব্যাডমিণ্টনের শাটল্ বা বলের ওজন ৪.৭ গ্রাম থেকে ৫.৫ গ্রামের মধ্যে হবে ; ২.৫ থেকে ২.৮ সেণ্টিমিটার ব্যাসের কর্কে ১৫ বা ১০টা পালক গাঁথা হয়। শাটলের উপরের দিকটাকে ফোকাস বলে।

খেলা : সিঙ্গলস্-এর খেলায় দু'দিকে দু'জন খেলোয়াড় থাকে। ডাবলস্-এর খেলা হয় ২+২=৪ জনে। যারা সার্ভিস করে তারা 'ইন্ সাইড' ও যারা তা রিসিভ করে তারা 'আউট সাইড'। অন্যান্য খেলার মত ব্যাডমিণ্টনেও খেলা শুরুর আগে 'টস্' হয়। যারা টসে জেতে তারা প্রথমে সার্ভিস করতে পারে কিংবা দিক বেছে নিতে পারে।

(ক) ডাবলস্ এবং পুরুষদের খেলা শুরুর আগেই স্থির হয় গেম ১৫ না ২১ পয়েণ্টে হবে। ১৫ পয়েণ্টের গেমে দু' দলের পয়েণ্ট যখন ১৩-১৩ হয়, তখন যে-দল আগে পয়েণ্ট করে তারা ইচ্ছানুযায়ী সেট নিতে পারে। তখন

সেটের গেম হবে ৫ পয়েণ্টে। যখন দুই দলের পয়েণ্ট ১৪-১৪, তখন যে-দল আগে ১৪ পয়েণ্ট করে তারা সেট নিতে পারে। এই সময় সেটের গেম হবে ৩ পয়েণ্টে। এইভাবে সেট হলে স্কোর ডাকতে হয় গোড়া থেকে অর্থাৎ 'লাভ্ অল' বলে।

১৩ পয়েণ্টে সেট হলে যে-দল আগে ৫ পয়েণ্ট করে তারা বিজয়ী হয়, আর ১৪ পয়েণ্টের সেটে যারা আগে ৩ পয়েণ্ট করে তারা বিজয়ী হবে।

২১ পয়েণ্টের গেমে একই পদ্ধতি অনুসৃত হয়। তবে ১৩ পয়েণ্টের বদলে ১৯ ও ১৪ পয়েণ্টের বদলে ধরতে হবে ২০। হ্যাঁ, সেট ডাকতে হয় ১৩ অথবা ১৪ পয়েণ্ট হওয়ার পরে, কিন্তু পরবর্তী সার্ভিস করার আগে।

(খ) মেয়েদের সিঙ্গলসের খেলায় গেম হবে ১১ পয়েণ্টে। ৯-৯ হলে তখন যারা আগে ৯ করেছে তারা সেট ডাকতে পারে। গেম হবে ৩ পয়েণ্টে। ১০-১০এর সময়েও সেট হয়। তখন গেম হবে ২ পয়েণ্টে। অনেকে প্রথম সুযোগে সেট দাবি না করে পরবর্তী সুযোগে দাবি করে। মনে রাখা দরকার, হ্যাণ্ডিক্যাপ খেলায় সেট দাবি করা যায় না।

(গ) আগে অন্যরকম সিদ্ধান্ত না হলে তিনটি খেলাতেই প্রতিযোগিতার ফল নিষ্পত্তি হবে। প্রতি গেমশেষে খেলোয়াড়রা কোর্ট বদল করে। তাছাড়া তৃতীয় গেমে ৮ পয়েণ্টে (১৫ পয়েণ্টের গেমে), ৬ পয়েণ্টে (১১ পয়েণ্টের গেমে), ১১ পয়েণ্টে (২১ পয়েণ্টের গেমে) কোর্ট বদল করা হয়।

ডাবলস্ঃ (ক) কোন্ দল আগে সার্ভিস করবে তা টসের মাধ্যমেই স্থির হয়। ধরা যাক দু'টি দলে খেলা হচ্ছে। একদিকের জুটি দীপু ঘোষ ও রমেন ঘোষ এবং তাঁদের বিপরীত দিকে সুরেশ গোয়েল ও দীনেশ খান্না। যেহেতু দীপু নিজের কোর্টে ডান দিকের কোর্টে আছেন তাই তিনি সার্ভিস করবেন কোণাকুণি অর্থাৎ দীনেশের কাছে। রিসিভকারী বা দীনেশ শাটল্ মাটিতে পড়ার আগে মেরে ইন সাইডের যে কোনো খেলোয়াড়ের কাছে ফেরৎ দিতে পারেন। দীপু বা রমেন আবার সেটি আউট সাইডের যে কোনো একজনের কাছে মেরে ফেরৎ দেবেন। এইভাবে খেলা চলবে ফল্ট হওয়ার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত বা মাটিতে পড়ার আগে পর্যন্ত। মনে রাখা দরকার, গেমের শুরুতে যে দল প্রথম সার্ভিস করে তখন মাত্র একজনেরই সার্ভিসের অধিকার থাকে। অর্থাৎ এই সময়ে সার্ভিসকারীদের ফল্ট হলে প্রতিপক্ষের ডান দিকের খেলোয়াড় সার্ভিসের অধিকার পাবে।

তবে শুরুতে যারা সার্ভিস করে তাদের ফল্ট না হলে অর্থাৎ দীপু-রমেন জুটির সার্ভিসে যদি সুরেশ-দীনেশ ফল্ট করেন তাহলে দীপু-রমেনের দলের একটি পয়েন্ট হবে। দীপু-রমেন বা ইন সাইড পয়েন্ট পেলেই পরস্পরে সার্ভিস কোর্ট বদল করবেন এবং তখন বাঁ দিকের সার্ভিস কোর্ট থেকে সুরেশ-দীনেশের বা বিপরীত দলের কোণাকুণি সার্ভিস কোর্টে অর্থাৎ বাঁদিকে সার্ভিস করে শাটল্ পাঠাতে হবে। যতক্ষণ একটি দল 'ইন' থাকে, তাঁরা পালা করে কোণাকুণি কোর্টে সার্ভিস করেই চলেন। ইন সাইড প্রতিবার পয়েন্ট পেয়েই সার্ভিস কোর্ট বদল করেন।

(খ) যারা সার্ভিসের অধিকার অর্জন করে তারা সর্বদা ডানদিকের কোর্ট থেকে সার্ভিস করে থাকে। সার্ভিসের পর দুই দলের খেলোয়াড়রা নেটের উপর দিকে লাইনের বাইরে অবস্থান করেও বল ক্লিয়ার করতে পারে।

কিন্তু সাবধান, যার দিকে শাটল্ আসছে কেবল সেই খেলোয়াড়ই বল মারবে। অন্যজন মারলে বা ছুঁলে সার্ভিসকারী দল পয়েন্ট অর্জন করবে।

আগেই বলেছি, গেমের শুরুতে প্রথমবারে কেবল সার্ভিসকারী দলের একজন সার্ভিস করে। কিন্তু এর পর পর্যায়ক্রমে দু'জনেই সার্ভিস করে। যারা একটি গেম জেতে পরবর্তী গেমের শুরুতেও তারাই সার্ভিস করে থাকে। তখন বিজয়ী দলের যে কোনো একজন সার্ভিস করতে পারে, আর বিপক্ষের যে কোনো একজন তা রিসিভ ও ক্লিয়ার করতে পারে।

লেট ঃ অনেক সময় দেখা যায় কোনো খেলোয়াড় ভুল সার্ভিস কোর্টে দাঁড়িয়ে সার্ভিস করছে—তার অন্য কার্টে দাঁড়িয়ে সার্ভিস করা উচিত ছিল। আবার ওই সার্ভিসের থেকে র‍্যালিতে তারাই জিতল বা পয়েন্ট পেল তখন তা 'লেট' পরিগণিত হবে। তবে পরবর্তী সার্ভিসের আগে 'লেট' দাবি করা হয় এবং আম্পায়ারকে জানাতে হয়। আবার কোনো দলের খেলোয়াড় ভুল কোর্টে দাঁড়িয়ে সার্ভিস রিসিভ করলে এবং তারা সেই র‍্যালিতে জিতলে 'লেট' হবে। আবার খেলতে হবে। এক্ষেত্রেও পরবর্তী সার্ভিসের আগে 'লেট' ব্যাপারটি আম্পায়ারকে জানাতে হয়। তবে যারা ভুল করে তারা র‍্যালিতে হারলে আর তা সংশোধন করবার বা পুনরায় খেলার সুযোগ পায় না। এবং অবশিষ্ট সময়ে খেলোয়াড়দের স্থান পরিবর্তন হয় না।

আবার অন্য ঘটনাও ঘটে। যেমন স্থান পরিবর্তনের আগে ভুলবশতঃ কারও কোর্ট পরিবর্তন। সার্ভিস করার আগে ভুল ধরা না পড়লে সেই গেমের

শেষ পর্যন্ত ভুলই থাকে। 'লেট' দাবি করা যায় না এবং গেম চলার সময়ে স্থান পরিবর্তন নিষেধ।

সিঙ্গলস্—

সিঙ্গলসের খেলায় ডাবলসের নানা নিয়ম মানা হলেও কিছু কিছু পৃথক বিধিও আছে। যথা :

পয়েন্ট ০, ২, ৪, ৬, ৮ বা ১০ অর্থাৎ জোড় হলে ডানদিকের সার্ভিস কোর্ট থেকে সার্ভিস করতে হবে, রিসিভও করতে হয় ডান দিকের কোর্টে, কিন্তু পয়েন্ট ১, ৩, ৫, ৭, ৯ বা বিজোড় হলে বাঁ দিকের সার্ভিস কোর্ট থেকে সার্ভিস করতে হয় ও রিসিভও করা হয় বাঁ দিকের কোর্টে। সেট হলেও একই বিধি। এবং একটি পয়েন্ট হলেই উভয়দিকের খেলোয়াড় কোর্ট বদল করে।

ফল্ট ও পয়েন্ট: কোনো ইন সাইড ফল্ট করলে সার্ভিস হারাতে হয়, আর আউট সাইড ফল্ট করলে ইন সাইড পয়েন্ট পায়। ফল্ট নানা কারণে হয় :

(ক) সার্ভিস করার সময় বল কোমরের উপরের অংশে থাকলে। কিংবা শাটলটি মারার সময় র‍্যাকেটের স্যাফ্‌ট (ডাঁটি) সার্ভারের হাতের নীচে না থাকলে।

(খ) সার্ভিস করার পর বল ভুল কোর্টে পড়লে, বা শর্ট সার্ভিস লাইনের আগে বা লং সার্ভিস লাইনের পিছনে পড়লে।

(গ) সার্ভিস শেষের আগে যদি সার্ভারের পা সার্ভিস কোর্টে না থাকে বা রিসিভারের পা-ও বিপরীত দিকের কোণাকুণি কোর্টে যদি না থাকে।

(ঘ) সার্ভিসের সময় বিপক্ষ যদি ভীতি প্রদর্শন করে। উপর্যুপরি যদি কেউ ভয়ে সার্ভিস না করে তবে তাকে 'প্রেলিমিনারি ফেন' বলে।

(ঙ) সার্ভিসের সময় বল কোর্ট-সীমানার বাইরে পড়লে, নেটের নীচ দিয়ে গেলে, নেটে আটকালে, ইনডোর কোর্টে ছাদে লাগলে, খেলোয়াড়দের গায়ে লাগলে। (কিন্তু লাইনের উপর পড়লে ফল্ট হয় না।)

(চ) শাটল্ নেট অতিক্রম করে নিজের দিকে আসার আগে মারলে। (কিন্তু র‍্যাকেট মারতে গিয়ে নেট অতিক্রম করতে পারে)।

(ছ) খেলা চলাকালে র‍্যাকেট দিয়ে নেট স্পর্শ করলে

(জ) দুই আঘাতে বল মারলে, র‍্যাকেটের উপরে বল রাখলে।

(ঝ) সার্ভিসের সময় বাধা দিলে।

আরও কিছু বিধি-নিষেধ ঃ (ক) রিসিভার প্রস্তুত না হলে সার্ভিস করতে নেই।

(খ) সার্ভিসের সময় প্রত্যেককে নিজ নিজ কোর্টের সীমানার মধ্যে দাঁড়াতে হয়। সার্ভিস হলে তবে নড়াচড়া করা যায়। কারও পা সার্ভিস লাইনের উপরে বা বাইরে থাকবে না। বিপক্ষের দেখার বিঘ্ন ঘটানো যায় না।

(গ) সার্ভিস বা র‍্যালির সময় বল জাল ছুঁয়ে উপর দিয়ে বিপরীত দিকের কোর্টে পড়ে তবে সেটি বৈধ হবে। বল পোস্টের বাইরের থেকে এসে কোর্টে পড়লেও বৈধ।

(ঘ) সার্ভিসের সময় বল জাল ছুঁয়ে উপর থেকে গিয়ে বিপরীত দিকে জালে জড়ালে 'লেট' হবে।

(ঙ) সার্ভিসের সময় বল মারতে না পারলে ফল্ট হয় না। কিন্তু বল বা শাটল্ র‍্যাকেট ছুঁলেই সার্ভিস হয়েছে ধরতে হয়।

আম্পায়ার, লাইন্সম্যান ইত্যাদি ঃ আম্পায়ারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হলেও কেবল আইনগত প্রশ্নে রেফারীর কাছে আবেদন করা যায়। নিজের লাইন সম্পর্কে লাইন্সম্যানের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। লাইন্সম্যান কোনো কারণে দেখতে না পেলে আম্পায়ার 'সেট' দিতে পারেন। সার্ভিস-জাজ সার্ভিসের ভুল-ত্রুটি লক্ষ্য করেন।

বল পরীক্ষা করে দেখার রীতি অনুযায়ী দুই খেলোয়াড় বল সম্পর্কে একমত না হলে আম্পায়ারকে বল দেওয়া হয়।

খেলার শুরু ঃ খেলা শুরু হয় 'লাভ্* অল, প্লে' বলে। সিঙ্গলস্ খেলার সময় কোনো খেলোয়াড় সার্ভিস হারালে 'সার্ভিস ওভার' বলা হয়। আর ডাবলস্-এর সময় প্রথম সার্ভারের সার্ভিসের সময় স্কোর বলা হয়। দ্বিতীয় সার্ভার সার্ভিস হারালে 'সার্ভিস ওভার' বলতে হবে।

ছেলেদের কোনো দলের ১৪ পয়েন্ট বা মেয়েদের কোনো দলের ১০ পয়েন্ট হলে গেম পয়েন্ট বা ম্যাচ পয়েন্ট ডাকতে হয়। ম্যাচশেষে ফল ও স্কোর ঘোষণা করতে হয়।

---

* 'শূন্য' বা 'কিছু নয়' বোঝাতে বহু খেলায় ব্যবহৃত 'লাভ্' কথাটি সর্বপ্রথম টেনিসে সীমাবদ্ধ ছিল। মূল ফরাসী শব্দটি হল "Loeuf", যার অর্থ ডিম। ডিমের আকৃতি শূন্যের মত। তাই মূল শব্দটির বিকৃতি 'লাভ্'-এর ব্যবহার।

লন টেনিস

উনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম দশকে টেনিস খেলার প্রচলন হয়। 'রিয়্যাল টেনিস' নামক এক ধরনের খেলা থেকেই এর উদ্ভব, কিন্তু এখন মূল খেলার থেকে লন টেনিসের জনপ্রিয়তা অনেক বেশি—এবং পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই এই খেলা চলে। বহু লোক নিজে খেলা ছাড়াও প্রতি বছর বিখ্যাত প্রতিযোগিতা-গুলিতে খেলা দেখতে যায়—যেমন, উইম্বলডন, ফরেস্ট হিলস ও প্যারিসে। এ ছাড়া, প্রতি বছর ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতায় প্রত্যেক দেশের পুরুষদের জাতীয় দল অংশ গ্রহণ করে এবং ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকার মহিলাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ উইটম্যান কাপও আছে। এই সবগুলিই অপেশাদার প্রতিযোগিতা; কিন্তু টেনিসে বিশ্ববিখ্যাত খেলোয়াড়দের প্রায় সকলেই পেশাদার এবং পেশাদারদের বিশ্বসংস্থাও আছে। প্রত্যেক বৎসর পেশাদার

লন টেনিস সিঙ্গলস্ কোর্ট
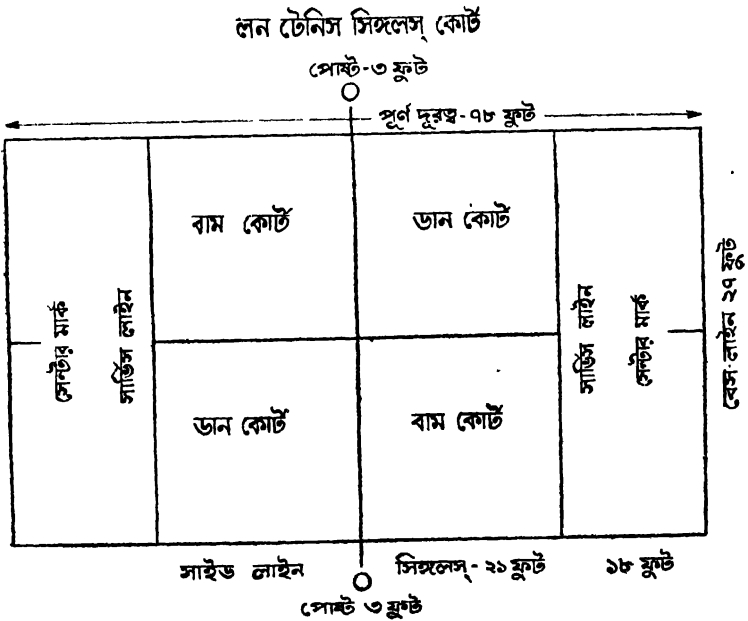
খেলোয়াড়দের বিশ্বভ্রমণ বা 'সার্কিটে' বিশ্বের বিভিন্ন নামকরা প্রতিযোগীদের অংশগ্রহণ এবং বিজয়ীদের কোটি কোটি ডলার বা পাউণ্ড উপার্জন লন টেনিসের আকর্ষণ অনেক পরিমাণে বাড়িয়ে দিয়েছে।

'লন' টেনিস নাম থেকেই বোঝা যায় যে, এই খেলা ঘাসের কোর্টে বা লনে খেলার জন্যে। কিন্তু এখন বিভিন্ন জিনিসের শক্ত কোর্টেও (হার্ড-সার্ফেস কোর্ট) টেনিস খেলা হয় এবং ইনডোর গেম হিসাবে কাঠের মেঝেতেও খেলা হয়। টেনিস কোর্ট ৭৮ ফুট লম্বা ও ২৭ ফুট চওড়া (২৩.৭৮ মিটার×৮.৪ মিটার) হয়। ডাবলস্-এর ক্ষেত্রে চওড়া ৩৬ ফুট (১১ মিটার) হয়। দৈর্ঘ্যের লাইন দু'টিকে বলে সাইড-লাইন। সিঙ্গলস্-এর কোর্টের চওড়ার দুই লাইনকে (বেস-লাইন) দু'দিকে ৪½ ফুট (১.৩৭ মিটার) করে বাড়িয়ে নিয়ে যুক্ত করলেই বেস-লাইন ৩৬ ফুট (১১ মিটার) হয়ে যাবে এবং নূতন সাইড-লাইন হবে। উভয় বেস-লাইন থেকে ১৮ ফুট (৫.৫ মিটার) দূরে কোর্টের আড়াআড়িভাবে সার্ভিস লাইন থাকে এবং সার্ভিস লাইন থেকে ২১ ফুট (৬.৪ মিটার) দূরে কোর্টকে আড়াআড়িভাবে বিভক্ত করছে নেট। মাটি থেকে নেটের উচ্চতা পোস্টে ৩½ ফুট (১.০৬ মিটার), মাঝখানে ৩ ফুট (০.৯১ মিটার)। সার্ভিস-লাইন নেটের সমান্তরাল হবে। নেটের উভয়দিকে সার্ভিস লাইন এবং সাইড-লাইনের মধ্যে যে অংশ তাকে 'সেণ্টার সার্ভিস লাইন' দু'টি সমান অংশে বিভক্ত করছে, যে অংশগুলির নাম সার্ভিস কোর্ট। সেণ্টার সার্ভিস লাইন ২ ইঞ্চি (৫ সে.মি.) চওড়া এবং দুই সাইড-লাইনের সমান্তরাল ও তাদের থেকে সমদূরবর্তী হবে। উভয় বেস-লাইন সেণ্টার সার্ভিস লাইনের এক কল্পিত বিস্তৃতি দ্বারা সমদ্বিখণ্ডিত হবে, অবশ্য সমদ্বিখণ্ডিত হওয়ার জায়গায় ঐ লাইন আঁকতেই হবে—লম্বায় ৪ ইঞ্চি ও চওড়ায় ২ ইঞ্চি (১০×৫ সে.মি.); এই ছোট লাইন দু'টিকে বলা হয় 'সেণ্টার মার্ক'। এগুলি বেস-লাইনের সঙ্গে সমকোণে থাকে। অন্য সব লাইন ১ ইঞ্চির কম বা ২ ইঞ্চির (২.৫ সে.মি. বা ৫ সে.মি.) বেশি চওড়া হবে না, তবে বেস-লাইন চওড়ায় চার ইঞ্চি (১০ সে.মি. হতে পারে। সমস্ত মাপ লাইনের বাইরের দিক পর্যন্ত নিতে হবে।

লন টেনিস বলের পরিধি ২½ ইঞ্চির (৬.৩৫০ সেণ্টিমিটার) বেশি এবং ২⅝ ইঞ্চির কম (৬.৬৬৮ সেণ্টিমিটার) আর ওজন ২ আউন্সের (৫৬.৭০ গ্রাম) বেশি এবং ২১/১৬ আউন্সের (৫৮.৪৭ গ্রাম) কম হতে হবে। বল অবশ্যই সাদা রঙের হবে।

সিঙ্গলস্-এর খেলায় খেলোয়াড়রা নেটের পরস্পর বিপরীত দিকে দাঁড়াবে। যে খেলোয়াড় প্রথমে বলটি খেলে তাকে বলা হবে সার্ভার, এবং অপরজনকে বলা হবে রিসিভার। কে কোন্ প্রান্তে খেলবে সেটা এবং প্রথম সার্ভার বা

রিসিভার হবার অধিকার টসের সাহায্যে ঠিক করা হয়। যে টসে জেতে সে ইচ্ছা করলে 'সার্ভার' বা 'রিসিভার' হতে পারে, সে ক্ষেত্রে তার প্রতিপক্ষের প্রান্ত বেছে নেবার স্বাধীনতা থাকবে; আবার টসে জয়ী খেলোয়াড় ইচ্ছা করলে বিশেষ প্রান্ত বেছে নিয়ে খেলতে পারে, সেক্ষেত্রে তার প্রতিপক্ষকে সার্ভার ও রিসিভার হওয়ার মধ্যে বেছে নিতে হবে।

সার্ভিস কীভাবে করতে হয়ঃ সার্ভারের দু'টি পায়ের পাতা বেস-লাইনের পিছনে এবং সেণ্টার মার্ক ও সাইড-লাইনের কল্পিত বিস্তৃতির মধ্যে স্থিরভাবে থাকবে; এই অবস্থায় সে বলটি হাতে করে যে কোনো দিকে শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে মাটি স্পর্শ করার আগেই বলটিকে র‍্যাকেট দিয়ে মারবে, এবং র‍্যাকেট ও বলের সংঘাতের মুহূর্তেই ডেলিভারী সম্পূর্ণ হয়েছে বলে গণ্য হবে। ডেলিভারীকালে সার্ভার হেঁটে বা ছুটে স্থান পরিবর্তন করতে পারবে না বা বেস লাইনের পিছনে সেণ্টার মার্ক ও সাইড-লাইনের কল্পিত বিস্তৃতির মধ্যের যে এলাকা তার বাইরে কোনো পা রাখতে পারবে না। সার্ভিস করার সময় সার্ভার ডানদিকের কোর্টের পিছন থেকে আরম্ভ করবে। 'ডান-বাম-ডান' এইভাবে পর্যায়ক্রমে এক-এক দিকের কোর্টের পিছন থেকে সার্ভিস করে যাবে। যদি ভুল কোর্ট থেকে সার্ভিস করা হয় এবং ভুল ধরা না পড়ে তাহলে ঐ সময়ের খেলার ফলাফল বহাল থাকবে, কিন্তু ভুল ধরা পড়া মাত্র অবস্থান সংশোধন করে নিতে হবে। সার্ভিস করার পর বল নেটের উপর দিয়ে গিয়ে কোণাকুণিভাবে বিপরীত কোর্টটির উপর বা সেই কোর্টের কোনো সীমার উপর পড়বে এবং তারপর রিসিভার বলটি ফেরৎ পাঠাবে।

ফল্ট হবে যদি সার্ভার উপরিলিখিত কোনো নিয়ম ভঙ্গ করে বা বল মারতে গিয়ে ফসকায় বা বল কোর্টের মাটি স্পর্শ করার আগে যদি কোনো স্ট্যাণ্ড, সীট, চেয়ার, দর্শক, আম্পায়ার ইত্যাদিকে স্পর্শ করে। ফল্টের পর (যদি সেটা প্রথম ফল্ট হয়) একই হাফকোর্ট থেকে সার্ভার সার্ভ করবে। কিন্তু সার্ভিসটি যদি ভুল হাফকোর্ট থেকে হয় তাহলে উপরের অনুচ্ছেদে বর্ণিত নিয়মে সার্ভার অপর হাফকোর্টটি থেকে মাত্র একটি সার্ভিস করবে। ফল্ট হওয়ার পরবর্তী বারে সার্ভিসটি হয়ে গেলে আর ফল্ট দাবি করা যায় না।

রিসিভার প্রস্তুত হওয়ার আগে সার্ভার সার্ভ করতে পারবে না। অবশ্য যদি রিসিভার সার্ভ ফেরাতে উদ্যত হয় তাহলে তাকে প্রস্তুত বলেই ধরে

নেওয়া হবে। কিন্তু রিসিভার তার অপ্রস্তুতি জানিয়ে দিলে আর ফল্ট দাবি করতে পারবে না।

নিয়ম অনুসারে বা খেলা থামাবার প্রয়োজন দেখা দিলে 'লেট' ডাকা হয়। লেটের এই রকম ব্যাখ্যা করা হয়—যদি লেট ডাকটি মাত্র একটি সার্ভিস সম্পর্কে হয় তা হলে সার্ভিসটি আবার হবে। অন্য যে কোনো ক্ষেত্রে লেট ডাকা হলে সেই পয়েণ্টটিরই আবার গোড়া থেকে খেলতে হবে। সার্ভ করার পর বল যদি নেট, অথবা নেটের স্ট্র্যাপ বা ব্যাণ্ড স্পর্শ করে কিন্তু আর সব দিক থেকে ঠিক হয়, কিংবা নেট, স্ট্র্যাপ বা ব্যাণ্ড স্পর্শ করে মাটিতে পড়ার আগে রিসিভার অথবা তার পোশাক বা শরীরসংলগ্ন কিছুকে স্পর্শ করে তা হলে সার্ভিসটি লেট হয়। আবার রিসিভার প্রস্তুত না থাকা অবস্থায় সার্ভিস বা সার্ভিস ফল্ট হলেও সার্ভিস লেট হয়। লেট ডাকা হলে সংশ্লিষ্ট সার্ভিসটি ধরা হবে না এবং সার্ভার আবার সার্ভ করবে কিন্তু সার্ভিস লেটের দরুন আগের কোনো ফল্ট রদ হয়ে যায় না।

দ্বিতীয় গেমে প্রথম গেমের রিসিভার সার্ভার হবে ও সার্ভার রিসিভার হবে এবং এইভাবে ম্যাচের পরবর্তী গেমগুলিতে পর্যায়ক্রমে রিসিভার ও সার্ভার বদল হতে থাকবে। যদি কোনো খেলোয়াড় ক্রম-বহির্ভূতভাবে সার্ভিস করে তা হলে যে খেলোয়াড়ের সার্ভ করা উচিত ছিল ভুলটি ধরা-মাত্র সে-ই সার্ভিস করবে, কিন্তু ভুল ধরার আগে হওয়া সব পয়েণ্টই গুনতে হবে। যদি ভুল ধরা পড়ার আগে গেমই শেষ হয়ে যায় তা হলে পরিবর্তিত ক্রম অনুসারেই সার্ভিস চলবে এবং ধরা পড়ার আগের ফল্ট সার্ভিস হিসাবের মধ্যে ধরা হবে না।

সার্ভিসে যে মুহূর্তে বল ডেলিভারী করা হয় সেই মুহূর্ত থেকে সংশ্লিষ্ট পয়েণ্টটির মীমাংসা হওয়া পর্যন্ত বল খেলার মধ্যে ('ইন প্লে') থাকে অবশ্য যদি না মাঝে ফল্ট বা লেট ডাকা হয়।

কার কখন পয়েণ্ট হবে? **সার্ভারের** পয়েণ্ট হবে (১) যদি সার্ভিসটি ত্রুটিহীন অবস্থায় অর্থাৎ লেট না হয়ে রিসিভারকে কিংবা তার পোশাক বা শরীরসংলগ্ন কিছু স্পর্শ করে অথবা যদি রিসিভার অন্যভাবে পয়েণ্ট হারায় (নীচে বলা হয়েছে)। **রিসিভারের** পয়েণ্ট হবে (১) যদি সার্ভারের উপর্যুপরি দু'টি ফল্ট হয় কিংবা (২) যদি সার্ভার অন্যভাবে পয়েণ্ট হারায়। কোনো খেলোয়াড়, তা সে সার্ভার বা রিসিভার যা-ই হোক না কেন, পয়েণ্ট

হারাবে যদি সে (১) খেলার মধ্যে থাকা বল পর-পর দু'বার মাটি স্পর্শ করার আগে বলটিকে সরাসরি নেটের উপর দিয়ে ফেরৎ পাঠাতে না পারে বা, (২) খেলার মধ্যে থাকা বলটি এমনভাবে ফেরৎ পাঠায় যে, প্রতিপক্ষের কোর্টের সীমারেখার বাইরের মাটি, বা কোর্টের স্থায়ী আসবাব* বা অন্য কোনো কিছুতে গিয়ে পড়ে বা, (৩) বল ভলি করে এবং ঠিক রিটার্ন করতে না পারে—কোর্টের বাইরে দাঁড়ানো থাকলেও—বা, (৪) খেলায় থাকা বল মারতে গিয়ে র‍্যাকেট দিয়ে একাধিকবার আঘাত করে বা স্পর্শ করে ; বা, (৫) সে কিংবা তার র‍্যাকেট (হাতে থাকা অবস্থায় বা অন্যভাবে) অথবা সে পরে আছে কিংবা তার শরীরসংলগ্ন কিছু নেট, পোস্ট, দড়ি বা ধাতব তার, স্ট্র্যাপ বা ব্যাণ্ড, বা প্রতিপক্ষের কোর্টের মাটি এমন সময় স্পর্শ করে যখন বল খেলার মধ্যে ; বা, (৬) বল নেট অতিক্রম করে আসার আগেই সে 'ভলি' করে, বা, (৭) খেলার মধ্যে থাকা বল তাকে বা তার পোশাককে বা এক-হাত বা দুই-হাতে-ধরা র‍্যাকেট বাদে শরীরসংলগ্ন কিছুকে স্পর্শ করে ; বা (৮) সে বলের উদ্দেশ্যে র‍্যাকেটটি ছুঁড়ে দেয় এবং বলটি মারে।

যদি কোনো খেলোয়াড় এমন কোনো কাজ করে যা তার প্রতিপক্ষের বল মারার ব্যাপারে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে, তা হলে কাজটি ইচ্ছাকৃত হলে আম্পায়ার প্রতিপক্ষকে পয়েন্ট দেবেন এবং অনিচ্ছাকৃত হলে পয়েন্টটি গোড়া থেকে আবার খেলবার নির্দেশ দেবেন। এই রকম ক্ষেত্রে বা কোর্টের স্থায়ী আসবাবের দরুন ছাড়া, অন্য এমন কোনো কারণে যদি খেলোয়াড় বল মারতে না পারে যা তার আয়ত্তের বাইরে, তাহলে লেট ডাকতে হবে।

বল কোনো লাইনের উপর পড়লে সেই লাইন যে কোর্টের সীমারেখা, সেই কোর্টে পড়েছে ধরে নেওয়া হবে।

---

*কোর্টের "স্থায়ী আসবাব" বলতে শুধু নেট, পোস্ট, নেটের দড়ি বা ধাতব তার, স্ট্র্যাপ ও ব্যাণ্ডই নয়, যেখানে যেখানে থাকবে ব্যাক ও সাইড স্টপ, স্ট্যাণ্ড, আঁটা বা সরানো যায় এমন বসবার আসন বা চেয়ার (যা কোর্টের চারধারে থাকে), চেয়ারে বসে থাকা ব্যক্তি, কোর্টের চার পাশের এবং উপরের আর সমস্ত জিনিসপত্র, স্ব-স্ব স্থানে আসীন আম্পায়ার, নেট-কর্ড জাজ, ফুট ফল্ট জাজ, লাইন্সম্যানরা এবং বল বয়রা—এ সবকেই বোঝাবে। অনেক সময় সুবিধার জন্য ডাবলস্ কোর্টেই সিঙ্গলস্ খেলার জন্যে সিঙ্গলস্ পোস্ট বসানো হয়। সেক্ষেত্রে ডাবলস্ খেলার পোস্টগুলি, এবং নেট, দড়ি বা ধাতব তার এবং ব্যাণ্ডের যতখানি অংশ সিঙ্গলস্ পোস্টের বাইরে থাকবে (সিঙ্গলস্) ম্যাচ চলবার সময় সেগুলিকেও স্থায়ী আসবাবের মধ্যেই গণ্য করা হবে এবং কোনোক্রমেই সিঙ্গলস খেলার পোস্ট বা নেটের অংশ বলে ধরা হবে না।

যদি খেলার মধ্যে থাকা বল মাটিতে পড়বার পরে কোনও স্থায়ী আসবাব (নেট, পোস্ট, দড়ি বা ধাতব তার, স্ট্র্যাপ বা ব্যাণ্ড ইত্যাদি বাদে) স্পর্শ করে তা হলে যে খেলোয়াড় বলটি মেরেছিল সে পয়েন্ট জিতবে, আর যদি আগেই স্পর্শ করে তার প্রতিপক্ষ পয়েন্টটি জিতবে।

ঠিক ('গুড') রিটার্ন বলেই ধরা হবে—(১) বল যদি নেট, পোস্ট, দড়ি বা ধাতব তার, স্ট্র্যাপ বা ব্যাণ্ড ইত্যাদি স্পর্শ করে, কিন্তু তাদের উপর দিয়ে গিয়ে উদ্দিষ্ট কোর্টের মধ্যে মাটিতে পড়ে; বা, (২) যদি সার্ভ করা বা রিটার্ন করা বল যথাযথ কোর্টে পড়ার পর প্রতিহত হয় বা হাওয়ায় নেটের উপর দিয়ে ফিরে আসে এবং যে খেলোয়াড়ের মারবার পালা সে নেটের উপর দিয়ে র‍্যাকেট বাড়িয়ে বলটি খেলে কিন্তু সে তার পোশাক বা র‍্যাকেটের কোনও অংশ যদি প্রতিপক্ষের কোর্টের মধ্যের নেট, পোস্ট, দড়ি বা ধাতব তার, স্ট্র্যাপ বা ব্যাণ্ড বা জমি স্পর্শ না করে এবং স্ট্রোকটি আর সব দিয়ে ঠিক হয়; বা (৩) যদি বলটি রিটার্ন করে পোস্টের বাইরের দিকে জালের উচ্চতার উপর বা নিচে পাঠানো হয় তা হলে, বল পোস্ট স্পর্শ করলেও—অবশ্য বলটি যথাযথ কোর্টের মাটিতে গিয়ে পড়া চাই; বা (৪) যদি কোনও খেলোয়াড় বল রিটার্ন করার পর তার র‍্যাকেট উপর দিয়ে নেট অতিক্রান্ত করে যায়, অবশ্য বলটি খেলা হওয়ার আগে উপর দিয়ে নেট অতিক্রম হওয়া এবং ঠিকভাবে রিটার্ন হওয়া চাই; বা (৫) সার্ভ করা বা খেলার মধ্যে থাকা বল যদি কোর্টের ভিতর রাখা কোনও বলের উপর পড়ে এবং কোনও খেলোয়াড় সেই বল রিটার্ন করতে সক্ষম হয়।

পয়েন্টের হিসাব—লন টেনিসের খেলা ৩ সেটে বা ৫ সেটে হয়। পাঁচের বেশি সেট বা মেয়েদের খেলায় তিনের বেশি সেট খেলা হবে না। কোনও সেটে যে খেলোয়াড় প্রথম ৬টি গেম পায় সে-ই সেট জিতবে কিন্তু তার সঙ্গে প্রতিপক্ষের অন্ততঃ দু' গেমের ব্যবধান থাকতে হবে। এই ব্যবধান সৃষ্টি করার জন্যে যদি দরকার হয় সেটকে দীর্ঘায়িত করতে হবে। কোনও খেলোয়াড় ৪টি পয়েন্ট পেলে গেম পাবে। কিন্তু যদি উভয় খেলোয়াড়েরই তিনটি করে পয়েন্ট হয়ে যায় তাহলে 'ডিউস' (deuce) হয়ে যায়; এই অবস্থায় কোনও খেলোয়াড় পয়েন্ট পেলে সে 'অ্যাডভান্টেজ' পেয়েছে বলা হয় (সার্ভারের ক্ষেত্রে 'অ্যাডভান্টেজ ইন' এবং রিসিভারের ক্ষেত্রে 'অ্যাডভান্টেজ আউট') এবং সেই খেলোয়াড়ই আবার পয়েন্ট পেলে সে গেমটি জিতবে।

কিন্তু যদি সেই খেলোয়াড় আবার পয়েণ্ট না পেয়ে তার প্রতিপক্ষ পায়, তাহলে আবার ডিউস হবে এবং খেলা চলবে। ডিউসের সময়ের স্কোরের অব্যবহিত পরেই কোনও খেলোয়াড় দু'পয়েণ্ট পেলে তবেই তার অনুকূলে গেম হবে। অর্থাৎ একজন খেলোয়াড়কে দু'পয়েণ্ট এগিয়ে থাকতে হবে।

লন টেনিসের পয়েণ্ট গোনা বেশ খানিকটা অদ্ভুত ধরনের। ১, ২, ৩ ইত্যাদি করে পয়েণ্ট গোনা হয় না। প্রথম পয়েণ্টকে বলা হয় '১৫', দ্বিতীয় পয়েণ্টকে '৩০', তৃতীয় পয়েণ্টকে '৪০'। চতুর্থ পয়েণ্টে গেম হয়, অবশ্য আগে যদি 'ডিউস' না হয়ে গিয়ে থাকে। সুতরাং ৪০—৪০ হলেই ডিউস হবে। পয়েণ্ট গোনার এই রীতি নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে এবং র‍্যাকেট, টেবল টেনিস প্রভৃতি খেলার মত সোজাসুজি ১-২-৩ করে হিসাবের প্রস্তাব উঠেছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর পুরাতন প্রথাকে বদলানো হয়ে ওঠেনি।

প্রতি সেটের প্রথম, তৃতীয় এবং পর্যায়ক্রমে পরবর্তী গেমগুলির শেষে এবং প্রতি সেটেরও শেষে খেলোয়াড়রা প্রান্ত পরিবর্তন করে নেবে। অবশ্য সেটে গেমের মোট সংখ্যা জোড় হলে পরবর্তী সেটের প্রথম গেমের শেষ পর্যন্ত প্রান্ত পরিবর্তন করা স্থগিত রাখা হয়।

যে-সব ম্যাচে আম্পায়ার নিযুক্ত করা হয়, সেইসব ক্ষেত্রে তাঁর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। কিন্তু কোথাও রেফারী নিযুক্ত থাকলে আইনগত প্রশ্নে আম্পায়ারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তাঁর কাছে আবেদন করা যাবে এবং এ সমস্ত ক্ষেত্রে রেফারীর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হবে। রেফারী তাঁর স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতাবলে যে কোনও সময়ে আলোকাভাব, বা মাঠের অবস্থা বা আবহাওয়ার কারণে খেলা স্থগিত রাখতে পারেন। এই সময় যা স্কোর ছিল এবং যে খেলোয়াড় যে কোর্টে ছিল, সেই অবস্থা থেকেই পরে খেলা হবে, অবশ্য যদি না রেফারী এবং খেলোয়াড়রা অন্য কিছু করার বিষয়ে একমত হয়ে থাকেন।

ডাবলসের খেলায় উপরের সব নিয়মই নিচের ব্যতিক্রম-সাপেক্ষে প্রযোজ্য। ডাবলসের কোর্টের প্রস্থ যে ৯ ফুট (২.৭৪ মিটার) বেশি এবং সেইজন্য সিঙ্গলস্ কোর্টকে ৪½ ফুট (১.৩৭ মিটার) করে দু'দিকে বাড়িয়ে নিতে হয়, সে-কথা আগেই বলা হয়েছে। এই বাড়িয়ে নেওয়ার ফলে সিঙ্গলস্ কোর্টের সাইড-লাইনের যে অংশ ডাবলস্ কোর্টের দুই সার্ভিস লাইনের মধ্যে পড়ছে তাদের সার্ভিস সাইড-লাইন বলা হয়।

প্রতি সেটের শুরুতে এইভাবে সার্ভিং ও রিসিভিং-এর ক্রম ঠিক করে নিতে

হবে। সেটের প্রথম গেমে যে জুটি সার্ভ করবে তারা ঠিক করে নেবে কোন্ পার্টনার সার্ভ করবে। প্রতিপক্ষ জুটিও একইভাবে দ্বিতীয় গেমের জন্য ঠিক করে

লন টেনিস ডাবলস্ কোর্ট
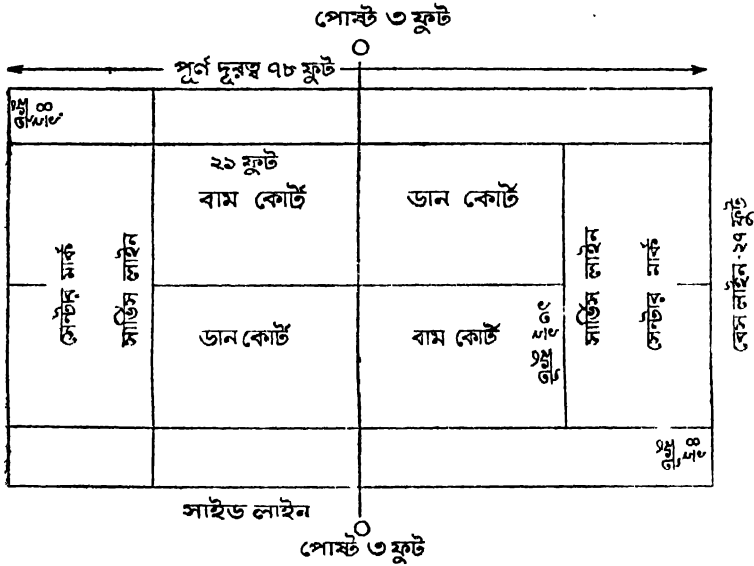
নেবে কে সার্ভিস করবে। প্রথম গেমে যে খেলোয়াড় সার্ভ করেছিল, তৃতীয় গেমে তার পার্টনার সার্ভ করবে এবং দ্বিতীয় গেমে যে সার্ভ করেছিল, চতুর্থ গেমে তার পার্টনার সার্ভ করবে এবং সেটের পরবর্তী গেমগুলিতে সার্ভিসের এই ক্রম চলবে। রিসিভ করার ব্যাপারে প্রথম গেমে যে জুটিকে সার্ভিস রিসিভ করতে হচ্ছে তারা ঠিক করে নেবে কোন্ পার্টনার প্রথম সার্ভিসটি রিসিভ করবে এবং সেই সেটের প্রতিটি বিজোড়সংখ্যক গেমে সেই পার্টনারই রিসিভ করতে থাকবে। প্রতিপক্ষ জুটিও সেই রকম ঠিক করে নেবে কোন্ পার্টনার দ্বিতীয় গেমে প্রথম সার্ভিসটি রিসিভ করবে এবং সেই সেটের প্রতিটি জোড়-সংখ্যক গেমে সেই পার্টনারই সার্ভিস রিসিভ করবে। প্রতি গেমে পার্টনাররা পর্যায়ক্রমে (অর্থাৎ ক, খ, ক, খ, এইভাবে) সার্ভিস রিসিভ করবে। যদি কোনও পার্টনার ক্রমের বাইরে সার্ভ করে, তা হলে ভুল ধরা পড়ামাত্র, যে পার্টনারের সার্ভ করা উচিত ছিল সে সার্ভ করবে, কিন্তু ধরা পড়ার আগের সমস্ত পয়েন্ট

এবং যে যে সার্ভিস ফল্ট হয়েছে সবই গোনা হবে। আর যদি ধরা পড়ার আগে গেমই শেষ হয়ে যায় তাহলে সার্ভিসের ভুল করে বদলানো ক্রমটিই বজায় থেকে যাবে। আবার কোনও গেমে রিসিভাররা রিসিভিং-এর ক্রম বদলে ফেললে যে গেমে ভুলটি ধরা পড়ে সেই গেমের শেষ পর্যন্ত পরিবর্তিত ক্রম অনুসারে খেলা হবে, কিন্তু সেই সেটের পরবর্তী গেমে যখন তারা সার্ভিস রিসিভ করবে তখন তারা প্রকৃত ক্রম অনুযায়ী রিসিভিং আরম্ভ করবে।

আগে সার্ভিসের ফল্ট হওয়া সম্পর্কে যা বলা হয়েছে এখানেও তা প্রযোজ্য। তা ছাড়াও বল যদি সার্ভারের পার্টনারকে বা তার পোশাক বা শরীর-সংলগ্ন কিছুকে স্পর্শ করে তা হলেও সার্ভিসের ফল্ট হবে। কিন্তু সার্ভ-করা বল যদি মাটিতে পড়ার আগে রিসিভারের পার্টনারকে বা তার পোশাক বা শরীর-সংলগ্ন কিছুকে স্পর্শ করে এবং লেট ডাকা না হয়ে থাকে তা হলে সার্ভারেরই পয়েন্ট হবে।

দুই প্রতিপক্ষ জুটির খেলোয়াড়দের একজন বা অপরজন পর্যায়ক্রমে বল মারবে এবং এই নিয়ম লঙ্ঘন করে যদি কোনও খেলোয়াড় খেলার মধ্যে থাকা বল তার র‍্যাকেট দিয়ে স্পর্শ করে তাহলে প্রতিপক্ষ পয়েন্ট পেয়ে যাবে।

টেবল টেনিস

১। **টেবল :** খেলার টেবলটি আয়তক্ষেত্রাকার হবে, লম্বায় ৯ ফুট এবং চওড়ায় ৫ ফুট (২.৮ × ১.৫২ মিটার); এটিকে এমনভাবে দাঁড়
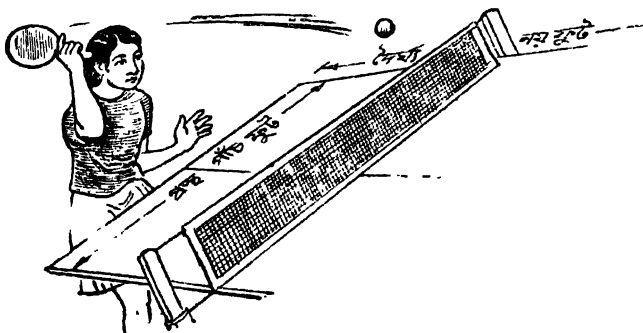
টেবল টেনিস

করা তে হবে যেন, এর উপরের পিঠ, যাকে বলা হবে খেলার পিঠ, মেঝে থেকে

২ ফুট ৬ ইঞ্চি (০.৭৬ মিটার) উঁচুতে অনুভূমিক সমতলে অবস্থান করে। এটি যে কোনও উপাদানে তৈরি হতে পারবে এবং টেবলের সমতলের ১২ ইঞ্চি (৩০.৫ সেন্টিমিটার) থেকে তার উপর একটি আদর্শ বল ফেললে সব সময়ে সমান লাফাবে, ৮¾ ইঞ্চির (২২.৩ সেন্টিমিটার) কম বা ৯¾ ইঞ্চির (২৪ ৯ সেন্টিমিটার) বেশি নয়। খেলার পিঠটি গাঢ় রঙের হবে, ঔজ্জ্বল্যহীন গাঢ় সবুজ রঙের হলেই ভালো হয় এবং প্রত্যেক ধারে ¾ ইঞ্চি (২ সেন্টিমিটার) চওড়া সাদা লাইন থাকতে হবে। ৫ ফুটের (১ ৫২ মিটার) ধারের বা প্রান্তসীমার লাইনগুলিকে 'এণ্ড-লাইন' এবং ৯ ফুটের (২.৮০ মিটার) ধারের বা পাশের লাইনগুলিকে 'সাইড-লাইন' বলা হবে।

ডাবলসের জন্যে খেলার পিঠকে ⅛ ইঞ্চি চওড়া একটি সাদা লাইন দিয়ে দুই অর্ধে বিভক্ত করতে হবে, সাইড-লাইনের সমান্তরাল এই লাইনকে 'সেণ্টার-লাইন' বলা হয়। সুবিধার জন্য সেণ্টার-লাইনের সবটাই পাকাপাকিভাবে টেবলে চিহ্নিত করে নেওয়া যেতে পারে এবং তার ফলে টেবলটি সিঙ্গলস্ খেলার জন্য কোনও রকমেই বাতিল হয়ে যাবে না।

২। **নেট ও তার অবলম্বন**—একটি নেট, যা এণ্ড-লাইনগুলির সঙ্গে সমান্তরালভাবে অবস্থিত, খেলার পিঠকে দু'টি সমান মাপের কোর্টে ভাগ করবে। লম্বনসমেত নেট লম্বায় ৬ ফুট (১.৮৩ মিটার) হবে ; এর সারা দৈর্ঘ্য জুড়েই উপরের অংশ খেলার পিঠ থেকে ৬ ইঞ্চি (১৫ ২৪ সেন্টিমিটার) উঁচুতে থাকবে এবং নিচের অংশ খেলার পিঠের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন থাকবে। উভয় পাশে ৬ ইঞ্চি (১৫.২৪ সেন্টিমিটার) উঁচু খাড়া দণ্ডের সঙ্গে বাঁধা দড়ির সাহায্যে নেট ঝোলানো থাকবে ; সাইড-লাইন থেকে ৬ ইঞ্চি (১৫.২৪ সেন্টিমিটার) দূরত্বই উভয় দণ্ডের বাইরের দিকের সীমা।

৩। **বল**—বল গোলাকৃতি হবে, পরিধি ১.৪৬ ইঞ্চির (৩.৭ সেন্টিমিটার) কম এবং ১.৫০ ইঞ্চির (৩.৮ সেন্টিমিটার) বেশি হবে না। সেলুলয়েড বা অনুরূপ নমনীয় উপাদান দিয়ে বল তৈরি হবে, রঙ হবে সাদা ও ঔজ্জ্বল্যহীন ; ওজনে ৩৭ গ্রেণের কম বা ৩৯ গ্রেণের বেশি (যথাক্রমে ৪½ আউন্স বা ১২৭.৫ গ্রাম ও ৪¾ আউন্স বা ১৩৪.৫ গ্রাম) হবে না।

৪। **র‍্যাকেট**—র‍্যাকেট যে কোনও মাপের, আকারের ও ওজনের হতে পারবে। এর পিঠ হবে গাঢ় রঙের এবং অনুজ্জ্বল। ব্লেড হবে চ্যাপ্টা,

সব জায়গায় সমান পুরু শক্ত কাঠের। ব্লেডের দু'পিঠে আবরণ দেওয়া হলে সেই আবরণ হয় অনধিক ২ মিলিমিটার পুরু ছোট ফুট্‌কিযুক্ত রাবার দিয়ে—ফুট্‌কিগুলো বাইরের দিকে থাকবে—, কিংবা, সেলুলার রাবারের আস্তরণের উপর সাধারণ ফুট্‌কিযুক্ত রাবার দিয়ে অনধিক ৪ মিলিমিটার পুরু 'স্যাণ্ডউইচ' হবে, রাবারের ফুট্‌কিগুলো ভিতরের দিকেও থাকতে পারে, আবার বাইরের দিকেও থাকতে পারে। ব্লেডের দু'পিঠে রাবার লাগালে রাবারের রঙ দু'দিকে একই রকমের হতে হবে ; যদি দু'দিকে কাঠ ব্যবহার করা হয়, কাঠের রঙ হয় স্বাভাবিক গাঢ় হবে কিংবা অন্য কোনও প্রক্রিয়ায় গাঢ় করতে হবে— রঙ লাগালে চলবে না—যাতে পিঠের স্বাভাবিক সংঘর্ষণ-ধর্ম অপরিবর্তিত থাকে।

ব্লেডের যে অংশ হ্যাণ্ডেলের নিকটতম এবং আঙ্গুলে করে ধরা হয়, ধরবার জন্য সেখানটা কোনও উপকরণ দিয়ে ঢেকে দেওয়া যেতে পারে এবং অংশটিকে হ্যাণ্ডেলের অংশ বলেই ধরতে হবে। সেইরকম, যদি র‍্যাকেটের উল্টো পিঠ দিয়ে মোটেই বল মারা না হয়, সেটিকে কোনও উপকরণ দিয়ে ঢেকে নেওয়া যেতে পারে, কারণ ঢাকা দেওয়ার উপকরণ-সংক্রান্ত বাধানিষেধ কেবল খেলার পিঠ সম্পর্কেই প্রযোজ্য ; অবশ্য উপরে নির্দিষ্ট উপকরণগুলি ছাড়া অন্য কোনও কিছু দিয়ে ঢাকা পিঠ দিয়ে বল মারলে তা আইনবহির্ভূত বলে গণ্য হবে এবং যে মেরেছে তার পয়েণ্ট যাবে।

৫। **খেলার ক্রমপর্যায়ঃ বিভিন্ন সংজ্ঞা**—বল যতটা সময় 'খেলার মধ্যে' থাকে ততক্ষণকে 'র‍্যালি' বলা হবে। যে র‍্যালির ফল হিসাব করা হয় না তাকে 'লেট' বলা হবে, যে র‍্যালির ফল হিসাব করা হয় তাকে 'পয়েণ্ট' বলা হয়।

কোনও র‍্যালিতে যে খেলোয়াড় প্রথমে র‍্যাকেট দিয়ে বল মারে তাকে 'সার্ভার' এবং তারপর যে খেলোয়াড় বল মারে তাকে 'রিসিভার' বলা হবে ; সিঙ্গলস্ খেলায় সার্ভার প্রথমে 'ঠিক' সার্ভিস করবে এবং তারপর রিসিভার 'ঠিক' রিটার্ন করবে যার পর সার্ভার ও রিসিভার পর্যায়ক্রমে ঠিক রিটার্ন করবে।

ডাবলসে প্রথমে সার্ভার ঠিক সার্ভিস করবে, তারপর রিসিভার ঠিক রিটার্ন করবে, তারপর সার্ভারের পার্টনার ঠিক রিটার্ন করবে, তারপর রিসিভারের পার্টনার ঠিক রিটার্ন করবে এবং তারপর ঐ ক্রম-অনুসারে প্রত্যেক খেলোয়াড় পর্যায়ক্রমে ঠিক রিটার্ন করবে।

৬। **ঠিক সার্ভিস**—বল রাখতে হবে মুক্ত হাতটির তালুতে, যা নিশ্চল

অবস্থায় থাকবে। বলটিকে না ঘুরিয়ে সার্ভার কেবল হাতে করে প্রায় লম্বভাবে উপর দিকে এমন করে ছুঁড়ে দেবে যাতে আম্পায়ার সব সময়ই বল দেখতে পান এবং যাতে হাতের তালু ছেড়ে বলের বেরিয়ে যাওয়াটা পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যায়। বলটি যখন উপর থেকে নিচে পড়ছে, তখন তাকে এমনভাবে মারতে হবে যে, সেটি প্রথমে সার্ভারের কোর্ট স্পর্শ করে, এবং তারপর নেটের সরাসরি উপর দিয়ে কিংবা নেট বেষ্টন করে গিয়ে রিসিভারের কোর্ট স্পর্শ করে। ডাবলসে বল প্রথমে সার্ভারের ডানদিকের অর্ধকোর্ট কিংবা নেটের যে পাশে সে আছে সেই পাশের সেণ্টার-লাইন স্পর্শ করবে এবং তারপর নেটের সরাসরি উপর দিয়ে কিংবা নেট বেষ্টন করে রিসিভারের ডান দিকের অর্ধকোর্ট বা রিসিভারের দিকের সেণ্টার-লাইন স্পর্শ করে। সার্ভিসের সময় যখন মুক্ত হাতের সংস্পর্শে বল থাকবে, হাতটি খেলার পিঠের চেয়ে উঁচু সমতলে খোলা অবস্থায় থাকবে, এবং সকল আঙুল জোড়া, কেবল 'বুড়ো' আঙুল আলাদা থাকবে। বলটি তালুতে থাকার সময় তাকে যেন কোনওক্রমেই আঙুল দিয়ে মুঠো করে ধরা বা মোচড়ানো না হয়। যে ক্ষেত্রে খেলা আরম্ভের আগেই আম্পায়ারকে জানিয়ে দেওয়া হয় যে, দৈহিক অক্ষমতার জন্য সংশ্লিষ্ট খেলোয়াড় নিয়ম মানতে পারবে না, সেখানে সার্ভিস করার এই নির্দিষ্ট পদ্ধতি কড়াকড়িভাবে প্রয়োগ করা হবে না।

সার্ভিসে যে মুহূর্তে র‍্যাকেটের সঙ্গে বলের সংঘাত ঘটবে, তখন বলটি অবশ্যই এণ্ড-লাইন বা তার এক কল্পিত বিস্তৃতির পিছনে থাকবে।

টীকাঃ ১। বল 'মারা' হয় অর্থ 'র‍্যাকেট দিয়ে বা র‍্যাকেট হাতের কব্জির নিচ দিয়ে আঘাত করা'। 'র‍্যাকেট হাত' হল যে-হাতে র‍্যাকেট ধরা রয়েছে এবং 'মুক্ত' হাত হল যে-হাতে র‍্যাকেট ধরা নেই। সুতরাং র‍্যাকেট পড়ে যাওয়ার পর শুধু হাত দিয়ে মার 'ঠিক নয়' কারণ, হাত তখন আর 'র‍্যাকেট হাত' থাকছে না। সেই রকম, হাত থেকে ফসকে যাওয়া বা ছুঁড়ে ফেলা র‍্যাকেট দিয়ে মাত্র মারও 'ঠিক নয়', কারণ তখন বল 'মারা' হচ্ছে না।

২। 'খেলার পিঠ' এই বিশিষ্টার্থক বাক্যাংশটিকে এমনভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে যেন তার মধ্যে টেবলের বহিঃপৃষ্ঠের উপরের কিনারাগুলিও ধরা হয়, এবং এই কিনারাগুলির কোনওটির

উপর বল পড়লে সেটি তখনও খেলার মধ্যেই থাকবে; কিন্তু বলটি কিনারার নিচের দিকে টেবলের বহিঃপৃষ্ঠের পাশের দিকে লাগলে সেটি খেলার বাইরে হয়ে যায় এবং শেষে যে বল মেরেছে তার পয়েণ্ট যায়।

৩। 'নেট বেষ্টন করে' বলতে বুঝতে হবে সাইড-লাইনের বাইরে নেটের দণ্ডগুলির যে অংশ বেরিয়ে আছে তার নিচে দিয়ে বা তাকে ঘুরে গিয়ে। নেটের প্রান্ত দণ্ডের সঙ্গে এমন ঘেঁষে থাকবে যেন বল নেট এবং দণ্ডের মধ্যে দিয়ে গলে না যায়, এবং ঐরকম গলে যাওয়াকে 'নেট বেষ্টন করে' যাওয়া বলে গণ্য করা হবে না।

৪। যদি কোনও খেলোয়াড় সার্ভ করতে গিয়ে বলটি একেবারেই ফস্‌কায়, তার পয়েণ্ট যাবে, কারণ বল তার হাত থেকে বেরোন-মাত্রই খেলার মধ্যে হয়ে গেছে এবং সেই অবস্থায় বলের ঠিক সার্ভিস করা হয়নি।

৭। **'ঠিক' রিটার্ন**—বল সার্ভিস বা রিটার্ন হয়ে খেলার মধ্যে আসার পর তাকে এমনভাবে মারতে হবে যে, বলটি নেটের সরাসরি উপর দিয়ে বা নেট বেষ্টন করে গিয়ে একেবারে বিপক্ষের কোর্ট স্পর্শ করে। অবশ্য যদি বল সার্ভিস বা 'রিটার্ন হবার পর' নিজের গতিতেই নেটের উপর দিয়ে বা নেট বেষ্টন করে ফিরে আসে তা হলে সেটি খেলার মধ্যে থাকা অবস্থায় তাকে এমনভাবে মারতে পারা যাবে যেন, তা সরাসরি বিপক্ষ কোর্ট স্পর্শ করে। যদি বল নেটের উপর দিয়ে বা নেট বেষ্টন করে যেতে যেতে নেট বা তার অবলম্বন স্পর্শ করে তা হলে সরাসরি অতিক্রম করেছে বলে ধরতে হবে।

৮। **'ইন্ প্লে'—সার্ভিসে বলটিকে হাত থেকে অভিক্ষেপ করার মুহূর্ত থেকেই বল 'খেলার মধ্যে' যে পর্যন্ত না:**

(এ) বলটি পরপর দু'বার একই কোর্ট স্পর্শ করে,

(বি) সার্ভিসের সময় ছাড়া অন্য সময়ে, অব্যবহিত পূর্বে র‍্যাকেটের মার না হওয়া সত্ত্বেও পর-পর উভয় কোর্ট স্পর্শ করে;

(সি) কোনও খেলোয়াড় বলটিকে পর-পর একাধিকবার মারে;

(ডি) বলটি কোনও খেলোয়াড় বা তার পোশাক বা তার শরীর-সংলগ্ন কিছু স্পর্শ করে;

(ই) নেটের একদিকে মারা হবার পর অপর দিকের খেলার পিঠ স্পর্শ

করার আগেই বল র‍্যাকেট বা কজ্জির নিচে র‍্যাকেট হাতের সংস্পর্শে আসে (যখন বল 'ভলি' করা হয়েছে বলা হয়) ;

(এফ) নেট, নেটের অবলম্বন বা উপরিলিখিত জিনিসগুলি ছাড়া বল অন্য কিছু স্পর্শ করে ,

(জি) ডাবলসের খেলায় সার্ভিসে বল সার্ভারের বা রিসিভারের বাঁ দিকের অর্ধ-কোর্ট স্পর্শ করে ;

(এইচ) ১৫নং আইনে বর্ণিত ব্যতিক্রম ছাড়া, ডাবলসের খেলায় কোনও খেলোয়াড় নির্দিষ্ট ক্রম ভঙ্গ করে বল মারে।

৯। **লেট**—কোনও র‍্যালি লেট ডাকা হবে এইসব ক্ষেত্রে :—

(এ) সার্ভ-করা বল যদি নেটের উপর দিয়ে যেতে যেতে নেট বা তার অবলম্বন স্পর্শ করে, অবশ্য যদি আর সব দিকে সার্ভিসটি ঠিক হয় বা রিসিভার সেটিকে ভলি করে ,

(বি) যদি রিসিভার বা তার পার্টনার প্রস্তুত নেই এমন সময় সার্ভিস করা হয়, অবশ্য খেলোয়াড় বা তার পার্টনার বলটি মারতে উদ্যত হলে তাদের অপ্রস্তুত বলে ধরা হবে না ;

(সি) আয়ত্তের বাইরে এমন কোনও আকস্মিক ঘটনার দরুন যদি খেলোয়াড় ঠিক সার্ভিস বা ঠিক রিটার্ন করতে অক্ষম হয় বা অন্য কোনওভাবে র‍্যালিটির সমাপ্তি ঘটাতে বাধ্য হয় ;

(ডি) যদি খেলার ক্রম বা প্রান্ত-সংক্রান্ত ভুল সংশোধনের জন্য খেলা সাময়িকভাবে বন্ধ করা হয় ;

(ই) যদি 'এক্সপিডাইট' প্রথার প্রয়োগের জন্য সাময়িকভাবে খেলা বন্ধ করা হয়।

টীকা : ১। যদি খেলা চলতে চলতে বলটি এমনভাবে ফেটে যায় যাতে কোনও খেলোয়াড়ের রিটার্নের উপর প্রভাব পড়ে, তাহলে র‍্যালিটি লেট হবে। যখন আম্পায়ার নিশ্চিত যে খেলার বল ফেটে গেছে বা খুঁত হয়েছে তখন তাঁরই কর্তব্য লেট ডেকে খেলা থামানো ; পয়েন্টের হিসাবের সময় তিনি অবশ্যই সিদ্ধান্ত নেবেন বলটি খেলার বাইরে যেতে যেতে ফেটে গেছে কিনা এবং রিটার্ন করার ব্যাপারে খেলোয়াড়ের কোনও রকম বাধা সৃষ্টি করেছে কিনা। সমস্ত সন্দেহের ক্ষেত্রে তিনি লেট ডাকবেন।

২। চলন্ত দর্শক, কাছের চলমান কোনও বস্তু বা পার্টনার ছাড়া অন্য খেলোয়াড়, হঠাৎ গোলমাল ইত্যাদিকে খেলোয়াড়ের আয়ত্তের বাইরের আকস্মিক ঘটনা বলে ধরতে হবে, যাদের দরুণ ব্যাঘাত ঘটলে লেট হবে। নিশ্চল দর্শক, আম্পায়ার, আলো, কাছের কোনও টেবল, সমান পর্দায় অবিরাম শব্দ বা এই রকমের কিছু আপেক্ষিকভাবে স্থির বা গতিহীন বিষয়কে তা মনে করা যাবে না এবং খেলার সময় তাদের থেকে বাধার বিষয় অভিযোগ করলে তা অসিদ্ধ বলে গণ্য হবে।

৩। যদি কোনও গেম আরম্ভের ১৫ মিনিট পরে অসমাপ্ত থাকে, তা হলে সেই গেমের অবশিষ্টাংশ এবং ম্যাচের বাকি গেমগুলি 'এক্সপিডাইট' প্রথা অনুযায়ী চলবে। ১৫ মিনিটের শেষে আম্পায়ার লেট ডেকে খেলা সাময়িকভাবে স্থগিত করবেন। যদি কোনও র‍্যালির মধ্যে এই ছেদ পড়ে, ছেদ-পড়া র‍্যালিতে যে খেলোয়াড় সার্ভিস করছিল সেই খেলোয়াড়ের সার্ভিস দিয়ে গেম আবার শুরু হবে; যদি দুই র‍্যালির মধ্যে ছেদ ঘটে তাহলে আগের র‍্যালিতে যে খেলোয়াড় রিসিভার ছিল তার সার্ভিস দিয়ে গেম আবার শুরু হবে। যে খেলোয়াড় বা জুটি বল রিসিভ করবে তাদের রিটার্ন মারগুলি, ১ থেকে ১৩ পর্যন্ত, আম্পায়ার ছাড়া অন্য কোনও কর্মকর্তা চেঁচিয়ে গুনবেন।

১০। পয়েণ্ট—৯ নম্বর আইনে উল্লেখিত ক্ষেত্রগুলি ছাড়া কোনও খেলোয়াড় এক পয়েণ্ট হারাবে :

(এ) যদি সে ঠিক সার্ভিস করতে অসমর্থ হয়;

(বি) যদি বিপক্ষ খেলোয়াড় ঠিক সার্ভিস বা ঠিক রিটার্ন করার পর সে ঠিক রিটার্ন করতে অসমর্থ হয়;

(সি) বলটি যখন খেলার মধ্যে এমন সময় যদি সে বা তার র‍্যাকেট বা তার শরীরে লাগানো আছে এমন কিছু নেট বা তার অবলম্বন স্পর্শ করে;

(ডি) বলটি যখন খেলার মধ্যে এমন সময় যদি সে বা তার র‍্যাকেট বা সে পরে আছে বা তার শরীরে লাগানো আছে এমন কিছু খেলার পিঠটি নড়িয়ে ফেলে;

(ই) বলটি যখন খেলার মধ্যে তখন তার মুক্ত হাতটি যদি খেলার পিঠটি স্পর্শ করে ;

(এফ) বিপক্ষের মারের পর, খেলায় থাকা বলটি নেটের যে পাশে সে আছে সেই দিকের খেলার পিঠ স্পর্শ না করে এণ্ড-লাইন বা সাইড-লাইনের উপর দিয়ে বেরিয়ে যাবার আগেই যদি তার বা সে পরে আছে বা তার শরীরে লাগানো আছে এমন কিছুর সংস্পর্শে আসে ;

(জি) যদি সে বল ভলি করে ;

(এইচ) ডাবলসের খেলায়, ১৫নং আইনের ব্যবস্থা ব্যতিরেকে, যদি ক্রম ভঙ্গ করে সে বল মারে ;

(আই) এক্সপিডাইট প্রথায় যদি তার সার্ভিস এবং সার্ভকারী খেলোয়াড়ের বা জুটির পরবর্তী বারোটি মার রিসিভার খেলোয়াড় বা জুটি ঠিক রিটার্ন করে ফেরৎ পাঠিয়ে দেয়।

১১। **গেম**—যে খেলোয়াড় বা জুটি প্রথমে ২১ পয়েণ্ট করবে সে পক্ষই গেম জিতবে, যদি না উভয় খেলোয়াড় বা জুটিরই ২০ পয়েণ্ট করে হয়ে থাকে, সে ক্ষেত্রে বিপক্ষ খেলোয়াড় বা জুটির আগে যে খেলোয়াড় বা জুটি ২ পয়েণ্ট বেশি করবে সে বা তারাই বিজয়ী হবে।

১২। **ম্যাচ**—ম্যাচ হবে এক গেমে বা 'বেস্ট অব থ্রী' বা 'বেস্ট অব ফাইভ' গেমের। খেলা আগাগোড়া অবিচ্ছিন্নভাবে চলবে, ব্যতিক্রম শুধু এই যে, পাঁচ গেমের ম্যাচে তৃতীয় এবং চতুর্থ গেমের মধ্যে যে কোনও খেলোয়াড় বা জুটি পাঁচ মিনিট বিশ্রাম দাবী করতে পারবে।

১৩। **প্রান্ত ও সার্ভিস নির্বাচন**—প্রান্ত বেছে নেওয়া এবং প্রথমে সার্ভিস বা রিসিভ করার অধিকারের মীমাংসা টসের সাহায্যে হবে, তবে এই শর্তে যে, টসে জয়ী পক্ষ প্রথমে সার্ভ করার বা রিসিভ করার অধিকার বেছে নিলে পরাজিত পক্ষ প্রান্ত বেছে নিতে পারবে এবং জয়ী পক্ষ প্রান্ত বেছে নিলে পরাজিত পক্ষ প্রথমে সার্ভ বা রিসিভ করার অধিকার নেবে ; অবশ্য ইচ্ছা করলে টসে জয়ী পক্ষ পরাজিতেরই উপব প্রথমে পছন্দ জানাবার ভার দিতে পারে।

ডাবলসের খেলায় যে জুটি কোনও গেমে প্রথমে সার্ভ করার অধিকার পাবে, তারা ঠিক করে নেবে কোন্ পার্টনার সার্ভ করবে। ম্যাচের প্রথম গেমে বিপক্ষ জুটিও অনুরূপভাবে ঠিক করে নেবে কে প্রথম রিসিভার হবে।

পরবর্তী গেমগুলিতে সার্ভকারী জুটি তাদের প্রথম সার্ভার ঠিক করে নেবে এবং তার পরে প্রথম সার্ভারের যথাযথ প্রথম রিসিভার ১৪নং আইনের ব্যবস্থামত আপনাআপনিই ঠিক হয়ে যাবে।

১৪। **প্রান্ত ও সার্ভিস পরিবর্তন**—যে খেলোয়াড় বা জুটি এক প্রান্তে খেলা শুরু করেছিল তারা অব্যবহিত পরের গেমটিতে অপর প্রান্তে খেলা শুরু করবে এবং ম্যাচের শেষ পর্যন্ত এইভাবে চলবে। ম্যাচের সম্ভাব্য শেষ গেমটিতে যখন প্রথমে কোনও খেলোয়াড়ের বা জুটির ১০ পয়েন্ট হচ্ছে তখন খেলোয়াড়রা বা জুটিরা পরস্পর প্রান্ত পরিবর্তন করে নেবে। সিঙ্গলসে, নিম্নবর্ণিত ব্যবস্থা ব্যতিরেকে, পাঁচ পয়েন্টের পর রিসিভার হবে সার্ভার এবং সার্ভার হবে রিসিভার এবং গেমের শেষ পর্যন্ত এইভাবে চলতে থাকবে। ডাবলস্-এ সার্ভ করার অধিকারী জুটির মনোনীত পার্টনার প্রথম পাঁচটি সার্ভিস করবে এবং বিপক্ষ জুটির উপযুক্ত পার্টনার সেগুলি রিসিভ করবে। দ্বিতীয় পাঁচটি সার্ভিস করবে প্রথম পাঁচটি সার্ভিসের রিসিভার এবং রিসিভ করবে প্রথম সার্ভারের পার্টনার। তৃতীয় পাঁচটি সার্ভিস করবে প্রথম সার্ভারের পার্টনার এবং রিসিভ করবে প্রথম রিসিভারের পার্টনার। চতুর্থ পাঁচটি সার্ভিস করবে প্রথম রিসিভারের পার্টনার এবং রিসিভ করবে প্রথম সার্ভার। পঞ্চম পাঁচটি সার্ভিস হবে প্রথম পাঁচটির মতই এবং এই ক্রম অনুযায়ী শেষ পর্যন্ত চলবে, নিম্নবর্ণিত ব্যবস্থা ছাড়া।

উভয় পক্ষের ২০ পয়েন্ট হয়ে যাবার পর থেকে কিংবা যদি এক্সপিডাইট প্রথায় গেমটি খেলা হয় তা হলে সার্ভ ও রিসিভ করার ক্রম একই থাকবে, কিন্তু গেমের শেষ পর্যন্ত প্রত্যেক খেলোয়াড় পালা করে একটি মাত্র সার্ভিস করবে। ডাবলসের খেলার সম্ভাব্য শেষ গেমে যখন প্রথমে যে কোনও জুটি ১০ পয়েন্টে যাবে, তখন রিসিভার জুটি তাদের রিসিভ করার ক্রম বদলে নেবে। ডাবলসের ম্যাচের প্রতিটি গেমে রিসিভিং-এর প্রারম্ভিক ক্রম পূর্ববর্তী গেমের প্রারম্ভিক ক্রমের বিপরীত হবে। যে খেলোয়াড় বা জুটি একটি গেমে প্রথমে সার্ভ করেছিল তারা অব্যবহিত পরের গেমে প্রথমে রিসিভ করবে।

১৫। **ক্রমবহির্ভূত প্রান্ত, সার্ভিং বা রিসিভিং**—যখন প্রান্ত পরিবর্তন করা উচিত ছিল, খেলোয়াড়রা যদি তখন প্রান্ত পরিবর্তন না করে থাকে, ভুলটি ধরা পড়া মাত্র তারা সঙ্গে সঙ্গে তা করবে,

অবশ্য যদি না ভুলের পর গেমটি শেষ হয়ে গিয়ে থাকে, তা হলে ভুলটি উপেক্ষা করতে হবে। যে কোনও ক্ষেত্রেই ভুল ধরা পড়ার আগের সমস্ত পয়েণ্টই ধরতে হবে।

যদি ভুল করে কোনও খেলোয়াড় তার ক্রমের বাইরে সার্ভ বা রিসিভ করে, ভুল ধরা পড়া মাত্র খেলা স্থগিত রাখতে হবে এবং যে স্কোর হয়েছে তাতেই সেই খেলোয়াড়ের সার্ভ বা রিসিভিং দিয়ে খেলা চলতে থাকবে খেলার শুরুতে প্রতিষ্ঠিত ক্রম অনুযায়ী বা ১৪নং আইন অনুযায়ী সেই ক্রমের পরিবর্তন হয়ে থাকলে সেই অনুযায়ী যার সার্ভার বা রিসিভার হওয়া উচিত ছিল। যে কোনও ক্ষেত্রেই ভুল ধরা পড়ার আগের সমস্ত পয়েণ্টই ধরতে হবে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

হিন্দুস্থান বল

স্বাধীনতালাভের বহু আগে এই খেলার প্রচলন হয়। কিন্তু স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে এর যোগাযোগ আছে---এই অভিযোগে ব্রিটিশ সরকার
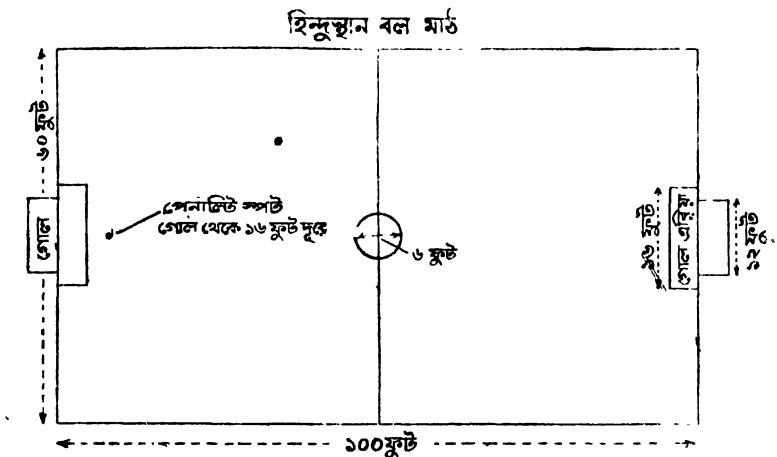
হিন্দুস্থান বল খেলা নিষিদ্ধ করেন। তারপর আর এই খেলাটির তেমন প্রচার ও প্রসার হয়নি। কলকাতার 'ছাত্র সমিতি' এই খেলার উদ্ভাবন করেন।

মাঠ: তৎকালীন সংবাদপত্রে ও সাময়িকপত্রে হিন্দুস্থান বল সম্পর্কে যে নিয়মাবলী প্রকাশিত হয়েছিল, তা থেকে জানা যায় মাঠের দৈর্ঘ্য ১০০ ফুট (৩০.৪৮ মিটার), প্রস্থ ছিল ৬০ ফুট (১৮.২৮ মিটার); ফুটবল মাঠের মতই সীমানা থাকে চতুর্দিকে। ফুটবলের মতই সেণ্টার-লাইন ও সেণ্টার বানাতে হবে। গোলের দৈর্ঘ্য ১২ ফুট (৩.৬৫ মিটার) এবং মাটি থেকে পোস্টের উচ্চতা ৭ ফুট (২.১৩ মিটার)। গোল-এলাকার দৈর্ঘ্য ২০ ফুট ও প্রস্থ ১২ ফুট (৬.০৯×৩.৬৫ মিটার)। পেনাল্টি-বক্স থাকে গোল থেকে ১৭ ফুট (৫.১৮ মিটার) দূরে।

খেলা: প্রতি অর্ধে ২০+২০=৪০ বা ২৫+২৫=৫০ মিনিট এবং বিরতির জন্য ৫ মিনিট রাখা হয়। প্রতি দলে ৭ বা ৯ জন নিয়ে খেলা যেতে পারে দু' দলে। দুই হাতে বল ছোঁড়া, যে কোনও হাত দিয়ে মারা বা ধাপানো যায়। পা ও হাঁটু বাদে কোমরের উপরের শরীরের যে কোনও অংশ হিন্দুস্থান বল খেলায় ব্যবহার করা চলে। উদ্দেশ্য গোল দেওয়া। ফুটবলের মতই গোলকীপার, ব্যাক, হাফব্যাক, ফরওয়ার্ড ইত্যাদিতে দল বিভক্ত করা হয়। তৎকালে গোলে ১, ব্যাকে ২, হাফে ১ ও ফরওয়ার্ডে ৩ জন নিয়ে বেশির ভাগ ম্যাচ খেলা হত।

টসে যারা জেতে তারা বল ছুঁড়ে খেলা শুরু করে। কিন্তু বল হাতে নিয়ে ২ পা-র বেশি যাওয়া যায় না। ৫ সেকেণ্ডের বেশি বল হাতে রাখাও আইন-বিরুদ্ধ। এসব দিক থেকে এখনকার হ্যাণ্ড-বলের সঙ্গে হিন্দুস্থান বলের যথেষ্ট মিল আছে। আবার ফুটবলের মত অফ্-সাইড, ফাউল ইত্যাদিও প্রচলিত। তবে হিন্দুস্থান বলে গোলকীপার পা দিয়ে বল থামিয়ে গোল বাঁচাতে পারে, কিন্তু হকির মত পা দিয়ে বল মারতে পারে না। কোনও রকম নিয়ম ভঙ্গ না করে বল গোলের ভিতর ঢুকলেই গোল হয়।

হিন্দুস্থান বল যেহেতু হাতেই অধিকাংশ সময় খেলা হয়, তাই এতে 'কিক্' নেই। সবই 'থ্রো'। যথা—গোলের পর বা কর্ণার হলে সেণ্টার-থ্রো করতে হয়। সাইড-লাইন দিয়ে বল বাইরে গেলে সাইড-থ্রো। গোলপোস্টের উপর বা পাশ দিয়ে বল গেলে আউট-থ্রো। পেনাল্টি হলে পেনাল্টি-থ্রো, ফাউল থেকে যে থ্রো দেওয়া হয় সেটি ফাউল-থ্রো।

ক্যাপ্টেন বল

সরঞ্জাম: একটি নেটবল বা ছোট ফুটবল।

মাঠ: মাঠে ১২ জন খেলোয়াড় থাকে এবং কে কোথায় দাঁড়াবে তা
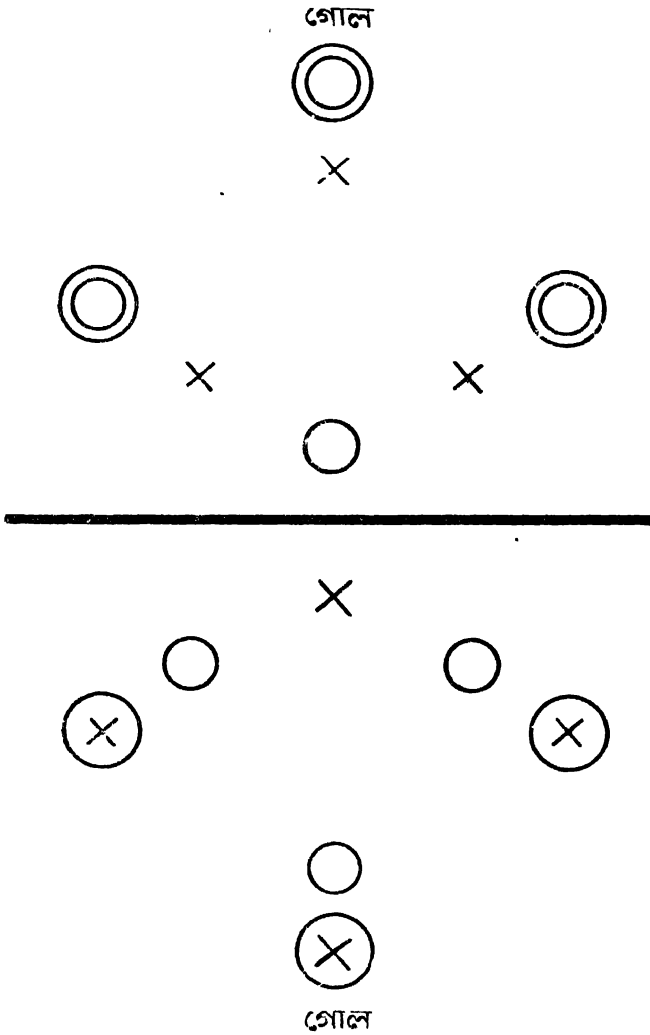
ক্যাপ্টেন বল

নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয় চক বা চুন দিয়ে। বেসগুলি বৃত্ত। ব্যাস হবে

০.৬১ মিটার থেকে ১.২২ মিটার। একটি বৃত্ত থেকে আর একটি বৃত্তের দূরত্ব ৪.৫৭ মিটার থেকে ৬.১০ মিটার। মাঠের মাঝে থাকবে সেণ্টার লাইন। ছবি দ্রষ্টব্য)

বিবরণ : প্রতি দলে ৭ জনের মধ্যে ৩ জন বেসম্যান থাকে। তারা দাঁড়াবে বৃত্তের মধ্যে। প্রতিটি বেস-এর কাছে বিপক্ষের ১ জন করে গার্ড থাকে। দুই দলের দুই ফিল্ডার দাঁড়াবে সেণ্টার-লাইনের ধারে। ক্যাপ্টেন দাঁড়ায় গোল বেসে।

খেলার উদ্দেশ্য গোল দেওয়া। বেসম্যানের পাস দেওয়া বল ক্যাপ্টেন লুফতে পারলেই গোল হবে। গার্ড বা ফিল্ডারের কাছ থেকে ক্যাপ্টেনের কাছে বল পাস এলে গোল হয় না। তবে এক পক্ষের গার্ডরা বিপক্ষের ফিল্ডার ও গার্ডদের পাস আটকাবার চেষ্টা করে যখন তারা বল তাদের ক্যাপ্টেনের কাছে পাঠাতে উদ্যত হয়।

আম্পায়ার সেণ্টার-লাইনে বল বাউন্সের মাধ্যমে খেলা শুরু করেন। যে ফিল্ডার বল ধরতে পারে, সে ধরেই তার বেসম্যানদের কাছে বল ছোঁড়ে। বিপক্ষের গার্ডরাও প্রাণপণে তখন বল আটকাবাব চেষ্টা করে। গার্ডরা বল ধরে বিপরীত দিকে নিজের বেসম্যানদের দিকে বল ছোঁড়ে যাতে তাদের বেসম্যানরা বল নিজের অধিনায়কের কাছে পাঠাতে পারে গোল দেওয়ার জন্য।

সকলেই দু'হাতে বল ধরে। বল মাঠের বাইরে গেলে বা গোল হলে সেণ্টার লাইনে আনতে হয়। তখন ড্রপ দিয়ে খেলা শুরু করান আম্পায়ার।

ফিল্ডার ছাড়া আর কেউ সেণ্টার-লাইন অতিক্রম করতে পারবে না। ক্যাপ্টেন ও বেসম্যানকে সর্বদা এক পা বৃত্তের মধ্যে রাখতে হবে। তবে ডজ করতে ও পাস ধরতে পারে যে কোনও দিকে ফিরে।

রিলে গেমস

অ্যাথলেটিকসের বিভিন্ন ইভেণ্টের মধ্যে অন্যতম রিলে রেস (বা দৌড়)। ব্যাটন পরিবর্তনের দ্বারা চারজন খেলোয়াড় দৌড় শেষ করে। স্টার্টিং-লাইন থেকে বিভিন্ন দলের প্রথম জন দৌড় শুরু করে পরবর্তী বাঁকে দাঁড়িয়ে-থাকা নিজ দলের দ্বিতীয় জনকে ব্যাটন দেয়। এইভাবে দ্বিতীয় জন দেবে তৃতীয়

জনকে, তৃতীয় জন চতুর্থ জনকে। যে দলের শেষ জন দৌড়ে ফিনিশিং পয়েন্টে পৌঁছায় তারাই বিজয়ী হয়। এটি সাধারণ রিলে।

সাট্ল রিলে ঃ ১৫ ২৪ মিটার থেকে ২২.৮ মিটার দূরে দুটি সমান্তরাল লাইন থাকবে। খেলোয়াড়রা দু'টি দলে বিভক্ত হবে। এবং প্রতিটি দল 'এক' ও 'দুই' দু'টি গ্রুপে ভাগ হবে। এই গ্রুপ দু'টি মুখোমুখি দাঁড়ায় পৃথক লাইনে। হুইশল বাজার সঙ্গে সঙ্গে 'এক' গ্রুপের প্রথম জন সামনে ছুটে 'দুই' গ্রুপের প্রথম জনকে ছোঁবে। তারপর প্রত্যেক গ্রুপের একজন অপর জনকে ছোঁবে। তবে একজন একবারই একদিকে দৌড়বে। যে দলের শেষ খেলোয়াড় সামনের স্টার্টিং লাইন প্রথম অতিক্রম করবে তারাই বিজয়ী হয়।

হুইল রিলে ঃ একটি বড় বৃত্ত এঁকে কেন্দ্রবিন্দু থেকে ঘড়ির কাঁটার ১২টা, ৩টা, ৬টা, ও ৯টা বরাবর চারটি দল দাঁড়াবে। প্রতি দলে ৫ জন করে খেলোয়াড়। ঘড়িতে যে যে দিকে ১২, ৩, ৬, ও ৯ থাকে সেখানে থেকে ১ নম্বর খেলোয়াড় শুরু। এইভাবে কেন্দ্রবিন্দু পর্যন্ত ১, ২, ৩, ৪ ও ৫ নম্বর খেলোয়াড়। প্রতি দলের ১ নম্বরের হাতে ছোট বল থাকে। হুইশলের সঙ্গে সঙ্গে ১ নম্বর খেলোয়াড় বল নিয়ে বৃত্তাকারে অন্য দলগুলিকে ঘুরে নিজের দলের কাছে আসবে ও ২ নম্বরকে বল দেবে। সে তারপর দৌড় শুরু করে একই ভাবে ঘুরবে। যারা আগে দৌড় শেষ করে তারাই বিজয়ী হয়।

খো-খো রিলে ঃ খো-খো-র মতই সামনে ও পিছনে মুখ করে সকলে বসে। তবে ১.৫২ থেকে ৩.০৫ মিটার দূরত্ব হবে প্রত্যেকের। প্রত্যেক দলের একজন তাদের দলের সামনে দাঁড়ায়। হুইশলের সঙ্গে সঙ্গে সে টার্নিং পয়েন্ট থেকে ছুটে এসে প্রথম বসা খেলোয়াড়কে ছোঁবে 'খো' শব্দে পিছন থেকে। সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় খেলোয়াড় উঠবে, তখন তার জায়গায় আগের খেলোয়াড় বসে 'খো' শব্দে তৃতীয় জনকে ছোঁয় ও তার জায়গায় বসে। তৃতীয় জন উঠে ছোঁয় চতুর্থ জনকে। এইভাবে শেষ খেলোয়াড় পর্যন্ত খেলা চলবে। সেখান থেকে আবার একইভাবে ছুঁতে ছুঁতে প্রথম খেলোয়াড় অর্থাৎ যে ছোঁয়া আরম্ভ করেছিল তার কাছে ফিরতে হবে। যে দল আগে ছোঁয়া শেষ করে তারাই বিজয়ী হয়। এই খেলায় প্রত্যেক খেলোয়াড় আর একজনকে স্পর্শ করে পিছন থেকে এবং স্পর্শ-করা খেলোয়াড় যেদিকে মুখ করে বসে ছিল সেইভাবে বসতে হয়। তাই প্রত্যেককে এঁকে-বেঁকে যেতে হয়।

সার্কল রিলে ঃ একই ব্যাসের দুটি বৃত্ত থাকে। দুটি ক্লাশ সমসংখ্যক

খেলোয়াড়ে বিভক্ত হবে। উভয় দল বৃত্ত ঘুরে দাঁড়ায়। প্রত্যেক দলের অধিনায়কের হাতে বল থাকে। হুইশলের সঙ্গে সঙ্গে ঘড়ির কাঁটার মত বল ঘুরবে হাতে হাতে। বল নিয়ে যারা আগে বৃত্ত শেষ করে তারাই জিতবে।

দাড়িয়াবান্ধা

দাড়িয়াবান্ধার কোর্ট
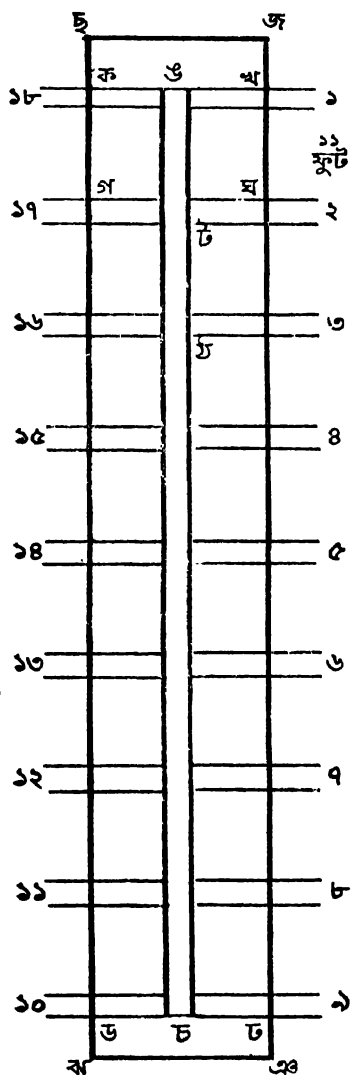
১। ১ থেকে ৯ আড়াআড়ি লাইন-গুলিকে (২৩ ফুট ১ ইঞ্চি লম্বা ও ১৩ ইঞ্চি চওড়া) দুর্গ বা **পাতি** বলা হয়। যেমন, কখ ও গঘ।

২। মাঝে লম্বা ঙচ লাইন কেন্দ্রীয় দুর্গ বা '**সুরপাতি**'। ঙ থেকে চ পর্যন্ত মাপ ৮৯ ফুট ১ ইঞ্চি (ছবি দ্রষ্টব্য)। এই লাইনটিও ১৩ ইঞ্চি চওড়া।

৩। সুরপাতি প্রতিটি দুর্গকে আধাআধি বিভক্ত করেছে।

কোর্ট

ঙ চ	৮৯ ফুট ১ ইঞ্চি
ক ড	ঐ
খ চ	ঐ
ক খ	২৩ ফুট ১ ইঞ্চি
গ ঘ	ঐ

৪। (ক) সামনের দুটি দুর্গের লাইনদ্বয়ের (খ ঘ) মধ্যে দূরত্ব ১১ ফুট।

(খ) সুরপাতি ও পাতির সংযোগস্থলে ১৬ ইঞ্চির ছোট বর্গক্ষেত্র (টঠ) তৈরী হয়।

৫। (ক) মোট দুর্গ ৯টি।

(খ) সম্মুখ ও পশ্চাৎ—দুই দুর্গের থেকে .১১ ফুট দূরে (ছজ ও ঝঞ) সমান্তরালভাবে দুটি লাইন টানা হয়।

(গ) মাঠের বা কোর্টের চারদিকে ১০ ফুট জায়গা ছেড়ে দিতে হবে।

৭। যাদের বয়স ১০ বছর হয়নি বা যারা উচ্চতায় ৫ ফুটের কম, তারা জুনিয়র খেলোয়াড়।

৮। জুনিয়রদের কোর্টের মাপ :—

(ক) দুর্গ ১২ ইঞ্চি×২১ ফুট।

(খ) সম্মুখ লাইন ও সন্নিহিত দুর্গের দূরত্ব ১০ ফুট।

(গ) স্থরপাতি ১২ ইঞ্চি×৮১ ফুট।

সংজ্ঞা

সাইড লাইন, এণ্ড লাইন ও বাউণ্ডারি : কোর্টের দুই পাশে লম্বা লাইন দুটি সাইড লাইন (ক ড ও খ ঢ)। সম্মুখ ও পশ্চাৎ দুর্গের শেষের (ছ জ ও ঝ ঞ) লাইনদ্বয় এণ্ড লাইন। এরাই সীমানা বা বাউণ্ডারি।

দুর্গ বা পাতি : আয়তক্ষেত্রাকার (২৩ ফুট ১ ইঞ্চি দীর্ঘ ও ১৩ ইঞ্চি প্রস্থ) সরুপথগুলি দুর্গ বা পাতি।

সম্মুখ দুর্গ : প্রথম দুর্গকে সম্মুখ দুর্গ, সম্বরপাতি বা কিংবা কাপাল পাতি বলা হয়।

পশ্চাৎ দুর্গ : শেষের দুর্গকে পশ্চাৎ দুর্গ বা লোনা পাতি বলে।

কেন্দ্রীয় দুর্গ : লম্বালম্বিভাবে যে সরু পথ আধাআধি ভাগ করেছে দুর্গগুলিকে, সেটি কেন্দ্রীয় দুর্গ বা স্থরপাতি।

পিছনে যাওয়া, উপরে ওঠা : সম্মুখ দুর্গ থেকে পশ্চাৎ দুর্গে যাওয়াকে পিছনে যাওয়া এবং পুনরায় অতিক্রম করে সামনে আসাকে উপরে ওঠা বলা হয়।

স্কোয়ার : কেন্দ্রীয় দুর্গ ও সাধারণ দুর্গগুলির মিলিত স্থানে যে চতুষ্কোণ ছোট স্থান, তাকে স্কোয়ার বলে।

দুর্গের কোর্ট : দুটি পাশাপাশি দুর্গের মাঝের স্থানই কোর্ট। রক্ষক-দলের যে খেলোয়াড় তার সামনের যে জমিতে আক্রমণকারী কাউকে রক্ষা করে সেটিই তার কোর্ট।

রক্ষক : যারা দুর্গে দাঁড়িয়ে থাকে এবং বিপক্ষকে দুর্গ অতিক্রমে বাধা দেয় তারাই রক্ষক বা পাতিওয়াল। পাতিওয়াল বিপক্ষ খেলোয়াড়দের ছুঁয়ে আউট করে।

গ্রেনেডার : রক্ষকদলের যে সম্মুখ দুর্গ ও কেন্দ্রীয় দুর্গ রক্ষা করে সে গ্রেনেডার বা সুর।

আক্রমণকারী : যে বা যারা দুর্গ অতিক্রমের চেষ্টা করে তারাই আক্রমণকারী।

ফুট ফল্ট : রক্ষকদলের কারও দেহের কোনো অংশ দুর্গের লাইনের বাইরের জমি স্পর্শ করলে তার ফুট ফল্ট হবে।

হ্যাণ্ড ফল্ট : রক্ষকদের কারও পা ছাড়া দেহের অন্য কোনো অংশ মাটি স্পর্শ করলে হ্যাণ্ড ফল্ট হবে।

স্কোয়ার কাটিং : (ক) কেন্দ্রীয় তথা সম্মুখ দুর্গরক্ষক ইনিংসের শুরুতে তার পা বা পায়ের অংশ সম্মুখ দুর্গের স্কোয়ারে রাখবে। খেলার শুরুতেও ওই করবে, আবার স্পর্শ করবে। একে স্কোয়ার কাটিং বা স্কোয়ার বলা হয়।

(খ) তবে এই সময় ওই সুরপতি হ্যাণ্ড বা ফুট ফল্ট করতে পারে।

পা তোলা : দুর্গরক্ষক এক পা তুলে দাঁড়ালে তাকে পা তোলা বলা হয়।

মুখ ফেরানো : দুর্গরক্ষক সমকোণের বেশি মুখ ফেরাতে পারে না। অর্থাৎ সে তাকাতে পারে কাঁধ বরাবর। এর বেশি মুখ ফেরালে 'মুখ ফেরানো' হয়েছে বলা হয়।

বাইরে পা : আক্রমণকারীর পা কোর্টের বাইরের বা সীমানার বাইরে জমিতে গেলে তার 'বাইরে পা' হবে।

আউট করা : কোনো দুর্গরক্ষক আক্রমণকারীকে ছুঁয়ে দিলে আউট হবে।

ডাকা বা টোগু দেওয়া : যখন কোনো আক্রমণকারী দুর্গগুলি পুনরায় অতিক্রমের উপক্রম করে তখন সে দুর্গরক্ষককে উদ্দেশ্য করে 'টোগু' বলে চীৎকার করে। দুর্গরক্ষক তখন পশ্চাৎ দুর্গের দিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ায়।

টোগু দেওয়া-নেওয়া : যখন একজন আক্রমণকারী উপরে ওঠে ও আর একজন আক্রমণকারী পিছনে যায় ও একটি স্কোয়ারে মিলিত হয় তখন 'টোগু' হয়েছে ধরে নিতে হবে।

লোনা : যখন আক্রমণকারী দলের শেষ খেলোয়াড় পুনরায় দুর্গ অতিক্রম শুরু করে বা উপরে ওঠে এবং অবশেষে সম্মুখ দুর্গ অতিক্রম করে তখনই তাদের (আক্রমণকারী) লোনা বা গেম হয়।

ফাউল: (ক) যদি উপরে ওঠার জন্য কোনো আক্রমণকারী দুর্গ অতিক্রম করে এবং পিছনে ধাবমান আক্রমণকারী টৌণ্ড না নেয় তবে ধাবমান খেলোয়াড়ের ফাউল হবে।

(খ) যদি পশ্চাৎগামী আক্রমণকারী খেলোয়াড় একটি দুর্গ অতিক্রম করে যা ইতিপূর্বে সম্মুখগামী তার সতীর্থ পুনরায় অতিক্রম করেছে অথচ 'টৌণ্ড' দেয়নি, তবে তার (পশ্চাৎগামী) ফাউল হবে।

রিং: কোনো দুর্গরক্ষাকারী ও তাদের সুরপাতি যদি দুই বা ততোধিক আক্রমণকারীকে ঘিরে ফেলে তবে 'রিং' হয়।

খেলার বিধি-নিষেধ: (ক) খেলার শুরুতে আক্রমণকারীরা সম্মুখ দুর্গ ও এণ্ড লাইনের মাঝের জমিতে দাঁড়ায়। রক্ষকদলের প্রত্যেকে এক একটি দুর্গে দাঁড়ায়। অর্থাৎ ৯ জন দুর্গরক্ষক ৯টি দুর্গে দাঁড়ায় সম্মুখ দুর্গের দিকে মুখ করে। ইনিংসের মাঝে তারা দুর্গ বদল করতে পারে না। দুর্গগুলির নাম এইভাবে হবে—প্রথম দুর্গ, দ্বিতীয় দুর্গ, তৃতীয় দুর্গ ইত্যাদি।

(খ) সংকেতের সঙ্গে খেলার ইনিংস শুরু হবে। এবং সুরপাতি স্কোয়ার স্পর্শ করবে। স্কোয়ার না ছুঁলে সে কাউকে আউট করতে পারে না। যদি সে ঠিকমত স্কোয়ার না ছোঁয়, তবে আম্পায়ার পুনরায় তা ছোঁয়ার নির্দেশ দেবেন। কিন্তু যদি সে নিজের দুর্গসহ মোট তিনটি দুর্গ অতিক্রম করে যায় তবে আম্পায়ার আর পুনরায় ছোঁয়ার নির্দেশ দিতে বা স্কোয়ার কাট করতে বলতে পারেন না।

(গ) অন্যান্য দুর্গরক্ষকরা ইনিংসের শুরু থেকেই আক্রমণকারীকে আউট করতে পারে।

(ঘ) সুরপাতি বা কেন্দ্রীয় দুর্গরক্ষক পিছনে বা সামনে দুইদিকে ধাবমান যে কোনো খেলোয়াড়কে আউট করতে পারে। অন্য রক্ষকরাও তার দুর্গে যে কোনো পার্শ্বে আক্রমণকারীদের আউট করতে পারে।

(ঙ) আক্রমণকারী দুর্গ অতিক্রমের সময় যেন দুর্গ না স্পর্শ করে।

(চ) তবে রক্ষক আউট করেই পা তুলবে না, হ্যাণ্ড ফল্ট বা ফুট ফল্ট করবে না বা মুখ ফেরাবে না; এসব করলে আক্রমণকারী আউট হয় না।

(ছ) কিন্তু সুরপাতি পা তুলতে পারে, দুর্গে হ্যাণ্ড ফল্ট করতে পারে। সামনে-পিছনে যেতে পারে, তার মুখ ফেরানো নিষেধ নয়।

(জ) আক্রমণকারী আউট হয় ফাউল করলে ও সীমানার বাইরে গেলে।

কতজন, কতক্ষণ

(ক) প্রতি দলে ৯ জন খেলোয়াড় থাকে।

(খ) অধিনায়করা টস্ করে এবং তারাই স্থির করে দুর্গরক্ষক হবে, না আক্রমণ করবে।

(গ) প্রতিটি ইনিংস হবে ৭ মিনিট করে। তবে তার আগে অধিনায়ক ইনিংস ডিক্লেয়ার করতে পারে।

(ঘ) প্রতি ইনিংসের শেষে বিরতি হবে তবে কখনও ৫ মিনিটের বেশি নয়।

(ঙ) আক্রমণকারীরা ১০ পয়েণ্ট পাবে প্রত্যেকে দুর্গ অতিক্রম করার পরে। অর্থাৎ ৯ জনে সব দুর্গ অতিক্রম করলে ৯০ পয়েণ্ট। লোনা হলে ১৮০ পয়েণ্ট হবে।

(চ) পালা করে ৩ ইনিংস খেলা হয়।

পরিচালকমণ্ডলী : দাড়িয়াবান্ধা পরিচালনার জন্য ১ জন রেফারী, ৯ জন আম্পায়ার, ১ জন স্কোরার ও ১ জন মার্কার থাকে। প্রতিটি দুর্গ দেখেন ১ জন করে আম্পায়ার। রেফারীর সংকেতে খেলা শুরু ও শেষ হয়; তিনি স্কোর ঘোষণা করেন। স্কোরার আক্রমণকারীদের রেকর্ড রাখেন, দেখেন, কে বা কারা আউট হল।

ট্যাগ গেমস

৪০ বর্গফুটের আকৃতির মাঠের মধ্যে ৩০ বা ৫০ জন খেলোয়াড় থাকবে মাঠটি চুন দিয়ে চিহ্নিত করা হয়। যাকে 'অধিনায়ক' নির্বাচিত করা হয়—সে ছুটে ছুটে যে কোনো একজনকে নতুন অধিনায়ক করে। পুরনো অধিনায়ক তারপর অন্যদের সঙ্গে যোগ দেবে। এইভাবে খেলা চলবে। এটি **সাধারণ ট্যাগ গেম বা অনুসরণের খেলা।**

হুইপ ট্যাগ : সাধারণ ট্যাগের মতই খেলতে হয়। তবে দৌড়ে অন্যকে পিছন থেকে চাবুক দিয়ে আঘাত করতে হবে। চাবুক মেরেই সে ফেলে দেয় ও অন্যদের সঙ্গে যোগ দিয়ে ছুটতে থাকে।

হপিং ট্যাগ : অধিনায়ক এক পা তুলে দৌড়য়। দুই পা ব্যবহার নিষেধ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

লাঠি

লাঠি নানা প্রকারের : যথা—**বেনেটি, বড় লাঠি বা হাড়ুয়া, বেনা বা বেনথ, বড় লাঠি রং খেলা, ছোট লাঠি রং খেলা।**

বেনেটি : এই লাঠির দুই প্রান্তে ছোট বল জোড়া থাকে। বিভিন্নভাবে পর্যায়ক্রমে দু'হাতে এই লাঠি ঘোরানো হয়। শোনা যায়, পুরাকালে শত্রুসৈন্যের মধ্যে পড়লে সংশ্লিষ্ট সৈন্য আত্মরক্ষার জন্য বেনেটির দু'দিকে আগুন জ্বালিয়ে লাঠি ঘোরাতে ঘোরাতে বেরিয়ে আসত। একে অগ্নিবেনেটি বলা হয়।

হাড়ুয়া বা বড় লাঠি : লাঠির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ খেলা হাড়ুয়া বা বড় লাঠি। তবে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে নানা পদ্ধতিতে বড় লাঠি খেলা হয়ে থাকে। বড় লাঠির দৈর্ঘ্য হবে দণ্ডায়মান অবস্থায় ডান পা-র মাটি থেকে ডান হাত উঁচু করে দাঁড়ালে মধ্যমা যতদূর যায়, ততখানি। প্রত্যেকে নিজ নিজ উচ্চতা অনুযায়ী লাঠি ব্যবহার করে। লাঠি হবে বাঁশের। এই লাঠি কলকাতায় বড়বাজারে পাওয়া যায়। স্কাউটরাও এই ধরনের লাঠি ব্যবহার করে। এই বাঁশের লাঠি অন্যান্য বাঁশের মত ফাঁপা থাকে না।
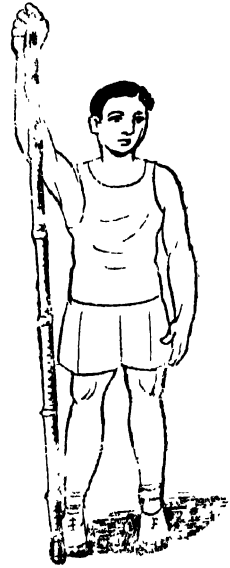
হাড়ুয়া বা বড় লাঠি

লাঠি ধরা : লাঠির প্রান্তভাগ থেকে একহাত ছেড়ে ডান হাতে ধরতে হয়, সেখান থেকে আর একহাত দূরে বাঁ হাতে ধরতে হবে। ঘোরাবার পদ্ধতি নানা প্যাঁচের। যথা : **অনুলোম, বিলোম, সম্মুখ পৃষ্ঠাবেষ্টন, শিরাবেষ্টন** ইত্যাদি। জটিল প্যাঁচগুলি—**যমক, যমকাবর্তন, উগ্র যমকাবর্তন, ত্রয়ী, ত্রয়াবর্তন, উৎকট, চমক, ব্রহ্মাবর্তন, অঙ্গকরণ, মিত্রমণ্ডল** প্রভৃতি। শুরুতে দাঁড়িয়ে এসব অভ্যাস করতে হয়। তারপর নড়ে-চড়ে বা অবশেষে লাফিয়ে লাফিয়ে লাঠি খেলা উন্নতমানের খেলার পরিচায়ক।

বড় লাঠি রং খেলা : হাড়ুয়া বা বড় লাঠি আয়ত্তে এলেই বড় লাঠি রং

খেলা আরম্ভ করা যায়। এই খেলায় এক পক্ষ মারতে গেলে বিপক্ষ খেলোয়াড় তা প্রতিরোধ করে। এই খেলা শুরুর আগে গড়াপেটা করে নিতে হয় কে কী করবে। এর বিভিন্ন আঘাত—**ঘাত, বিঘাত, শ্যামঘাত বা সমঘাত**। বিভিন্ন জায়গায় আঘাতকে বলা হয় **শির, তামেচা, বাহেরা, ভাণ্ডার, কটী, মন, দে, পাঙ্গটি, কড়ক, হুল**।

বড় লাঠি ছুট বা ফ্রী-ফাইট : বড় লাঠি রং খেলায় যারা চৌকশ তারাই ফ্রী-ফাইট করতে পারে। এতে গড়াপেটার ব্যাপার থাকে না। উভয়পক্ষে নকল 'যুদ্ধ' হয় না। কেউ বাধা-নিষেধ মানে না। তবে যে বিপক্ষকে নিষ্ক্রিয় করতে পারে, সে-ই বিজয়ী হয়।

ছোট লাঠি : ছোট লাঠির দৈর্ঘ্য সাধারণতঃ খেলোয়াড়ের নিজের দু' হাত ও আট আঙুল হবে। এর যেদিকটা ধরা হয় সেইদিক কিছুটা মোটা ও অগ্রভাগ সরু থাকে। একহাতে এই লাঠি ধরতে হয়, তা না হলে বড় লাঠির মতই আঘাতে ও প্রতিঘাতে নানা নিয়ম পালন করা হয়।

লাঠি-খেলা বই পড়ে শেখা যায় না, তার জন্যে যোগ্য শিক্ষক বা গুরুর প্রয়োজন। তবুও সংক্ষেপে লাঠি খেলার কয়েকটি আঘাতের সংজ্ঞা সংক্ষেপে দেওয়া হল বিপ্লবী স্বর্গতঃ পুলিনবিহারী দাসের গ্রন্থ থেকে :
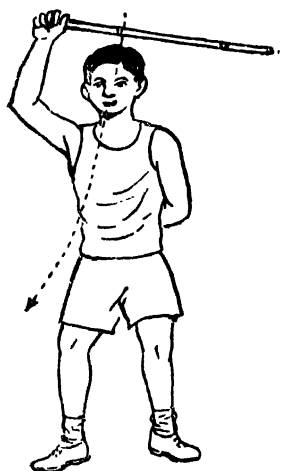
শির

শির ঃ "মস্তকের ঠিক মধ্যস্থিত সিঁথির দুই অঙ্গুলি বাম হইতে আরম্ভ করিয়া বাম ভ্রূ, বাম চক্ষু, নাসিকার অগ্রভাগ এবং দক্ষিণ কটি পার্শ্ব ভেদ করিয়া অসি নির্গত করিয়া লওয়া হেতু আঘাত"।

লাঠি বাম হইতে পৃষ্ঠের সমান্তরাল পশ্চাৎ দিক দিয়া ঘুরাইয়া আনিয়া,—হস্ত-মুষ্টি দক্ষিণ স্কন্ধের উপরে আসিলে,—লাঠির অগ্রবিন্দু ক্রমে উপরে তুলিয়া, হস্ত সম্পূর্ণ সরল করিয়া স্থির লক্ষ্যে "শির মারিয়া প্রতিপক্ষের কটীপার্শ্ব অভিমুখে লাঠি ত্রাসে চালনা করাতে, দক্ষিণ হস্ত বাম পার্শ্বে আসিলে পর,—ঐ ভাবেই ক্রমে লাঠিসহ হস্ত ঊর্ধ্বে তুলিয়া প্রতিপক্ষের 'শিরের' আঘাতের প্রতিরোধ হেতু প্রস্তুত হইতে হইবে।"

সব সময় মনে রাখতে হবে, লাঠি খেলার শিক্ষার্থীরা একে অপরের শত্রু নয়। তবে আঘাত ও প্রতিরোধ সম্পর্কে শিক্ষালাভের সময় একে অপরের আঘাতকারী কল্পনা করে নেওয়া হয়। তবুও যাতে 'শত্রু' মনোভাব জেগে না ওঠে সেজন্যে খেলার শুরু ও শেষে উভয়ের মধ্যে অভিবাদনের রীতি প্রচলিত।

মোড়া : "দক্ষিণ কক্ষ মুণ্ড (স্কন্ধ-মোড়) হইতে আরম্ভ করিয়া বাম স্তন-চুচুকের দুই অঙ্গুলী নিম্নে বাম বক্ষ পার্শ্ব পর্যন্ত ছেদন করা হেতু আঘাত।

মোড়া প্রতিরোধকালে লাঠি ঠিকভাবে ধারণ করিলে হস্ত-মুষ্টির বৃদ্ধাঙ্গুলি দক্ষিণ স্কন্ধমোড়ের প্রায় চারি অঙ্গুলি দক্ষিণে ও চারি অঙ্গুলি নিম্নে এবং কিঞ্চিদধিক অর্ধ হস্ত সম্মুখে থাকিবে। লাঠির অগ্রবিন্দু বাম স্কন্ধ মোড় হইতে অর্ধ হস্ত সম্মুখস্থ লম্বরেখার সমসূত্র ঊর্ধ্বে থাকিবে। লাঠি বক্ষ-ক্ষেত্রের সমান্তরাল প্রশস্তিক্ষেত্র অবলম্বনে থাকিবে।

মোড়া
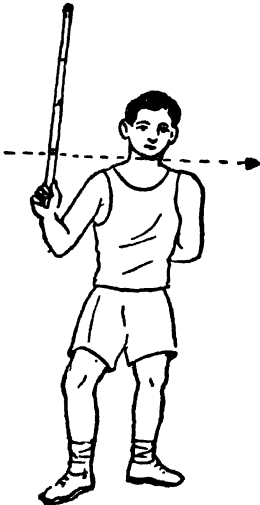
প্রতিরোধকালে সর্বদাই নিজ লাঠি দ্বারা প্রতিপক্ষের লাঠিকে, তাহার গতির বিপরীত দিক অভিমুখে সামান্য বেগে আঘাত করিয়া দূর করিয়া দিতে হইবে।"

অন্তর : "দক্ষিণ কর্ণ-মূলের দুই অঙ্গুলি নিম্ন হইতে আরম্ভ করিয়া মস্তক ও গলদেশের ঠিক সন্ধিস্থল ভেদ করিয়া বাম কর্ণমূলের দুই অঙ্গুলি নিম্ন পর্যন্ত ছেদন করিয়া দেওয়া হেতু আঘাত।

অন্তর প্রতিরোধকালে লাঠি ঠিক লম্বভাবে ঊর্ধ্বমুখ হইয়া থাকিবে, হস্ত-মুষ্টির বৃদ্ধাঙ্গুলি দক্ষিণ স্কন্ধের প্রায় চারি অঙ্গুলি নিম্নে, চারি অঙ্গুলি দক্ষিণে এবং কিঞ্চিদধিক অর্ধহস্ত সম্মুখে থাকিবে।"

অন্তর

কুচ : "গুল্‌ফের (পাদসন্ধির) বাম পার্শ্বের ঘুন্টিকাটি (গুটিকাবৎ উন্নত

অংশটি) ব্যাপিয়া চারি অঙ্গুলি স্থানমধ্যে, ঈষৎ নিম্নাভিমুখে বক্রভাবে ওই গুল্‌ফ (পাদসন্ধি) বিচ্ছিন্ন করা হেতু আঘাত।

কুচ

কুচের আঘাত প্রতিরোধ করতঃ তাহার লাঠিকে আঘাত করিয়া দূর করিয়া দিয়া অব্যাহত গতিতেই বাম পার্শ্ব দিয়া ক্রমে ঊর্ধ্বমুখ হইয়া বক্ষদেশের সমান্তরালভাবে ঘুরিয়া আইসে ; পরে হস্ত-মুষ্টি বামস্কন্ধের উপরে আসিয়া পুনরায় "অন্তর" মারিবার জন্য প্রস্তুত হইবে।"

তামেচা : "বাম কর্ণরন্ধ্র হইতে আরম্ভ করিয়া নাসিকার অগ্রভাগ ভেদ করিয়া দক্ষিণ কর্ণমূল পর্যন্ত ছেদন করিবার নিমিত্ত আঘাত।

তামেচা

তামেচা প্রতিরোধকালে হস্ত-মুষ্টির বৃদ্ধাঙ্গুলি বাম স্কন্ধ-মোড়ের প্রায় চারি-অঙ্গুলি ঊর্ধ্বে ও কিঞ্চিদধিক অর্ধহস্ত সম্মুখে থাকিবে, এবং লাঠির অগ্রবিন্দু দক্ষিণস্কন্ধ মোড়ের কিঞ্চিদধিক অর্ধহস্ত সম্মুখ হইতে লম্বরেখার ঊর্ধ্বে থাকিবে।"

বাহেরা
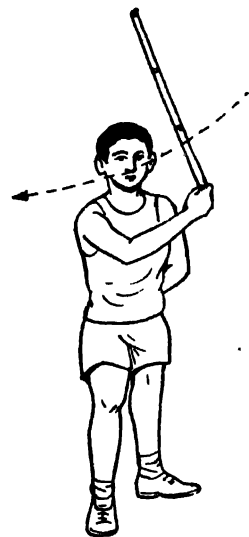
বাহেরা : "দক্ষিণ-কর্ণরন্ধ্র হইতে আরম্ভ করিয়া নাসিকার অগ্রভাগ ভেদ করিয়া বাম কর্ণমূল পর্যন্ত ছেদন করিবার নিমিত্ত আঘাত।

বাহেরা প্রতিরোধ-কালে হস্ত-মুষ্টির বৃদ্ধাঙ্গুলি দক্ষিণ স্কন্ধমোড়ের প্রায় চারি অঙ্গুলি ঊর্ধ্বে কিঞ্চিদধিক অর্ধ হস্ত সম্মুখ হইতে লম্বরেখার সমসূত্রে ঊর্ধ্বে থাকিবে।"

কটী ঃ "দক্ষিণ কটীপার্শ্ব হইতে আরম্ভ করিয়া ঠিক সরলভাবে বাম কটী-পার্শ্ব পর্যন্ত ছেদন করা হেতু আঘাত।

কটীর প্রতিরোধকালে হস্ত-মুষ্টি দক্ষিণ বক্ষ-পার্শ্ব হইতে প্রায় অর্ধ হস্ত দক্ষিণে ও প্রায় অষ্টাদশ অঙ্গুলি সম্মুখে থাকিবে; লাঠি ভূমির উপরে লম্বরেখার সমসূত্রে থাকিবে। কটী প্রভৃতি শরীরের নিম্নাংশের আঘাতের প্রতিরোধকালে (অবশ্য যে কোনো আঘাতেরই প্রতিরোধকালে) কদাচ যেন কটীদেশ বক্র হইয়া শরীরের উর্ধ্বাংশ কুব্জভাবে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইয়া না পড়ে।
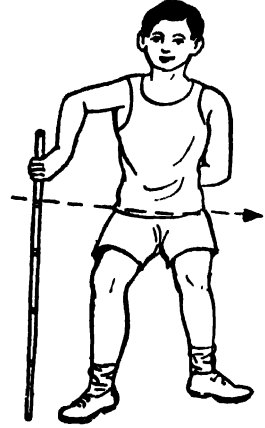
কটী

জুডো

কৃতিত্ব অনুযায়ী জুডো খেলোয়াড়দের দু'ভাগে ভাগ করা হয়। প্রাথমিক গ্রুপে থাকে :

গোকিয়ু	৫ম কিয়ু	সাদা বেল্ট
য়োনকিয়ু	৪র্থ কিয়ু	সাদা বেল্ট
সান্‌কিয়ু	৩য় কিয়ু	হলুদ বেল্ট
নিকিয়ু	২য় কিয়ু	হলুদ বেল্ট
ইক্কিয়ু	১ম কিয়ু	হলুদ বেল্ট

ইক্কিয়ুপ্রাপ্তরা প্রাথমিক গ্রুপের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়।

সিনিয়র গ্রুপের খেলোয়াড়দের মধ্যে থাকে :

সেডান	১ম ডান	কালো বেল্ট
নিডান	২য় ডান	কালো বেল্ট
সানডান	৩য় ডান	কালো বেল্ট
য়োনডান	৪র্থ ডান	কালো বেল্ট
গোডান	৫ম ডান	কালো বেল্ট
রোকুডান	৬ষ্ঠ ডান	লাল ও সাদা বেল্ট
সিচিডান	৭ম ডান	লাল ও সাদা বেল্ট

হাচিডান	৮ম ডান	লাল ও সাদা বেল্ট
কিয়ুডান	৯ম ডান	লাল বেল্ট
জুডান	১০ম ডান	লাল বেল্ট

একাদশ ও দ্বাদশ ডান (যথাক্রমে জুইচিডান ও জুনিডান) আজ পর্যন্ত কেউ পায়নি।

জিমন্যাসিয়াম বা 'ডোজো': জাপানী ভাষায় জুডোর জিমন্যাসিয়াম বা যেখানে জুডো খেলা হয়, তাকে 'ডোজো' বলে। এই ডোজো ৩×৬ ফুট (৩.৯১×১.৮৩ মিটার) আকারের গদী দিয়ে মোড়া থাকে। ডোজোর আকৃতি অনুযায়ী ২৪ থেকে ৫০টি গদী পাততে হয়। তবে বড় প্রতিযোগিতায় ৫০টি গদী অবশ্যই প্রয়োজন। কলকাতার ময়দানে গুরু-নানক সরণীতে ক্যালকাটা জুডো ক্লাবে অনুরূপ ব্যবস্থা আছে। জুডো খেলোয়াড়রা খালি পায়ে খেলে। পোশাক এমন হবে যেন কব্জি থেকে হাত পর্যন্ত খোলা থাকে। গোড়ালি থেকেও উপরে প্রায় ছয় ইঞ্চি (১৫ সে.মি) অনুরূপ আলগা রাখা হয়। জিন কাপড়ের বেল্ট এবং জিন কাপড়ের জ্যাকেট পরা হয়। (ছবি দ্রষ্টব্য)। পা ও হাতের নখ ছোট করে কাটতে হবে; পোশাক, গদী সর্বদা পরিচ্ছন্ন রাখা বাঞ্ছনীয়। লাঠির মত জুডোও উপযুক্ত কোচের কাছে হাতে-কলমে না শিখলে প্যাঁচগুলি আয়ত্তে আনা সম্ভব নয়। সাধারণ ট্রেনিং এইরকম:

পোশাক পরে জুডো খেলোয়াড়

(ক) ক্যালিস্থেনিকস্—পেশীর উন্নতি ও গা ঘামিয়ে নেওয়ার ব্যায়াম।

(খ) উকেমি—আছাড় খাওয়ার ব্যায়াম।

(গ) উচিকোমি—বিভিন্ন টেকনিক আয়ত্তে আনা ইত্যাদির জন্যে ব্যায়াম।

(ঘ) বান্দোরী—এবার আর একজনের সঙ্গে অনুশীলনে নেমে বিভিন্ন টেকনিক প্রয়োগ করতে হবে আত্মরক্ষা বা বিপক্ষকে ছুঁড়ে ফেলতে।

উকেমি (আছাড় খাওয়া): **জুডোয় সব কিছুর আগে রপ্ত করতে হয় আছাড় খাওয়া। নির্ভুলভাবে আছাড় জুডো অনুশীলনে আত্মবিশ্বাস**

আনে, আঘাত থেকে অব্যাহতি দেয়। উকেমি জুডোর গা ঘামানো বা ওয়ার্মিং-আপ ব্যায়ামের অন্তর্ভুক্ত।

পিছনে আছাড়ঃ (ক) গদীতে বসে পা দু'খানি সামনের দিকে ছড়িয়ে বসতে হবে, যেন দুই হাঁটু ও দুই গোড়ালি কাছাকাছি থাকে। দুই হাত থাকে দুই হাঁটুর উপরে এবং মাথা সোজা ও চোখ সামনের দিকে।

(খ) দুই হাত তুলে পিছনে পড়ার জন্য প্রস্তুত হতে হবে।

(গ) এবার শুধু কোমর গদীতে থাকবে। পা দু'খানি একটু উপরে ওঠে, হাত উপরে, মাথাও সামান্য উপরে। অর্থাৎ জুডো খেলোয়াড়কে এই অবস্থায় দেখায় অনেকটা ধনুকের মত।

(ঘ) এবার কোমর থেকে মাথা পর্যন্ত গদীতে নেমে আসে। পা দু'খানি বেঁকে মাথার সমান্তরাল হয়। আর বাঁ হাতের চেটো দিয়ে দেহের ভারসাম্য কিছুটা রক্ষিত হবে। চেটো গদীতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে জোরে শব্দ করাই জুডোর রীতি।

আছাড় বা উকেমি নানা ধরনের। পিছনে আছাড়ও গুরুত্বপূর্ণ।

জুডোর ৭০-এরও বেশি কৌশলের কিছু উদাহরণ এখানে দেওয়া হল।

তাচিওয়াজা বা ছোঁড়ার কৌশলঃ তাচিওয়াজাকে কেউ কেউ নাগেওয়াজা বলেন। জুডোর সবচেয়ে আকর্ষণীয় এই ছোঁড়া। শ্রেষ্ঠ ছুঁড়িয়েকে কখনও কখনও মনে হয় বুঝি ম্যাজিক দেখাচ্ছে।

(ক) তাচিওয়াজার শুরুতে দাঁড়াতে হবে সহজে সামান্য পা ফাঁক করে সামনের দিকে তাকিয়ে। একে বলা হয় 'সিজেনতাই'। ক্লান্ত না থাকলে সিজেনতাই থেকে যে কোনো অবস্থায় দাঁড়ানো যায়।

(খ) 'মিজি সিজেনতাই' বলতে বোঝায় ডান পা সামান্য সামনের দিকে এগিয়ে দাঁড়ানো।

(গ) 'হিদারি সিজেনতাই'য়ে বাঁ পা এগিয়ে থাকে, আর 'জিগোতাই দুই হাঁটুতে ভর করে হাঁটু দু'পাশে একটু ভেঙে দাঁড়ানো, তবে এই অবস্থায় দাঁড়ানো থেকে অন্য অবস্থায় দ্রুত ফেরা সম্ভব নয়, তাই সিজেনতাই অবস্থাই উত্তম।

কীভাবে বিপক্ষ খেলোয়াড়কে ধরতে হবেঃ বিপক্ষ খেলোয়াড়ের পোশাক ধরার পদ্ধতিকে 'কুমিকাটা' বলা হয়। মিজি সিজেনতাই-এর পরে নিজের বাঁ হাত দিয়ে বিপক্ষ খেলোয়াড়ের ডান হাতের কনুইয়ের জামা ধরতে হবে। আর ডান হাত দিয়ে ধরতে হয় বিপক্ষ খেলোয়াড়ের

কলারের ঠিক নিচের জামা। ডান দিকে ছুঁড়ে ফেলার (মিজিওয়াজা) এটাই উৎকৃষ্ট প্রস্তুতি। ছোট আঙ্গুল দিয়ে সজোরে জামা ধরতে হবে একটু বাঁকিয়ে। এবার একটু এদিক-ওদিক টানাটানি করা হয়, যাতে বিপক্ষ খেলোয়াড় তার উদ্দেশ্য বুঝতে না পারে।

বাঁদিকে ছুঁড়তে (হিদারিওয়াজা) গেলে উপরের নিয়মগুলি বিপরীতভাবে প্রয়োগ করতে হয়।

কুমিকাটা বা বিপক্ষকে ধরার আর একটি পদ্ধতি হল: ডান হাত দিয়ে বিপক্ষ খেলোয়াড়ের বাঁদিকে কলারের নিচে ও বাঁ হাত দিয়ে ডান দিকে বুকের কাছে জামা ধরে। আত্মরক্ষার জন্য এই পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। তবে এতে বিপক্ষের অনেক সুবিধা হয়।

ইপ্পন শিওনেজ বা এক হাতে কাঁধের উপর থেকে ছুঁড়ে ফেলা:

(ক) এই পদ্ধতি প্রয়োগের আগে খ বা বিপক্ষ খেলোয়াড় ডান পা এগিয়ে দিলে ক খেলোয়াড়কে বাঁ পা কিছুটা পিছিয়ে আনতে হবে ও ডান গোড়ালি খ খেলোয়াড়ের ডান পায়ের কাছে নিতে হয়।

ইপ্পন শিওনেজ

(খ) এবার ডান গোড়ালিতে ভারসাম্য রেখে কোমর পিছনে নিয়ে একটু ঝুঁকে পিছন দিক থেকে খ খেলোয়াড়কে কাঁধে তুলতে হবে (ছবি দ্রষ্টব্য)।

(গ) ক খেলোয়াড় আরও ঝুঁকে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিপক্ষ খেলোয়াড়ের ডান হাত খেলোয়াড়ের ডান হাতে হুকের মত আটকে থাকে। এই সময় বিপক্ষ খেলোয়াড় সমস্ত শক্তি হারিয়ে ফেলে।

হানে গোসি বা পাছায় তুলে ছোঁড়া:

হানে গোসি

(ক) খ বা বিপক্ষ খেলোয়াড় ডান পা এগিয়ে দিলে ক খেলোয়াড় সামান্য পিছিয়ে এসে বাঁ গোড়ালি ঘুরিয়ে দাঁড়ায়। বাঁ হাঁটু একটু বাঁকাতে হয় ভারসাম্য রাখতে।
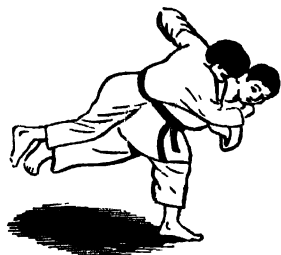
(খ) এবার খ খেলোয়াড়ের ভারসাম্য টলাতে তার ডান হাতের কনুইয়ের

জামা ধরে ক খেলোয়াড় বাঁ হাত দিয়ে নিজের কোমরের ডান দিকে তুলতে থাকে। (ছবি দ্রষ্টব্য)।

(গ) ক খেলোয়াড় খ খেলোয়াড়কে দেহের উপর তোলার সময় এবার ডান পা দিয়ে তার শিন বোনে ধাক্কা দেয়। এবার খ খেলোয়াড় আরও উপরে ওঠে। অবশেষে ক খেলোয়াড় বাঁদিকে মাথা ঘুরিয়ে শরীরও ঘোরায় ও খ-কে ছুঁড়ে ফেলবে।

উচিমাতা বা পাছার উপরে তুলে ভিতরে ছোঁড়া :

(ক) খ বা বিপক্ষ খেলোয়াড়কে ক খেলোয়াড় তার ডান দিকে টানবে এবং ক এক পা পিছিয়ে নেয় তার ডান পা।

(খ) খ-কে এবার ধরে ক বাঁ পায়ে ভার-সাম্য রেখে ডান দিকের কোমরে তোলে। (ছবি দ্রষ্টব্য)

(গ) এবার খ-র ডান হাত ক তার বুকের কাছে আনে ও ক-র ডান পা খ-র দুই পায়ের মাঝে যায়। ক-র ডান দিকের পাছা খ-র ডানদিকের ভিতরের উরুতে ধাক্কা দেয়।

উচিমাতা

(ঘ) ক এবার ডান পা উঁচুতে তোলে এবং দেহের উপরের অংশ মাটির দিকে ঝুঁকে পড়ে। তারপর ক-র মাথা বাঁদিকে যায় ও ছুঁড়ে ফেলা হয় খ-কে।

ওশোটো ওটোশি

ওশোটো ওটোশি বা ড্রপ দিয়ে ছোঁড়া :

(ক) খ বা বিপক্ষ খেলোয়াড় একটু ঝুঁকে দুই পা ফাঁক করে দাঁড়ালে ক-ও হাঁটু বাঁকিয়ে একইভাবে দাঁড়াবে।

(খ) এবার ক বাঁ পা খ-র ডান কোমরে তুলে দিয়ে জামা ধরে টান মারলে খ ভারসাম্য (ছবি দ্রষ্টব্য) হারায়।

(গ) সবশেষে ক-কে ডান হাঁটু তুলে চাপ দিতে হবে। পায়ের পাতা

যাবে মাটি বা গদীর দিকে এবং খ-র ছ'পায়ের মাঝে ঢুকবে। তারপর ক ওই পা নিজের দিকে টেনে আনতে থাকে ও ঝুঁকে পড়ে ছুঁড়ে ফেলে খ-কে।

টোমোনেজ বা সামারসল্টের মত ছোঁড়া :

(ক) বিপক্ষকে পিছনে ঠেলতে হবে।

(খ) বিপক্ষ খেলোয়াড় বা খ তখন ক-কে রুখতে চেষ্টা করে।

(গ) ক তখন তার বাঁ পা খ-র দুই পা'র মাঝে ঢুকিয়ে দেয়। এবং খ-কে ধরেই চিং হয়ে গদীতে পড়ে।

টেমোনেজ

উদে গারামি

(ঘ) এবার ক ডান পা খ-র তলপেটে রাখে ও দুই হাতে তাকে টানতে থাকে।

(ঙ) খ ভারসাম্য হারালে তখন পা দিয়ে জোরে তলপেটে ধাক্কা দেয় ও দুই হাতে সজোরে টান মারে।

উদে গারামি বা হাতে তালা লাগানো :

খ-কে শুইয়ে ফেলে ক বাঁ হাত দিয়ে খ-র কব্জি ধরবে ও নিজের বাঁ হাত খ-র কনুইয়ের নিচে ঢুকিয়ে ডান হাতকে জোরদার করার জন্য ডান হাতের কব্জি আটকে রাখবে। (ছবি দ্রষ্টব্য)

কুস্তি

সামগ্রিক দৈহিক শক্তি বা চলতি কথায় লোকে যাকে বলে 'গায়ের জোর' তার আইন ও ন্যায়সম্মত পরীক্ষা কুস্তির মাধ্যমে যেমন হয়, তেমন নিশ্চয়ই খেলাধূলার আর কোনো শাখার মাধ্যমে হয় না। সত্যি, কুস্তি বা মল্লযুদ্ধই খেলাধূলার স্বাভাবিকতম এবং অন্যতম প্রাচীন অঙ্গ। অথচ কুস্তির সবচেয়ে

বড় অসুবিধা হল এই যে, এতে খুব কৃতী প্রতিযোগীদেরও কৃতিত্বের চাক্ষুষ পরীক্ষা ছাড়া অন্য কোনও পরিমাপ করা যায় না। এ এমনই এক 'খেলা' যেখানে স্কেল বা টেপ্‌ বা স্টপওয়াচ্‌ কৃতিত্বের স্বাক্ষরকে ধরে রাখতে পারে না —'সম্মুখ' দ্বৈরথ ছাড়া কুস্তিগীরের শক্তিপরীক্ষা সম্ভব নয়।
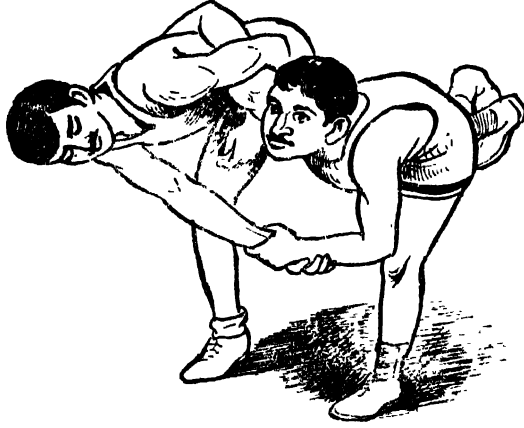
কুস্তির টাঙ্গ প্যাচ

অনেকেই বলেন যে, ভারতই কুস্তির জন্মস্থান। একথা ঠিক যে, অনেক বিখ্যাত মল্ল আমাদের দেশে জন্মগ্রহণ করেছেন: গামা (বড়), করিম বক্স, 'ছোট' গামা, অম্বিকাচরণ গুহ ও তাঁর পৌত্র যতীন্দ্রনাথ গুহ ('গোবরবাবু'), ইমাম বক্স, গুঙ্গা, হামিদা, আল্লা বক্স, গণ্ডা সিং, দারা সিং প্রভৃতি কুস্তিকে জনপ্রিয় করেছেন এবং এঁদের মধ্যে অনেকেই বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কুস্তিগীর হিসাবে সম্মানিত হয়েছেন। বিদেশের বিখ্যাত মল্লদের মধ্যে জিস্কো (Zbysko) ভ্রাতৃদ্বয়, 'কিং কং', জি. জেবিস্‌, জোয়ান রিস্তফ, হামিদ কাপলান প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

কুস্তি বহু দেশেই প্রচলিত, তবে সব দেশে কুস্তিতে একই রকম নিয়ম অনুসরণ করা হয় না। অবশ্য প্রধান যে দু'ধরনের কুস্তি অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় স্থান পেয়েছে—'ক্যাচ অ্যাজ ক্যাচ ক্যান' (Catch As Catch Can)

বা 'ফ্রী স্টাইল' এবং 'গ্রেকো-রোমান স্টাইল'—তাদের মূল পার্থক্যটি ছাড়া আর সব নিয়ম মোটামুটি একই। কুস্তিতে সম্মুখ সমররত দুই প্রতিযোগীর প্রত্যেকেই চেষ্টা করে কেবল খালি হাত ব্যবহার করে অপরকে ফেলে দিতে বা, কুস্তির পরিভাষায় 'চিং' (Fall) করতে। ফ্রী স্টাইল কুস্তিতে প্রতি-যোগীরা পরস্পরের শরীরের যে কোনও অংশ (নিষিদ্ধগুলি ছাড়া) ধরতে পারে, কিন্তু গ্রেকো-রোমান পদ্ধতিতে প্রতিদ্বন্দ্বীর পাছার নীচে কেউ ধরতে পারে না এবং প্রতিদ্বন্দ্বীর পা ধরাও নিষিদ্ধ ; এ-ছাড়া, এই দুই পদ্ধতির কুস্তির নিয়ম মোটামুটি একই। পেশাদার কুস্তিতে আগে গ্রেকো-রোমান পদ্ধতিই অনুসরণ করা হত, কিন্তু সম্প্রতি পেশাদাররা 'ফ্রী স্টাইল' কুস্তির দিকে ঝুঁকেছেন ; অবশ্য এঁদের ফ্রী স্টাইল পদ্ধতির নিয়ম সব সময় পরিষ্কার নয়। এই কারণে এবং "প্রতিযোগিতা যথার্থ প্রতিযোগিতা নয়, ফল 'গড়া-পেটা' হয়", এই সন্দেহেও লোকে পেশাদার কুস্তিকে খানিকটা 'স্টাণ্ট' হিসেবেই নিয়ে থাকে, ঠিক খেলাধূলার পর্যায়ে দেখে না।

ফ্রী স্টাইল ও গ্রেকো-রোমান পদ্ধতি ছাড়াও 'কাম্বারল্যাণ্ড অ্যাণ্ড ওয়েস্টমোরল্যাণ্ড' পদ্ধতি, 'কর্নিশ' পদ্ধতি প্রভৃতি প্রচলিত আছে, তবে এদের প্রচলন স্থানীয়ভাবে মাত্র। আমাদের আলোচনা প্রধান দু'টি পদ্ধতি নিয়েই (এবং পৃথকভাবে বলে দেওয়া না থাকলে বক্তব্য উভয় ধরনের কুস্তির সম্পর্কেই প্রযোজ্য বলে ধরে নিতে হবে)।

নিয়মানুযায়ী প্রতিযোগীদের ওজন নেওয়া হয়, এই সময় তাদের কোনো পোশাক পরতে দেওয়া হয় না। ওজন অনুসারে প্রতিযোগীদের বিভাগ ঠিক করা হয়। পরের পাতার তালিকা দেখলেই কুস্তিতে প্রতিযোগিতাক্ষেত্রে প্রচলিত দৈহিক ওজন জানা যাবে, তবে সব সময় মনে রাখা দরকার যে, কুস্তি ও ভারোত্তোলনের ক্ষেত্রে যে ওজন অনুসারে শ্রেণীবিভাগ হয় তা বক্সিংয়ের ক্ষেত্রের শ্রেণীবিভাগের সঙ্গে এক নয়, বক্সিংয়ে বেশ খানিকটা কম ওজনে একই নামের বিভাগের শুরু হয়। দু'টি তালিকা তুলনা করলেই এটা সহজে বুঝতে পারা যাবে।

কুস্তি প্রতিযোগিতার বিভিন্ন বিভাগ ও ওজন

বিভাগ	ওজন	কিলোগ্রাম	(পাউণ্ড)
লাইট ফ্লাইওয়েট	অনধিক	৪৮	১০৫.৮২
ফ্লাইওয়েট	,,	৫২	১১৪.৬৪
ব্যাণ্টামওয়েট	,,	৫৭	১২৫.৬৬
ফেদারওয়েট	,,	৬২	১৩৬.৬৯
লাইটওয়েট	,,	৬৮	১৪৯.৯১
ওয়েল্টারওয়েট	,,	৭৪	১৬৩.১৪
মিডল্‌ওয়েট	,,	৮২	১৮০.৭৮
লাইট হেভিওয়েট	,,	৯০	১৯৮.৪২
হেভিওয়েট	,,	১০০	২২০.৪৬
হেভিওয়েট প্লাশ (সুপার হেভিওয়েট)		১০০-র বেশি	

(উপরের তালিকা সিনিয়রদের জন্যে। ইণ্টারমিডিয়েটদের তালিকা আলাদা।)

ওজন হওয়ার আগে প্রতিযোগীদের ডাক্তারী পরীক্ষা করা হয় এবং কোনো প্রতিযোগী থেকে কোনো রোগ সংক্রমণের সম্ভাবনা থাকলে তাকে ডাক্তার বাতিল করে দেন। মোটের উপর, প্রতিযোগীদের শারীরিক অবস্থা সন্তোষজনক থাকা চাই। তারা অবশ্যই নখ খুব ছোট করে কাটবে এবং দাড়ি সদ্য কামানো থাকা চাই; এ সবই ওজনের সময় দেখে নেওয়া হবে। অবশ্য কয়েক মাসের দাড়ি হলে আপত্তির কিছু নেই।

প্রতিযোগীরা একটুকরো কাপড়ের আঁট পোশাক পরবে—লাল বা নীল। গোড়ালিযুক্ত বা কাঁটা দেওয়া জুতো পরা বা শরীরে তৈলাক্ত বা আঠালো কিছু মাখা বা ঘর্মাক্ত অবস্থায় থাকা চলবে না। কব্জিতে, বাহুতে বা পায়ের গাঁটে কোনো ব্যাণ্ডেজ বাঁধা চলবে না, অবশ্য আঘাত থাকলে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী তা চলে। আংটি, ব্রেসলেট, বেল্ট-লাগানো জুতো ইত্যাদি এবং প্রতিদ্বন্দ্বীকে আহত করতে পারে এমন কিছু পরা চলবে না।

যে পুরু গদীর উপর কুস্তি হয় তাকে 'ম্যাট' বলা হয়। সমস্ত অলিম্পিক ম্যাচে ৬ মিটার × ৬ মিটার ম্যাট (অলিম্পিক গেমস্‌ এবং বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ৮ মিটার × ৮ মিটার) আবশ্যিক। দুর্ঘটনা এড়াবার জন্য ম্যাটের চার ধারে

দু'মিটার চওড়া খালি জায়গা রেখে দিতে হবে এবং এই জায়গাটিকে কিছুর সাহায্যে ম্যাটের সমান উঁচু করে দিতে হবে। অনধিক ১'১০ মিটার উঁচু একটি পাটাতনে ম্যাট বসানো হয়। ম্যাটের কোণগুলি লাল বা নীল রঙের করতে হয় এবং ঠিক মাঝখানে একটি বৃত্ত আঁকা থাকে।

আগেই বলা হয়েছে, কুস্তিতে দুই প্রতিদ্বন্দ্বীরই একমাত্র লক্ষ্য অপরকে চিৎ করা। এই চিৎ করা যেমন তেমন করে হলে হবে না, যে চিৎ হচ্ছে তার দু'টি কাঁধই ম্যাট স্পর্শ করতে হবে। আর, কোনো অবৈধ কায়দায় প্রতিদ্বন্দ্বীকে চিৎ করা যাবে না অর্থাৎ কোনো 'ফাউল হোল্ড' প্রয়োগ করা যাবে না। এসব করা হয়েছে কিনা, তা বিচার করবেন রেফারী। সমস্ত আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় প্রতিটি বাউটের জন্য তিনজন কর্মকর্তা থাকেন—ম্যাট চেয়ারম্যান, রেফারী ও জাজ। রেফারী প্রতিযোগিতা পরিচালনা করলেও ম্যাট চেয়ারম্যানই চূড়ান্ত কর্তা। কোনো ব্যাপারে যে পয়েন্ট দেওয়া হবে তার মূল্য নিয়ে রেফারী ও জাজ একমত হতে না পারলে ম্যাট চেয়ারম্যানের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে হবে। এ-ছাড়া জয়ী প্রতিযোগীর পোশাকের রঙের একখণ্ড কাপড় উঁচু তুলে করে দেখিয়ে ম্যাট চেয়ারম্যানই ফল ঘোষণা করেন। 'ড্র' হলে সাদা রঙের একখণ্ড কাপড় দেখানো হয়।

রেফারীরও ক্ষমতা অনেক। তাঁর বাঁশিতেই বাউট স্বরু, স্থগিত ও শেষ হয়। তিনি নিয়মভঙ্গকারী প্রতিযোগীকে বা প্রতিযোগীদের সতর্কিত করতে পারেন। প্রতিদ্বন্দ্বীরা যদি কুস্তি করতে করতে ম্যাট ছেড়ে বেরিয়ে আসে তা হলে একমাত্র তিনিই তাদের ম্যাটে ফিরে যাবার নির্দেশ দেবেন—এবং কীভাবে কুস্তি আবার আরম্ভ হবে—মাটিতে (অর্থাৎ ম্যাটের উপর), না দাঁড়ানো অবস্থায় —তাও ঠিক করে দেবেন। রেফারীর যে কোনো সিদ্ধান্ত, যার জন্যে কুস্তি থামাতে হয়, সঙ্গে সঙ্গে জানানো দরকার অর্থাৎ খুব আগেও নয়, খুব পরেও নয়। তিনি প্রতিদ্বন্দ্বীদের খুব কাছে দাঁড়াবেন না কারণ তা হলে তাদের পা লক্ষ্য করতে পারবেন না; গ্রেকো-রোমান পদ্ধতির লড়াইয়ে রেফারীকে সব সময়ই তাদের পায়ের দিকে নজর রাখতে হয়। 'ফল্' দেখার জন্যে দরকার হলে রেফারীকে মুহূর্তের মধ্যে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়তে হবে।

প্রতিটি বাউট ৯ মিনিট স্থায়ী হয় এবং এই ৯ মিনিট সময়কে তিন মিনিটের তিনটি ভাগে বিভক্ত করা হয় এবং দু'ভাগের মধ্যে এক মিনিট করে বিরতি হয়। এক প্রতিদ্বন্দ্বী অপরজন কর্তৃক চিৎ না হওয়া পর্যন্ত বাউট চলবে,

কিংবা কেউ চিং না হলে পুরো ৯ মিনিটই চলবে। কুস্তির সময় প্রতিযোগীরা কেউ কারো সঙ্গে কোনো কথা বলবে না। এই সময় প্রতিযোগীদের ট্রেনাররা তাদের জল বা উত্তেজক ঔষধও দিতে পারবে না। এক মিনিটের বিরতির পর লড়াই দাঁড়ানো অবস্থায় সুরু হবে।

দু'জনের মোট তিনটি পা ম্যাটের বাইরে হয়ে গেলে বাউট থামাতে হবে এবং কুস্তিগীরদের ম্যাটের মধ্যস্থলে এনে দাঁড়ানো অবস্থায় কুস্তি চালিয়ে যেতে হবে। কোনো 'হোল্ড' আইনসিদ্ধ হতে হলে যার উপর প্রয়োগ করা হচ্ছে তার মাথা এবং কাঁধকে ম্যাটের সীমানার মধ্যে আনতে হবে কিন্তু যে প্রতিযোগী স্বয়ং ম্যাটের বাইরে, প্রতিদ্বন্দ্বী ম্যাটের উপর থাকলেও সে কোনও 'হোল্ড' প্রয়োগ করতে পারবে না। যদি দুই প্রতিদ্বন্দ্বীই ম্যাট ছেড়ে বেরিয়ে যায় তা হলে কীভাবে বাউট পুনরারম্ভ হবে তা আগেই বলা হয়েছে। এই সব নিয়ম দাঁড়ানো অবস্থায় কুস্তি সম্পর্কে প্রযোজ্য। মাটিতে কুস্তির ক্ষেত্রেও অনুরূপ কিছু নিয়ম আছে। যে প্রতিদ্বন্দ্বী নীচে, সে যদি ম্যাটের ভিতরে থাকে, তাহলে ৩ বা ৪টি পা বাইরে থাকলেও যতক্ষণ কুস্তি ম্যাটের ভিতরে চলে ততক্ষণ বাউটটি চলবে। কিন্তু যদি নীচের ব্যক্তি এমন হোল্ড প্রয়োগ করে যাতে প্রতিদ্বন্দ্বীকে নিয়ে সে ম্যাটচ্যুত হয় বা নীচের ব্যক্তির হাত ও কাঁধসমেত মাথা ম্যাটের বাইরে চলে আসে বা আক্রান্ত হওয়ার ফলে নীচের ব্যক্তির দু'টি হাতই ম্যাটের বাইরের মেঝে স্পর্শ করে তা হলে লড়াই থামাতে হবে। যদি দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর একজনকে ঠেসে ধরে মাটিতে নামানো হয় তা হলে মাটিতেই লড়াই চলবে।

"ফাউল হোল্ড"ঃ নিম্নলিখিত কাজ এবং হোল্ডগুলি নিষিদ্ধ—চুল, গায়ের মাংস, কান এবং অন্যান্য নিষিদ্ধ অঙ্গ এবং পোশাক ধরে টানা চলবে না। হাতের বা পায়ের আঙ্গুল মুচড়ে দেওয়াও চলবে না। সেইরকম, চেঁচিয়ে গোলমাল বা ঝগড়া করা, লাথি মারা, গলা টিপে ধরা, ধাক্কা দেওয়া এবং এরকম হোল্ড প্রয়োগ করা যাতে প্রতিদ্বন্দ্বীর জীবন বিপন্ন হতে পারে বা হাড় ভেঙে বা সরে যেতে পারে সেগুলি নিষিদ্ধ। আবার যে যে হোল্ডের উদ্দেশ্য প্রতিদ্বন্দ্বীকে পীড়ন করা বা যন্ত্রণা দেওয়া (যাতে সে আর অংশগ্রহণ করতে না রাজী হয়) সেগুলিও চলবে না। প্রতিদ্বন্দ্বীর পায়ের উপর দাঁড়ানো চলবে না এবং তার চোখের ভ্রূ এবং মুখের লাইনের মাঝের অংশ স্পর্শ করা কিংবা গলা আঁকড়ে ধরা যাবে না। প্রতিদ্বন্দ্বীর বাহু ৯০ ডিগ্রীর বেশী দোমড়ানো যাবে

না। এবং তার পেটে বা পাকস্থলীতে কনুই কিংবা হাঁটু দিয়ে চাপ দেওয়া যাবে না। কাঁচির মত কায়দায় পা দিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বীর মাথা বা শরীর ("সিজার্স গ্রিপ") ধরা নিষিদ্ধ। ম্যাটের কিনারা ধরা চলবে না।

কিন্তু পায়ে পা বাধিয়ে ফেলে দেওয়া ('ল্যাং মারা') এবং পাশের দিকে পা দিয়ে ঠেলা বা আঘাত করা চলবে।

গ্রেকো-রোমান পদ্ধতিতে মূল নিষেধ ছাড়াও পা দিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বীকে ধাক্কা দেওয়া, চাপ দেওয়া বা তুলে ধরা নিষিদ্ধ।

'ফাউল হোল্ড' প্রয়োগ করলে কোনো প্রতিযোগীকে তার মূল্য দেওয়া হবে না। কিন্তু প্রয়োগকারী যদি ফাউল হোল্ড প্রয়োগ করেও অসুবিধাজনক অবস্থায় পড়ে যায় তা'হলে বাউট চলবে। এটা ফুটবল, হকি প্রভৃতি খেলার অ্যাডভাণ্টেজ নিয়মের সঙ্গে তুলনীয়।

বক্সিং

বিশ্বক্রীড়াঙ্গনে বক্সিংকে ঘিরে যেমন বিতর্ক তেমনটি বোধ হয় আর কিছু নিয়ে নেই। সমর্থকরা যেখানে "The Noble Art of Self-Defence" বলে বক্সিংয়ের প্রশস্তি গাইছেন, বিরোধীরা সেখানে "Legalised Murder" বলে এর বিরুদ্ধে সোচ্চার। সঙ্গত কারণেই এ-বিতর্কের মধ্যে আমরা যেতে পারছি না। তবে, একটা কথা উল্লেখ করা দরকার। বক্সিংয়ে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যার দিকে একটু দৃষ্টিপাত করলে মনে হয় না যে, তাঁদের উপর বক্সিংবিরোধীদের যুক্তি কিছুমাত্র প্রভাব বিস্তার করেছে। শুধু ইংল্যাণ্ডেই ১৯৫৬ সালে ১,০০০ অ্যামেচার বক্সিং ক্লাব এবং ৭৫,০০০ অপেশাদার বক্সার ছিল। রাশিয়াতে বক্সিং ফেডারেশন অব দি ইউ. এস. এস. আর. ২,৫০,০০০ সদস্যসংখ্যাবিশিষ্ট (এই হিসাব ১৯৭২ সালের)।

আগেকার দিনের Prize fighting-এর যুগ থেকে আজকের যুগের বক্সিংয়ের ইতিহাস নেহাৎ সংক্ষিপ্ত নয়। তার মধ্যেও বিশদভাবে যাবার অবকাশ আমাদের নেই। তবে বর্তমানকে বুঝতে হ'লে অতীতকে জানতে হয়, সেজন্যে আগেকার বক্সিংয়ের চেহারাটাও একটু দেখে নেওয়া যাক।

রোমান রাজা এগাসের পুত্র থেসাস নাকি একধরনের মুষ্টিযুদ্ধ প্রচলন করেছিলেন যাতে যে-কোনো একজন প্রতিযোগীর মৃত্যু হওয়া পর্যন্ত

প্রতিযোগিতা চলতো। মনে হয়, এরই অনুসরণে আগেকার দিনের 'প্রাইজ ফাইটিং'য়ে একজন প্রতিযোগী পড়ে যাওয়া পর্যন্ত একটি রাউণ্ড চলতো এবং সম্পূর্ণ পরাস্ত হওয়া পর্যন্ত বক্সিং চলতো। ('নক্‌ডাউনের' অর্থাৎ ঘুঁষি খেয়ে পড়ে যাওয়ার পর ৩০ সেকেণ্ডের মধ্যে উঠে স্ক্র্যাচলাইনে না আসতে পারলেই কাউকে পরাস্ত বলে গণ্য করা হত।) ঐ সময় ৯০ রাউণ্ড ধরে বক্সিং চলাটাও একটা কিছু আশ্চর্যের ব্যাপার ছিল না। ১৭৪৩ সালে ব্রিস্টলের এক মুষ্টিযোদ্ধা, নাম জ্যাক ব্রাউটন, সর্বপ্রথম বক্সিংয়ের নিয়ম লিপিবদ্ধ করেন। এতে আম্পায়ার রাখার প্রথা চালু হয়। ব্রাউটনের দেওয়া সাতটি নিয়ম অনুসারে ৯৫ বছর বক্সিং চলে। তারপর ১৮৩৮ সালে 'লণ্ডন প্রাইজ রিং রুলস্' বা 'নিউ রুলস অব প্রাইজ ফাইটিং' প্রবর্তিত হলেও তা' দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। কিন্তু তখনও পর্যন্ত বক্সিং ছিল খালি হাতে অর্থাৎ গ্লাভস্ না পরে আঙুলের গাঁট দিয়ে লড়াই। কুস্তির মত প্যাঁচে প্রতিদ্বন্দ্বীকে ধরা বা আঁকড়ে ধরে থাকা, এ-সবই চলতো। ১৮৬৪ সালে মার্কুইস অব কুইন্সবেরী ওই দু'টি জিনিস বন্ধ করে দিয়ে বক্সিংকে আধুনিক যুগে এনে দিলেন; বস্তুতঃ এই "কুইন্সবেরী রুলস্"ই আজকের বক্সিংয়ের নিয়মাবলীর ভিত্তি। তবে কুইন্সবেরী রুলসেও "পয়েণ্টে জেতা"র নিয়মের ব্যবস্থা হয়নি এবং গ্লাভসের কথা বলা হলেও তার ওজনের কথা কিছু বলা হয়নি। এসব এসেছে আরও পরে।

নিজেদের দক্ষতা যাচাই করে নেওয়ার সুযোগ বক্সারদের অন্যান্য খেলোয়াড়দের তুলনায় কম। (এখানে 'বক্সার' বলতে অপেশাদার বা অ্যামেচার মুষ্টিযোদ্ধাদের কথাই বলা হচ্ছে। পেশাদার বক্সারদের কথা আলাদা; অর্থ, খ্যাতি সব দিক থেকেই প্রোফেসনাল বা পেশাদার বক্সিং অ্যামেচার বক্সিংকে নিষ্প্রভ করে রেখেছে।) অপেশাদার বক্সারদের জন্য কোনো বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতা নেই, এটা খুবই দুঃখের কথা। যা আছে তা হলো অলিম্পিক গেমস্-এর অন্তর্ভুক্ত বক্সিং (প্রতি চার বছর অন্তর) এবং ইউরোপীয়ান বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপ যা প্রতি দু'বছর অন্তর অনুষ্ঠিত হয়।

সাধারণভাবে বক্সিংয়ে আরও দু'একটি অসুবিধা আছে। অনেক ক্ষেত্রেই মীমাংসা হয় পয়েণ্টে। যখন প্রতিদ্বন্দ্বিতা এমন তীব্র হয় যে, চূড়ান্তভাবে কেউই জয়লাভ করতে পারল না, তখন পয়েণ্টে মীমাংসা হওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না; এটা অবশ্য খুব উঁচু পর্যায়ের বক্সিংয়েই (যেখানে প্রতিদ্বন্দ্বীদের ক্ষমতার পার্থক্য 'উনিশ-বিশ') হয়ে থাকে। এর পর রেফারীদের ব্যক্তিগত

ধারণার কথাটাও অস্বীকার করা যায় না এবং অনেক ক্ষেত্রেই জয়পরাজয় নির্ধারণে ঐ ধারণার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। রেফারীরা মানুষ। তাই, তাঁরা ভুল করবেন না, এ-কথা জোর করে বলা যায় না। তবে "ভুল"টা ইচ্ছাকৃত কিনা সে কথা আলাদা। খোদ অলিম্পিক বক্সিং নিয়েই তো পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ উঠেছে। একজন বক্সিং বিশেষজ্ঞ লিখছেন: "It is unfortunate that the Olympic boxing···suffers so seriously from incompetent and partisan judging that its value as an international tournament is largely destroyed." আর একটি বিষয়ে বক্সিং অন্যান্য খেলাধূলা থেকে পৃথক। টেনিস, ব্যাডমিণ্টন ইত্যাদির মত বাছাই করার বা "সীডিং"-এর রীতি বক্সিংয়ে নেই। ফলে অনেক সময় এমনও হয় যে, কোনো প্রতিযোগিতায় যাদের ফাইন্যালে সাক্ষাৎকার ঘটা উচিত এমন দু'জন প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে গোড়ার দিকেই প্রতিযোগিতা হয়ে একজনকে বিদায় নিতে হ'ল।

এবার **অ্যামেচার বক্সিংয়ের প্রধান নিয়মগুলি** লক্ষ্য করা যেতে
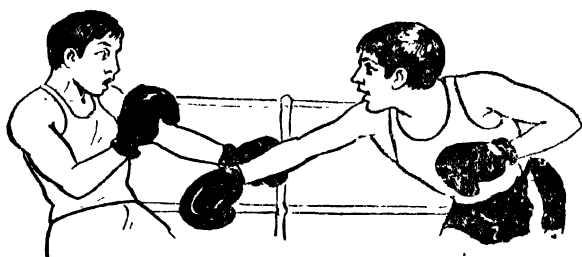
বক্সিং

পারে। (মনে রাখতে হবে যে, অ্যামেচার ও পেশাদার বক্সিংয়ের নিয়মে অনেক পার্থক্য আছে। সে বিষয়ে পরে বলা হচ্ছে।)

প্রতিযোগিতার দিন প্রতিযোগীরা ওজন হবে—কে কোন্ বিভাগে পড়ে সেটা স্থির করার জন্যে। ইচ্ছা করলে কোনো প্রতিযোগী বক্সিং-এর নির্দিষ্ট পোশাক পরেও ওজন হতে পারে, তবে ঐ পোশাকের জন্যে বাড়তি ওজন ধরা হবে না। চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতায় সমস্ত ওজনের যন্ত্র যে যথাযথ সে সম্পর্কে অনধিক ৪৮ ঘণ্টা আগের প্রমাণপত্র থাকা চাই।

নীচে বিভিন্ন বিভাগের নাম এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগে দেহের ওজন মেট্রিক মাপে এবং পাউণ্ডে দেওয়া হ'ল :—

বিভাগ	মেট্রিক মাপে ওজন (কিলোগ্রাম)	পাউণ্ডের মাপে ওজন (পাউণ্ড—আউন্স—ড্রাম)
লাইট ফ্লাইওয়েট	৪৫.৫ কেজি. থেকে, ৪৮ কেজি-র উর্ধ্বে নয়	১০৫ পাঃ ১৩ আঃ ২ ড্রা.র বেশী নয়
ফ্লাইওয়েট	৪৮ কেজি-র উর্ধ্বে, ৫১ ” ” ”	১০৫—১৩—২-র উর্ধ্বে, ১১২—১৬—১৫-র উর্ধ্বে নয়
ব্যান্টাম ওয়েট	৫১ ” ” ৫৪ ” ” ”	১১২—১৬—১৫-র ,, ১১৯—০—১২-র ,, ,,
ফেদারওয়েট	৫৪ ” ” ৫৭ ” ” ”	১১৯—০—১২-র ,, ১২৫—১০—৯-র ,, ,,
লাইট ওয়েট	৫৭ ” ” ৬০ ” ” ”	১২৫—১০—৯-র ,, ১৩২—১৪—৭-র ,, ,,
লাইট ওয়েল্টারওয়েট	৬০ ” ” ৬৩.৫ ” ” ”	১৩২—১৪—৭-র ,, ১৩৯—১৫—১৪-র ,, ,,
ওয়েল্টারওয়েট	৬৩.৫ ” ” ৬৭ ” ” ”	১৩৯—১২—১৪-র ,, ১৪৭—১১—৫-র ,, ,,
লাইট মিডলওয়েট	৬৭ ” ” ৭১ ” ” ”	১৪৭—১১—৫-র ,, ১৫৬—৮—৭-র ,, ,,
মিডলওয়েট	৭১ ” ” ৭৫ ” ” ”	১৫৬—৮—৭-র ,, ১৬৫—৫—৮-র ,, ,,
লাইট হেভিওয়েট	৭৫ ” ” ৮১ ” ” ”	১৬৫—৫—৮-র ,, ১৭৮—৯—৩-র ,, ,,
হেভিওয়েট	৮১ ,, ,, উর্ধ্বসীমা নেই	১৭৮—৯—৩-র ,, উর্ধ্বসীমা নেই

(সমস্ত আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় এই তালিকা অনুসরণ করা হয়।)

বর্তমান অ্যামেচার প্রতিযোগিতায় সাধারণতঃ লড়াই হয় তিন রাউণ্ড। প্রতি রাউণ্ড তিন মিনিট স্থায়ী হয় এবং এক এক রাউণ্ডের মধ্যে এক মিনিট বিরতি থাকে।

বক্সিংয়ে জয় দু'রকমে হতে পারে। কোনো প্রতিযোগী নক্-আউটে জিততে পারে, কিংবা, পয়েন্টে জিততে পারে। নক্-আউট আবার দু'রকম: সরাসরি নক্-আউট এবং টেকনিক্যাল নক্-আউট। **সরাসরি নক্-আউট**—নক্-ডাউন, অর্থাৎ ঘুঁষি খেয়ে কোনো প্রতিযোগী 'ডাউন' হয়ে বা পড়ে গেলেই ঐ রাউণ্ডের সমাপ্তি ঘটে না, তাকে ১০ সেকেণ্ড সময় দেওয়া হয় উঠবার জন্যে। বক্সার পড়ে যাওয়ার সময় থেকে আঙুলের সাহায্যে নির্দেশ করে রেফারী চেঁচিয়ে ১ থেকে ১০ পর্যন্ত সেকেণ্ড গুনবেন যাতে সেই বক্সার বুঝতে পারে। এর মধ্যে সে না উঠতে পারলে তার প্রতিদ্বন্দ্বী সরাসরি নক্-আউটে জিতে যাবে। **টেকনিক্যাল নক্-আউট**—যদি রেফারী মনে করেন যে, একজন বক্সার এমন আহত হয়েছে যে, তার সেদিন আর অংশগ্রহণ করা উচিত নয়, করলে সে গুরুতরভাবে জখম হবে, তাহলে তিনি সেই পর্যায়ে লড়াই বন্ধ করে দেবেন এবং আহত ঐ বক্সারের প্রতিদ্বন্দ্বীকে বিজয়ী ঘোষিত করা হবে। এটা হল টেকনিক্যাল নক্-আউট। (এ ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পূর্ণ ক্ষমতা রেফারীর। অবশ্য তিনি প্রতিযোগিতার ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করতে পারেন; তা করলে কিন্তু ডাক্তারের উপদেশ মানতে তিনি বাধ্য।) অন্যভাবেও টেকনিক্যাল নক্-আউট হতে পারে। যদি রেফারী দেখেন যে, কোনো বক্সারের চেয়ে তার প্রতিদ্বন্দ্বীর উৎকর্ষ অনেক বেশী, তাহলে তিনি সেই পর্যায়ে লড়াই বন্ধ করেন; প্রথমোক্ত বক্সারকে পরাজিত গণ্য করা হবে। এ ছাড়া 'টাইম' ডাকা হওয়ার পর যে প্রতিযোগী বক্সিং আরম্ভ করতে পারছে না, সে সেই পর্যায়ে পরাজিত হচ্ছে। এই দু'টি ক্ষেত্রেই জয়ী বক্সার টেকনিক্যাল নক্-আউটের বিধি অনুসারে জিতছে।

অ্যামেচার বক্সিংয়ে রেফারী, পাঁচজন বিচারক ও একজন সময়রক্ষক থাকেন। রেফারী বক্সিং রিংয়ের উপর থেকে লড়াই পরিচালনা করেন এবং বক্সিং চলার সময় তিনিই চূড়ান্ত ক্ষমতাসম্পন্ন নিয়ন্ত্রণকর্তা। তাঁর কর্তব্য হল এটা দেখা যে, দুর্বল বক্সার যেন অযথা বা অপ্রয়োজনীয়ভাবে বেশি রকমের মার না খেয়ে যায়।

অ্যামেচার বক্সিংয়ের নিয়ম অনুযায়ী দরকার হলে তিনি যে কোনো সময়

লড়াই থামাবার আদেশ দিতে পারেন। সাধারণতঃ অতীতের অভিজ্ঞ বক্সারদের মধ্যে থেকেই রেফারী ঠিক করা হয়। (ইংল্যাণ্ডের অ্যামেচার বক্সিং অ্যাসোসিয়েশন দীর্ঘদিন তাঁদের নিজেদের করা নিয়ম অনুযায়ী রেফারীকে রিংয়ে রাখতেন না, অর্থাৎ রিংয়ের মধ্যে বক্সার দু'জনই নামত। কিন্তু যখনই বাইরে তাঁদের বক্সাররা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করত আন্তর্জাতিক নিয়ম অনুসারে রিংয়ে রেফারীর উপস্থিতিতেই তাদের লড়তে হত, তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতি তাদের পক্ষে অস্বস্তিকর হত। শেষ পর্যন্ত এ. বি. এ. আন্তর্জাতিক নিয়মই মেনে নেয়।) বিচারক পাঁচজনের দু'জন বসেন রিংয়ের একধারে আলাদা আলাদা, অপর তিনজন রিংয়ের বাকী তিন ধারে একজন করে। বিচারকদের প্রধান কাজ হল পয়েণ্ট দেওয়া। প্রতি রাউণ্ডের শেষে তাঁরা নির্দিষ্ট 'স্কোরিং পেপারে' পয়েণ্ট দেবেন এবং এগুলি একেবারে লড়াইয়ের শেষে যোগ করা হবে। পয়েণ্ট দেওয়ার ব্যাপারে ভগ্নাংশের ব্যবহার নিষিদ্ধ। স্কোরিং পেপারে প্রত্যেক প্রতিযোগীর নাম ও তার কোমরে বাঁধা রঙীন কাপড়খণ্ডের ('স্যাশ') রং উল্লেখ করা বাধ্যতামূলক। প্রত্যেক বিচারক একজন বিজয়ী মনোনীত করে স্কোরিং পেপারে স্বাক্ষর দেবেন। তাঁদের দেওয়া পয়েণ্টের যোগফলে অবশ্যই বিজয়ীর নাম স্পষ্ট করে লেখা থাকতে হবে। সময়রক্ষকের কাজ হল রাউণ্ডগুলির সংখ্যা, সময় এবং দুই রাউণ্ডের মধ্যে বিরতিকাল আইন অনুসারে পরিচালনা করা। লড়াই আরম্ভ হওয়ার আগে একজন ঘোষক প্রতিযোগীদের নাম, শ্রেণীবিভাগ, স্যাশের রং ইত্যাদি ঘোষণা করে দর্শকদের সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দেন এবং খেলার শেষে বিজয়ীর নাম ঘোষণা করেন। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঘোষকই দুই ঘোষণার মাঝে সময়রক্ষক হিসাবে কাজ করে থাকেন ও ঘণ্টা বাজান। রেফারী ও বিচারকদের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত এবং তার বিরুদ্ধে কোনো রকম আবেদন চলে না।

কীভাবে পয়েণ্ট দেওয়া হয়ঃ যে বক্সার তার প্রতিপক্ষকে বেশি কার্যকরী ঘুঁষি বা 'স্কোরিং ব্লো' মারতে পারবে, সে প্রতি রাউণ্ডের শেষে ২০ পয়েণ্ট পাবে; প্রতিপক্ষ তার দেওয়া ঘুঁষির হিসাবে আনুপাতিকভাবে কম পয়েণ্ট পাবে। সাধারণতঃ ২০ : ১৭ এই অনুপাতেই পয়েণ্ট দেওয়া হয়ে থাকে। যখন বিচারক দেখবেন যে, উভয়েই উভয়কে সমসংখ্যক 'স্কোরিং ব্লো' মেরেছে, তিনি দু'জনকেই ২০ পয়েণ্ট করে দেবেন। যদি একটি রাউণ্ডের শেষে দুই বক্সারের প্রাপ্ত পয়েণ্টের সংখ্যা সমান হয়, যে বক্সার বেশিসংখ্যক

'লিডিং-অফ্' করেছে সে একটি পয়েণ্ট অতিরিক্ত পাবে। যদি বিচারক মনে করেন যে, লিডিং-অফে দুই বক্সারই সমান ছিল, যে বক্সারের 'ডিফেন্স' বা আত্মরক্ষামূলক কৌশল বেশি ভালো, তাকেই ঐ অতিরিক্ত পয়েণ্টটি দেওয়া হবে।

সুতরাং 'স্কোরিং ব্লো', 'লিডিং-অফ', 'ডিফেন্স' ইত্যাদি সম্বন্ধে একটু ধারণা থাকা দরকার। যে কোনো হাত মুঠো করা অবস্থায় (যাকে বলা হয় ক্লোজড্ গ্লাভস্') আঙুলের গাঁটের দিক দিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বীর মাথার সামনে বা পাশে কিংবা বেল্টের উপরে শরীরের যে অংশ আছে সেখানে ঘুঁষি মারলে এবং ঘুঁষির পিছনে যথেষ্ট জোর থাকলে, তবেই 'স্কোরিং ব্লো' হয়। কিন্তু 'ফাউল' বা অন্য কোনো রকম কোনো নিয়মভঙ্গ করলে, প্রতিদ্বন্দ্বীর বাহুর উপর বা পিঠে ঘুঁষি মারলে কিংবা ঘুঁষিতে যদি জোর না থাকে তা হলে সেগুলি 'নন-স্কোরিং ব্লো' ধরা হবে। প্রতিদ্বন্দ্বীর চেয়ে আগে নিয়ম অনুযায়ী আঘাত করা বা আঘাত করার চেষ্টা করাকে লীডিং-অফ্ বলা হয়। নিয়ম না মানলে লীডিং-অফের জন্য কোনও মূল্য দেওয়া হয় না। 'স্কোরিং ব্লো' এবং 'লীডিং-অফ্' দুইই আক্রমণাত্মক কলাকৌশল। কিন্তু বক্সার যত বড়ই হোক না কেন, তার আত্মরক্ষা করাও চাই। সমস্ত আত্মরক্ষামূলক কায়দাকে এক কথায় 'ডিফেন্স' বলা হচ্ছে। এর মধ্যে আছে আঘাত প্রতিহত করা ('ব্লকিং'), আঘাত ঠেকানো ('প্যারিং'), নীচু হয়ে গিয়ে ('ডাকিং') বা পাশে সরে গিয়ে ('সাইড-স্টেপিং') এড়ানো ইত্যাদি কলাকৌশল।

কখন ফাউল হয়ঃ (১) হাত মুঠো-না-করা অবস্থায় ('ওপেন গ্লাভস্' অবস্থায়) মারলে, গ্লাভ্স্-এর ভিতরের দিক দিয়ে মারলে, কব্জি দিয়ে মারলে বা গ্লাভস পরা হাত মুঠো করা অবস্থায় আঙুলের গাঁট ছাড়া কোনো অংশ দিয়ে মারলে ; (২) কনুই দিয়ে মারলে (৩) কোমরের নীচে মারলে ('হিটিং বিলো দি বেল্ট') ; (৪) 'কিডনি পাঞ্চ' চালালে, (৫) 'পিভট ব্লো' চালালে, (৬) প্রতিদ্বন্দ্বীর পিঠে বা ঘাড়ে বা মাথায় ইচ্ছাকৃত ঘুঁষি চালালে ; (৭) পড়ে-যাওয়া বা শুয়ে-থাকা বা উঠতে চেষ্টা করছে এমন প্রতিদ্বন্দ্বীকে আঘাত করলে ; (৮) প্রতিদ্বন্দ্বীকে ধরে রাখলে ; (৯) মাথা বা শরীর মেঝেয় রেখে শুয়ে থাকলে ; (১০) প্রতিদ্বন্দ্বীর বিপদ হতে পারে এমনভাবে কোমরের নীচে 'ডাকিং' করলে ; (১১) প্রতিদ্বন্দ্বীর মাথায় মাথা লাগালে বা মাথার বিপজ্জনক ব্যবহার করলে ; (১২) প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতি ইচ্ছাকৃত বা প্রয়োজনাতিরিক্তভাবে হিংস্র আচরণ

করলে ('রাফিং') ; (১৩) কাঁধ দিয়ে আঘাত করলে ; (১৪) 'কুস্তি' করলে ; (১৫) ঘুঁষি না খেয়েই ইচ্ছা করে পড়ে গেলে ; (১৬) প্রতিদ্বন্দ্বী আক্রমণ করার সুযোগ যাতে না পায় সেই উদ্দেশ্যে বার বার ব্যবধান অত্যন্ত কমিয়ে এগিয়ে দাঁড়ালে ; (১৭) রিংয়ের দড়ি থেকে অন্যায় সুযোগ নিলে, বা এমন কিছু কাজ করলে যেটাকে রেফারী অন্যায় বলে মনে করেন। আর রেফারীর দিকে মারমুখী হয়ে তেড়ে যাওয়াটা যে ফাউলের মধ্যে, তা বলাই বাহুল্য।

এ-ছাড়া, রেফারী 'স্টপ' বা 'ব্রেক' নির্দেশ দিলে সেই নির্দেশ মানতে হবে। রেফারী যখন 'ব্রেক' বা তফাতে থাকার নির্দেশ দেবেন, তখন উভয় প্রতিদ্বন্দ্বীকেই এক পা করে পিছিয়ে গিয়ে তবে আবার বক্সিং সুরু করতে হবে। 'ব্রেক' ডাকার সঙ্গে সঙ্গে কোনো মুষ্টিযোদ্ধা অবশ্যই প্রতিদ্বন্দ্বীকে আঘাত করবে না ; করলে ফাউল তো হবেই, উপরন্তু তার নামই বাতিল হয়ে যাবে। তেমনি ব্রেক বলার পর রেফারী 'বক্স্' নির্দেশ দিলে প্রতিদ্বন্দ্বীদের আবার বক্সিং আরম্ভ করতে হবে ; তবে অনেক রেফারীই এ নির্দেশ দেন না, প্রতিদ্বন্দ্বীরা নিজেরাই বক্সিং শুরু করে দেয়।

যদি কোনও প্রতিযোগীর পা ছাড়া শরীরের অন্য কোনও অংশ রিংয়ের মেঝে স্পর্শ করে কিংবা সে যদি সম্পূর্ণভাবে বা অংশতঃ দড়ির বাইরে থাকে বা অসহায় অবস্থায় দড়ির উপরে ঝুলতে থাকে বা একটি জোর ঘুঁষি খেয়ে সে যদি না পড়ে গিয়েও বা দড়ির উপর না ঝুলেও অর্ধ-অচৈতন্য অবস্থায় থাকে তাহলে তাকে '**ডাউন্**' গণ্য করা হবে। বক্সার ডাউন্ হবার পর রেফারী কীভাবে ১০ সেকেণ্ড হিসাব করেন সে কথা আগেই বলা হয়েছে। এই সময়ে পড়ে যাওয়া বক্সারের প্রতিদ্বন্দ্বী দূরে নিউট্রাল কর্ণারে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে এবং রেফারীর নির্দেশ পাওয়ার আগে বক্সিং আরম্ভ করবে না। সে তা না করলে রেফারী গোনা বন্ধ করে দেবেন, এবং করার পর যেখান থেকে গোনা বন্ধ হয়েছিল তার পর থেকে আবার গুনবেন। যদি রেফারীর 'টেন্' (১০) উচ্চারণের আগে 'ডাউন্' হওয়া বক্সার উঠে আবার লড়াই করতে পারে তবে বাউট চলবে, না পারলে 'টেন্' বলার পর বাউট শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু ডাউন্ বক্সার যদি চালিয়ে যেতে রাজিও হয়, তা হলেও 'আট' গোনা হবার আগে বাউট আবার সুরু হবে না। রেফারী যদি মনে করেন যে, একজন বক্সার পড়ে যাওয়ার মূলে 'ফাউল' মার, তাহলেও তিনি গুনে যাবেন—বক্সার

ওঠা পর্যন্ত কিংবা 'দশ' পর্যন্ত এবং তারপর বিচারকদের সঙ্গে পরামর্শ না করে বাউট আবার চলতে দেবেন না।

পেশাদার বক্সিংয়ে রেফারীর কাজ অনেক শক্ত। তিনি 'ব্রেক' বললেই যে বক্সাররা সরে যাবে এমন কোনো কথা নেই। তা ছাড়া রেফারী কোনো বিচারকের সাহায্যও পান না। কখন থেকে গোনা স্থরু করতে হবে সে বিষয়ে তিনি সময়রক্ষকের মুখাপেক্ষী। পেশাদার বক্সিংয়ে রাউণ্ড জিতলে ৫ পয়েন্ট এবং হারলে আনুপাতিকভাবে কম পয়েন্ট দেওয়া হয়—অনেক সময় ভগ্নাংশেও দেওয়া হয়। ব্রিটেনে বাউটের শেষে যার মোট পয়েন্ট সবচেয়ে বেশি সে-ই বিজয়ী হয়। কিন্তু আমেরিকায় তা নয়; আমেরিকায় সবচেয়ে বেশি সংখ্যক রাউণ্ড যে জিতেছে, তা সে জয়লাভ যত কষ্টার্জিতই হোক না কেন, তাকেই বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। সাধারণতঃ ১৫ রাউণ্ডের বেশি কোথাও প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় না।

এ পর্যন্ত বক্সিং রিংয়ের সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি। বক্সিং রিং মাটি থেকে অন্ততঃ ৩ ফুট (৯১.৪৪ সেন্টিমিটার) উঁচুতে থাকবে কিন্তু ৪ ফুটের (১২১.৯০ সেন্টিমিটার) বেশি উঁচুতে থাকবে না। রিং কমপক্ষে ১৬ ফুট বর্গ (৪৮৭.৬৮ সেন্টিমিটার বর্গ) ও অনধিক ২০ ফুট বর্গ (৬০৯.৬০ সেন্টিমিটার বর্গ) হবে। গোটা পাটাতনে ক্যানভাস বিছানো থাকবে এবং ক্যানভাসের নীচে অন্ততঃ আধ ইঞ্চি (১২.৭ মিলিমিটার) ঘন রবার, ফেল্ট বা ঐ জাতীয় কোনো অনুমোদিত উপকরণের স্তর থাকবে। চারদিকের চারটি খুঁটি থেকে টেনে তিনটি করে দড়ি বেঁধে রিং তৈরি করতে হবে, দড়ির ঘনত্ব ৩ সেন্টিমিটারের বেশি বা ৫ সেন্টিমিটারের কম হবে না। গ্লাভসের ওজন আট আউন্স হবে, অবশ্য জুনিয়রদের প্রতিযোগিতায় বিশেষ ব্যবস্থা করা যেতে পারে। প্রতি বক্সারের একজন সহকারী বা 'সেকেণ্ড' থাকে যে পাটাতনের নীচে, মাটি থেকে তাকে সাহায্য করে।

প্রতিযোগিতার স্থরুতে ও শেষে করমর্দন করা বক্সারদের পক্ষে বাধ্যতামূলক।

ভারোত্তোলন

প্রথম পর্যায়ঃ ৪ বর্গমিটার প্ল্যাটফরমের উপরে ভারোত্তোলকের পায়ের কাছে আড়াআড়িভাবে বারে বিভিন্ন ওজনের লোহার গোল চাকৃতি লাগান থাকে। উত্তোলক চাকৃতিসহ বার দুই হাতে কাঁধের উপর তোলে এক টানে। এই সময়ে তার শরীর বেঁকে, বেঁকে হাঁটুও। বার অতঃপর বিশ্রাম নেবে কণ্ঠাস্থির উপরে। এই সময়ে পা দু'খানি একত্রিত হতে পারে, কিন্তু সোজা থাকবে। রেফারীর সংকেত পর্যন্ত এইভাবে অপেক্ষা করতে হবে।
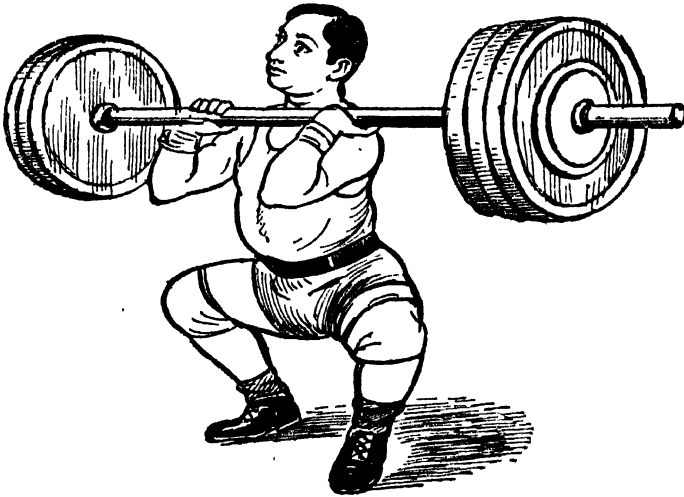
ভারোত্তোলন

দ্বিতীয় পর্যায়ঃ রেফারী যেই হাত তুলবেন 'আপ' বলে, অমনি উত্তোলক পা না বেঁকিয়ে কণ্ঠাস্থি থেকে দু'হাত সোজা করে মাথার উপর খাড়া তুলবে বারসহ চাকৃতিগুলি। রেফারীর 'ডাউন' বলা পর্যন্ত এইভাবে সমস্ত ওজন উঁচু করে রাখতে হবে। 'ডাউন' শোনামাত্র বার থামাতে হয় প্ল্যাটফরমের উপর।

ভুল ভঙ্গীঃ (ক) জার্কে কাঁধে তোলা যায় না। এই সময় রেফারী সংশ্লিষ্ট ভারোত্তোলককে লিফ্‌ট করতে না দিয়ে ওজন মাটি বা প্ল্যাটফরমে রাখার নির্দেশ দেন।

(খ) রেফারীর সংকেতের আগে শুরু করা যায় না।

(গ) কাঁধের উপরে তোলার পর খুব সামান্য হাঁটু বেঁকতে পারে, বেশি বেঁকলে ভুল হবে।

(ঘ) রেফারীর সংকেতের পরে নিয়ম লঙ্ঘন চলে না।

(ঙ) বারের নিচে পিছনের দিকে বেশি বাঁকানো নিষেধ।

(চ) অসম্পূর্ণ হাত প্রসারিত করা।

(ছ) পা রদবদল।

(জ) গোড়ালি বা পায়ের পাতা তোলা।

(ঝ) রেফারীর সংকেতের আগে বার নামানো।

স্ন্যাচ : বার আড়াআড়িভাবে উত্তোলকের পায়ের কাছে থাকে, এবার সে দুই হাতে বারটি ধরে খাড়া তুলবে মাথার উপরে। এই সময়ে পা বেঁকতে পারে। না থেমে বার উপরে তুলতে হয়। শেষ অবস্থায় ২ সেকেণ্ড অবস্থান করতে হবে। একই লাইনে তখন পা ফাঁক হলেও ৪০ সেন্টিমিটারের বেশি কিন্তু কদাচ নয়। স্ন্যাচে একবারেই ওজন তুলতে হয়।

ক্লিন ও জার্ক : বার আড়াআড়িভাবে উত্তোলকের পায়ের কাছে থাকে। দুই হাতে বার ধরে উত্তোলক তুলবে কাঁধে চূড়ান্ত অবস্থায় পৌছবার আগে তবে যেন বুক স্পর্শ না করে। কিন্তু পরে বুকে রাখা যায়। তারপর পা দু'খানি প্রথমাবস্থায় ফিরে আসে। এবার পা বাঁকিয়ে দ্রুত প্রসারিত করে বার আবার খাড়া উপরে তুলতে হবে। এক্ষেত্রেও বার ২ সেকেণ্ড থাকবে চূড়ান্ত পর্ব অবস্থায়।, পা প্রসারিত হবে সর্বাধিক ৪০ সেন্টিমিটার।

ভুল ভঙ্গী : (ক) কাঁধে শেষ বার তোলার আগে মাটিতে হাঁটু ঠেকলে।

(খ) 'হুকিং' করা যায়।

(গ) হাঁটুর উপরে বার তুললেই ধরা হবে 'লিফ্‌ট' করেছে।

গভর্নিং বডি ও রেফারী : রেফারী থাকেন তিনজন। তাঁরা লিফ্‌ট দেখে দুই বা তিনটি সাদা আলো জ্বালালে—'ভুল' লিফ্‌টিং হয়েছে বুঝতে হবে।

ওজন তোলায় রেকর্ড হলে তিনজন রেফারী বারের ওজন পরীক্ষা করেন। এর আগে সংশ্লিষ্ট প্রতিযোগী প্ল্যাটফরম ছেড়ে যাবে না।

প্রতিযোগিতা : প্রতিযোগিতা চলাকালে প্ল্যাটফরম বা মঞ্চে টিম ম্যানেজার, জুরি আর অ্যাপীলের সদস্যবৃন্দ ও জাজ ছাড়া কেউ উঠতে পারে না।

নাম ডাকার ২ মিনিটের মধ্যে সকলকে মঞ্চে বা প্ল্যাটফরমে হাজির হতে হয়। উপস্থিত না হলে ২ মিনিট পরে আবার নাম ডাকা হবে। তখন ৩ মিনিটের বেশি দেরী হলে সতর্ক করে দেওয়া হয়।

ওজন বৃদ্ধি করা হয় প্রতিবারে ৫ কিলো করে। আড়াই কিলোর অনুরোধ হলে বুঝতে হবে সেই প্রতিযোগীর এটিই শেষ তোলা।

প্রতিযোগিতায় ৭টি ওয়েট-গ্রুপ আছে। এগুলি হল: ব্যাণ্টাম—৫৬ কিলো পর্যন্ত, ফেদার—৬০ কিলো পর্যন্ত, লাইট—৬৭½ কিলো পর্যন্ত; মিডল্—৭৬ কিলো পর্যন্ত, লাইট হেভি—৮২½ কিলো পর্যন্ত; মিডল হেভি—৯০ কিলো পর্যন্ত এবং হেভি—৯০ কিলোর উপরে। প্রতিযোগিতার এক ঘণ্টা আগে প্রতিযোগিদের ওজন নেওয়াই বিধি।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ক্যাম্পিং, হাইকিং ও পর্বতারোহণ

পশ্চিমবঙ্গে তো বটেই, সমগ্র ভারতে 'ক্যাম্পিং' বা শহর ছেড়ে দূরে তাঁবু খাটিয়ে কয়েকদিন বাস করে আসার প্রচলন বিশেষ নেই বললেই চলে। বিদেশে, বিশেষতঃ ব্রিটেনে এবং আমেরিকায় 'ক্যাম্পিং'-এর যে জনপ্রিয়তা তা এখান থেকে বোঝা শক্ত। অবশ্য সংখ্যা যদি বুঝতে কিছুটাও সাহায্য করে—তা হলে এর থেকেই ক্যাম্পিংয়ের আদর বোঝা যাবে যে, শুধু ইংল্যাণ্ডে একটি ক্যাম্পিং ক্লাবেরই সদস্য সংখ্যা পঞ্চাশ হাজারেরও বেশি। ক্লাবটির নাম হল ক্যাম্পিং ক্লাব অব গ্রেট ব্রিটেন অ্যাণ্ড আয়ার্ল্যাণ্ড। সেখানে এছাড়াও আরও অনেক ক্যাম্পিং ক্লাব, যেমন অ্যামেচার ক্যাম্পিং ক্লাব আছে। এই সব ক্লাবে সাধারণ সদস্য ছাড়াও 'জুনিয়র' সদস্য এবং সদস্যের পরিবারভুক্ত লোকদের 'ফ্যামিলি' সদস্য করে নেওয়া হয়। যৎসামান্য চাঁদার বিনিময়ে এই সব ক্লাব মাসিক বা দ্বিমাসিক পত্রিকা, বুলেটিন ইত্যাদির সাহায্যে সদস্যদের ক্যাম্পিংয়ের নানা দিক সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করে এবং শুধু তাই নয়, অনেক 'ক্যাম্পিং সাইট' (Camping Site) রক্ষণাবেক্ষণ এবং সদস্যরা যাতে বিশেষ সুবিধাজনক শর্তে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র পায় তার ব্যবস্থাও করে।

গৃহকোণের নিশ্চিন্ত আরাম ছেড়ে কয়েকদিনের জন্য উন্মুক্ত প্রকৃতির বুকে 'সংসার পেতে' বাস করে আসাটার মধ্যে নিছক আনন্দ বা অ্যাডভেঞ্চার ছাড়াও আরও অনেক কিছু আছে যেটা শুধু ছাত্রছাত্রীদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এক কথায় বলা যায়, একাধারে আনন্দ এবং শিক্ষার ব্যবস্থা করে ক্যাম্পিং। নিয়মানুবর্তিতা, একত্রে মিলে-মিশে কাজ করার অভিজ্ঞতা, দলের প্রতি আনুগত্য, পরিবর্তিত পরিস্থিতি ও আবহাওয়ার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়া ইত্যাদি শেখার সর্বোৎকৃষ্ট মাধ্যম হল ক্যাম্পিং। যে-সব মধ্যবয়স্ক বা প্রৌঢ় ব্যক্তি ক্যাম্প-জীবনে অংশ গ্রহণ করেন তাঁদের লক্ষ্য অবশ্য নিছক আনন্দ উপভোগ। তাঁরা মনের দিক দিয়ে তরুণ বা যুবা থাকেন বলেই বয়সের ভারকে গ্রাহ্য করেন না।

যাঁরা এ-কথা বলেন যে, ক্যাম্পিং, হাইকিং, ট্রেকিং ইত্যাদি সমৃদ্ধ সমাজের (Affluent Society) বিলাসিতা মাত্র, 'ওসব আমাদের দেশে চলে না, দেশের লোক যেখানে অর্ধভুক্ত' ইত্যাদি ইত্যাদি, তাঁরা একটি বিষয়ে বিরাট ভুল করেন। ক্যাম্পিংয়ে অর্থব্যয়টাই বড় কথা নয়, মন বা ইচ্ছাটাই বড় কথা। ইচ্ছা থাকলে অতি সামান্য খরচে একা একাই কেউ ক্যাম্পিং করতে বেরিয়ে পড়তে পারে। অনেক ব্যয় করে অনেক ক্রোশ ঘুরে তো বহু ব্যক্তিই ভ্রমণ করে থাকেন—এই দেশেই—কিন্তু তাদের ক'জন 'ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া' 'একটি ধানের শীষের উপর একটি শিশির বিন্দু' দেখতে আগ্রহী? সুতরাং আগ্রহটাই বড় কথা। সাজসজ্জা বা লটবহর চাপিয়ে দিয়ে সাইকেলে বা এমন কি হেঁটেও কিছুটা দূরে পল্লী-অঞ্চলে গিয়ে প্রকৃতির উন্মুক্ত শ্যামলিমার বৈচিত্র্যে দু'একটা ছুটির দিনও কাটিয়ে আসা যেতে পারে।

সাইকেলে হোক, মোটর সাইকেলে বা স্কুটারে হোক, ছোট নৌকায় হোক, প্রয়োজন অনুযায়ী মালপত্র বা সাজসরঞ্জাম নিয়ে গিয়ে ক্যাম্পিং করে আসা যায়। ক্যাম্পিংয়ে কতজন যেতে পারে এ সম্পর্কে কোনো ধরা-বাঁধা নিয়ম নেই। যেমন নেই কী কী জিনিসপত্র নিয়ে যেতে হবে সে সম্পর্কেও। দু'জন যেতে পারে, চার-পাঁচজন যেতে পারে, আবার গোটা পরিবার বা কোনও বড় দলও যেতে পারে। বলা বাহুল্য, সঙ্গে যেসব জিনিসপত্র বইতে হবে তার পরিমাণ 'হেভি ওয়েট' হবে, না 'মিডল্ ওয়েট' হবে কিংবা 'লাইট ওয়েট' হবে—সবই নির্ভর করছে ক্যাম্পারদের সংখ্যার উপর। জিনিস নিয়ে যাওয়া সম্পর্কে মনে রাখতে হবে যে, যে-সমস্ত জিনিস না নিয়ে গেলেই নয়, মাত্র সেই সব জিনিসই

নিতে হবে। কারণ অনর্থক বোঝা বাড়িয়ে লাভ নেই, আবার এমন জিনিস ফেলে যাওয়া উচিত নয়, যা হঠাৎ দরকার হতে পারে। প্রত্যেক ক্যাম্পারের নিজস্ব কিছু জিনিস থাকবে, যেগুলি অপরের কাছ থেকে নেবার প্রশ্ন ওঠে না, যেমন পোশাক, শয্যাদ্রব্যাদি, বাসনপত্র ও অন্যান্য উপকরণ। বিস্তারিতভাবে বলা যায়, ক্যাম্পে যাবার ও ক্যাম্প থেকে ফেরার সময়ের পোশাক, অতিরিক্ত পোশাক, জ্যাকেট বা সোয়েটার, বর্ষাতি, জুতো ও মোজা, পাজামা, রাতের পোশাক, রুমাল, স্লীপিং ব্যাগ (বিকল্পে কম্বল), চাদর, মশারি, হাওয়া-ভরা বালিশ, থালা, বাটি, কাপ, বড় ও ছোট ছুরি, কাঁটা, চামচ, সাবান, মাজন, চিরুণী আয়না, তোয়ালে বা গামছা, হাতঘড়ি, দিয়াশলাই, টর্চ, পকেট ফার্স্ট এড সরঞ্জাম, টাকা-পয়সা রাখার ব্যাগ, নোটবুক, পেন্সিল বা পেন, প্যাক করার জন্য ব্যাগ—এ সবই প্রত্যেকের নিজের জন্য নিতে হবে। সকলের ব্যবহারের জন্য বয়ে নিয়ে যেতে হবে—তাঁবু খাটাবার জিনিসপত্র, প্ল্যাস্টিক বা পলিথিনের ব্যাগ বা বোতল, খাদ্য, পলিথিনের বালতি, রান্নার হাঁড়ি বা ঐ জাতীয় কিছু, সস্‌প্যান, ফ্রাইং প্যান, স্টোভ বা প্রেসার কুকার, টিন কাটার যন্ত্র, টেবিল ক্লথ, বাসনপত্রাদি পরিষ্কার করার পাউডার, কুঠার (ছোট ও বড়), ছুঁচ, সুতা, বোতাম ও সেফ্‌টিপিন, নাইলনের দড়ি, সরু তামার তার, পেরেক, ফার্স্ট এড বক্স। এ-ছাড়া, যারা ইচ্ছা করে আমোদ-প্রমোদের জন্য ট্র্যানজিস্টর রেডিও, টেপ-রেকর্ডার, ক্যামেরা ইত্যাদিও নিতে পারে। মনে রাখা দরকার যে, এই তালিকা সম্পর্কেও ধরা-বাঁধা কিছু নেই। সব কিছুই নির্ভর করছে রুচি এবং প্রয়োজনের উপর। তবে দেখতে হবে, এক একজনের বোঝা ১০/১৫ কিলোগ্রামের বেশি যেন না হয়। যাঁরা স্কাউটিং করেছেন বা এখনও করেন তাঁদের কাছে এ-সব সম্পর্কে কিছু বলা একরকম নিষ্প্রয়োজন। বস্তুতঃ, আমাদের দেশে অধুনাপ্রতিষ্ঠিত দু'একটি ক্যাম্পিং ক্লাব বা শ্রীমিহির সেন প্রতিষ্ঠিত এক্সপ্লোরার্স ক্লাবের কথা ছেড়ে দিলে, ক্যাম্পিংয়ের সঙ্গে লোকের যতটুকু পরিচয় তার প্রায় সবটাই স্কাউট, ব্রতচারী ও এন. সি. সি.দের ক্যাম্পের মাধ্যমে। স্কাউটিং আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা লর্ড ব্যাডেন পাওয়েলের বিশ্ববিখ্যাত বই 'স্কাউটিং ফর বয়েজ' পড়লে বয় স্কাউটদের ক্যাম্পিং-জীবন সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা গড়ে তোলা যায়। এবং সেখানে ক্যাম্পিং সম্পর্কে যা লেখা আছে প্রয়োজনীয় পরিবর্তনসাপেক্ষে তা সাধারণভাবেও প্রযোজ্য।

ক্যাম্পারদের প্রথমেই ক্যাম্পিং-এর জায়গা বা 'সাইট' ঠিক করে নিতে হবে।

ঠিক কোথায় যাওয়া হবে এবং ক্যাম্প কী ধরনের হবে আগে থেকে ঠিক না করা থাকলে 'অ্যাডভেঞ্চারের' ভাগ বেড়ে যায় সন্দেহ নেই, কিন্তু সে ক্ষেত্রে অতি অবশ্যই সন্ধ্যার আগে তাঁবু খাটিয়ে ফেলতে হবে, কারণ, অচেনা জায়গায় রাতের অন্ধকারে জায়গা খোঁজাখুঁজি করে তাঁবু খাটানোর মধ্যে অনেক ঝুঁকি আছে।

কোনো ব্যক্তির ঘেরা জায়গা বা জঙ্গল থাকলে, তাঁর অনুমতি নিয়েও সেখানে তাঁবু খাটানো যেতে পারে ; জঙ্গলের ভিতরে হলে রান্নার জন্যে জ্বালানি কাঠের অভাব হবে না। দেখতে হবে যেন কাছাকাছি পানীয় জল প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। জল এবং কাঠ, এই দু'য়ের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বেশি বলা বাহুল্য। সুতরাং স্থান নির্বাচনের সময় ঐ দুটি বিষয়ের কথা সব চেয়ে আগে মনে রাখতে হয়। কাছাকাছি ছোট নদী থাকলে ভালো হয়, বাসনপত্রাদি ধোওয়ার ব্যাপারে খুব সুবিধা হয়। তাঁবুর বা টেণ্ট-এর আকৃতি বহু রকমের হতে পারে—'A' টেণ্ট ('Λ' আকৃতির সাধারণ তাঁবু), জিপসি টেণ্ট, কুঁড়ে ঘরের আকৃতির 'কটেজ' টেণ্ট, এস্কিমোদের ইগলুর মত টেণ্ট। এখানেও প্রয়োজন এবং রুচির সমন্বয়ে সব কিছু ঠিক করতে হয়। এরপর আসছে খাওয়ার ব্যাপার। কিছু রান্না করা ক্যাম্পারদের সকলের না হোক, কয়েক জনের জানা থাকা দরকার, এবং থাকেও। তবে সহজে যে সব জিনিস তৈরি করা যায়, সেগুলি সকলেরই শিখে নেওয়া উচিত। যেমন, বিভিন্ন সব্জী, ডিম ও মাছ ভাজা, ভাত, রুটি, খিচুড়ি, মাংস, চাটনি ইত্যাদি। বিদেশের মত এখানে টিনে প্যাক করা তরকারী খাওয়ার রেওয়াজ যদি কোনো দিন আসে, তখন ক্যাম্পারদের কাজ অনেকটা সহজ হয়ে যাবে একথা মনে করার কোনো কারণ নেই, কারণ নিজেরা এক-একদিন এক-একরকম রেঁধে খাওয়ার বৈচিত্র্যের পরিবর্ত কিছুই নেই।

ক্যাম্প-জীবনে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্বের সীমা নেই বললেই চলে। যে জায়গায় তাঁবু খাটানো হয় সেই জায়গাটি নোংরা করে ফেলে আসা কখনই উচিত নয় (যে প্রবণতাটা আমাদের দেশে অধিকাংশ পিকনিকের দলের মধ্যে দেখা যায়)। সমস্ত আবর্জনা একত্রিত করে পুঁতে বা পুড়িয়ে ফেলা উচিত। খাওয়া শেষ হওয়া মাত্রই বাসনপত্রাদি ধুয়ে ফেলা উচিত এবং ধোওয়ার কাজটি তাঁবুর কাছেই করা বাঞ্ছনীয় নয় ; ধোওয়ার পাউডার সব সময়েই হাতের কাছে রেখে দেওয়া উচিত।

ক্যাম্পিংয়ে বাড়ি ছেড়ে বাইরে উন্মুক্ত প্রকৃতির বুকে থাকার মধ্য দিয়ে যে

সব জিনিস শেখা যায় সে সবই **হাইকিং এবং ট্রেকিং**-এর ক্ষেত্রে কাজে লাগছে। সত্যি কথা বলতে কি, হাইকিং, ট্রেকিং, পর্বতারোহণ বা মাউন্টেনিয়ারিং—এ সবের ক্ষেত্রে যা প্রয়োজন তা হল ক্যাম্পিং। হাইকিং বা ট্রেকিং সম্পর্কে খুব বেশি বলা নিষ্প্রয়োজন। হাইকিং, ট্রেকিং এ সমস্তই পায়ে হেঁটে বেড়ানোর বা পদযাত্রার রকমফের। অবশ্য সাইকেল, ঘোড়া বা নৌকায় চড়েও হাইকিং অনেকে করে থাকেন। তবুও বলা যায়, হাইকিং মুখ্যতঃ পদযাত্রাই। বিশেষতঃ ক্যাম্পিংয়ের মধ্যে 'হাইক' করা বা 'ক্যাম্প হাইকিং' সেটা ক্যাম্প-জীবনের অন্যতম আকর্ষণ। ক্যাম্প ছেড়ে খানিকটা দূরে হেঁটে বেড়িয়ে আসা যায়, বা দরকার হলে সেখানে দু'-একদিন কাটিয়ে আসাও যায়, তবে সেটা একেবারে প্রথমেই সম্ভব হয় না। বেশ কিছুদিন অভ্যস্ত হওয়ার পর দিনে দশ-বারো মাইল হাইকিং করা যায়।

ট্রেকিং হাইকিংয়ের থেকে দুরূহ। বিপদসঙ্কুল, দুর্গম পথে যাত্রাই হল ট্রেকিং। কথাটি দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে এসেছে। বলদে টানা চারচাকার গাড়িতে মালপত্র, লটবহর চাপিয়ে নিয়ে ঘুরে বেড়ানোর প্রচলন থেকেই কথাটির উদ্ভব। ট্রেকিংয়ে অবশ্য বড় দল থাকে এবং গন্তব্যস্থলও বেশ দূরেই হয়।

পর্বতারোহণ

উপরে ক্যাম্পিং, হাইকিং ও ট্রেকিং সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে বলতে পারা যায় যে, বিপদের বা দুরধিগম্যতার দিক থেকে দেখতে গেলে বোধ হয় পর্বতারোহণের সমকক্ষ কিছুই নেই। পর্বতারোহণকে যদি 'দুরূহতম ক্রীড়াকৌশল' বলে বর্ণনা করা যায়, তাহলে নিশ্চয়ই কারও আপত্তি করার কিছু থাকতে পারে না। এ সম্পর্কে কিছু তথাকথিত ক্রীড়াবিদের উন্নাসিকতা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। প্রায় পাঁচশো বছরের পুরনো এই ক্রীড়াকৌশলে অভিযাত্রীদের সকলেই এ কথাটা ভালোভাবে জানেন যে, তাঁদের যে কোনো সময়ই মৃত্যু ঘটতে পারে। পর্বতে ধস, হিমানী-সম্প্রপাত, অবিরাম তুষারপাত, তুষার-ঝঞ্ঝা, বন্য পশু ইত্যাদির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে করতে যাঁরা শিখর থেকে শিখরে উঠছেন তাঁদের প্রাপ্য সম্মান দিতে কার্পণ্য করা উচিত নয়।

পর্বতারোহণে বিশেষ প্রশিক্ষণ, প্রস্তুতি, সাজসরঞ্জাম এবং অভিজ্ঞতা দরকার। এ ছাড়া আরোহীদের শারীরিক পটুতা—যেটা সব চেয়ে বেশি দরকার, উপস্থিত বুদ্ধি, দৈহিক বল, এবং বিপদে স্থির থাকাও দরকার। আর দলনেতার প্রতি চূড়ান্ত আস্থা, পারস্পরিক বিশ্বাস, বোঝাপড়া এবং সহযোগিতার কথা বলাই বাহুল্য। দার্জিলিঙের হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং

পর্বতারোহণ

ইনস্টিটিউটে পর্বতারোহণ বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়। আজকাল মেয়েরাও পর্বতারোহণে অংশ গ্রহণ করছে এবং এই প্রচেষ্টার মূলে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে সফল রোপ্টি অভিযান। ভারতে পর্বতারোহণের বিষয়ে পশ্চিমবাংলা অগ্রণী, একথা বললে বোধ হয় ভুল হবে না। এ রাজ্যে হিমালয় ও পর্বতারোহণ সংক্রান্ত প্রায় চল্লিশটি সংঘ আছে। ১৯৫৩ সালে হিমালয় অভিযানের সাফল্যের পর পশ্চিমবঙ্গে পর্বতারোহণ প্রচেষ্টার যেভাবে প্রসার হয়েছে তা সত্যিই প্রশংসনীয়। পর্বতারোহণে উৎসাহী তরুণ ও যুবকদের উচিত কোনো পর্বতারোহণ সমিতির বা শিক্ষণ-কেন্দ্রের সদস্য হওয়া। আজকাল বাঁকুড়ার শুশুনিয়া পাহাড়ে পর্বতারোহীদের শিক্ষার প্রথম পাঠ দেওয়া হয়।

একলাফে কেউ পাকা পর্বতারোহী হতে পারে না। এজন্যে প্রথমে ছোট ছোট পাহাড়ে হাঁটা, চড়া শিখে নিতে হয়, যাকে বলে 'হিল ওয়াকিং'। তারপর আসে 'শৈলারোহণ' (Rock Climbing) এবং তুষারারোহণ (Snow Climbing) বা বরফারোহণ (Ice Climbing)। পর্বত সর্বত্র একরকম নয়, কোথাও কঠিন শিলা, কোথাও বরফ, কোথাও বা তুষার—পর্বতারোহণের কৌশল এবং প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম ঐ পার্থক্য অনুসারে আলাদা হয়।

পর্বতারোহণের সাজসরঞ্জামের বৈচিত্র্য আছে এবং এই সব সাজসরঞ্জামের মধ্যে অধিকাংশই ব্যয়সাপেক্ষ। প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি পছন্দ করার ব্যাপারে সব সময় যন্ত্রপাতির উপযোগিতার দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত, অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে তাদের গঠন সুন্দর কিনা, সেগুলি মজবুত কিনা এবং হাল্কা কিনা সেদিকেও লক্ষ্য রাখা উচিত। খরচ কমানোর জন্য সস্তার বাজে যন্ত্রপাতি বা সাজ-সরঞ্জাম কেনা উচিত নয়, কারণ একদিন হয়তো পর্বতাভিযাত্রীর জীবনটাই নির্ভর করবে একটি বিশেষ সরঞ্জামের উপর। রাবার সোলের বুট (ভাইব্রাম) শীতে বরফের বা তুষারের উপর দিয়ে হাঁটবার জন্যে প্রয়োজন হয়। যাতে বুট বরফের বা তুষারের উপর পিছলে না যায় সেজন্যে তার তলায় 'ক্র্যাম্পন' বা সাঁড়াশি-জাতীয় স্ক্রুওয়ালা একরকম যন্ত্র আটকে নিতে হয়। কিন্তু পয়সা বাঁচাতে গিয়ে কেউ যদি জুতোয় ক্র্যাম্পন না লাগিয়ে নেয়, তাহলে নিশ্চয়ই প্রচণ্ড মূর্খতা করা হবে। তেমনি, আরোহণের জন্য যে নাইলনের বা পারলনের দড়ি দরকার সেটা অবশ্যই অত্যন্ত মজবুত হতে হবে, খরচ বাঁচানোর জন্যে পুরনো দড়ি ব্যবহার করা উচিত নয়।

অবশ্য পোশাক-পরিচ্ছদের ও সাজসরঞ্জামাদির ব্যাপারে সব আরোহী যে একমত হবে এমন কোনো কথা নেই। তবু যেগুলি না হলেই নয়, সেগুলি হল: বুট, হুডসমেত 'অ্যানোরাক' (বায়ুনিরোধক জ্যাকেট), রুকস্যাক, ম্যাপ, কম্পাস, অতিরিক্ত পোশাক, খাবার, টর্চ, অতিরিক্ত বাল্‌ব্‌ ও মার্কারি ব্যাটারি, হুইশল, ছুরি, ঘড়ি, টাকা-পয়সা, পলিথিনের হাল্কা ব্যাগ এবং/অথবা 'স্পেস ব্ল্যাংকেট', নাইলনের মোটা দড়ি, বরফ-কাটা কুঠার (Ice axe), ঔষধপত্র ও চিকিৎসার সরঞ্জাম। সরঞ্জামের তালিকা থেকেই বুঝতে পারা যাবে আগে থেকেই পর্বতারোহীর ক্যাম্প-জীবনের অভিজ্ঞতা থাকলে সেটা এই সময় খুব কার্যকরী হয়।

একলাফে যেমন কেউ পর্বতারোহী হতে পারে না, তেমনি একলাফে কেউ হিমালয় বা আল্পসের চূড়ায় উঠতেও পারে না। তরুণ শিক্ষার্থীদের পক্ষে বিভিন্ন গাইডবুকে দেওয়া শ্রেণীবিভাগ অনুসরণ করে নিজের যোগ্যতা অনুসারে পর্বতারোহণের চেষ্টা করা উচিত। এইসব গাইডবুকে কোনো পর্বত ও পার্বত্য জায়গা সম্পর্কে অজস্র তথ্যের সম্ভার থাকে। আরোহণের দুরূহতার দিক থেকে সাধারণতঃ পর্বতগুলিকে এইরকমভাবে ভাগ করা হয়: সহজ ('E' অর্থাৎ Easy), মাঝামাঝি (Mod. অর্থাৎ Moderate), শক্ত (D অর্থাৎ

Difficult), খুব শক্ত (V.D. বা Very Difficult), দুরূহ (S অর্থাৎ Severe), অত্যন্ত দুরূহ (V.S. অর্থাৎ Very Severe)।

বলা বাহুল্য, প্রকৃত আরোহণকারীদের শৈলারোহণ এবং বরফারোহণ, তুষারারোহণ এই দুয়েতেই পারদর্শী হতে হয়।

উপরে সাজসরঞ্জামাদির যে তালিকা দেওয়া হয়েছে তা ছাড়াও শিলার আঘাত থেকে মাথা বাঁচাবার জন্য সেফটি হেলমেট দরকার। নাইলনের দড়িটি কম করে ১২০ ফুট দৈর্ঘ্যের এবং ১½ ইঞ্চি ঘনত্বের হওয়া দরকার। অবশ্য ঐ দৈর্ঘ্যের এবং ১⅛ ইঞ্চি ঘনত্বের দু'টি দড়ি নিলেও হয়। এ ছাড়া কয়েকটি পিটন হাতুড়ি নেওয়া দরকার। শৈলারোহণে পায়ের দক্ষ কাজের সাহায্যে নিরাপদ স্থান বেছে নিয়ে পা রাখতে হয়, শুধু তাই নয় 'বিলেয়িং' বা বিলে করা ছাড়া শৈলারোহণ বা বরফারোহণ হয় না বলে দড়ির 'নট' বা গ্রন্থি বাঁধা ভালো করে শিখতে হয়।

দড়ি ব্যবহার করে নিরাপদ জায়গায় থাকা এবং একে অপরকে আরোহণ করতে সাহায্য করাকে Belaying বা 'বিলে করা' বলা হয়। এই জন্যেই মোটা নাইলনের (বা পারলনের) দড়ি দরকার। দড়ি মজবুত অথচ হাল্কা হতে হবে। কোথাও কোথাও টেরিলিনের দড়ি ব্যবহার করা হয়েছে, তবে দেখা গেছে যে, উপকারিতার দিক থেকে টেরিলিনের দড়ি নাইলনের কাছে কিছুই নয়। গ্রন্থি (Knot) বহু ধরনের আছে—বোলাইন (Bowline), ওভার-হ্যাণ্ড, টারবাক্, ফিসারম্যান'স্, পেনবার্থি ইত্যাদি। এই বইয়ের স্বল্প পরিসরে সে সব সম্পর্কে আলোচনা করা গেল না।

আগেই বলা হয়েছে, বরফে এবং তুষারে যাতে ঠিকভাবে পা রেখে চলা যায় তার জন্যে বুটে ক্র্যাম্পন লাগিয়ে নিতে হয়। নামকরা প্রস্তুতকারকের ক্র্যাম্পন নিতে হয়—ক্যাম্পিন, চার্লেট, সিমণ্ড, গ্রিভেল, স্টুবাই এইসব প্রস্তুতকারকের নাম জগদ্বিখ্যাত। ক্র্যাম্পন দু'ধরনের—সাধারণ ক্র্যাম্পন যাতে ৮ বা ১০টি পয়েন্ট বা কাঁটা থাকে এবং 'লবস্টার ক্ল' ক্র্যাম্পন যাতে ১০ বা ১২টি কাঁটা থাকে। আজকাল অভিজ্ঞ পর্বতারোহীরা 'লবস্টার ক্ল' ক্র্যাম্পনই ব্যবহার করতে বলেন।

বরফকুঠার প্রয়োজন হয় বরফের উপর দিয়ে ধাপ কেটে কেটে ওঠবার জন্যে। কুঠার পছন্দ করা আরোহীর নিজস্ব উচ্চতার এবং যে ধরনের বরফারোহণ করা হবে তার উপর নির্ভর করে। আগে বড় বরফঠাকুর (প্রায়

৩২ ইঞ্চি) ব্যবহার করার কথা বলা হত, কিন্তু বর্তমানের প্রবণতা ছোট বরফকুঠারের দিকে। বরফকুঠার আবার তিন ধরনের। (১) সাধারণ ব্যবহারের জন্যে: এগুলি একটু লম্বা। ৫ ফুট ৮ ইঞ্চি থেকে ৬ ফুট উচ্চতার আরোহীদের জন্যে ২৭ থেকে ৩০ ইঞ্চি লম্বা; (২) খুব শক্ত বরফ কাটার জন্যে খুব ছোট বরফকুঠার এবং (৩) খুলে ফেলা যায় এরকম বরফকুঠার। সিমণ্ড এই ধরনের বরফকুঠার তৈরি করেছেন, যাতে (১) এবং (২)-এ বর্ণিত দুই কাজই চলে। অনেক সময় বরফকুঠারের মাথা অবধি বরফের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে নোঙরের মত দড়ি আটকাবার ব্যবস্থা করে বিলে করা হয়, কিন্তু এটা নিরাপদ নয়।

যে কোনো পর্বতারোহণ অভিযানে সাহস এবং ধৈর্যের সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে নিরাপদ রাখার প্রশ্নটাও এসে যাচ্ছে। সব সময়েই মনে রাখতে হবে যে, অবিমৃষ্যকারিতা বা হঠকারিতা কোনো কাজের কথা নয়। এই সূত্রে ব্রিটিশ মাউন্টেনিয়ারিং কাউন্সিল যে তালিকা প্রস্তুত করেছেন সেটি লক্ষ্যণীয় এবং এই তালিকা দিয়েই আমরা এই পরিচ্ছেদ শেষ করছি।

পর্বতের উপর নিরাপত্তা

১। আগে পরিকল্পনা করবে এবং কাজটি করবে ম্যাপ দেখে।

২। একলাফে অনেক কিছু করতে যাবে না। আস্তে আস্তে বড় জিনিসের দিকে এগোবে।

৩। অপরের সঙ্গে যাবে এবং সব সময় একত্রে থাকবে। অভিজ্ঞ না হলে অপরের দায়িত্ব নিতে যেও না; সে ক্ষেত্রেও দশ বা তার কম জনের।

৪। সবচেয়ে খারাপ অবস্থার বিরুদ্ধে প্রস্তুত থাকবে। ভালো জুতো পরবে, গরমের পোশাক, বায়ু-নিরোধক আবরণ, অতিরিক্ত পোশাক, সকলের খাদ্য, ম্যাপ, হুইশল, টর্চ, কম্পাস সঙ্গে রাখবে।

৫। সময় নিয়ে কাজ করবে এবং বেশির ভাগ সময়েই সহকারী হিসাবে অবিচলিতভাবে এগিয়ে যাবে। তাড়াহুড়ো করবে না, সময় নষ্টও করবে না।

৬। শিলা বা পাথর নীচে ফেলবে না বা স্থানচ্যুত করবে না।

৭। আবহাওয়ার দিকে নজর রাখবে। মাত্র কয়েক ঘণ্টাতেই আবহাওয়া

একেবারে বদলে যেতে পারে। যদি আবহাওয়া খারাপ হয় তাহলে বেপরোয়া-ভাবে এগিয়ে যাবে না। নেমে আসতেও ভয় করবে না।

৮। অভিজ্ঞ নেতা ছাড়া শৈলারোহণ, তুষারারোহণ বা বরফারোহণ করবে না।

৯। পথ হারিয়ে ফেললে আতঙ্কগ্রস্ত হবে না বা ছুটে নামতে যেও না। দল বেঁধে থাকবে এবং সকলে মিলে আলোচনা করে তোমাদের অবস্থান এবং নীচে নামার সর্বোত্তম পথ ঠিক করবে।

১০। তোমরা কোন্ পথ দিয়ে যাচ্ছ এবং কী রকম সময় নাগাদ ফিরে আসতে পারো সে বিষয়ে কিছু জানিয়ে রেখে যাবে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

প্রাথমিক চিকিৎসা

ঘরে-বাইরে (খেলার মাঠে তো বটেই) দুর্ঘটনা ঘটে, এবং ঘটবেও। এই সমস্ত ক্ষেত্রে সময়মত প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা দরকার এবং না করতে পারলে রোগীর অবস্থা দ্রুত খারাপের দিকে যেতে যেতে তার জীবন পর্যন্ত বিপন্ন হতে পারে। উপযুক্ত চিকিৎসা অর্থাৎ ডাক্তারের দ্বারা চিকিৎসা যতক্ষণ না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত চিকিৎসাকেই প্রাথমিক চিকিৎসা বা 'ফার্স্ট এড' (First aid) বলে। সম্ভবস্থলে টেলিফোনে বা লোক পাঠিয়ে ডাক্তারদের সঙ্গে যোগাযোগ করা উচিত এবং প্রাথমিক চিকিৎসার বিষয়েও তাঁদের উপদেশ নেওয়া উচিত। যেমন—কীভাবে রক্ত বন্ধ করা যাবে বা রোগীকে বয়ে নিয়ে যেতে হবে বা রোগী স্নায়বিক সংঘাত পেলে কী করতে হবে, ইত্যাদি বিষয়ে ডাক্তারের পরামর্শ না নিয়ে আনাড়ী বা সবজান্তা ধরনের লোক নিজের কৃতিত্ব জাহির করতে গিয়ে হিতে বিপরীত ঘটাতে পারে। কাজেই প্রাথমিক চিকিৎসার বিষয়ে নিজের ওজন বুঝে চলা উচিত, এতে লজ্জার কিছুই নেই। 'আমি নিজে ডাক্তার নই' এ-কথা সব সময়েই মনে রাখা দরকার।

আর একটা কথা। একজন রোগী মৃত এ সম্পর্কে নিঃসন্দেহ না হওয়া পর্যন্ত চিকিৎসা চালিয়ে যাওয়া দরকার; সাধারণ লোকের কাছে অজ্ঞান লোককেও অনেক সময় মৃত মনে হতে পারে। যদিও হৃৎপিণ্ডের শব্দ শুনে বা

নাড়ী 'দেখে' এটা অনেক সময় ধরা যায়, তবুও সন্দেহ থাকলেই রোগীকে জীবিত বলে ধরে নিয়েই চিকিৎসা চালিয়ে যেতে হবে।

নীচে খুব সংক্ষেপে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কয়েকটি প্রাথমিক চিকিৎসার কথা বলা হল—

১। **কেটে গেলে বা ছড়ে গেলে :** কাটা জায়গাটি যদি পরিষ্কার থাকে, সামান্য টিংচার আয়োডিন বা স্পিরিট ঐ জায়গায় লাগিয়ে তার ওপর এক খণ্ড পরিষ্কার পাতলা স্বচ্ছ কাপড় দিতে হবে এবং ব্যাণ্ডেজ বা অ্যাডহেসিভ টেপ লাগিয়ে কাপড়টিকে যথাস্থানে আটকে রাখতে হবে। একটু তুলোকে সামান্য পাতলা করে নিয়ে টিংচার বেঞ্জিনে ডুবিয়ে ভিজিয়ে নিয়ে ক্ষতস্থানে আটকে রাখা যেতেও পারে।

ক্ষত বেশি এবং গভীর হলে ক্ষতস্থানটিকে পরিষ্কার করে একটি পরিষ্কার, পাতলা ও স্বচ্ছ কাপড়ের পটি এবং ব্যাণ্ডেজের সাহায্যে বেঁধে রেখে চিকিৎসককে খবর দেওয়া উচিত।

ক্ষতস্থানে যদি ময়লা লাগে পরিষ্কার, 'স্টেরাইল গজ্' দিয়ে সেটিকে প্রথমে ঢাকতে হবে এবং ক্ষতের চারদিকেও পরিষ্কার করতে হবে। মাথায় আঘাত লাগলে ক্ষতের চারদিকের কিছুটা চুলও ছেঁটে ফেলতে হবে। তারপর ক্ষত-স্থানটিকে সাবান এবং গরম জল দিয়ে ভালো করে ধুয়ে ফেলে তাতে টিংচার আয়োডিন লাগিয়ে সেটিকে পাতলা, স্বচ্ছ কাপড়ের পটি দিয়ে বাঁধতে হবে। ময়লা ক্ষতের ক্ষেত্রে টিটেনাস হবার সম্ভাবনা যথেষ্টই থাকে, কাজেই ডাক্তারের সাহায্যে উপযুক্ত ইঞ্জেকশনের ব্যবস্থা করা অবশ্যই কর্তব্য।

কালশিরা পড়লে, যেমন দরজার পাল্লায় আঙুল আটকে চেপে গেলে কিংবা ঘুঁষির আঘাতে চোখে কালশিরা পড়লে আহত অংশে ঠাণ্ডা জলের কম্প্রেস করতে হবে।

২। **রক্তপাত হলে :** রক্তপাত জালক থেকে হতে পারে, ধমনী থেকেও হতে পারে, আবার শিরা থেকে হতে পারে। জালক থেকে রক্তপাত হলে রক্ত উজ্জ্বল লাল রঙের হয় এবং ফোঁটা ফোঁটা করে ঝরে ; এস্থলে রক্ত বন্ধ করতে হলে 'স্টেরাইল গজ্' দিয়ে ক্ষত স্থানটিকে ঢেকে শক্ত করে ব্যাণ্ডেজ বাঁধতে হবে।

ধমনী থেকে রক্ত বেরোলে রক্তের রঙ উজ্জ্বল লাল হয় এবং প্রবল বেগে রক্ত বেরিয়ে আসে। এরকম হলে রক্তক্ষরণের জায়গাটি বুড়ো আঙুল দিয়ে

জোরে চেপে ধরা উচিত; ক্ষতে অন্য কিছু বাইরের জিনিস ঢুকলে ঠিক ক্ষতস্থানটি চেপে না ধরে ধমনীর উপরের অংশে চাপ অঞ্চলে (Pressure point) নীচে হাড় আছে এমন জায়গায় চেপে ধরা উচিত। অত্যধিক রক্তপাত হলে সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার ডাকার ব্যবস্থা করা উচিত। মনে রাখতে হবে ধমনী ছিঁড়ে গেলে কোনো লোকের দু'টি মিনিটের মধ্যেই মৃত্যু হতে পারে, কাজেই দ্রুততম চিকিৎসার ব্যবস্থা হওয়া দরকার। রক্তপাত বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত চা বা কফি বা অনুরূপ উত্তেজক পদার্থ রোগীকে দেওয়া উচিত নয়। অবশ্য সে তৃষ্ণার্ত হলে তাকে দু'এক চুমুক মাত্র জল দেওয়া যেতে পারে।

শিরা থেকে রক্তপাত হলে রক্তের রঙ কাল্চে লাল হয় এবং রক্ত আস্তে কিন্তু অবিরাম গতিতে বেরিয়ে আসে। এক্ষেত্রে সম্ভব হলে আহত অঙ্গটি দেহের বাকি অংশ থেকে উপরে তুলে রাখতে হবে এবং ক্ষতস্থান থেকে দূরে শিরা চেপে ধরে রক্ত বন্ধ করতে হবে। নাক দিয়ে রক্ত পড়লে রক্তপাত বন্ধ করতে হলে রোগীকে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে মাথা পিছন দিকে হেলিয়ে মুখ হাঁ করে মুখের ভিতর দিয়ে শ্বাসকার্য চালাতে বলতে হবে এবং নাক টানতে নিষেধ করতে হবে। এই সময় রোগীর নাকে, কপালে এবং ঘাড়ের পিছনে আইস ব্যাগ বা বরফ বা ভিজে রুমাল চাপা দিতে হবে।

৩। **মচ্‌কে গেলে:** হঠাৎ হাত বা পায়ের গাঁট মুচড়ে বা দুমড়ে গেলে জায়গাটি মচ্‌কে যায়। হাঁটু বা গোড়ালিতে এরকম প্রায়ই হয়। এর ফলে যে সন্ধিবন্ধনীগুলি হাড়গুলিকে একত্রে ধরে রাখে (ligaments) সেগুলি সরে যায় বা ছিঁড়ে যায়, ফলে গাঁট ফুলে যায় ও খুব ব্যথা হয়। এ রকম হলে রোগীকে হাঁটাহাঁটি করতে কিংবা পায়ের ওপর কোনো ভার নিতে দেওয়া উচিত নয় এবং আহত অংশে ঠাণ্ডা কম্প্রেস করা উচিত। এছাড়া শক্ত করে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে গাঁটটি ঠিক করা উচিত। দরকার হলে 'চটা' বা স্প্লিণ্ট (splint) ব্যবহার করতে হবে।

৪। **হাড় ভেঙে গেলে:** হাত বা পায়ের হাড় ভেঙে গেলে আহত স্থানের ফোলা এবং বেদনা থেকেই বলে দেওয়া যায় কোথায় কোন্ হাড় ভেঙেছে। কখনও বা অঙ্গটি অস্বাভাবিকভাবে বেঁকে যায়। এসব ক্ষেত্রে সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারকে ডাকা উচিত। আহত অঙ্গটিকে একেবারে নাড়াচাড়া করা উচিত নয়। যদি রোগীকে স্থানান্তরিত করা খুব দরকার হয়ে পড়ে তা

হলে শক্ত কোনো কিছুর সাহায্যে (যেমন সরু বোর্ড, লাঠি, ছড়ি) অঙ্গটি বেঁধে ফেলতেই হবে, একেই চটী (splint) বলে। যে জিনিসটিকে চটী রূপে ব্যবহার করা হচ্ছে সেটি যথেষ্ট লম্বা হওয়া দরকার, তা হলে সেটা আহত অঙ্গের উপর ও নীচে ভেঙে যাওয়া জায়গার বাইরে গিয়ে পৌছাতে পারবে। সম্ভব হলে আহত অঙ্গের দু'ধারেই চটী লাগাতে হবে। কিন্তু দেখতে হবে চটী বাঁধা যেন এত শক্ত না হয় যাতে রক্তসঞ্চালন ক্রিয়া বন্ধ হয় কিংবা ফোলা জায়গায় চাপ লাগে।

হঠাৎ পড়ে গিয়ে কণ্ঠাস্থিও ভেঙে যেতে পারে। এক্ষেত্রে কোনো চটীর দরকার হবে না। যেদিকের কণ্ঠাস্থি ভেঙেছে সেদিকের হাত বেঁকিয়ে বুকের সঙ্গে আড়াআড়িভাবে তুলে ধরতে হবে এবং ঝুলনায় (Arm sling) রাখতে হবে।

৫। **আগুনে পুড়ে গেলে:** হঠাৎ আগুনে পুড়ে বা গরম জলের ভাপ লেগে ঝলসে কারও দেহের চামড়া লাল রঙের হয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে পোড়া জায়গায় ভেসলিনের মত কোন চর্বিজাতীয় জিনিস লাগিয়ে বা স্যাভলন, সেটাভলন, বার্নল জাতীয় কোনো অ্যান্টিসেপ্টিক ক্রীম লাগিয়ে আলতো করে ব্যাণ্ডেজ বাঁধতে হবে, এতে পোড়ার জ্বালা খানিকটা কমবে।

যদি কোনো ব্যক্তির পোশাকে আগুন ধরে যায় তা হলে সেই ব্যক্তিকে তাড়াতাড়ি কম্বল বা কার্পেট ইত্যাদির সাহায্য মুড়ে আগুন নেভাতে হবে।

গুরুতরভাবে পুড়ে গিয়ে ফোস্কা পড়লে বা মাংস কয়লার মত কালো হয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার ডাকতে হবে এবং 'শক্'-এর প্রতিরোধ ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। ফোস্কাগুলি 'গেলে দেওয়া' উচিত নয়।

৬। **জলে-ডোবা ব্যক্তিকে উদ্ধার করা হলে:** জলে-ডোবা ব্যক্তির মুখ এবং গলা পরিষ্কার করতে হবে যাতে জলের সঙ্গে কোনো জিনিস ঢুকলে তা বেরিয়ে যায়। কিন্তু সব চেয়ে বড় দরকার হল জলে-ডোবার জন্যে শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ বন্ধ হয়ে গেলে কৃত্রিম উপায়ে সেই ব্যক্তির শ্বাসকার্য আবার চালানো। সে অবস্থায় রোগীকে বুকের উপর উপুড় করে শুইয়ে তার দেহের ভেতর থেকে চাপ দিয়ে বায়ু বার করে পুনরায় বায়ু ঢোকার ব্যবস্থা করতে হবে।

(ক) জল থেকে তুলে আনার অব্যবহিত পরেই রোগীকে উপুড় করে শোয়াতে হবে। তার একটা বাহু থাকবে ছড়ানো, আর মুখ থাকবে আর এক

বাহুর উপর রাখা অবস্থায় একদিকে ফেরানো। রোগীর এক পাশে হাঁটু গেড়ে বসতে হবে। যে প্রাথমিক চিকিৎসা করছে তার মুখ রোগীর মাথার দিকে থাকবে।

(খ) এইবার হাত দুটি রোগীর পিঠের সরু অংশের দু'দিকে রাখতে হবে ; হাতের আঙুল থাকবে পাঁজরের সবচেয়ে নীচের হাড়ের উপর।

(গ) হাত দুটি সোজা রেখে সামনের দিকে ঝুঁকে পাঁজরের উপর দৃঢ়ভাবে নিম্নচাপ দিতে হবে। এইভাবে মাটির সঙ্গে চাপ দিলে রোগীর বুকের ভিতরকার বায়ু বেরিয়ে আসবে।

(ঘ) তার ২ সেকেণ্ড পরে (প্রাথমিক চিকিৎসকের) দেহ পিছন দিকে হেলিয়ে হাতের চাপ শিথিল করতে হবে, কিন্তু হাত যেন সরে না যায়।

এইভাবে মিনিটে ১৬।১৮ বার সামনে ও পিছনে পর্যায়ক্রমে রোগীকে মাটির সঙ্গে চাপ দিতে এবং হাত শিথিল করতে হবে যতক্ষণ না রোগী নিজেই প্রশ্বাস গ্রহণ ও নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে পারে। এরপর রোগীর ভিজে কাপড়গুলি বদলে দিতে হবে, তোয়ালে দিয়ে তার দেহ শুকনো করে তাকে কম্বল দিয়ে জড়িয়ে দিতে হবে। যখন রোগীর কিছু খেতে পারার মত অবস্থা হবে তখন তাকে চা বা কফিজাতীয় উত্তেজক পানীয় দিতে পারা যাবে।

৭। **মূর্চ্ছা গেলে :** রোগী মূর্চ্ছিত হয়ে চেহারা ফিকে হয়ে গেলে তার মাথাটি দুই হাঁটুর মধ্যে নামিয়ে দিতে হবে এবং সুবিধা থাকলে পা দুটি উঁচু করে তুলে ধরতে হবে। পোশাক আঁট থাকলে আলগা করে দিতে হবে। দেখতে হবে যেন রোগী টাটকা বাতাস যথেষ্ট পরিমাণে পায়, রোগীর চারদিকে যেন ভিড় হয়ে না যায়। স্মেলিং সল্ট বা রুমালে অ্যামোনিয়া ভিজিয়ে কিংবা পেঁয়াজ থেঁতো করে নাকের সামনে ধরতে এবং মুখে ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা দিতে হবে কিন্তু রোগীর জ্ঞান না ফেরা পর্যন্ত কিছু খাওয়ানোর চেষ্টা করা উচিত নয়। জ্ঞান ফিরলে চা চামচের আধ চামচ অ্যামোনিয়া জলে ভালো করে মিশিয়ে বা গরম চা বা চিনি ও দুধ-ছাড়া কফি ('ব্ল্যাক কফি') দেওয়া যেতে পারে।

৮। **বৈদ্যুতিক শক্ পেলে :** বৈদ্যুতিক তার বা পোস্ট ছুঁয়ে অনেক লোক ধাক্কা খেয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে ; রোগীকে সঙ্গে সঙ্গে ঐ তার বা পোস্ট থেকে বিচ্ছিন্ন করতে হবে (এবং এ কাজ যে করবে তার নিজের খুব সতর্ক হওয়া দরকার)। সঙ্গে সঙ্গে সুইচ বন্ধ করতে হবে, সে সুযোগ না থাকলে তার টান মেরে ছিঁড়ে ফেলে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করতে হবে ; (কোনো রকম লোহার

ছুরি-কাঁচি ইত্যাদি দিয়ে তার কাটতে গেলে মূর্খতা হবে।) অন্যথায় কাঁচ কিংবা একেবারে শুকনো কাঠের উপর দাঁড়িয়ে রোগীকে ছুঁতে হবে, রাবারের দস্তানা হাতে পরে নিতে পারলে ভালো হয়।

রোগীকে টেনে সরিয়ে আনার পর কৃত্রিম উপায়ে তার শ্বাস-প্রশ্বাস ফিরিয়ে আনার দরকার হতে পারে। জলে-ডোবা ব্যক্তির সম্পর্কে যে ব্যবস্থা, এক্ষেত্রেও সেই একই ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে।

৯। **বিষক্রিয়া ঘটলে :** বিষাক্ত গ্যাসে বা বিষ মুখ দিয়ে গিলে খেলে বা ইঞ্জেকশন নিলে বিষক্রিয়া ঘটে। বিষাক্ত গ্যাস, যেমন মোটরের ধোঁয়া, উনানের গ্যাস, স্টোভের গ্যাস শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে ফুসফুসের মধ্যে গেলে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। রোগী অজ্ঞান হয়ে পড়ে ও শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়। মুখ দিয়ে বিষ গিলে খেলে পাকস্থলীতে বিষ যখন ঢোকে তখন হেঁচকি ওঠে, গা বমি বমি করে, পেট খারাপ হয়। মুখ দিয়ে বিষ খেলে সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার আনতে পাঠাতে হবে। খাওয়া বিষের অবশিষ্ট অংশ পাওয়া গেলে খুব ভালো হয়, কারণ কোন্ ধরনের বিষ খেয়েছে—জানা যাবে এবং সেইভাবে চিকিৎসার সাহায্য নেওয়া যাবে। অ্যাসিড, অ্যালকালি বা কেরোসিনজনিত বিষক্রিয়া ছাড়া অন্যান্য সব ক্ষেত্রে রোগীকে বমি করাতে হবে—একগ্লাস জলে দু'চামচ নুন দিয়ে রোগীকে পান করতে দিতে হবে, তাতে যদি বমি না হয় তবে গলায় আঙুল দিয়ে বমি করাতে হবে; রোগী অচৈতন্য থাকলে বমি করানোর চেষ্টা করা উচিত নয়; ঠোঁট, মুখ ও গা পুড়ে গেলেও বমি করানো উচিত নয়। এক্ষেত্রে বিষঘ্ন ওষুধ ব্যবহার করে বিষের ক্ষমতাকে নিষ্ক্রিয় করতে হয়। যেমন, অ্যাসিড খেলে খাবার সোডা বা চুনজাতীয় জিনিস কিংবা মিল্ক অব ম্যাগনেসিয়া দেওয়া যেতে পারে। রোগীর তন্দ্রার ভাব থাকলে তাকে যেন ঘুমোতে দেওয়া না হয়। গরম দুধ, চা ইত্যাদি দেওয়া যেতে পারে।

১০। **সাপে কামড়ালে :** সমস্ত সাপ বিষধর নয়। বিষধর সাপ কামড়ালে সেই জায়গায় প্রায় ২.৫ সেন্টিমিটার তফাতে দুটি ছোট ক্ষতচিহ্ন দেখা যায়। সাপ দেখতে পাওয়া গেলে প্রতিষেধক সেরাম বা 'অ্যান্টি-ভেনম' সেরাম ক্ষতস্থানে লাগাতে হবে। অবশ্য যাঁরা ঐ সেরাম ব্যবহারে পটু তাঁরাই তা ব্যবহার করবেন। যাতে বিষ ছড়িয়ে পড়তে না পারে সে জন্য ক্ষতস্থানের দু'দিকে শক্ত করে দড়ি দিয়ে বেঁধে দিতে হবে এবং আধঘন্টা পরে আলগা করে দিতে হবে মাত্র আধ মিনিটের জন্যে। অবশ্য 'অ্যান্টি-ভেনম'

যদি পাওয়া যায়। তিন ঘণ্টা ঐ রকম বাঁধা অবস্থায় থাকার পর যদি কোনো বিপদের আশঙ্কা না দেখা যায় (এই সময়ের মধ্যে ডাক্তার বা হাসপাতালের ব্যবস্থা হয়ে যাবে, আশা করা যায়) বাঁধন খুলে দিয়ে ক্ষতস্থান পটাস পারমাঙ্গানেটের জল দিয়ে ধুয়ে দিতে হবে। তার পর ব্লেড বা ধারালো ছুরি (আগুনে পুড়িয়ে) দিয়ে ক্ষতস্থানটি চিরে দিতে হবে এবং চিকিৎসকের সাহায্য নিতে হবে।

অবশ্য যখন কোনো ব্যবস্থাই কার্যকরী হয না তখন কামড়ানো জায়গা থেকে বিষ চুষে ফেলে দিতে হবে। কিন্তু এই ব্যবস্থায় যে চুষবে সে অভিজ্ঞ না হলে তাব বিপদ ঘটতে পাবে। সেজন্যে সম্ভবমত একটা সরু রবার বা পলিথিনের শীটের মধ্য দিয়ে বিষ চুষতে হয়।

১১। **কুকুরে কামড়ালে:** জন্তুটিকে ভালোভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। জলাতঙ্ক বোগগ্রস্ত কুকুর ১১ দিনেব মধ্যে মাবা যায। কাজেই এই সময়ের মধ্যে জলাতঙ্কেব চিহ্ন না দেখা দিলে বা কুকুবটি বেঁচে থাকলে কামড়-খাওয়া ব্যক্তিব বিপদেব আশঙ্কা কমে যায়।

এর চিকিৎসা যতদূব সম্ভব ডাক্তাব ডাকিয়ে করা উচিত। যেখানে আঁচড়েছে বা কামড়েছে সেখান থেকে কিছুটা রক্ত বেবিযে যেতে দিয়ে তাবপর জায়গাটি সাবান দিয়ে ধুয়ে ফেলা উচিত। বিশুদ্ধ কার্বলিক অ্যাসিড বা উগ্র নাইট্রিক অ্যাসিডে ক্ষতস্থানটি পুড়িয়ে ফেলা উচিত। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে।

সমাজসেবা ও বিদ্যালয়কৃতি

শিক্ষার্থীর মন যদি সমাজমুখী ও পারস্পরিক সহযোগিতায় বিশ্বাসী না হয়, তা হলে তথাকথিত উচ্চশিক্ষা—যেটা মস্তিষ্কের চর্চা করে অনেকেই পেতে পারে (এবং পায়ও) মূল্যহীন হয়ে যায় না কি? কর্মশিক্ষা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আমরা যে প্রশ্ন তুলেছিলাম, এখানেও ঠিক সেই প্রশ্নটিই এসে যাচ্ছে—রাম বা শ্যাম বা যদু বা মধু কেউ ব্যক্তিগতভাবে এম. এ., পি. এইচ. ডি., পি. আর. এস., ডি. লিট. হয়ে গেল, কিন্তু তাতে সমাজ নামক জনসমষ্টির কী লাভ বা উন্নতি হল? সমাজকে সে কিছু দিচ্ছে কি?

সুতরাং, যা প্রয়োজন, তা হল বিদ্যালয়ের সঙ্গে সমাজের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন। এতদিন বিদ্যালয় ও সমাজের মধ্যে কোনও যোগসূত্রই ছিল না। বুনিয়াদী (Basic) শিক্ষানীতির অন্যতম মূল্যবান নির্দেশ হল এই যোগসূত্র স্থাপন।

"বুনিয়াদী শিক্ষা বিদ্যালয়কে একটি ছোট-খাট সমাজে পরিণত করতে চায়। সমাজে যেমন বিভিন্ন লোকের উপর বিভিন্ন কাজের ভার থাকে, বিদ্যালয়েও ছাত্ররা দৈনন্দিন কাজের ভার নিজেদের মধ্যে বণ্টন করে নেবে। বিদ্যালয়ের বাইরে শিক্ষক ও ছাত্র মিলে স্থানীয় সমাজের কল্যাণমূলক কাজের ভার নেবে।......**বিদ্যালয়ের সামুদায়িক জীবন পরিচালনা** এবং **সমাজ-কল্যাণমূলক কাজে অংশ গ্রহণ** করলে শিশুর দায়িত্ব বাড়বে, সমাজে যৌথ জীবনযাত্রা সম্বন্ধে তারা জ্ঞানলাভ করবে। সেই সঙ্গে শিশুদের মধ্যে **আত্মনির্ভরতা, সহযোগিতা, শ্রমের মর্যাদাবোধ** ইত্যাদি গুণের বিকাশ সাধন ক'রে বুনিয়াদী শিক্ষা একটি প্রগতিশীল সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে সহায়তা করবে।"

উপরের দীর্ঘ উদ্ধৃতিটি থেকেই বুঝতে পারা যায় যে, নবম ও দশম শ্রেণীর পাঠ্যসূচীতে যে **Social Service and School Performance** বা "সমাজসেবা এবং বিদ্যালয়কৃতি"-র কথা বলা হয়েছে (যার জন্যে ২০ নম্বর আছে) তা পুরোপুরি বুনিয়াদী শিক্ষানীতিকে অনুসরণ করেই রাখা হয়েছে। এর মধ্যে দুটো দিক আছে: প্রথমতঃ, সমাজকল্যাণ বা সমাজসেবা (Social

Service) এবং দ্বিতীয়তঃ, বিদ্যালয়ের সামুদায়িক বা যৌথজীবন পরিচালনায় অংশ গ্রহণ (School performance)। দুটিতেই দশ করে নম্বর ধরা আছে।

কিন্তু এটা ভাবা হাস্যকর হবে যে, এই কুড়ি নম্বরের 'উত্তর করা যাবে এই বইখানি থেকে।' না, তা যায় না। যেমন যাবে না বাকী ৮০ নম্বরের অর্থাৎ শারীর-শিক্ষা ও কর্মশিক্ষার উত্তর করা। ছাত্রছাত্রীরা নিজেরাই খেলাধূলা করবে, বিভিন্ন কর্মকেন্দ্র দেখে আসবে, বা কর্ম-সমস্যা (project) নিয়ে নিজেদের ব্যস্ত রাখবে, বা বিদ্যালয়ের গণ্ডীর মধ্যে কিংবা বাইরে থেকে সমাজশিক্ষামূলক কাজে অংশ নেবে—সব সময়েই প্রথমে শিক্ষক তাদের দেখিয়ে দেবেন এবং পরে তারা শিক্ষকের সাহায্য ছাড়াই করবে—এইভাবে কাজ করতে করতে তারা প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হলেই তাদের তথা সমাজের লাভ। কথায় বলে, "Practice makes a man perfect"—কাজ করতে করতেই লোকে পাকা হয়। আমাদের বাংলা ভাষায়ও লঘুভাবে বলা হয়, "কচুগাছ কাটতে কাটতেই ডাকাত হয়"! সুতরাং **পড়ার চেয়ে করার উপরেই, লেখার চেয়ে দেখা এবং শেখার উপরেই এই নতুন শিক্ষণীয় বিষয়ের জোর।** অর্থাৎ এখানে ছাত্র-ছাত্রীর ভূমিকাই মুখ্য, নেপথ্যে সাহায্য বা সংশোধনের জন্যে সব সময়েই শিক্ষক বা শিক্ষিকা থাকবেন, বইয়ের ভূমিকা নগণ্য না হলেও গৌণ। 'এই বই থেকে সব উত্তর করা যাবে' মনে করলে এই নূতন বিষয়টির উপরেই অবিচার করা হবে।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রাকালে প্রকাশিত The First Five-Year Plan গ্রন্থে (৫৪২—৩ পৃষ্ঠা) বলা হয়েছে—"Social education implies an all-comprehensive programme of community uplift through community action. External aid may be there but only to stimulate and not to replace, community effort". অর্থাৎ "সমাজশিক্ষা বলতে বোঝাচ্ছে সমাজক্রিয়ার মাধ্যমে সমাজ-উন্নয়নের এক সর্বব্যাপক কর্মসূচী। এতে বাইরের শক্তির সাহায্য থাকলেও থাকতে পারে কিন্তু তা যৌথ প্রচেষ্টাকে শক্তিশালী করবার জন্যে, তাকে অপসারিত করবার জন্যে নয়।" এর গুরুত্ব কী? সে-সম্পর্কে বলা হচ্ছে—"It should not only make our limited resources more effective, but also build up a self-reliant nation." ("এতে যে শুধু আমাদের সীমিত সম্পদের অধিকতর কার্যকর ব্যবহার হবে তাই নয়, একটা স্বয়ং-নির্ভর জাতিও গঠিত হবে।")

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় যে সমাজ-শিক্ষার কথা বলা হয়েছে তা অবশ্য সর্বসাধারণের জন্যে—শুধু ছাত্রদের জন্যে নয়। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ নতুন মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থার পাঠক্রমে যে সমাজশিক্ষার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন তার কথাও এই একই—সকলের কাজ সকলে মিলেই করে নেওয়া। কথায় বলে "দশে মিলি করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ।"*

তাহলে সমাজ-শিক্ষার দু'টি দিক হল:

(১) **সমাজসেবা বা সমাজকল্যাণমূলক কাজ**;

(২) **বিদ্যালয়কৃতি বা বিদ্যালয়ের সামুদায়িক জীবন পরিচালনা।**

নীচে পাঠ্যতালিকা অনুযায়ী এদেব বিষয়ে পৃথকভাবে আলোচনা করা হল।

সমাজসেবামূলক কাজ

অর্থনীতি বা Economics-এ শ্রমবিভাগ (Division of labour) বলে একটি কথা আছে, যাব মোটামুটি অর্থ হল একটি কাজকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে নিয়ে কাজের যে-অংশ সম্পর্কে যার দক্ষতা আছে সেই অংশের দায়িত্ব তাকে দেওয়া।

অর্থনীতিতে অবশ্য ব্যাপারটি ঘটে কোনও দ্রব্যের উৎপাদন সম্পর্কে। কিন্তু শুধু দ্রব্যের উৎপাদন বিষয়েই নয়, সমাজের সর্বক্ষেত্রেই এই নীতিই অনুসরণ করা হয়ে থাকে, কোথাও প্রকাশ্যে কোথাও বা প্রচ্ছন্নভাবে। একটা কাজ সবাই মিলে ভাগ করে নিয়ে কাজের যে-দিকে যে পটু সে সেই দিক নিয়েই ব্যস্ত থাকে।

সমাজসেবাব দিক থেকেও এই কর্মবিভাগ বা শ্রমবিভাগের সার্থকতা আছে। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের নির্দেশ অনুযায়ী নবম ও দশম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরা সমাজকল্যাণমূলক কাজ করার জন্যে ৫টি দলে নিজেদের বিভক্ত করে নেবে—**(১) সেবা-শুশ্রূষা সংক্রান্ত দল বা, সংক্ষেপে, সেবা দল (Nursing unit) (২) প্রাথমিক চিকিৎসা দল (First Aid squad) (৩) সাফাই দল ("Keep the Area Clean" squad) (৪) নিরক্ষরতা দূরীকরণ**

---

* মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন (মুদালিয়র কমিশন) এর গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন—"...students will take an active part in various forms of social service for the good of the community and the school will not only inculcate the ideals and desire for social service but also provide opportunities and the necessary material facilities." (Report : Pp. 215)

দল (**'Teach the Unlettered' squad**) (৫) (**বিভিন্ন দিবস**) **উদ্‌যাপন দল** (**Observance group**)।

প্রত্যেক দলের নেতৃত্ব যে ছাত্রের বা ছাত্রীর উপর থাকবে তাকে সেই সংক্রান্ত 'মন্ত্রী' বলা যেতে পারে। অবশ্য এক এক করে সকলকেই এই দায়িত্ব নিতে হবে। কোন্ ছাত্র বা ছাত্রী কোন্ দলের হয়ে কাজ করবে সেটা তার ইচ্ছা এবং/অথবা প্রবণতা লক্ষ্য করে শিক্ষক বা শিক্ষিকাই স্থির করে দেবেন ; তবে প্রত্যেকটি ছাত্র-ছাত্রীকে কোনও না কোনও দলে থাকতেই হবে, তার কাজটা অন্যে করে দেবে না।

এবার দেখা যাক কোন্ দলের কাজ কী হতে পারে—

(১) **সেবা দল**ঃ সেবা দলের কাজ হবে গ্রামে বা শহরে কারও সেবা-শুশ্রূষার প্রয়োজন হলে তার ব্যবস্থা করা। বলা বাহুল্য, এটা প্রয়োজন হবে সেখানেই যেখানে অসুস্থ ব্যক্তিটির বাড়িতে লোকবল কম বা দেখাশোনা করার কেউ নেই।

যারা সেবা-শুশ্রূষা করবে তারাও নিজেদের মধ্যে রুটিন করে নিয়ে কে কখন রোগীর ঘরে থাকবে তা ঠিক করে নেবে। কাজ ভাগ করে দেবে সেবামন্ত্রী।

রোগীর ঘরটিতে যাতে উপযুক্ত পরিমাণে আলো, বাতাস, রোদ আসতে পারে, সেখানে যাতে জিনিসপত্র যথাসম্ভব কম থাকে এবং একটা নির্দিষ্ট সময় অন্তর যাতে ফিনাইল জল দিয়ে ঘর ধুয়ে বা মুছে ফেলা হয়, যাতে বাইরে থেকে জুতো পরে কেউ রোগীর ঘরে না আসে—এই সমস্ত দিকেই লক্ষ্য রাখা শুশ্রূষা-কারীর কর্তব্য। রোগীর পরিবেশের এই মূল প্রয়োজনগুলিব কথা বাদ দিলে স্বয়ং রোগীকে নিয়েই শুশ্রূষাকারীর আসল কাজ। রোগীকে ঠিক সময়ে খাওয়ানো, ওষুধ দেওয়া, তার জ্বর পরীক্ষা করা, জ্বরের একটি চার্ট তৈরী রাখা, মলমূত্রাদি ত্যাগে সাহায্য করা, এবং চিকিৎসক এলে তাঁর কাছে রোগী-সংক্রান্ত বিবরণ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেওয়া—এ সমস্ত কাজই শুশ্রূষাকারীকে অত্যন্ত ধৈর্য এবং নিষ্ঠার সঙ্গে করে যেতে হবে। ঘড়ি, থার্মোমিটার, একটি ছোট খাতা, পেন ও পিক্‌দানী—এগুলি রোগীর ঘরে থাকবেই। পিক্‌দানিটি যেন যথাসম্ভব রোগীর নাগালের মধ্যে থাকে। এ ছাড়া রোগীর ব্যবহারের জন্যে একটি কুঁজো ও গ্লাস রেখে দেওয়া দরকার। শুশ্রূষাকারীর সব সময় স্মরণ রাখা দরকার যেন চিকিৎসকের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালিত হয়, এবং তার বাইরে যেন সে

কিছু করতে না যায়। বিশেষ প্রয়োজন হলে লোক পাঠিয়ে বা সম্ভবক্ষেত্রে টেলিফোনে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

আর একটা কথা মনে রাখা দরকার। রোগীকে যতটা সম্ভব শান্তিতে থাকতে দেওয়া উচিত, তার ঘরে কোনওরকম গোলমাল যেন না হয়। রোগী নিজে না চাইলে ঘরে রেডিও চালানো উচিত নয়। রোগীর সামনের বা পাশের বাড়ীতে যদি কেউ জোরে রেডিও বা অ্যামপ্লিফায়ার চালিয়ে দায়িত্ব-জ্ঞানহীনতার পরিচয় দেয়, তাহলে সেবা দলের উচিত হবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নিবৃত্ত করা।

(২) প্রাথমিক চিকিৎসা দল ঃ বিদ্যালয়েই হোক বা ছাত্র-ছাত্রীদের বাসগৃহের কাছেই হোক, আকস্মিক দুর্ঘটনা প্রায়ই ঘটতে দেখা যায়। খেলতে গিয়ে কারো হাত-পা ভেঙে যেতে পারে, কেউ কোনও ভাবে হাত কেটে ফেলতে পারে, কেউ জলে ডুবতে পারে বা বিষ খেতে পারে—এসব ক্ষেত্রে প্রাথমিক চিকিৎসা একান্ত প্রয়োজন। এখানে আমরা প্রাথমিক চিকিৎসার পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করছি না (সে-সম্পর্কে খেলাধূলা অংশে আগেই অনেক কিছু বলা হয়েছে); প্রাথমিক চিকিৎসা অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তার কথা বলছি। এই অনুশীলনের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীরা স্বাস্থ্য সম্পর্কে ব্যবহারিক জ্ঞান লাভ করবে—শারীরবৃত্ত, জীবতত্ত্ব সম্বন্ধে তারা কার্যকরী, স্থায়ী জ্ঞান লাভ করবে। তা ছাড়া, প্রত্যেকটি ছাত্র-ছাত্রীর মনে জাগবে সেবা-শুশ্রূষার নতুন প্রেরণা, অপরের দুঃখ-কষ্টে সে সমবেদনা দেখাতে শিখবে।

বলা বাহুল্য, সেবা-শুশ্রূষাই হোক আর প্রাথমিক চিকিৎসাই হোক—পূর্বশিক্ষা ছাত্র-ছাত্রীদের প্রয়োজন। পূর্বশিক্ষা ছাড়া এ-সব কাজ করা যায় না। করতে গেলে অনেক সময় হিতে বিপরীত হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, জলে-ডোবা ব্যক্তিকে জল থেকে তোলার পর মাথার জল বার করে দেবার সঠিক পদ্ধতি প্রয়োগ না করতে পারলে ব্যক্তিটিকে বাঁচানো যাবে না। সুতরাং এগুলি আগে শেখা দরকার। এবং এই শিক্ষা দেবেন শারীর-শিক্ষক (যাঁর এ-বিষয়ে শিক্ষা ও দক্ষতা অবশ্যই আছে) কিংবা অন্য কোনও উপযুক্ত-ভাবে শিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তি। প্রাথমিক চিকিৎসার সরঞ্জাম (First Aid Box) রাখা এবং সেণ্ট জন অ্যাম্বুলেন্স কর্তৃক প্রকাশিত প্রাথমিক চিকিৎসার বইটি ভালো করে পড়ে নেওয়া শুধু প্রাথমিক চিকিৎসা দলেরই নয়, সব ছাত্র-ছাত্রীরই অবশ্য কর্তব্য।

(৩) **সাফাই দল ঃ** সাফাই দলের কাজ কিন্তু বিদ্যালয় সাফাই নয়। বিদ্যালয় সাফাইও ছাত্র-ছাত্রীদের করতে হবে বটে, কিন্তু সেটা বিদ্যালয়কৃতির (School performance) অন্তর্ভুক্ত। এখানে বিদ্যালয়ের কাছাকাছি এলাকা সাফাইয়ের কথাই বুঝতে হবে। একটু চিন্তা করলেই বোঝা যাবে কত বিভিন্ন ভাবে সাফাই দল কাজ করতে পারে—(ক) আবর্জনা পরিষ্কার, (খ) নর্দমা পরিষ্কার, (গ) জঙ্গল ও আগাছা পরিষ্কার, (ঘ) পানা (বিশেষতঃ কচুরি পানা) পরিষ্কার।

সুতরাং একদিকে আবর্জনা পরিষ্কার, অপরদিকে জঙ্গল, আগাছা ও পানা পরিষ্কার সাফাই দলেব কাজের মধ্যে আসছে। খুব বেশী দূরে না গেলেও, বিদ্যালয়ের চারধারের এলাকা সাফাই করতে পারলে নিজেদেরই লাভ, পরিচ্ছন্ন পরিবেশে পড়াশোনায় মন বেশ ভালোভাবে বসবে। আর একটি কথা মনে রাখা দরকার—সমস্ত আবর্জনাই ফেলে দেবার নয়, আবজনা থেকে সার প্রস্তুত করা যেতে পারে। এইজন্যে জমা-করা আবর্জনা থেকে বাছাই করতে হবে কোন্ কোন্ অংশ সার তৈরীর কাজে লাগবে আর কোন্ অংশ পুঁতে বা পুড়িয়ে বা অন্যভাবে নষ্ট করে ফেলা হবে। কম্পোস্ট সার তৈরী করতে পারলে আবর্জনার অনেকটা অংশই কাজে লেগে যাবে—এ-সম্পর্কে কর্মশিক্ষা অংশে (২৭—২৯ পৃষ্ঠা) আলোচনা কর' হয়েছে।

যারা সাফাই দলে থাকবে তারা সাফাইয়ের উপকরণগুলির যেন উপযুক্ত যত্ন নেয়। কী কী উপকরণ অর্থাৎ ঝাঁটা, ঝুড়ি, কোদাল, খন্তা, জীবাণুনাশক ঔষধপত্র কতগুলি আছে সেগুলির হিসাব রাখা, কাজের সময় দলের সদস্যদের মধ্যে সেগুলি বিলি করা এবং কাজ শেষ হলে সেগুলি সংগ্রহ করা—এ সমস্ত দায়িত্ব অবশ্যই দলনেতার বা 'সাফাই মন্ত্রীর'।

অনেক সময় "অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট" হয়ে যায়। অর্থাৎ একসঙ্গে সবাই কাজ করতে গেলে কাজের চেয়ে গোলমালই বেশী হয়। সেজন্যে সাফাই মন্ত্রী দিনের বা সপ্তাহের সাফাই কাজের দল গঠন করে কাজ ভাগ করে দিলেই ভালো হয়।

গান্ধীজীর পল্লী-পুনর্গঠনের আদর্শে সাফাইয়ের একটি বিশেষ স্থান ছিল। এজন্যে গান্ধীজীর জন্মদিনটি "জাতীয় পরিচ্ছন্নতা দিবস" হিসাবে উদ্‌যাপিত হয়। সাফাইয়ের ভূমিকা সম্বন্ধে গান্ধীজী অতিমাত্রায় সচেতন ছিলেন বলেই তাঁর প্রবর্তিত বুনিয়াদী শিক্ষা সম্পর্কেও বলেছিলেন—

"নঈ তালিম সাফাইসে সুরু হোতি হ্যায়"

অর্থাৎ গান্ধীজী-প্রবর্তিত নয়া তালিম বা নতুন শিক্ষা (অর্থাৎ বুনিয়াদী-শিক্ষা) সুরু হবে সাফাই দিয়ে। গ্রামের সাফাই সম্পর্কে গান্ধীজী বলেছেন: "গ্রামের পুষ্করিণী আর কূয়াগুলি পরিষ্কার করা, পরিষ্কার রাখা, গ্রামের গোবর-গাদা সাফ করা—এই হবে গ্রামসেবকের কাজ। কর্মী যদি নিজের হাতে এ কাজ করা সুরু করেন এবং বেতনভুক্ ঝাড়ুদারের মত নিয়মিতভাবে সাফাইয়ের কাজ করতে থাকেন, সেই সঙ্গে গ্রামবাসীদের একথাও বুঝিয়ে দেন যে, ভবিষ্যতে সাফাইয়ের যাবতীয় কাজ নিজেরাই করে নেবার জন্য এখন থেকে তাঁদের গ্রামসেবকের সঙ্গে কাজে লেগে পড়া উচিত, তা হলে এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যেতে পারে যে, আজ হোক্ কাল হোক্ গ্রামবাসীরা সেবকের সঙ্গে সহযোগিতা করবেই।" (গান্ধী-রচনাসম্ভার, ৫ম খণ্ড, ৪৮০-৪৮১ পৃঃ)

উপরের উদ্ধৃতি থেকেই বোঝা যাবে কীভাবে ছাত্র-ছাত্রীরা সাফাই সুরু করলে ক্রমশঃ সাধারণ লোক এগিয়ে এসে তাদের সঙ্গে হাত মেলাবে।

(৪) **নিরক্ষরতা দূরীকরণ দল:** অশিক্ষার অন্ধকারে ভারত ও পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীদের এক বিরাট অংশ* এখনও রয়েছে। ফলে একদিকে যেমন স্বল্পসংখ্যক শিক্ষিত লোক নিজেদের জন্যে সুযোগ-সুবিধার সন্ধানে ব্যস্ত রয়েছে, অপরদিকে তেমনি বাকী মানুষ যে শুধু সাধারণ স্বাস্থ্যরক্ষার সুযোগ থেকেও বঞ্চিত তাই নয়, অশিক্ষার ফলে জনসংখ্যা-বৃদ্ধি এবং তারই ফলে উন্নয়নমূলক কর্মসূচীর রূপায়ণ ব্যাহত হচ্ছে।

সুতরাং নিরক্ষরতা দূরীকরণ একটা বড়ো কাজ এবং ছাত্র-ছাত্রীরা এ-বিষয়ে অনেক কিছু করতে পারে। **নিরক্ষরতা দূরীকরণের অনেকখানিই বয়স্ক-শিক্ষা।** সুতরাং নিরক্ষর কৃষকেরা ও শ্রমিকেরা যে যে-পথে দ্রুত সাক্ষর হয়ে ওঠে সেই পথেই শিক্ষক-শিক্ষিকার নির্দেশ অনুযায়ী ছাত্র-ছাত্রীদের চলা উচিত। এ বিষয়ে নীচের ইঙ্গিতগুলি অনুসরণ করা দরকার:

(ক) নিরক্ষরদের, বিশেষতঃ বয়স্ক গ্রামবাসীদের জ্ঞানদানের পদ্ধতি তাঁদের নিত্যকার জীবনের প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে সম্পর্কিত হবে। এটা তাঁদের উপর চাপিয়ে দিলে চলবে না। তাঁদের ভিতর এর জন্যে আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করা দরকার।

(খ) পরিচিত পরিবেশের মধ্যে যতটুকু ভূগোল, ইতিহাস, গণিত ইত্যাদি

* ভারতের ৩৮ কোটি ২৭ লক্ষ নিরক্ষরের মধ্যে ৩ কোটি পশ্চিমবঙ্গে।

শেখানো যায়, যেটুকু সাহিত্যজ্ঞান নিরক্ষর বয়স্কদের নিত্য প্রয়োজন অর্থাৎ চিঠিপত্র লিখতে পড়তে জানা—তাই তাঁদের শেখার ব্যবস্থা করতে হবে। "এই

খোলা মাঠে বয়স্ক-শিক্ষার আসর

ধরনের জ্ঞান তাঁরা সযত্নে রক্ষা করবেন ও শিক্ষার পরবর্তী ধাপের দিকে এগিয়ে যাবেন। যেসব পুস্তক তাঁদের নিত্যকার জীবনে গ্রহণীয় কিছু দিতে পারে না, তাঁদের তার প্রয়োজন নেই।" (গান্ধী-বচনাসম্ভার, ৫ম খণ্ড, ৩৩৩ পৃষ্ঠা।)

(গ) "সাক্ষরতার আন্দোলন বর্ণ-পরিচয়ে শুরু ও শেষ হবে না। প্রয়োজনীয় জ্ঞান-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এ কার্য চলবে।" শুধু তাই নয়, "শুধু মোটামুটি লিখতে, পড়তে ও হিসাব করতে জানা"-তে থেমে থাকলেও চলবেনা, দেশের রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক আদর্শ, স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস, অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনা—এ-সবের সম্পর্কেই সচেতন করে তুলতে হবে নিরক্ষরদের। জনসংখ্যা বৃদ্ধির কুফল সম্পর্কেও তাঁদের চেতনা জাগাতে হবে। এ-ব্যাপারে ভালো স্থানীয় পাঠাগার ও সরকারের প্রচার বিভাগ ছাত্র-ছাত্রীদের সাহায্য করতে পারে। অবসরবিনোদনমূলক এবং সাংস্কৃতিক কর্মধারাকে যতটা সম্ভব কাজে লাগাতে হবে। নৃত্যগীত, নাটক, পুতুলনাচ, মেলা, উৎসব, ভজন, কীর্তন, প্রভৃতি মাধ্যমগুলি জনশিক্ষা তথা নিরক্ষরতা দূরীকরণের দিক থেকে সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ। রেডিও ও চলচ্চিত্র সবচেয়ে বেশী সম্ভাবনাপূর্ণ জনসংযোগ-মাধ্যম বলেই নিরক্ষরতা দূরীকরণে এদের খুব ভালোভাবে কাজে লাগানো যেতে পারে। কিন্তু এগুলি ব্যয়সাপেক্ষ। তবে চেষ্টা করা উচিত যাতে প্রতিটি বয়স্ক শিক্ষা-

কেন্দ্রে একটি রেডিও থাকে এবং মাঝে মাঝে সরকারের প্রচার বিভাগ থেকে যে-সব ফিল্ম বিনামূল্যে জনশিক্ষার উদ্দেশ্যে দেখানো হয়ে থাকে তারও সুযোগ নেওয়া উচিত।

(ঘ) ছাত্র-ছাত্রীদের এ-ব্যাপারে ধৈর্যশীল হওয়া উচিত, কারণ তারা নিজেরা বিদ্যাবুদ্ধির যে-স্তরে আছে, তার অনেক নীচে নেমে এসে তবেই নিরক্ষরদের অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন করা যাবে।

(ঙ) **নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি** (এঁদের কার্যালয় কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের আশুতোষ ভবনের একতলায়) দেশে সাক্ষরতা আন্দোলনে যথেষ্ট কাজ করছেন। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বা শিক্ষিকার মাধ্যমে এঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

(৫) **দিবস উদ্‌যাপন দল ঃ** শুধু বিদ্যালয়গুলিতেই নয়, অন্যত্র নানারকম গুরুত্বপূর্ণ দিবসগুলির যথাযথ সার্থকতা উপলব্ধি করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না। সেদিক থেকে বলতে গেলে আমরা শুধু এক আত্মবিস্মৃত জাতিই নই, চরম অকৃতজ্ঞও বটে। বিভিন্ন দিবস আজ আমাদের কাছে শুধু 'ছুটির দিনে' পর্যবসিত হয়েছে।

সমাজশিক্ষার অঙ্গ হিসাবে ছাত্র-ছাত্রীদের অন্যতম কর্তব্য—বিদ্যালয়ে (এবং তার বাইরেও) অর্থাৎ পাড়ায়, ক্লাবে বিভিন্ন স্মরণীয় দিবসগুলি যথোপযুক্ত গাম্ভীর্যের সঙ্গে পালন করে তার আদর্শ বা বাণী পরিচিত ক্ষেত্রে প্রচার করা। এতে শুধু যে দিবসগুলিকে ঠিকভাবে পালন করা হবে তা-ই নয়, সামাজিক শিক্ষার কাজও করা হবে। বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা যদি দিবস উদ্‌যাপন দলের সদস্য হিসাবে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে সংশ্লিষ্ট দিবসগুলিকে সুন্দর ও সার্থক করে তুলতে পারে, যদি কোনও উৎসবকে তারা নিজেদের উৎসব বলে মনে করে তাহলে একদিকে যেমন তারা নির্মল আনন্দ লাভ করবে, অপরদিকে তেমনি উৎসবের জন্যে শিক্ষকের (বা শিক্ষিকার) নির্দেশসাপেক্ষে স্বাধীনভাবে কাজ করবার ও মাথা খাটানোর সুযোগ পাবে বলে কোনও একটি বিশেষ 'দিবস' তাদের কাছে আনন্দময় মনে হবে এবং দিবস উদ্‌যাপনের উদ্দেশ্যও হবে সার্থক। শুধু তাই নয়, তারা নেতৃত্ব গ্রহণ করতে শিখবে,* দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতে সুযোগ পাবে, তাদের

* "The students will be given full freedom to organize functions, to conduct many of the school activities through their own committees..."

(Report of Secondary Education Commission : Pp. 215

মধ্যে একটা পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাবও গড়ে উঠবে। কোনও বিশেষ দিবসের উদ্‌যাপন উপলক্ষে সঙ্গীত-নাটক-আবৃত্তি ইত্যাদি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তারা আত্মপ্রকাশের সুযোগও পাবে। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের অভ্যর্থনা-আপ্যায়নের মাধ্যমে তাদের সামাজিক কর্তব্যবোধও জাগ্রত হতে পারবে। কোনও দিবসের তাৎপর্য বুঝতে গিয়ে তাদেব কিছু জানতে হবে অর্থাৎ সেই বিষয়ে কিছু পড়াশোনা করতে হবে। সংশ্লিষ্ট দিবস উদ্‌যাপন সংক্রান্ত বিভিন্ন কাজ করতে গিয়ে তাদেব মনে বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য, ইতিহাস প্রভৃতি নানা বিষয়ের নানা প্রশ্ন জাগবে—শিক্ষক-শিক্ষিকার কাছে জেনে নিয়ে বা বিভিন্ন সাহায্যকারী বইয়ের প্রয়োজনীয় অংশ দেখে তাদের জিজ্ঞাসা তৃপ্ত হবে। অনুষ্ঠানের ব্যাপারে কী ভুল-ত্রুটি হল-না-হল এ সম্পর্কে তারা আত্মসমালোচনা কববে এবং ভবিষ্যতে যাতে ভুল না হয় সে বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন কববে। এইভাবে তাদেব বিচারশক্তি যাবে বেড়ে এবং তারা পরমতসহিষ্ণু হবে।

দিবস-উদ্‌যাপন গোষ্ঠীর কাজের গুরুত্ব বা সার্থকতা দেখা গেল। পাঠ্যসূচীতে **বীরবরণ দিবস (Hero Day), জাতীয় সংহতি দিবস (National Integration Day), সমাজসংস্কারক এবং ধর্ম-সংস্কারকদের স্মরণ-দিবস (Social and Religious Reformers' Day), বিজ্ঞান দিবস (Science Day)** ইত্যাদি পালনেব কথা বলা হয়েছে।

এই বইয়ের অন্যান্য বহু জায়গায় যে কথাটি বার বার বলা হয়েছে, দিবস উদ্‌যাপন সম্পর্কে সেই কথাটিই এখানে আবার বলা হচ্ছে—এটাও বই পড়ে শেখবার জিনিস নয়। ছাত্র-ছাত্রীবা তো অন্ততঃ রবীন্দ্র জন্মোৎসব, নেতাজী জন্মদিবস, স্বাধীনতা দিবস ইত্যাদি পালন করেই। তার জন্যে কি তারা কোনও বইয়ের সাহায্য নেয়?—না। কেবল ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকার দু'একটি উপদেশই তাদের পক্ষে যথেষ্ট। তবুও পালনযোগ্য দিবসগুলিকে কী ভাবে সুন্দর ও সার্থক করে তোলা যেতে পারে সে সম্পর্কে দু'একটি ইঙ্গিত নীচে দেওয়া হল। তার মানে অবশ্য এই নয় যে, এখানে যা বলা হচ্ছে ছাত্র-ছাত্রীরা তার অন্ধ অনুকরণ করবে। ববং তারা চেষ্টা করবে তাদের অনুষ্ঠানে একটা কিছু বৈশিষ্ট্য বা স্বকীয়তা যেন থাকে।

(১) যে-সব দিবস উদ্‌যাপন করা হবে শিক্ষাবর্ষের সুরুতেই সেগুলির একটি তালিকা প্রধান শিক্ষক, ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক এবং ছাত্র-প্রতিনিধি মিলে স্থির করবেন।

(২) কোনও বিশেষ দিবস উদ্‌যাপনের বেশ কিছুদিন আগে থেকেই প্রস্তুতি-পর্ব চলবে।

(৩) কাজের পরিকল্পনা গোড়াতেই ঠিক করে নিতে হবে। অনুষ্ঠানে যেন ব্যয়বাহুল্য না ঘটে, সেদিকে প্রখর দৃষ্টি রাখতে হবে। অল্পব্যয়ে বা বিনাব্যয়ে জিনিসপত্র সংগ্রহ করে সাজসজ্জা তৈরী করতে পারলেই ভালো হয়। ছাত্র-ছাত্রীদের নিজেদের বা পাড়া-প্রতিবেশীদের কাছে জিনিসপত্র (যেমন টেবিল ক্লথ, হারমোনিয়াম, ছবি, ফুলের টব) চেয়ে আনলে সেগুলি যেন সাবধানে ব্যবহার করা হয়, এবং যে অবস্থাতে আনা হয়েছিল ঠিক সেই অবস্থাতেই যেন ফেরত দেওয়া হয়।

(৪) সমস্ত দিবস-পালন যাতে একঘেয়ে না হয়ে পড়ে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। কোনওটি ঘরে, কোনওটি বাইরে খোলা মাঠে, কোনওটি বা অন্য কোথাও করা যেতে পারে। বিশেষ বিশেষ দিবস উপলক্ষে নাটক-নাটিকা, নৃত্যনাট্য, সঙ্গীতানুষ্ঠান, আবৃত্তি প্রতিযোগিতা, আলপনা বা চিত্রাঙ্কন, সঙ্গীত প্রতিযোগিতা, চলচ্চিত্র প্রদর্শন বা প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করে দিবসগুলিকে আকর্ষণীয় করে তোলা যেতে পারে।

(৫) বিদ্যালয়ে ধর্ম-সংস্কারক দিবস পালন করলে ধর্মীয় সংখ্যালঘু কোনও সম্প্রদায়ের শিক্ষক বা ছাত্র-ছাত্রী থাকলে তাঁদের হাতেই সংশ্লিষ্ট দিবস-পালনের সংগঠনের ভার ছেড়ে দেওয়া ভালো।

(৬) স্মরণ দিবসগুলিতে মহাপুরুষদের জীবনী ও বাণীপাঠ, তাঁদের জীবনের সুপরিচিত ও উল্লেখযোগ্য ঘটনা নিয়ে রচিত নাটিকা অভিনয়, তাঁদের ছবি আঁকা, তাঁদের বাণী সুন্দর ও নির্ভুলভাবে লিখে দেওয়ালে টাঙিয়ে রাখা ইত্যাদির ব্যবস্থা করবে ছাত্রছাত্রীরা। এ-সবের মধ্যে দিয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা একাধারে আত্মপ্রকাশের সুযোগ পাবে এবং মহাপুরুষদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হবে।

(৭) জাতীয় সংহতি দিবস এবং জাতীয় উৎসবের দিনগুলিতে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের দেশাত্মবোধ যাতে জাগ্রত হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সাধারণ অবস্থায় কোনও ক্ষেত্রেই বিদ্যালয়ে অ্যামপ্লিফায়ার বা রেকর্ডপ্লেয়ারের মাধ্যমে রেকর্ড বাজানো অনুচিত হলেও জাতীয় সংহতি দিবস বা অনুরূপ জাতীয় অনুষ্ঠান এবং মহাপুরুষ স্মরণোৎসব উপলক্ষে নির্বাচিত কয়েকটি রেকর্ড বাজানো যেতে পারে যেমন—

(ক) 'ধনধান্যে পুষ্পে ভরা', 'যেদিন সুনীল জলধি হইতে উঠিলে জননী

ভারতবর্ষ' (**দ্বিজেন্দ্রলাল**) (খ) 'বল বল সবে', 'উঠগো ভারতলক্ষ্মী' (**অতুল-প্রসাদ সেন**) (গ) 'হও ধরমেতে বীর, হও করমেতে বীর' (**রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়**) (ঘ) 'তুমি নির্মল কর মঙ্গল করে' (**রজনীকান্ত সেন**) (ঙ) 'ওই মহামানব আসে', 'হে নূতন', 'ও আমার দেশের মাটি', 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে,' 'এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে,' 'নিশিদিন ভরসা রাখিস,' 'আমি ভয় করব না ভয় করব না', 'আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে', 'সঙ্কোচের বিহ্বলতা নিজেরে অপমান,' 'নাই নাই ভয়, হবে হবে জয়,' 'আমাদের যাত্রা হল শুরু,' 'হে মোর চিত্ত, পুণ্যতীর্থে', 'বাংলার মাটি বাংলার জল', 'আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে,' 'অয়ি ভুবনমনোমোহিনী,' 'সার্থক জনম আমার,' 'এখন আর দেরি নয়, ধর্ গো তোরা,' 'বুক বেঁধে তুই দাঁড়া দেখি,' 'যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক,' 'শুভ কর্মপথে ধর নির্ভয় গান,' 'ওরে, নূতন যুগের ভোরে', 'ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে আগুন জ্বালো,' 'গ্রামছাড়া ঐ রাঙামাটির পথ,' 'তোমার আসন শূন্য আজি, হে বীর পূর্ণ করো,' 'খরবায়ু বয় বেগে,' 'ভাঙো, বাঁধ ভেঙে দাও,' 'আমরা নূতন যৌবনেরই দূত', 'সব কাজে হাত লাগাই মোরা,' 'আমরা চাষ করি আনন্দে,' 'আয় রে মোরা ফসল কাটি' ইত্যাদি (**রবীন্দ্রনাথ**) (চ) 'রাণার' (**সুকান্ত ভট্টাচার্য**) (ছ) 'বিদ্রোহী', 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার', 'ছাত্রদলের গান', 'লিচু-চোর', 'চল্ চল্ চল্' (**নজরুল**)

(৮) অনুষ্ঠান বাবদ যাবতীয় খরচ-খরচার হিসাব রাখতে হবে এবং

(৯) সর্বস্তরে অপচয় বন্ধ করতে হবে।

বিদ্যালয়কৃতি

বিদ্যালয়কৃতি বা School performance হল সমাজ-শিক্ষার দ্বিতীয় অঙ্গ। এর মূল কথা হচ্ছে বিদ্যালয়ে শ্রেণীকক্ষে বা বিভিন্ন পাঠক্রমবহির্ভূত কর্মধারার মাধ্যমে ছাত্রদের বা ছাত্রীদের যৌথ জীবনযাপনে উৎসাহিত করা। এ-ছাড়া হোস্টেলে ও খেলার মাঠে সর্বত্রই এই যৌথজীবন-যাপন প্রয়োজন এবং সম্ভব। এর ফলে একদিকে যেমন ছাত্র-ছাত্রীরা গণতান্ত্রিক ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে যাবে, তেমনই অপরদিকে যে চারিত্রিক গুণগুলির বিকাশ সমাজকল্যাণমূলক কাজের মাধ্যমে সম্ভব বলে আমরা লক্ষ্য করেছি, এক্ষেত্রে ভিন্ন পটভূমিতে সেই একই গুণাবলীর বিকাশ ঘটে এ-কথা জোর করেই বলা যায়।

বিদ্যালয়সজ্জার (School Decoration) কথাই ধরা যাক্ না কেন।

সৌন্দর্যবোধ এবং সৌন্দর্যানুরাগ সব ছাত্র-ছাত্রীরই অল্পবিস্তর থাকে। সেটাকে জাগ্রত করা দরকার। এ ব্যাপারে শিক্ষকমহাশয়ের উৎসাহ সব সময়েই ছাত্র-ছাত্রীদের অনুপ্রেরণা যোগাবে। বিদ্যালয় ও শ্রেণীকক্ষের পরিবেশ নানাভাবে সুন্দর করে তোলা যায়। অবশ্য সাজানোর আগের কাজ হল **বিদ্যালয় সাফাই** (School Cleaning) ; কিন্তু এটি পৃথক কাজ বলে এ বিষয়ে অন্যত্র আলোচনা করা হয়েছে।

বিদ্যালয়কে যথার্থ শ্রী-সম্পন্ন করাটা খুব একটা শক্ত বা ব্যয়সাপেক্ষ কোনও ব্যাপার নয়। এ বিষয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের নিজেদের সৌন্দর্যবোধ বা রুচি-বোধই শেষ কথা হলেও তাদের সুবিধার জন্যে এখানে কয়েকটি ইঙ্গিত দেওয়া গেল—

(১) দেশবিদেশের মহাপুরুষের ছবি সুন্দরভাবে শ্রেণীকক্ষে টাঙিয়ে রাখা যেতে পারে।
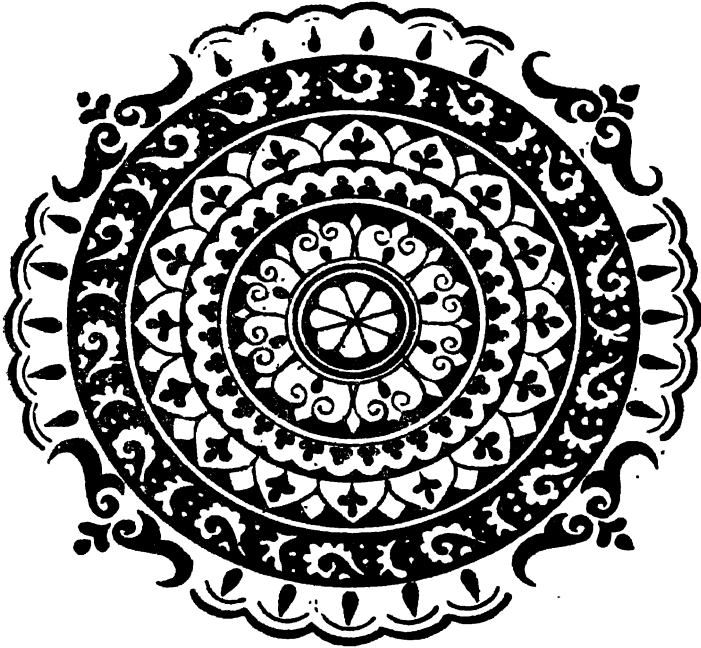
স্কুলে ঠিক জায়গায় ঠিকভাবে এই রকম আলপনা দিতে পারলে খুব সুন্দর দেখাবে

(২) মহাপুরুষদের বাণী বড় বড় করে লিখে পেস্টবোর্ডে এঁটে দেওয়ালে টাঙিয়ে রাখা যেতে পারে।

(৩) ছাত্র-ছাত্রীদের আঁকা উঁচু মানের ছবিও শ্রেণীকক্ষের দেওয়ালে স্থান পেতে পারে।

(৪) বিদ্যালয়ের উদ্যান থাকলে ছাত্র-ছাত্রীরা উদ্যানচর্চার মাধ্যমে ফলে-ফুলে বিদ্যালয়ের পরিবেশ শ্রীমণ্ডিত করতে পারবে। এটি আবার কর্মশিক্ষারও অঙ্গীভূত। (কর্মশিক্ষা অংশে উদ্যান-পরিচর্যা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে।) বিদ্যালয়ের উদ্যান না থাকলেও ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের শ্রেণীকক্ষের বারান্দায় বা দরজায় টবে ফুলগাছ রেখে তার দেখাশোনার ভার গ্রহণ করতে পারে।

(৫) মধ্যে মধ্যে বিদ্যালয়ের দেওয়াল চুনকাম করে দরজা-জানালা রঙ করলে যে বিদ্যালয়ের চেহারা ফিরে যাবে—এটা বলাই বাহুল্য। (উদ্যান-চর্চার মতই দেওয়াল চুনকাম করা ও দরজা জানালা রঙ করা কর্মশিক্ষার অঙ্গ হিসাবেই ছাত্র-ছাত্রীদের শিখতে হতে পারে এবং এ-বিষয়ে যথাস্থানে আলোচনা করা হয়েছে।)

(৬) বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠান উপলক্ষে আলপনা দিয়ে যে বিদ্যালয়ের শ্রীবৃদ্ধি করা যেতে পারে তা বলাই বাহুল্য।

প্রত্যেকটি শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরা যদি নিজ নিজ শ্রেণীকক্ষকে সুন্দর রাখার চেষ্টা করে তা হলেই সমষ্টিগতভাবে বিদ্যালয়ের অঙ্গের শ্রীবৃদ্ধি হবে, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

নানারকম **চার্টচিত্র, পোস্টার, মডেল** ও **সময়রেখা তৈরীর** মাধ্যমে পাঠ্যবস্তুকে যে আকর্ষণীয় করে তোলা যেতে পারে সকলেই তা জানে। বিশেষতঃ ভূগোল, ইতিহাস, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ের অনেক কিছু পঠনীয় বস্তু চার্টচিত্র, পোস্টার, মডেল প্রভৃতির মাধ্যমে সব সময় চোখের সামনে রাখলে শিক্ষা হয়ে ওঠে সহজ এবং আনন্দময়। ছাত্র বা ছাত্রী ইতিহাসের মোগল যুগ সম্বন্ধে পড়াশোনা করার পর হয়তো শিক্ষক মহাশয় বললেন মোগল যুগের প্রধান ঘটনা-পঞ্জী সম্পর্কে একটি চার্টচিত্র তৈরী করতে কিংবা কুতব মিনার বা তাজমহলের একটি মডেল তৈরী করতে। এগুলি করতে গিয়ে পঠিত বিষয়কে আরও অনেক বেশী ভালো লাগবে ছাত্র-ছাত্রীদের। অনুরূপভাবে ভূগোলের, পৌরবিজ্ঞানের, সাধারণ বিজ্ঞানের, এমন কি গণিতেরও বিভিন্ন রকম চার্টচিত্র বা পোস্টার তৈরী করা যেতে পারে। ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে অধিকাংশ বিদ্যালয়ে

আলাদা 'চিত্রকক্ষ'ই আছে—সেখানে নানারকমের চার্টচিত্র থাকে, সেগুলি দেখে ছাত্র-ছাত্রীরা নূতন নূতন চার্টচিত্র উদ্ভাবনও করে।

চার্টচিত্র মডেল ইত্যাদির পরই **রিলিফ ম্যাপ তৈরীর** কথা এসে পড়ে। ভূগোল পড়তে গিয়ে নানারকম রিলিফ ম্যাপ তৈরী দরকার হয়ে পড়ে। মাটি বা প্ল্যাস্টার, রঙ ইত্যাদির সাহায্যে কোনও দেশের মডেল তৈরী করে পর্বত, নদী, সমুদ্র ইত্যাদির আকার রিলিফ ম্যাপে দেখানো যেতে পারে। কিছু এঁটেল মাটি খুব ভালো করে গুঁড়িয়ে নিয়ে তার সঙ্গে কিছু তুঁষ ও পাট ছোট ছোট করে কেটে মিশিয়ে নিতে হবে। তারপর জল মিশিয়ে ভালো করে ছেঁকে নিতে হবে। জল একটু একটু করে না দিয়ে বেশী দিলে মাটি নরম হয়ে যাবে। মাটির সঙ্গে একটু গোবর মিশিয়ে নিলে রিলিফ ম্যাপ দীর্ঘস্থায়ী হয়, সহজে ফেটে যায় না। এ ছাড়া প্ল্যাসটিসিন ('মোম মাটি') বা কাগজের মণ্ড দিয়েও রিলিফ ম্যাপ তৈরী করা যেতে পারে। যার উপর রিলিফ ম্যাপ করা হবে সেই টিনের পাত বা তক্তায় ম্যাপের সীমারেখা এঁকে নিতে হবে। সীমারেখার মধ্যে কাদা (বা মণ্ড বা প্ল্যাসটিসিন) আঙুল দিয়ে সমানভাবে বসিয়ে নিতে হবে। সীমারেখার বাইরে সমুদ্র থাকলে তা সবচেয়ে নীচু হবে। উপত্যকা, মালভূমি, পর্বতপথ ইত্যাদি দেখাতে মাটি বেশী পরিমাণে টিপে বসাতে হবে। মাপকাঠি দিয়ে মাটি বা অন্য বস্তু বসিয়ে পর্বত দেখাতে হবে—তবে পর্বতের উচ্চতা অনুসারে বস্তুর পরিমাণ কম বা বেশী হবে। নদীর উৎস থেকে মোহনা পর্যন্ত অল্প গর্ত করে দেখাতে হয়। এই গর্ত কাঠির সরু দিক দিয়ে করে নিতে হয়। মোহনার দিকে নদী ক্রমশঃ চওড়া দেখাতে হবে। বাঁশের ছুরি দিয়ে কেটে নীচু করে নিয়ে হ্রদ দেখানো যেতে পারে।

সীমারেখার মধ্যে বিভিন্ন জায়গার উচ্চতা ঠিক রাখার জন্যে ঐসব জায়গা নির্দেশস্বরূপ আগে কতকগুলি পিন এঁটে নিয়ে ঐ পিন-আঁটা জায়গায় উচ্চতানুযায়ী মণ্ড বা কাদা লাগাতে হবে। রঙের ব্যবহার করতে হবে মানচিত্র অনুযায়ী।

আবহাওয়া বুলেটিন (**Weather bulletin**) ইত্যাদিও ছাত্র-ছাত্রীরা তৈরী করতে পারে। কোন্ দিন কতখানি বৃষ্টি হলো ছাত্র-ছাত্রীরা তা লক্ষ্য রাখতে পারে ও সারা মাসে বা সারা বছরে কত ইঞ্চি (বা সেন্টিমিটার) বৃষ্টি হল তা বৃষ্টিমাপক যন্ত্রের সাহায্যে পরিমাপের ব্যবস্থা করতে পারে। অনুরূপভাবে থার্মোমিটারের সাহায্য তাপমাত্রারও পরিমাপ করা যেতে পারে এবং গ্রাফের

সাহায্যে বৃষ্টিপাত ও তাপমাত্রার গড় পরিমাণকে দেখানো যেতে পারে। দৈনিক বৃষ্টিপাতের ও উষ্ণতার পরিমাণ থেকেই গড় দৈনিক, মাসিক ও বার্ষিক বৃষ্টিপাত বার করে নিতে হয়।

আবহাওয়া পর্যবেক্ষণের ফল এইভাবে কাগজে লিখতে হয়—

স্থান কলকাতা	জানুয়ারী	ফেব্রুয়ারী	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর
উষ্ণতা (ডিগ্রী ফারেনহাইট)	৬৯	৭২	৮২	৮৪	৮৮	৮৭	৮৫	৮০	৮২	৮১	৭৫	৬৮
বৃষ্টিপাত (সেণ্টিমিটার)	০·৫	১·১	১·৩	২·০	৫·৫	১২·০	১৩·৩	১৩·২	৯·৮	৫·১	০·৪	০·১

উপরের ধরনের হিসেবের উপর নির্ভর করে গ্রাফ কাগজের উপর রেখার সাহায্যে তাপের হ্রাসবৃদ্ধি এবং কালো স্তম্ভের সাহায্যে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ দেখানো যায়।

আড়াআড়ি (Horizontal) দাগের উপর মাসের নাম এবং লম্বালম্বি লাইনের উপর তাপমাত্রা ও বৃষ্টির পরিমাণ দেখাতে হবে।

সংবাদ বুলেটিন : পাঠ্যপুস্তকের বাইরে যে জগৎ রয়েছে সেই জগৎ সম্পর্কে সচেতন হতে হলে ছাত্র-ছাত্রীদের খবরের কাগজ পড়া দরকার এবং তারা পড়েও। কিন্তু তারা নিজেরাই যদি খবরের কাগজ সম্পাদনা ও প্রকাশিত করার সুযোগ পায় তা হলে সেটা নিশ্চয়ই এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় প্রত্যেকটি কলেজ ও হাইস্কুলের নিজস্ব জার্নাল বা সংবাদপত্র আছে এবং সেগুলি প্রতিষ্ঠিত বড় বড় সংবাদপত্রের সঙ্গে রীতিমত প্রতিযোগিতা করে। আমাদের দরিদ্র দেশে ঠিক এতটা সম্ভব না হলেও বৎসরে অন্তত দু-তিনবার একটি দুই বা চার পৃষ্ঠার ছাপা সংবাদ-বুলেটিন ছাত্র-ছাত্রীরা প্রকাশিত করতে পারে। বলা বাহুল্য, অন্যান্য সব ক্ষেত্রের মতই শিক্ষক বা শিক্ষিকাই প্রথমে দেখিয়ে দেবেন কোন্ সংবাদ কোন্ পৃষ্ঠায় যাবে, সম্পাদকীয় লিখতে হয় কী ভাবে, বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করতে পারলে, তা কোথায় বসানো হবে ইত্যাদি।

মুদ্রিত সংবাদ-বুলেটিন অবশ্য নবম ও দশম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই বার করতে পারবে। সেটা একান্ত ব্যয়সাধ্য মনে হলে তারা একটা দেওয়াল-পত্রিকাও করতে পারে। ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণীর ছেলেমেয়েরা হয়তো তা পারবে না।

স্কুলের সংবাদ বুলেটিন

তাই তাদের শ্রেণীকক্ষে খবর লেখার একটি পৃথক ব্ল্যাকবোর্ডের ব্যবস্থা করলে সেই বোর্ডে প্রতিদিনের চল্‌তি খবর লেখা যেতে পারে। কে কবে খবর লিখবে তা শিক্ষক-শিক্ষিকার সঙ্গে পরামর্শ করে স্থির করা হবে। তাঁরাই প্রথম প্রথম দেখিয়ে দেবেন কী ভাবে একটি খবর সুন্দরভাবে সংক্ষেপে লেখা যায়।

অবশ্য সংবাদ-সচেতনতা গড়ে তুলতে হলে একেবারে নীচের শ্রেণী থেকেই ছাত্র-ছাত্রীদের খবর সংগ্রহ করে নিয়ে আসবার অভ্যাস তৈরী করা দরকার। খুব নীচের শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে খবর শুনে শিক্ষক মহাশয়ই বোর্ডে বড বড অক্ষরে লিখে দেবেন।

একটি মুদ্রিত সংবাদ বুলেটিনের প্রথম পৃষ্ঠার নমুনা দেখানো হল আগের পাতায়।

বিদ্যালয় সাফাই (School cleaning) যে বুনিয়াদী শিক্ষা-ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান অঙ্গ এ-কথা আগেই বলা হয়েছে। আর সমাজ-কল্যাণমূলক কাজের মধ্যে সাফাই দলের কাজ কী এ সম্পর্কেও বলা হয়েছে।

নিজের বাড়ী ও গ্রাম/শহরের পরিবেশকে পরিচ্ছন্ন রাখার মত বিদ্যালয়ের পরিবেশকে পরিচ্ছন্ন রাখার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কোনও দ্বিমত থাকতে পারে না। এই প্রয়োজনীয়তা শেখা ও তার অভ্যাস গড়ে তোলা **সামাজিক সাফাই**-এর অন্তর্গত। যেমন দৈহিক পরিচ্ছন্নতা অর্থাৎ হাত, পা, নখ, চুল, দাঁত পরিষ্কার রাখা, স্নান করা, কাপড-জামা কাচা, যেখানে-সেখানে থুথু না ফেলা, রোগ সংক্রমণের কাবণ না হওয়া—এ সবের প্রযোজনীয়তা শিক্ষালাভ ও তার অভ্যাস গঠন **ব্যক্তিগত সাফাই**-এর অন্তর্গত। ছাত্র-ছাত্রীদের বোঝা উচিত যে নিজেব দেহকে পরিষ্কার রাখাটাই যথেষ্ট নয়, যে পরিবেশে বাস ও পডাশোনা করতে হবে সেটিকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন না রাখলে শুধু নিজের নয়, পরিবারের ও সমাজের সকলেরই স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতির কারণ হযে দাঁড়াবে।

প্রত্যেক শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরা যদি নিজ নিজ শ্রেণীকক্ষের ভিতরে-বাইরে পরিষ্কার রাখে তা হলে এইরকমভাবে প্রায় সমগ্র বিদ্যালয়টিই সাফাই হয়ে যাবে। যে যে জায়গা বাকী থাকবে সেগুলি পালা করে সাফাই-দলভুক্ত ছাত্র-ছাত্রীরা পরিষ্কার করবে। **অনেক ছাত্র-ছাত্রীর স্বভাব আছে নিজের বাড়ী বা বাসা পরিচ্ছন্ন রাখলেও বিদ্যালয়ের প্রতি কোনও মমতা নেই। এটা খুবই দুঃখের কথা। বিদ্যালয়কে দ্বিতীয় বাড়ী মনে করে তাকে পরিচ্ছন্ন রাখার বিষয়ে যত্নবান হওয়া উচিত।**

বিদ্যালয় সাফাইয়ের দুটি দিক আছে—নেতিবাচক বা Negative এবং ইতিবাচক বা Positive। **প্রথমতঃ, সচেষ্ট হতে হবে যাতে জঞ্জাল না জমে বা কম জমে। এই কাজগুলি করলে বিদ্যালয় তথা শ্রেণীকক্ষ নোংরা হয়—যেখানে-সেখানে পেন্সিলের টুকরো, চক, ছেঁড়া কাগজ, আম (বিশেষতঃ কাঁচা আমের),**

কমলালেবু প্রভৃতি ফলের খোসা ইত্যাদি ফেলা। নিজ নিজ শ্রেণীকক্ষের দরজার একপাশে আবর্জনা ফেলার একটি বাক্স (Litter Bin) রেখে তাতে এগুলি ফেলতে হবে। আর দেওয়ালে নিজেদের নাম বা আজেবাজে কথা লেখা, এবং সর্দি মোছা, হেলান দিয়ে বসে মাথার তেলের বিশ্রী দাগ সৃষ্টি করা, যেখানে-সেখানে থুথু ফেলা—এগুলি না করলে যে সাফাইয়ের কাজ যথেষ্ট হালকা হয়ে যাবে, সে-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। ছাত্র-ছাত্রীদের স্মরণ রাখতে হবে যে, বিদ্যালয় তাদের নিজেদের সম্পত্তি, তাকে নোংরা করলে পরিষ্কার করার দায়িত্ব নিজেদেরই। কাজেই শুধু শুধু সমস্যাকে নিমন্ত্রণ করে আনার প্রয়োজন কী?

সাফাইয়ের ইতিবাচক দিকের মধ্যে বিদ্যালয়ের সমস্ত আসবাব পরিষ্কার রাখা, বছরে অন্ততঃ তিনবার নিজ নিজ শ্রেণীকক্ষের ঝুল ঝাড়া (কোনও রবিবারে এ-কাজটি সহজেই করা সম্ভব), বিদ্যালয়-প্রাঙ্গণকে শুকনো পাতা বা অন্যান্য জঞ্জাল থেকে মুক্ত করা, আবর্জনা থেকে সার তৈরী করা ইত্যাদি আসছে। সাফাইয়ের উপকরণগুলি যেখানে সেখানে ফেলে-ছড়িয়ে না রেখে ভালোভাবে গুছিয়ে রাখা উচিত। এলাকা সাফাই রাখা সম্পর্কে এ-কথা বলা হয়েছে। সবচেয়ে পরিচ্ছন্ন শ্রেণীর জন্য একটি কাপ বা শীল্ডের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

প্রকৃতি পাঠ (Nature Study)—শোনা কথার চেয়ে দেখা জিনিস সকলের মনে থাকে বেশী, সেই জন্যে বই থেকে খানিকটা পড়া মুখস্থ করার চেয়ে যদি ছাত্র-ছাত্রীরা পাঠ্য বিষয়বস্তুর সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় করে, সে-জ্ঞানের মূল্য অনেক বেশী। ছাত্র-ছাত্রীরা অনেকেই সমুদ্রবায়ু ও স্থলবায়ু সম্পর্কে ভূগোল বই থেকে গড় গড় করে মুখস্থ বলে যাবে, কিন্তু বিকেলে গড়ের মাঠে ঠাণ্ডা হাওয়া দেয় কেন সে কথা জিজ্ঞাসা করলে চুপ করে থাকে।

তা হলে নিজের গ্রাম বা শহর ও তার পারিপার্শ্বিককে না জেনে ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান প্রভৃতি পাঠ্যপুস্তকের পাতার মধ্যে আবদ্ধ বৃহত্তর পরিবেশকে জানতে যাওয়া হাস্যকর। তাই ছাত্র-ছাত্রীদের আগে জানতে হবে, বুঝতে হবে, আর চিনতে হবে নিজের পরিবেশকে। কাছের জিনিস ফেলে আমরা দূরের জিনিস দেখতে যাই, কিন্তু আমাদের প্রকৃতপক্ষে দেখা হয় না কোনওটাই। কারণ সত্যিকারের চোখ মেলে দেখবার ক্ষমতা আমাদের নেই। পুঁথিগত শিক্ষা আমাদের পর্যবেক্ষণ-শক্তি ও সন্ধানী দৃষ্টিভঙ্গীকে নষ্ট করে দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলেছেন—

"বহু দিন ধ'রে বহু ক্রোশ দূরে
বহু ব্যয় করি বহু দেশ ঘুরে
দেখিতে গিয়েছি পর্বতমালা,
দেখিতে গিয়েছি সিন্ধু।

দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া
একটি ধানের শিষের উপরে
একটি শিশিরবিন্দু।"

কথায় বলে, প্রকৃতি একজন বিশিষ্ট শিক্ষক। বর্ষার কালো মেঘ কী ভাবে পৃথিবী ভিজিয়ে দেয়, কেমন করে কালবৈশাখীতে সব কিছু করে আলোড়িত, শীতের সোনালী সকালে শিশির-ভেজা ঘাসে সূর্যের কিরণ কী ভাবে প্রতিফলিত হয়, দিন-রাতের বিবর্তন, ঋতুচক্র—এ সবই শিশু-বয়স থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের মনে নানা জিজ্ঞাসার সৃষ্টি করে এবং সঙ্গে সঙ্গে তারা নিত্য নতুন তথ্যের সন্ধান পায়। ঐ সব জিজ্ঞাসাকে তৃপ্ত করতে গিয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা একটা বিজ্ঞানী মন গড়ে তুলতে পারে এবং প্রকৃতির অফুরন্ত ভাণ্ডার ও বিরাট রাজ্যই তাদের কাছে পাঠ্যপুস্তকের স্থান অধিকার করে।

নিকটতম পরিবেশ থেকে পর্যবেক্ষণের কাজ সুরু করতে হয়। প্রথমে বাড়ী ও স্কুলের পরিবেশ, পরে গ্রাম বা শহর, তারও পরে দূরের গ্রাম বা শহর। পর্যবেক্ষণে গিয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা পরিবেশের সবটাই খুব ভালো করে ঘুরে দেখবে। শুধু 'দেখার জন্যে দেখা-ই নয়, আবিষ্কারকের দৃষ্টিভঙ্গী ও অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। প্রতিটি দেখা বস্তুর 'কী ও কেন' বুঝতে চেষ্টা করবে।

আবার শুধু পর্যবেক্ষণই নয়, অপরিচিত বহু জিনিস—ফুল, ফল, লতা, পাতা, পাথর, কীট, পতঙ্গ ইত্যাদির নাম সংগ্রহ করে আসবে ছাত্রছাত্রীরা। কেঁচো, মাকড়সা, শামুক, প্রজাপতি, শুঁয়াপোকা ইত্যাদি কীটপতঙ্গের জীবনযাত্রার দিকে ছাত্র-ছাত্রীদের দৃষ্টি সজাগ রাখতে হবে। বলা বাহুল্য, এ-বিষয়ে শিক্ষক বা শিক্ষিকাই তাদের সাহায্য করবেন। মাটি, ফল, ফসল, উদ্ভিদ, কীটপতঙ্গ, আবহাওয়া ও প্রকৃতির নানা দিকের কথা তাঁরাই ছাত্র-ছাত্রীদের বলে দেবেন। স্কুলে ফিরে এসে ছাত্র-ছাত্রীরা সংগৃহীত জিনিসগুলিকে পরিষ্কার করবে এবং

সেবেন এঁটে শ্রেণীকক্ষে কিংবা **স্কুলের সংগ্রহশালায় (School museum)** সাজিয়ে রাখবে।

অবশ্য, ছাত্র-ছাত্রীরা পরিবেশ-পর্যবেক্ষণে যাবার আগে পর্যবেক্ষণের সঠিক পদ্ধতি সম্পর্কে শিক্ষক-শিক্ষিকা ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে আলোচনা করে নেবেন এবং **প্রকৃতি ডায়েরী (Nature Book) লেখার রীতি*** শিখিয়ে দেবেন।

প্রকৃতি ডায়েরীতে সংগৃহীত তথ্যাবলী একটি প্রশ্নমালা (Questionnaires) উত্তরের আকারে লিখে রাখাই সুবিধাজনক। পাতা, ফুল ইত্যাদি সংরক্ষণ করার সঠিক পদ্ধতি জানা দরকার। দু' টুকরো ব্লটিং কাগজের মধ্যে ফুল, পাতা ইত্যাদিকে সাবধানে চেপে রাখলে ২।৪ দিনের মধ্যে ব্লটিং কাগজ ফুল ও পাতার রস শুষে নেয়, তারপর সেগুলিকে প্রকৃতি ডায়েরীতে রাখা যাবে। এইরকম ভাবে বিভিন্ন পাখীর পালক, প্রজাপতি, ফড়িং ইত্যাদিও ছাত্র-ছাত্রীরা সংগ্রহ করবে। আবার ঋতু-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কী ভাবে প্রকৃতির রূপ বদলায় তাও তারা লক্ষ্য করে ডায়েরীতে লিখে রাখবে।

কমন রুম এবং পাঠচক্র পরিচালনা (Running Common Room and Study Group) করাও বিদ্যালয়কৃতির অন্যতম কাজ। ক্লাস ও পড়াশোনার একঘেয়েমির হাত থেকে সাময়িক মুক্তি পাওয়ার জন্যে বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের কমন রুমের প্রয়োজন আছে। অবসর-সময়ে তারা কমন রুম ব্যবহার করবে। কমন রুমে থাকবে বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকা, বিভিন্ন ইনডোর গেম্‌স্‌-এর ব্যবস্থাও রাখা যেতে পারে। অবসর-বিনোদনের জন্যে হলেও কমন রুমে যাতে অনর্থক গণ্ডগোল বা বিশৃঙ্খলা না হয়, এ-বিষয়ে ছাত্রছাত্রীদের দৃষ্টি রাখা দরকার। অবশ্য, এসব বিষয়ে ভারপ্রাপ্ত ছাত্র বা ছাত্রীরাই সচেষ্ট থাকবে, তারা সব সময়ই ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক বা শিক্ষিকার উপদেশ ও পরামর্শ অনুযায়ী চলবে।

কোনও বিশেষ বিষয়ে পাঠচক্র বা আলোচনা-চক্র পরিচালনাও কমন রুমের মাধ্যমেই সাধারণতঃ করা হয়। যেমন, ধরা যাক, স্থির হল 'বাংলা সাহিত্যে স্বদেশপ্রেম' নিয়ে একটি আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হবে। সেখানে ঐ বিষয়ে ছাত্রছাত্রীরা তাদের নিজেদের বক্তব্য রচনা-আকারে লিখে এনে উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীর সামনে পড়ে শোনাবে। তারপর শেষে আলোচনা চালানোর

---

*পরিশিষ্ট (গ) দ্রষ্টব্য।

ভার যে-শিক্ষকের উপর থাকবে তিনি প্রত্যেকের রচনার সংক্ষিপ্তসার বলে সমস্ত বিষয়টি সম্পর্কে তাঁর সুচিন্তিত অভিমত দেবেন।

নাট্যাভিনয় (Drama), বিতর্ক (Debate), বাগ্মিতা প্রতিযোগিতা (Elocution Competition),* আবৃত্তি প্রতিযোগিতা (Recitation Competition), চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা (Drawing Competition), সঙ্গীত প্রতিযোগিতা (Music Competition) প্রভৃতির মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতিভার স্ফুরণ সম্ভব। যোগ্যতা অনুসারে ছাত্র-ছাত্রীদের এইসব 'extra-curricular' কাজে অংশগ্রহণ করতে উৎসাহিত করবেন ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক বা শিক্ষিকা। সব চেয়ে ভালো হয় যদি এইসব অনুষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্ব নেবার জন্যে বিদ্যালয়ের একটি স্থায়ী সাংস্কৃতিক পরিষদ থাকে। অবশ্য এই পরিষদ প্রতি মাসেই যাতে পুনর্গঠিত হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত।

এইসব অনুষ্ঠান সম্পর্কে প্রথমে সাধারণ কয়েকটি কথা বলে নেওয়া যেতে পারে :—

(১) যে কোনও ব্যাপারেই বিষয়বস্তু নির্বাচন করবেন ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক এবং তাঁদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হবে। এ নিয়ে কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। প্রয়োজনবোধে বাইরে থেকে খ্যাতনামা ব্যক্তিদের সভাপতি ইত্যাদি করে আনা যেতে পারে।

(২) অনুষ্ঠানের সাংগঠনিক দিকটি অবশ্য ছাত্র বা ছাত্রীদের হাতেই অর্থাৎ সাংস্কৃতিক পরিষদের হাতে থাকবে। সাংস্কৃতিক পরিষদের সম্পাদক বা সম্পাদিকা যে ছাত্র বা ছাত্রী হবে সে স্থির করে নেবে অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন করার জন্যে সাংস্কৃতিক পরিষদের সদস্যরা ছাড়াও আর কারা কাজ করবে।

(৩) বিচারে বা কৃতিত্বের মূল্যায়নে শিক্ষকের নিরপেক্ষতার উপর পূর্ণ আস্থা রাখতে হবে ছাত্র-ছাত্রীদের।

(৪) এ-সব অনুষ্ঠানে অভিভাবক-অভিভাবিকা বা বাইরের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ করে আনা হলে তাঁদেব কাছে যাতে বিদ্যালয়ের মর্যাদা অক্ষুন্ন থাকে সে বিষয়ে প্রত্যেকটি ছাত্র-ছাত্রীকে সচেতন থাকতে হবে।

নাট্যাভিনয়ের উপযুক্ত কতকগুলি নাটকের বা নাট্যাংশের কথা এখানে বলা হল :—The Selfish Giant (Oscar Wilde) এর নাট্যরূপ,

The Merchant of Venice (Shakespeare)-এর বিচার-দৃশ্য, Macbeth এর অংশবিশেষ। **রবীন্দ্রনাথের** ডাকঘর, শারদোৎসব, লক্ষ্মীর পরীক্ষা (ছাত্রীদের উপযোগী), বিনি পয়সার ভোজ।

বিতর্কের উপযোগী কয়েকটি বিষয়

১। বিজ্ঞান আশীর্বাদ না অভিশাপ

২। ছাত্রদের রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করা উচিত কিনা

৩। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হয় কিনা

৪। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলিতে দেশের কোনও উন্নতি হয়েছে কিনা

৫। আমাদের পূর্বপুরুষরা আমাদের চেয়ে সুখী ছিলেন

৬। শান্তির জন্যে যুদ্ধপ্রস্তুতি চাই একথা সত্য কিনা

৭। সাহিত্য বনাম বিজ্ঞান

৮। 'আর্ট ফর আর্টস্ সেক'

৯। রাজনীতিতে নারীর স্থান আছে কিনা

১০। সামরিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা উচিত কিনা

১১। সহশিক্ষা বাঞ্ছনীয় কিনা

১২। অহিংসার আদর্শ এযুগে অচল কিনা

১৩। ধর্মঘট নিষিদ্ধ করা উচিত কিনা

১৪। ধনতন্ত্র বনাম সমাজতন্ত্র

১৫। শিক্ষাদানের মাধ্যম কোন্ ভাষা হবে

আবৃত্তির উপযুক্ত কয়েকটি কবিতা

নজরুল: বিদ্রোহী, সাম্যবাদী, ফরিয়াদ, আমার কৈফিয়ৎ, দারিদ্র্য, লিচু-চোর ইত্যাদি।

সুকান্ত: একটি মোরগের কাহিনী, রানার, লেনিন ইত্যাদি।

জীবনানন্দ: বেড়াল, শকুন, বনলতা সেন, বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, আবার আসিব ফিরে, ভিখিরী ইত্যাদি।

রবীন্দ্রনাথ: নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ, প্রাণ, কাঙালিনী, বধূ, দুরন্ত আশা, মেঘদূত, সোনার তরী, যেতে নাহি দিব, ঝুলন, বসুন্ধরা, এবার ফিরাও মোরে, মধ্যাহ্ন, সভ্যতার প্রতি, বঙ্গমাতা, পদ্মা, অতীত, ব্রাহ্মণ, পূজারিণী, অভিসার, বন্দীবীর, নকল গড়, পণরক্ষা, পুরাতন ভৃত্য, দেবতার গ্রাস, দুঃসময়, বর্ষামঙ্গল,

শবৎ, জুতা আবিষ্কার, অশেষ, বর্ষশেষ, বৈশাখ, যথাস্থান, সেকাল, সুখ-দুঃখ, বীবপুরুষ, দুই বিঘা জমি, প্রশ্ন, ভারততীর্থ, আফ্রিকা, বলাকা, শা-জাহান, নমস্কাব, সুপ্রভাত।

সুকুমার রায়ঃ গোঁফচুবি, সৎপাত্র, খুড়োব কল, বাবুবাম সাপুড়ে, নাবদ! নাবদ! বামগরুড়েব ছানা, পালোযান, নোট বই ইত্যাদি।

সত্যেন্দ্রনাথঃ ঝর্ণা, গান্ধীজী।

যতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চীঃ সিংহগড, অন্ধবধূ।

প্রেমেন্দ্র মিত্রঃ সুদূবেব আহ্বান।

কবিতাব বিষযবস্তু অনুসাবে শ্রেণীবিভাগ কববেন অর্থাৎ কোন্ কবিতা কোন্ শ্রেণীব ছাত্র-ছাত্রীব আবৃত্তিব জন্যে তা ঠিক কববেন ভাবপ্রাপ্ত শিক্ষক বা শিক্ষিকা। চিত্রাঙ্কন ও সঙ্গীত প্রতিযোগিতাব বিষযবস্তু সংশ্লিষ্ট শিক্ষক বা শিক্ষিবাই স্থিব কবতে পাববেন।

মনে রাখতে হবে, এইসব ক্রিয়াকাণ্ডে প্রত্যেকটি ছাত্র-ছাত্রীরই অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক। প্রত্যেকটিতেই প্রত্যেকেব অংশগ্রহণ সম্ভব বা বাঞ্ছনীয নয়, কিন্তু প্রবণতা ও দক্ষতা অনুসাবে তাবা নিজেদেব ক্ষেত্র বেছে নিযে এক বা একাধিক বিষযেব অনুষ্ঠানে যোগ দেবে এটাই উচিত। কেউ হযতো বিতর্ক প্রতিযোগিতা, অঙ্কন প্রতিযোগিতা ইত্যাদিতে দক্ষতা দেখাতে না পাবে বা ওগুলি তাব ভালো নাও লাগতে পাবে, দেখা গেল হযতো আবৃত্তি, গান ও নাটক তাব ভালো লাগে এবং এগুলি সে পাবেও ভালো। এইভাবেই **নিজ নিজ ক্ষেত্র ঠিক করে নিতে হবে ছাত্র-ছাত্রীদের।** এ-বিষয়ে শিক্ষকেব অভিজ্ঞতাপ্রসূত পবামর্শ বা উপদেশ তাদেব পথ দেখাবে বলে আশা কবা যায়।

বিদ্যালয়-পত্রিকাকে (School magazine) একদিক থেকে ভবিষ্যতেব সাহিত্যিক তৈবীব পবীক্ষাগাব বা ল্যাবোবেটবী বলা যায়। কাব মধ্যে কী প্রতিভা লুকোন আছে তা কেউ জানে না। হয়তো সে নিজেও না। বিদ্যালয়-পত্রিকাতে লিখতে লিখতেই তার সুপ্ত প্রতিভাব আত্মপ্রকাশ সম্ভব হয়ে উঠবে। শুধু লেখা নয, পত্রিকাব জন্যে শিক্ষকদেব কাছ থেকে বা ছাত্র-ছাত্রীদেব কাছ থেকে লেখা সংগ্রহ কবা, নির্বাচিত লেখাগুলি ছাপানোব ব্যবস্থা কবা, ইত্যাদি পবিচালনাগত দিকটির দাযিত্বও ছাত্রবা পালন কববে। অবশ্য সকলে একই কাজ কবতে গেলে বিশৃঙ্খলাব সম্ভাবনা, তাই কাজ ভাগ করে নেওয়াই ভালো। পত্রিকা সমিতিতে যে-সব ছাত্র-প্রতিনিধি থাকবে তাদের উপবই দায়িত্ব

এসে পড়বে সব চেয়ে বেশী। পত্রিকা প্রেসে ছাপতে দিতে গিয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা মুদ্রণ-পদ্ধতির সমস্ত দিক সম্পর্কে জানতে পারবে। কী ভাবে মুদ্রণযোগ্য বিষয় 'কম্পোজ' করা হয়, কম্পোজ-করা জিনিস সংশোধন করা হয়, ফর্মা 'মেক-আপ' করা হয়, ব্লক বসাতে হয়—ইত্যাদি সব জিনিসই তারা শিখতে পারবে। শিক্ষক মহাশয়ও সব কিছু ছাত্রদের বুঝিয়ে দিতে পারবেন।

প্রত্যেক ক্লাসে ছাত্র-ছাত্রীরা **ক্লাস লাইব্রেরী** গড়ে তুলতে পারে। স্কুলের লাইব্রেরী তো আছেই। কিন্তু নিজেদের পাওয়া উপহারের বই এবং পাঠ্য বিষয়ের উপরও নানারকম বই দিয়ে গড়ে তোলা ক্লাস লাইব্রেরীটি সম্পূর্ণভাবে তাদের নিজস্ব জিনিস হবে। লাইব্রেরী থেকে বই নিয়ে পড়া ছাড়াও ছাত্র-ছাত্রীরা ক্লাস লাইব্রেরী থেকে অনেক বিষয় শিক্ষা পাবে, যেমন—পুস্তক-সংরক্ষণের উপযুক্ত পদ্ধতি এবং গ্রন্থাগার পরিচালনা। গ্রন্থাগার পরিচালনা করতে গেলে প্রত্যেক ছাত্র বা ছাত্রী এক-এক সপ্তাহ করে গ্রন্থাগারিকের কাজ করবে। গ্রন্থাগারিকের কাজ করতে গিয়ে গ্রন্থ বর্গীকরণের ও শ্রেণীবিভক্তীকরণের কাজও (Cataloguing and classification) তারা কিছুটা শিখতে পারবে।

ছাত্র-ছাত্রীদের আগ্রহ থাকলে **বিদ্যালয়ের সংগ্রহশালা** নানাভাবে সমৃদ্ধ হয়ে উঠতে পারে। সংগ্রহশালা যদিও বিদ্যালয়-কর্তৃপক্ষের উদ্যোগেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে, ছাত্র-ছাত্রীরা নানারকম দুষ্প্রাপ্য মুদ্রা, ডাকটিকিট, বই, পাণ্ডুলিপি, ছবি ইত্যাদি সংগ্রহ করে এনে সেখানে জমা করলে বাইরের লোকেদের কাছেও সংগ্রহশালাটি আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে. সংগ্রহ-করা উদ্ভিদ ও প্রাণী ছাত্র-ছাত্রীরা কীভাবে সংরক্ষণ করবে সে সম্পর্কে আগেই বলা হয়েছে—এই সংগ্রহগুলিও বিদ্যালয়ের সংগ্রহশালায় স্থান পাবে। এলাকা-ভিত্তিতে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের সংগ্রহশালার মধ্যে প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করলে ছাত্র-ছাত্রীদের যে এ-বিষয়ে উৎসাহ বৃদ্ধি পাবে তাতে সন্দেহ নেই।

পরিশিষ্ট (ক)

ওয়ার্ক বুক লেখার পদ্ধতির নমুনা

আজ যা দেখে এলাম

তারিখ······ পরিচালক শিক্ষক শ্রী······

কোন্ কর্মকেন্দ্র দেখে এলাম······

স্কুল থেকে সেটি কত দূরে······

কতজন গিয়েছিলাম······

১। সেখানে কী করা হয়ে থাকে এবং কী ভাবে ?······

....

.. ..

....

২। কতজন ব্যক্তি সেই কর্মে বা কর্মকেন্দ্রে নিযুক্ত ?

(ক) আমার গ্রামে/শহরে··· ····

(খ) জেলায়······

(গ) রাজ্যে···

(ঘ) রাষ্ট্রে······ ·

৩। সেই কর্মকেন্দ্রে সরাসরি কী উৎপন্ন হয় বা কী কিনতে পাওয়া যায় ?

....

(ক) জিনিসটি তৈরী করতে কী কী উপকরণ লাগে······

....

(খ) আনুমানিক মূলধন··· ·

(গ) উৎপন্ন দ্রব্যের/দ্রব্যাদির বাজার দর···· ·

(ঘ) আনুমানিক লাভ······

(ঙ) উৎপন্ন দ্রব্য কী ভাবে বাজারে পাঠানো হয়ে থাকে ?

... .

রপ্তানি করার সুযোগ আছে কি ?······

৪। কর্মটির উপযোগিতা—

(ক) দেশের কাছে··· ·

....

(খ) আমার ও আমার পরিবারের ব্যক্তিদের কাছে

......

৫ কর্মীদের কী কী বিষয়ে অসুবিধা হয়ে থাকে ?

......

......

৬। কোন্ কোন্ বিষয়ে উন্নতি করা যায় ও কী ভাবে ?

......

.....

......

......

৭। আমাদের স্কুলে অনুরূপ কর্মকেন্দ্র স্থাপনের সুবিধা/অসুবিধা

......

......

৮। আমার অভিমত :

এই কারণ বা কারণগুলির জন্যে আমি কর্মক্ষেত্রটির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছি/হতে পারিনি

....

....

৯। ফিরে আসার পর পরিচালক শিক্ষক মহাশয়ের সঙ্গে কী আলোচনা হল ?................. ....

ছাত্রের/ছাত্রীর স্বাক্ষর .... শিক্ষকের/শিক্ষিকার স্বাক্ষর .... তারিখ ....

আজ নিজের হাতে করলাম

তারিখ......

কী করেছি......,

১। (ক) কী কী যন্ত্রপাতি ও উপকরণ লেগেছে ?... ..

(খ) কত সময় লেগেছে ?......

২। উপকরণগুলি সংগ্রহ করা হয়েছে কী ভাবে ?......

৩। কী ভাবে জিনিসটি তৈরী করলাম/কাজটি করলাম......

আমার কী কী অসুবিধা হয়েছে......

৫। কী ভাবে আরো ভালো করা যায়……

৬। কোনও উপকরণের অপচয় ঘটেছে কি? ঘটলে কেন ঘটেছে এবং তা কী ভাবে এড়ানো সম্ভব?……

৭। যে জিনিস/কাজ করলাম কে বা কারা সেটি ব্যবহার করবে বা তাতে উপকৃত হবে?……

৮। কী কী ত্রুটি রয়ে গেল জিনিস/কাজ সম্পর্কে?……

৯। কাজটি করে আনন্দ পেয়েছি কিনা……

তার কারণ ….

১০। শিক্ষক মহাশয়ের/শিক্ষিকার মন্তব্য……

ছাত্রের/ছাত্রীব স্বাক্ষর	শিক্ষকের/শিক্ষিকার স্বাক্ষর	তারিখ
………	………	…………

"ওয়ার্ক বুক"-এর পাতায় কী ভাবে অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করতে হবে প্রশ্ন আকাবে তার নমুনা উপবে দেওয়া হল। ওয়ার্ক বুকটি হবে ল্যাবরেটরী নোট বুকের মত—বাঁ দিকের সাদা পৃষ্ঠায় ছবি **আঁকা** থাকবে এবং ডান দিকেব লাইন-টানা পৃষ্ঠাগুলি উপরের বা অনুরূপ প্রশ্নমালার উত্তব ছাত্র-ছাত্রীবা **কারও সাহায্য না নিয়ে** লিখে ভর্তি কববে। যেখানে কিছু উত্তব দেওয়াব নেই সেখানে '×' চিহ্ন দেবে।

প্রশ্নগুলি (ও উত্তর লেখাব প্রয়োজনমত জায়গা) যদি ওয়ার্ক বুকে ছাপানো থাকে তাহলে খুবই ভালো হয়। মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ অবশ্য এ-পর্যন্ত কোনও আদর্শ ওয়ার্ক বুক প্রকাশিত করেন নি। জায়গাগুলি লিখে ভর্তি করার আগে শিক্ষক/শিক্ষিকাব কাছে কোনও একদিন শিখে নিতে হবে কোথায় কী লিখতে হয়। যে পাতায় লেখা শুরু হচ্ছে তার বাঁ দিকের পাতায় ছবি থাকবে। ছবি নিজেরা আঁকতে পারলেই ভালো।

পরিশিষ্ট (খ)

সুতো-কাটার হিসাব রাখার ছক

তারিখ	পাঁজের ওজন	উৎপন্ন সুতো				পাঁজ ফেরত	অপচয়	মোট পাঁজের হিসাব	পদ্ধতি		সুতো জড়ান		দোবটী		মন্তব্য
		সময়	গুণ্ডী	তার	ওজন				আসন	বাম বা ডান হাত	সময়	তার	সময়	গুণ্ডী	